মাহিষ্য-সমাজ।

(বঙ্গীয় মাহিষ্য-জাতির মাসিক মুখপত্র)

দ্বিতীয় ভাগ—১৩১৯।

সম্পাদক—শ্রীসেবানন্দ ভারতী।

MAHISHYA-SAMAJ:

A Vernacular Monthly Organ of the Mahishya Community of Bengal.

Vol. II.

EDITOR—SEBANANDA BHARATI.

কলিকাতা,

২৭ ও ৩৮ নং পুলিশ হাসপাতাল রোড, ইটালী,

বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতি কার্য্যালয় হইতে

শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এবং

বহুবাজার, ১৪ নং মদন বড়াল লেন, "লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে"

প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(২য় ভাগ—১৩১৯)

মাহিষ্য-সমাজ।

(বঙ্গীয় মাহিষ্য-জাতির মাসিক মুখপত্র)

দ্বিতীয় ভাগ—১৩১৯।

সম্পাদক—শ্রীসেবানন্দ ভারতী।

MAHISHYA-SAMAJ:

A Vernacular Monthly Organ of the Mahishya Community of Bengal.

Vol. II.

EDITOR—SEBANANDA BHARATI.

কলিকাতা,
২৭ ও ৩৮ নং পুলিশ হাসপাতাল রোড, ইটালী,
বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতি কার্যালয় হইতে
শ্রীনরেন্দ্র নাথ দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
বহুবাজার, ১৪ নং মদন বড়াল লেন, "লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ যন্ত্রে"
প্রকাশক কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

বঙ্গীয় কৃষি-পরিষৎ।

বাঙ্গলা দেশের কৃষির উন্নতিকল্পে পরামর্শ করিবার জন্য—গবর্ণমেণ্টের সহিত একযোগে কার্য্য করিয়া ভারতীয় কৃষি-বিজ্ঞানের গবেষণা করার জন্য—বিভিন্ন দেশে প্রচলিত নূতন পদ্ধতির অনুসরণ করিয়া এই দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে কৃষিকার্য্যের বিস্তারের সহিত অধিক পরিমাণে শস্যাদি উৎপাদনের পন্থা আবিষ্কারের জন্য—প্রকৃতপক্ষে কৃষিতে অনুরক্ত ব্যক্তিগণ যাহাতে একত্র চিন্তা ও পরামর্শ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে "বঙ্গীয় কৃষি-পরিষৎ" নামক একটী সভা গঠনের আয়োজন করা যাইতেছে। মৌলিক কৃষিজীবী ব্যক্তিমাত্রেই এই সভার সদস্য পদে নির্ব্বাচিত হইয়া যাহাতে সত্বর ইহার কার্য্য আরম্ভ করেন, তৎপ্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে। এই পরিষদের সদস্য পদ গ্রহণ করিবার জন্য নিম্ন ঠিকানায় পত্র লিখুন ঃ—

শ্রীকালীপদ দাস,
১৭ নং অন্নদা প্রসাদ বানার্জির লেন,
ভবানীপুর, কলিকাতা।

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

(২য় ভাগ—১৩১৯)

মাহিষ্য-সমাজ।

দ্বিতীয় ভাগ।

শিক্ষা-প্রচারের অন্তরায়।

হিন্দুর সর্ব্বজাতি মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিবার জন্য কোন কোন সম্প্রদায়ে একটা নূতন আড়ম্বর চলিয়াছে। এই বিশ্বপ্রেমের মূলে অনেক কথা, অনেক ভাব, অনেক রাজনৈতিক দাবার চাল নিহিত আছে, বলিয়াই বোধ হয়।

অনেকেই জানেন, বিলাতের লোক ও গবর্ণমেণ্ট এ দেশের এক সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদিগকে জনসাধারণের প্রতিনিধি বলিয়া কদাচ গ্রহণ করেন না, করিতে পারেনও না। হিন্দু সমাজের যে ২।৩টি জাতির সঙ্গে উহাঁদের বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব সজাতীয়তা আছে, ইহাঁরা সেই দুই তিনটী জাতির প্রতিনিধি বলিয়াও স্বীকৃত নহেন। কোন দিন অন্যান্য জাতি যে ইহাঁদিগকে নিজের প্রতিনিধি করিয়াছেন, কি প্রতিনিধি বলিয়া স্বীকার করেন, তাহা এ দেশের লোকে জানে না। তথাপি ইহাঁরা সকলের নেতা !! এইরূপ আত্মকৃত প্রতিনিধি হওয়ার নিয়ম এই অজ্ঞবহুল দেশেই প্রচলিত, অন্য দেশে এই কুপ্রথা চলিতে পারে না। যদি শিক্ষাপ্রচারের ধূয়া ধরিয়া সর্ব্বজাতির প্রতিনিধিরূপে খাড়া হওয়া সম্ভব হয়, সে সুযোগ ইহাঁরা কখন পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ইহা স্বাভাবিক। যে দেশে অনাহূত ও আত্মকৃত প্রতিনিধিত্বের কোন দণ্ডবিধান নাই, সে দেশে এই আকারের বিড়ম্বনা দীর্ঘকালই চলিবে।

"আত্মকৃত প্রতিনিধিগণের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতি সাধারণের শাসন-দৃষ্টি নাই বলিয়া—জনসাধারণ উদাসীন বলিয়া—বাঙ্গালী জাতির কি গুরুতর অনিষ্ট সাধিত হইল, তাহা জনসাধারণকে বুঝাইতে হইবে না; অন্ততঃ কলি-

কাতার ভূম্যধিকারী, দালাল, ইমারতওয়ালা, সওদাগর ও শ্রমজীবিগণকে, বিশেষতঃ চাকুরীজীবিগণকে বুঝাইতে হইবে না। অতীব দুঃখের কথা—অতীব লজ্জার কথা—দেশবাসী, কলিকাতাবাসী কি কুহকে, কি মন্ত্রে ভুলিয়া, এই গুরুতর ক্ষতিকারী সম্প্রদায়ের কোনরূপ দণ্ডবিধান করিলেন না! সকলে মিলিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া একটা অভিশাপ পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে প্রদান করিলেন না!! আমরা জানি, অন্তরে অন্তরে তাঁহাদিগকে কে কি আশীর্ব্বাদ করিতেছেন!!! এত বিড়ম্বনার পরেও, আবার তাঁহারাই, কি সাহসে বলিতে পারি না, সামাজিক কার্য্যে পর্য্যন্ত হস্ত-প্রসারণের উদ্যোগ করিতেছেন। কোন কোন শিক্ষিত শ্রেণীর কতিপয় লোকে মনে করিতে পারেন, এই সুযোগে তাঁহাদের সামাজিক সম্মানের দাবিটা প্রচারিত ও গৃহীত হইবে, তাহাতে ক্ষতির কথা নাই; কিন্তু ক্ষতি যে অতি গুরুতর হইয়া দাঁড়াইবে, তাহা তাঁহাদের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

এই নবীন শিক্ষা-প্রচারের উদ্যমকে জাতিসাধারণ কখনও সমাদর করিবেন কি না, ঘোর সন্দেহ। আমাদের দেশে জাতি সাধারণ শিক্ষার জন্য যে পরিমাণে ট্যাক্স প্রদান করেন, ঐ ট্যাক্স দ্বারা মাত্র ২।৩টি জাতির কতিপয় লোক শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছেন; যাঁহারা ট্যাক্স দান করেন, তাঁহারা ঐ টাকা দ্বারা কোন উপকার প্রাপ্ত হন না। জগতের কোন সমাজে এই আকারের বিচার দেখা যায় না—কিন্তু ভারতবর্ষে, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে, তাহা বেশ হইয়া আসিতেছে। দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছি। মনে করুন, বাঙ্গলাদেশে প্রতি বৎসর যেন এক কোটী টাকা শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হয়। অল্পদিন পুর্ব্ব পর্য্যন্ত এই এক কোটী টাকা দ্বারা কেবল উচ্চ শিক্ষাই বিস্তৃত হইতেছিল। উচ্চশিক্ষার স্কুল কলেজে ২।৩টী হিন্দু জাতীয় কতিপয় ছাত্র দ্বারাই পরিপূর্ণ। অন্যান্য জাতি এ যাবৎ এই সকল স্কুল কলেজে পড়া শুনা করিত না। মনে করুন, এই সকল ছাত্রের বেতন দ্বারা এক কোটী টাকার মধ্যে মাত্র এক লক্ষ টাকা উঠিয়া থাকে এবং বাকী ৯৯ লক্ষ টাকা গুবর্ণমেণ্ট দান করিয়া থাকেন। গবর্ণমেণ্ট এই ৯৯ লক্ষ টাকা প্রদান না করিলে তৎক্ষণাৎ উচ্চশিক্ষা বন্ধ হইয়া যায়। গবর্ণমেণ্ট এই ৯৯ লক্ষ টাকা ৪॥০ কোটী মুসলমান ও আ০ কোটী হিন্দু হইতে ট্যাক্সের আকারে উঠাইয়া থাকেন। যে দুই তিনটী জাতীয় ছাত্রগণ ঐ সকল বিদ্যালয়ে পাঠ করে, তাহাদের জনসংখ্যা ২০।২৫ লক্ষের অধিক নহে। কাজেই ৮ আট কোটী লোকের মধ্যে ইঁহাদের

সংখ্যাও যেমন নগণ্য, ইহাঁদের প্রদত্ত ট্যাক্সের ভাগও তেমনি নগণ্য—অর্থাৎ উপরিবর্ণিত ৯৯ লক্ষ টাকার মধ্যে ইহাঁদের প্রদত্ত ট্যাক্স কিছুই নহে। অথচ ইহাঁদেরই কতকগুলি লোক অন্যের প্রদত্ত ৯৯ লক্ষ টাকার ষোল আনা উপস্বত্ব ভোগ করেন। আমাদের দেশের অন্যান্য জাতি খুব অজ্ঞান বলিয়াই এই সকল কথা বুঝেন না, প্রতিবাদও করেন না। কাজেই ব্যাপার এই দাঁড়াইয়াছে যে, এ দেশের অন্যান্য জাতি বাধ্য হইয়া নিজ পুত্র সন্তানদিগকে শিক্ষা না দিয়া, ঐ ২।৩টী জাতীয় কতকটী লোকের পড়াশুনার খরচ চালাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়িতেছেন। তাঁহাদের পক্ষে কথা বলিবার একটী লোকও নাই। ইহারা কতকাল যে এইরূপ পোষ্য পুত্র পালন করিবে, বলা যায় না; বিগত অর্দ্ধশতাব্দী যাবৎ এইরূপ চলিয়াছে। অথচ যাহারা নিজের পিতার অর্থ দ্বারা বিদ্যাশিক্ষা না করিয়া অন্যজাতীয় লোকের প্রদত্ত অর্থদ্বারা বিদ্যা শিক্ষা করেন, তাঁহাদের নিকট হইতে সেই অন্যান্য জাতি কিছুমাত্র প্রতিদান প্রাপ্ত হইতেছেন না। প্রতিদান পাওয়া ত দূরের কথা, তাঁহারা নিজ টাকা দ্বারা অন্যজাতীয় লোকদিগকে লেখা পড়া শিখাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে নিয়ত অবজ্ঞা ও গালিভক্ষণ করেন, অপমান ভোগও করেন।

দেশহিতৈষী বিদ্যাদাতৃগণ এই সুযোগ অত্যধিক ভোগ করিতেছেন। যাঁহারা পরের প্রদত্ত অর্থে অনেক বিদ্যা ও অনেক ধন উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে অন্যের প্রদত্ত অর্থ আর গ্রহণ করা উচিত নহে, অন্যের শ্রমার্জ্জিত অর্থ আর অপহরণ করা সঙ্গত নহে। নেতৃগণ ন্যায়বান্ গবর্ণমেণ্টকে বলুন, তাঁহারা অতঃপর নিজের ব্যয় নিজেই বহন করিবেন, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য দেশবাসীর প্রদত্ত ট্যাক্সের ভাগ হইতে গবর্ণমেণ্ট-প্রদত্ত অর্থ ব্যয়িত হওয়া অনাবশ্যক। তাঁহারা নিজের ব্যয় নিজে বহন করুন। তাহা হইলেই ত অন্যান্য জাতি নিজ নিজ প্রদত্ত অর্থ দ্বারা অনেকটা শিক্ষালাভ করিতে পারিবেন। তাহার উপর যদি কিছু অধিক চাঁদা ট্যাক্স আকারে গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিতে পারেন, তবে তাঁহাদের শিক্ষালাভ আরও সহজ হইবে।

দেশহিতৈষী মহাত্মারা এই দিকে দৃষ্টি করিবেন না; তাঁহাদের মতলব এই—"তোমরা পোষ্যপুত্র শিক্ষাদানের ব্যয় ত বহন করিবেই করিবে, তাহার উপর আরো চাঁদা করিয়া আমাদের হস্তে প্রদান কর, উহার কতক আমাদের পারিশ্রমিক ব্যয় বাবদ রাখিয়া, বাকী টাকা দ্বারা তোমাদের ছেলেদের কিছু মুণ্ডপাত করিয়া দিই।"

সকলেই অবগত আছেন, এ দেশের কৃষকগণই পর্য্যাপ্ত কর দান করিয়া থাকেন। হিন্দু কৃষকদিগের মধ্যে আগুরী, সদ্গোপ ও চাষীকৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) মৌলিক কৃষিজীবী বলিয়া সকল লেখক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতন্মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দুই জাতির জনসংখ্যা অনেক কম। মাহিষ্যের জনসংখ্যা প্রায় বিশ লক্ষ। এই প্রকাণ্ড ও প্রবল সম্প্রদায় বিগত ৬০ বৎসর যাবৎ শিক্ষার জন্য অনেক কোটী টাকা প্রদান করিয়াছেন। এই করভারদায়ী কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তার অপরিহার্য্য হইয়া পড়িয়াছে। কৃষক সম্প্রদায়ের জন্য উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজে প্রভৃত বৃত্তি ও ফ্রীশিপ স্থাপিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছে। এখন এই সকল সহিষ্ণু জাতির উচ্চশিক্ষার্থে গবর্ণমেণ্ট অবশ্যই বিশেষ বিধান করিবেন। যাহাতে ন্যায়পরায়ণ গবর্ণমেণ্ট এই সকল শিক্ষা বিস্তার কার্য্যে সফলকাম হইতে পারেন, স্বার্থপর লোকে কোন বাধা না দিতে পারে, তাহাই আমাদের মিলিতভাবে দেখা কর্ত্তব্য। ন্যায়-পরায়ণ বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট মৌলিক কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের হিতসাধন করিবেন, এই আশঙ্কাতেই স্বার্থপরায়ণ সম্প্রদায় গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন—পাছে স্বার্থে আঘাত লাগে। কিন্তু তাঁহারা ভাবুন যে, তাঁহাদের হিসাব নিকাশের দিন ঘনাইয়াছে—লোকের ঘুম ভাঙ্গিতেছে।

সত্যবাদী।

অবনতির ইতিহাস (১)।

সংসারে যে কোনও ব্যক্তি বা জাতি উন্নতি লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহার একবার আপন বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষ করিয়া ভাবিয়া দেখা উচিত। উন্নতিকামী ব্যক্তি বা জাতিমাত্রেরই এই দুইটীর একটী অবস্থা থাকিতে পারে,—হয় সে ইতিপূর্ব্বে উন্নত ছিল এবং সকলের সম্মানভাজন হইয়া পরম সুখে দিন কাটাইত, সহসা কোনও প্রতিকূল অবস্থায় তাহার সে সুখের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে—আনন্দের খেলায় বাধা পড়িয়াছে, তাই সে এখন আবার দুঃখের সাগর পার হইয়া সুখের রাজ্যে—উন্নতির অবস্থায়—উঠিতে চাহে; আর না হয় সে কোনকালেই সুখের আস্বাদ পায় নাই, দুঃখে দুঃখে অবনতির আবিল পঙ্কে

এতকাল কাটাইয়াছে, এখন চারিদিকে সুখের কোলাহল শুনিয়া উন্নতির মধুর ফল চিন্তা করিয়া কোনও উপায়ে সে দিকে যাইতে অভিলাষী হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সুখ হইতে দুঃখে পড়িয়াছে, উন্নতির উচ্চ শিখর হইতে অবনতির গভীর কূপে পতিত হইয়াছে, তাহাদেরই আবার উঠিবার সম্ভাবনা অধিক। তাহারা যত্ন করিলেই সুখের দিন পাইতে পারে। আমাদের মাহিষ্যজাতির অবস্থাও এইরূপ। মাহিষ্যজাতি একদিন তদানীন্তন জগতে উন্নতির শিখরদেশে বিরাজ করিয়াছিল, নিয়তির কঠোর শাসনে এখন সে অবনতির আঁধারকূপে নিমগ্ন-প্রায়। এখন পুনরায় উঠিতে হইবে। এই উত্থানকালে দুইটী বিষয় ভাবিয়া দেখা উচিত। প্রথমতঃ আমরা 'কি ছিলাম' আর 'কি হইয়াছি', দ্বিতীয়তঃ 'কি কি কারণে' আমরা পূর্ব্বের অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িয়াছি। প্রথমটী সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে 'সেবিকা' ও 'মাহিষ্য-সমাজে' কতক আলোচনা হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রকৃত কথা সর্ব্বসাধারণকে তত স্পষ্ট করিয়া বলা হয় নাই। বিশেষতঃ আমাদের পতনের কারণগুলির বিশেষ কিছু আলোচনাই হয় নাই বলিতে হইবে। এই প্রবন্ধে আমরা অতি সরল ভাষায় মাহিষ্য ভ্রাতৃগণের সম্মুখে প্রকৃত অবস্থাগুলি একে একে আঁকিয়া দেখাইতে বাসনা করি।

এই গুরুতর বিষয়টীর সম্পূর্ণ অংশ নিম্নলিখিত কয়েকটীভাগে বিভক্ত করিয়া একে একে আলোচনা করিব। যথা :—(১) জমিদারীর কথা (২) লেখা-পড়া ও সরকারী চাকুরীর কথা (৩) ব্যবসায় ও বাণিজ্যের কথা (৪) কৃষি-কথা (৫) উপসংহার।

১। জমিদারীর কথা।

প্রথম কথা, প্রাচীনকালে জমিদারীর অবস্থা কিরূপ ছিল। আমরা অতি পূর্ব্বকালের কথা বলিব না। প্রাচীন মাহিষ্যরাজ্য সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে অনেক কথাই আলোচনা হইয়াছে। মাহিষ্য-সমাজ সম্পাদক শ্রীযুক্ত সেবানন্দ ভারতী মহাশয় সম্প্রতি "বাঙ্গলায় মাহিষ্যাধিকার" নামক প্রবন্ধে এ বিষয়ে অতি সুন্দররূপে কিছু কিছু আলোচনা করিতেছেন। আমরা বাঙ্গালায় মুসলমান রাজত্বের সময়ে মফঃস্বলস্থ গ্রামগুলির কথা লইয়া আরম্ভ করিব। সে বড় অধিক দিনের কথা নহে। ঊর্দ্ধতন ১০।১২ পুরুষের কীর্ত্তিকলাপ অনেকের গৃহেই ঠাকুরমার উপকথার মত বৃদ্ধ লোকদের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়।

প্রতিবেশী স্বজাতীয় কিংবা অপরজাতীয় প্রাচীন লোকদের নিকট বসিয়া গল্প শুনিতে থাকিলে, অনেকের ইতিহাস খণ্ড খণ্ড ভাবে সংগ্রহ করা যাইতে পারে। মুদ্রিত পুস্তকে এ সব কথা বড় পাওয়া যাইবে না। যে সময় নদের চাঁদ গৌরহরি বাঙ্গালাদেশ হরিনামের মধুর রসে প্লাবিত করিয়াছিলেন তাহারও শত বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাংলার গ্রামগুলির অবস্থা মনে করুন। সেকালে নবাবের ক্ষমতা মফস্বলস্থ গ্রামগুলিতে ততদূর বিস্তৃত ছিল না। বার্ষিক কিছু খাজনা পাইলে তাঁহারা গ্রামের তত্ত্ব ততটা রাখিতেন না। জমিদারেরা মফস্বলে সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। গ্রামে গ্রামে প্রায়ই লড়াই, মারামারি ও কাটাকাটি চলিত। দস্যু ও লুণ্ঠনকারীর দল আসিয়া উপদ্রব করিত। জমিদারেরা নিজ নিজ প্রভুত্ব ও কুলগৌরব বৃদ্ধির নিমিত্ত পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন। বিবাহাদির শোভাযাত্রা ও অন্যান্য বৃহৎ বৃহৎ উৎসবের সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনায় বহু রক্তারক্তি ও প্রাণিহত্যা হইয়া যাইত। আক্রমণকারিদিগের ভয়ে সকলে এক একটী বড় বড় গ্রামে একত্র হইয়া বসতি করিত। গ্রামের মধ্যভাগে জমিদার-বাড়ী পরিখাবেষ্টিত থাকিত, চতুর্দ্দিকে ব্রাহ্মণ, ভদ্রলোক, ব্যবসায়ী ও ভৃত্যজাতি বসতি করিত, সকলের বাহিরে চণ্ডাল, হাড়ি, মুচি, ডোম প্রভৃতিরা স্থান পাইত। গ্রামের চতুষ্পার্শে ধান্যক্ষেত্র বন বা পতিত জমি ছিল। শান্তির সময়ে জমিদারগণ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে আপন আপন গ্রাম শাসন করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিধি অনুসারে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম তাঁহাদের দ্বারাই প্রতিপালিত হইত। দেবদ্বিজে অভক্তি প্রদর্শন অথবা জাতিবিধি অতিক্রম করিলে জমিদারগণ উপযুক্ত দণ্ডবিধান করিতেন। গ্রামবাসীরা এইরূপে পরিরক্ষিত হইয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিত। যুদ্ধ বাধিলে বা ডাকাইত পড়িলে জমিদার বাড়ী হইতে "টিকারা" পড়িত। অথবা শঙ্খ, বাঁশী বাজান হইত। টিকারার শব্দে সকলে তাড়াতাড়ি ধনসামগ্রী সাবধান করিয়া স্ত্রীপুত্রাদি লইয়া জমিদার বাটীর মধ্যে অথবা বাটীর পিছনে "আন্ধার পুকুরের" পারে ঝোপের আড়ালে লুকাইয়া রাখিত। কেহ বা অন্যত্র পলাইত। যাহারা যুদ্ধে নিপুণ, টিকারার শব্দে তাহাদের হৃদয় নাচিয়া উঠিত। তীর, ধনু, বল্লম, লাঠি, ঢাল, তরবারি ইত্যাদি লইয়া তাহারা বিপক্ষের সম্মুখীন হইত। যুদ্ধে জয়লাভ করিলে সকলে ঘরে ফিরিত। আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটিয়া যাইত। আর পরাজিত হইলে শত্রুদল আসিয়া বাড়ীঘর লুঠ করিত। স্ত্রীপুত্রাদির অনুসন্ধান করিত; সন্ধান পাইলে কতক কাটিয়া ফেলিত, কতক দাসদাসী করিবার জন্য লইয়া যাইত।

শত্রু চলিয়া গেলে যাহারা বাঁচিত, তাহারা শূন্যঘরে ফিরিয়া আসিত, এবং চক্ষের জল মুছিয়া আবার নূতন সংসার পাতিত।

এখন কথা হইতেছে—এইরূপ ভীষণ মারামারি, কাটাকাটি করিতে কে যাইত? ব্রাহ্মণ চিরকালই ভীরু। ধর্ম্মকার্য্য ও শাস্ত্র-চর্চ্চা লইয়াই তাঁহারা বিব্রত। লাঠি চালাইবার অবসর বা শিক্ষা তাঁহাদের নাই। পরশুরাম কর্তৃক ক্ষত্রিয়নাশকালে ব্রাহ্মণের অস্ত্রধারণ ও যুদ্ধের কথা শুনা যায় বটে, কিন্তু সে ভাব বহু প্রাচীনকাল হইতেই লোপ পাইয়াছে। পশ্চিমাঞ্চলে এখনও দুই একটী ব্রাহ্মণজাতি যুদ্ধ ব্যবসায় করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বঙ্গীয় ব্রাহ্মণকুলের সে অবস্থা ইতিহাসে পাওয়া যায় না। বৈদ্যজাতির সংখ্যা সেকালে অতি অল্প ছিল। তাঁহারা চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। নবশাখেরা চিরকালই ব্যবসায়ী ও ভীরু। চণ্ডাল, ডোম, কাহার, পোদ ইহারা সময়ে প্রয়োজনে আসিত সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উপর প্রভুতা ও নেতৃত্ব করিবার মত কোনও ক্ষমতা তাহাদের ছিল না। কায়স্থজাতি চিরকাল মসীজীবী ও লিপিব্যবসায়ী, ইহারা কখনও যুদ্ধে বা ঐরূপ কর্ম্মে যাইতেন না। বস্তুতঃ বঙ্গদেশে আগুরি ও মাহিষ্য এই দুই জাতিকেই এই সময়ে জমিদারী করিতে ও লড়াই করিতে হইত। আগুরির সংখ্যা অতি অল্প। কুলীন ও অর্থশালী মাহিষ্যগণই তখন জমিদারী করিতেন। তাঁহাদের সজাতীয় দরিদ্রগণ নায়েব, সর্দ্দার ইত্যাদির কার্য্য করিতেন। অনেকে কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। যুদ্ধ বাধিলে বা ডাকাইত পড়িলে জমিদারের আহ্বানমতে সকলেই অস্ত্র শস্ত্র লইয়া গ্রামরক্ষা করিতেন। স্ত্রীপুত্রের জন্য, অনাথ ও দুর্ব্বলের প্রাণ রক্ষার জন্য, আপন আপন জীবন অকাতরে বিসর্জ্জন দিতেন। অবশ্য মারা মারি একবার আরম্ভ হইয়া গেলে তেলি মালি, নাপিত, কায়স্থ, বৈদ্য, ব্রাহ্মণ, ইঁহারাও সাহায্য করিতেন।

এই দিনে অন্য জাতীয় জমিদার একেবারেই ছিল না বলা যায়। ব্রহ্মোত্তর ও দেবোত্তর সম্পত্তি রক্ষা করিতে হইলে মাহিষ্যের বাহুবল ছাড়া গতি ছিল না। তবে যাহারা নবাব সরকার হইতে জায়গির পাইত তাহারা অনেক সময়ে মুসলমান পাইক বরকন্দাজ আনিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে মাহিষ্য নায়েব ইত্যাদি নিযুক্ত করিয়া জমিদারি চালাইত। এরূপ করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল।

মুসলমান অধিকারের প্রথম ভাগে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই গ্রামের অবস্থা এইরূপ ছিল। রাজপুত, মারাঠা, জাঠ, খণ্ডাইত প্রভৃতি সকলেই প্রায় এইভাবে

গ্রামের মধ্যে জমিদারী করিয়া অন্যান্য জাতীয় সকলকে রক্ষা করিতেন। ইতিহাসে এ সব কথার প্রচুর আভাস বিদ্যমান রহিয়াছে।

তার পর আর একদিন আসিল। মুসলমান রাজত্ব অধিককাল স্থায়ী হওয়াতে তাহাদের চেষ্টায় দেশে অনেকে মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। ইহার ফলে গ্রামে গ্রামে মুসলমান জাতির বসাত আরম্ভ হইল। এই সময়ে বহু উচ্চশ্রেণীর হিন্দুসন্তান ও জমিদার বংশধর নানা কারণে নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। মাহিষ্য-জাতি হইতেও অনেকে এই সময়ে নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া যান। ইহাতে সমাজের ক্ষমতা কমিয়া আসিল। বিশেষতঃ মুসলমানধর্ম্মীদিগের সংখ্যাবাহুল্যের সঙ্গে সঙ্গে ঐ জাতীয় বহু জমিদার ও তালুকদারের প্রাদুর্ভাব হইল। ইঁহারা অল্প চেষ্টাতেই নবাব সরকার হইতে জমিদারি বন্দোবস্ত আনিতে বা জায়গির পাইতে পারিতেন। এইরূপ জমিদারি হস্তান্তর কালে বহু মাহিষ্যসন্তান জমিদারি হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন। এই সময়ে পশ্চিমদেশ হইতে অনেক রাজপুত, জাট, মারাঠা, কর্ণাটী, পাঠান প্রভৃতি সামরিক জাতীয় লোক সিপাহী কার্য্যের জন্য এ দেশে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। ইহারা অল্প বেতনই কার্য্য করিত। কাজে কাজেই ব্রাহ্মণাদি কতিপয় জাতির বিশেষ সুবিধা হইল। জমিদারী রক্ষার জন্য আর তাঁহাদিগকে মাহিষ্যের অপেক্ষা রাখিতে হইল না। তাঁহারা আশ্বস্তচিত্তে নবাব সরকার হইতে জমিদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইতে লাগিলেন। বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গির চাহিলেন এবং বেতনভোগী সিপাহীদ্বারা জমিদারী চালাইলেন। মাহিষ্যজাতির কপাল ভাঙ্গিল। অবনতি আরম্ভ হইল। এই সময়ে যশোরে "প্রতাপাদিত্য"; পূর্ব্ববঙ্গে 'গাবর কেদার রায়' * প্রমুখ কতিপয় ভূঁয়া উপাধিধারী 'রাজা' নামধারী জমিদারের আবির্ভাব হয়। ইঁহারা চাকুরী বা লুণ্ঠন দ্বারা সঞ্চিত অর্থে নানাজাতীয় পাইক বরকন্দাজ রাখিয়া কতিপয় বৎসর দেশে দেশে উপদ্রব ও দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন; অবশেষে মুসলমান সম্রাট কর্ত্তৃক তাঁহারা উপযুক্ত দণ্ডে দণ্ডিত হন। সে সময়েও বঙ্গের পশ্চিমপ্রান্তে স্বাধীন মাহিষ্য রাজনিচয় অতুলবীরত্বে মুসলমান বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন।

---

* মৈমনসিং অঞ্চলে 'কেদার রায়' বলিলে লোকে কাহাকেও চিনিতে পারে না। আপামর সাধারণ সকলেই 'গাবর কেদার রায়' বলিয়া থাকেন। এই নামে অনেক সারিগান প্রচলিত

মুসলমান-বীরগণ সে বীরত্বের প্রকৃত সম্মান দেখাইয়া শূরকুলসুলভ প্রশস্ত হৃদয়ের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন।

ক্রমে নবাবী আমলের শেষভাগ আসিল। মাহিষ্য জাতি ক্রমেই জমিদারী হারাইতে লাগিল। চাকুরির অর্থে ও নানাবিধ উপায়ে অপরাপর জাতীয় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমিদারীর সৃষ্টি হইল। তারপর কোম্পানীর মুলুক আসিল। চাকুরীজীবীদিগের আরও সুবিধা বাড়িল। মুসলমানগণ এদেশের অধিবাসী হওয়াতে তাঁহারা হিন্দুসমাজ বিলক্ষণ চিনিতেন। বিশেষতঃ বঙ্গদেশ বিজয় কালে তাঁহারা বঙ্গবীরগণের পরিচয় জ্ঞাত হইয়াছিলেন, সুতরাং মাহিষ্যজাতির প্রতি সর্ব্বদাই তাঁহারা বীরোচিত মর্য্যাদা রক্ষা করিতেন। ইহার ফলে জমিদারী বন্দোবস্ত বা হস্তান্তর কালে মাহিষ্য প্রার্থিগণ অধিক সমাদর পাইতেন। কোম্পানীর প্রথম সময়ে ইংরেজগণ এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জ্ঞাত ছিলেন না। সর্ব্বদা যে সমুদয় নগরবাসী কেরাণীবৃন্দের দ্বারা কোম্পানীর কর্ম্মচারিগণ পরিবেষ্টিত থাকিতেন, তাঁহাদের কথা অনুসারেই কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা না থাকা হেতু এই সময়ে মাহিষ্যজাতি ইংরেজগণ হইতে দূরে সরিয়া থাকেন এবং ইহার ফলেই তাহারা সে কালে কোনও বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারেন নাই। সুতরাং পতনের বেগ আর রুদ্ধ হইল না। বিশেষতঃ যাহারা পূর্ব্বে কোনও কারণে শত্রুতার ভাব পোষণ করিত, তাহারা সম্প্রতি সুযোগ বুঝিয়া শত্রুতা সাধনে অগ্রসর হইল। এই সময়ে মাহিষ্যজাতির বহু কুৎসা শত্রুদিগের দ্বারা দেশবিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। পতনোন্মুখ মাহিষ্যকুলে কোনও সামর্থ্যবান পুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলেন না। এইরূপে দেখিতে দেখিতে মাহিষ্যজাতি ধ্বংশের মুখে পতিত হইল।

এই নিদারুণ সময়েও সার আয়ার কুট প্রমুখ ইংরেজ সেনানীগণ বঙ্গীয় মাহিষ্যজাতি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া শতমুখে মাহিষ্যবীর্য্যের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু চতুরের চতুরতায় মাহিষ্যগণ আর সৈনিকপদেও স্থান পাইলেন না। সেই দিন অবধি "বাঙ্গালী ভীরু" প্রবাদটী জগতে প্রচার হইল।

অতঃপর বিখ্যাত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় আসিল। জমিদারেরা তৎকালে প্রায়ই বাটীতে আসিতেন। সদরে তাহাদের এক একজন নায়েব বা মুহুরি অথবা আমমোক্তার থাকিত। উঁহাদের হস্ত দিয়া কোম্পানির বা নবাব সরকারের সহিত খাজনা আদায় প্রদান চলিত। বন্দোবস্তের সময়ে এই শ্রেণীর অনেক কর্ম্মচারীই বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিজ নামে বা আত্মীয়ের নামে

'মনিবের' জমিদারী বন্দোবস্ত লইয়া ফেলে। ইহাতে বহু পরিবারের সর্ব্বনাশ হইয়া যায়। কেহ কেহ বা একবারে রিক্তহস্ত হইয়া বিশ্বাসঘাতকদিগের নিকট হইতে সামান্য স্থান ভিক্ষা পাইয়া অতিকষ্টে জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহু মাহিষ্য রাজা ও ভূম্যধিকারী ঐ সময়ে লোপ পাইয়াছেন। অনেক সম্ভ্রান্ত পরিবার নিঃস্ব হইয়া সামান্য কৃষক শ্রেণীতে পরিণত হইয়া গিয়াছেন। পাঠক, এই হৃদয়-বিদারক কাহিনী শুনিয়া আপনি চক্ষের জল ফেলিয়াছেন কি? সে ঘোর দুর্দ্দিনে প্রতারকের হাতে অনেক মুসলমান জমিদারকেও ঐরূপ কষ্টে পড়িতে হইয়াছিল। নবাবী আমলেও ঐরূপ বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা অনেক শুনিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সেকালে কোনও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত না হওয়াতে অনেক সময়েই জমিদারী উদ্ধার করা যাইত। কাজেই উহাতে মাহিষ্য জাতির বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে নাই।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অব্যবহিত পরেই প্রজাস্বত্ব বিষয়ক আইন প্রণয়ন ও আরও নানা বিধির ফলে জমিদারদিগের আয় পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া যায়। ইহাতে প্রাচীন জমিদারদিগের বিশেষ অসুবিধা ঘটে। কারণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষানুগত রীতিনীতি ও সামাজিকতা রক্ষা করিতে হইত। দাসদাসী আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি বহু পোষ্যবর্গ লইয়া জমিদারকুল অতীব সঙ্কটে পতিত হইলেন। ইহার ফলে ঋণবৃদ্ধি ও তালুক নীলাম ব্যতীত গত্যন্তর রহিল না। কাজেই মাহিষ্য জমিদারগণ ক্রমে ক্রমে দেশ হইতে বিলুপ্ত হইতে লাগিলেন!! পক্ষান্তরে যাঁহারা চাকুরীর টাকায় নূতন জমিদারী ক্রয় করিতেছিলেন, তাঁহারা প্রাচীন কোনও পারিবারিক রীতিনীতির ধার ধারিতেন না। সুতরাং আয় অনুসারে ব্যয় করা হেতু তাঁহারা জমিদারী রক্ষা করিয়া উন্নতি করিতে লাগিলেন।

এইরূপে অন্যান্য জাতীয় জমিদারের সংখ্যা বৃদ্ধি ও মাহিষ্য ভূম্যধিকারীর সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পাইতে লাগিল। এখন বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ জমিদারের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তৎপর কায়স্থ জমিদারের ও তার পর মাহিষ্য জমিদারের সংখ্যা। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় তমলুকের মহারাজ বার্ষিক দশলক্ষের অধিক টাকা কেবল সদর জমা দিতে অঙ্গীকার করিয়া বন্দোবস্ত গ্রহণ করেন। আর আজ শত বৎসর পরেই সেই তমলুক পতির বংশধর রাজা সুরেন্দ্র নারায়ণ মাত্র কয়েক হাজার টাকা আয়ের জমিদারী লইয়া কষ্টে জীবন যাপন করিতেছেন। কালের কি বিচিত্র গতি!! কবিবর সত্যই গাহিয়াছেন:—"নিজবাস ভূমে পরবাসী হলে"॥

শ্রীবিজয়কুমার রায়—ঢাকা।

মাহিষ্যজাতির উপনাম-বিচার।

মাহিষ্য-বিবৃতি-ধৃত, হাজরা, লস্কর প্রভৃতি বীরোচিত উপাধি ব্যতীত, এতদ্দেশে মজুমদার, তোকদার তালুকদার, জোয়ারদার, ফৌজদার, বক্সী, সি. সরকার, ভৌমিক, বিশ্বাস, মণ্ডল, পাল প্রভৃতি মাহিষ্য জাতির অনেক উপাধি বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে মজুমদার হইতে সরকার পর্য্যন্ত উপাধি গুলি যাবনিক (পারসী) শব্দ। উহা যবন রাজাদের অধিকার কালে, রাজ-সরকারে কর্ম্মানুমত তাঁহাদের প্রদত্ত উপাধি মাত্র। যেমন মফঃস্বলের বহুস্থান হইতে খাজনা আদায় হইয়া আসিয়া, সদরে খাজনার ভাণ্ডার যাঁহাদের জিম্মায় থাকিত, তাঁহারা মজুমদার; বহু ফৌজ অর্থাৎ সৈন্য যাঁহাদের অধীনে থাকিত তাঁহারা ফৌজদার; কোন একটি জোয়ার যাঁহাদের অধীনে থাকিয়া শাসন ও কর আদায় হইত, তাঁহারা জোয়ারদার; ঐরূপ কোন একটি তোক যাঁহাদের অধীনে ছিল, তাঁহারা তোকদার; আর যাঁহাদের অধীনে অনেক তালুক ছিল, তাঁহারা তালুকদার। ইহাতে জানা যাইতেছে যে, মুসলমানদের রাজত্ব সময়ে, মাহিষ্যজাতি রাজকীয় কার্য্যে তাঁহাদের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। ভৌমিক হইতে পাল পর্য্যন্ত উপাধিগুলি যাবনিক শব্দ নহে। বহু ভূমির অধিপতিকে ভৌমিক; রাজ-সরকারের বিশ্বস্ত পাত্রকে বিশ্বাস; গ্রামের প্রধানকে মণ্ডল বা মোড়ল; যুক্তি প্রমাণ দ্বারা ন্যায়-বিচারে সমর্থ ও মান্যমানুগণকে প্রামাণিক; এবং বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ধনাঢ্য মহাজনকে সাহা বলে। মণ্ডল উপাধি ব্রাহ্মণ হইতে ব্রাহ্মণেতর সমস্ত জাতির মধ্যেই দৃষ্ট হয়। প্রাচীনকালে রাজচক্রবর্ত্তির নিম্নপদস্থ ব্যক্তিই মণ্ডলেশ্বর নামে অভিহিত হইতেন, অনেক সংস্কৃত গ্রন্থে ইহা পরিদৃষ্ট হয়। ব্যষ্টিমণ্ডল সমূহের অধিপতিই মণ্ডলেশ্বর। প্রামাণিক উপাধিও গোপ, তন্তুবায় প্রভৃতি অনেক জাতির মধ্যে বিদ্যমান আছে। এই সকল উপাধি ছাড়া, এ দেশের মধ্যে কোন কোন মাহিষ্যের মাঠিয়াল ও কাঠিয়া উপাধি ছিল। উহা শুনিতে বা বলিতে লজ্জা বোধ হয় বলিয়া, এক্ষণে তাঁহারা ত্যাগ করিয়া সরকার উপাধি লইয়াছেন। এইরূপ অনেকে মণ্ডল ও প্রামাণিক উপাধিও ত্যাগ করিয়া সরকার উপাধি লইয়াছেন। মণ্ডল ও প্রামাণিক, সরকার ও মজুমদার প্রভৃতি উপাধির ন্যায় যাবনিক শব্দ নহে; অতএব উহা বিশুদ্ধ ও মহান্ অর্থযুক্ত। সুতরাং উহা বহন করিতে

কোন লজ্জার কারণ বিদ্যমান নাই। হড়ি, ভড়, ভূত প্রভৃতি জাত্যন্তরের উপাধির ন্যায় মাঠিয়াল বা কাঠিয়া উপাধি ক্ষতি-লজ্জাকর নহে। মাঠিয়াল ও কাঠিয়া উপাধি, বোধ হয়, কোন হিন্দী শব্দের অপভ্রংশ। বন্দ্যোপাধ্যায় ও চট্টোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ উপাধি দুটি যেমন বাঁড়ুর্য্যে ও চাটুর্য্যে এবং ইংরাজীতে ব্যানার্জ্জি, চাটার্জ্জিতে পরিণত হইয়াছে, তদ্রূপ উক্ত উপাধিদ্বয়ও কোন শব্দ বিশেষ হইতে অপভ্রংশ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু উহা কোন্ শব্দের অপভ্রংশ, তাহা ঠিক করা যায় না। জাঠ, রাঠোর প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কতকগুলি ক্ষত্রিয় জাতি আছে। এদেশে ঠাটার নামে এক শ্রেণীর বাঙ্গালী জাতি আছেন। তাঁহারা এদেশের রাজপুত জাতির সমকক্ষ। তাঁহাদের উপবীত নাই, কিন্তু ক্ষত্রিয় নিয়মে দ্বাদশাহাশৌচ পালন করেন। মাহিষ্যক্ষত্রিয়ের মধ্যে ঐ প্রকারের অনেক ক্ষত্রিয় মিশিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। ঠাটার জাতির ন্যায়, বোধ হয় মাঠার, কাঠোর, নামেও কোন ক্ষত্রিয় জাতি ছিলেন, তাঁহারা বহুদিন পূর্ব্বে এ দেশে মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়ের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছেন, কিন্তু মাঠিয়ার, কাঠিয়া এই অপভ্রংশ শব্দে তাঁহাদের পরিচয় রহিয়াছে। 'সি' এই উপাধিটির কি অর্থ তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই ; ইহা কি সিংহ শব্দের অপভ্রংশ ? চৌধুরী উপাধি সংস্কৃত চতুর্ধুরী শব্দের অপভ্রংশ। ধুরী অর্থে শ্রেষ্ঠ। নদীয়া জেলায় মথুরাপুরের ও মজলিসপুরের চৌধুরীবংশ, মুক্তাদহের মজুমদারবংশ এবং রাজশাহি জেলায় অর্জ্জুন পাড়ার ভৌমিকবংশ প্রভৃতি মাহিষ্যজাতিতে এ দেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ কুলীন বলিয়া প্রসিদ্ধ। বারান্তরে এই সব প্রাচীন কুলীন বংশের সদাচারাদির খ্যাতি বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিব ইচ্ছা থাকিল।

উপরে মাহিষ্য জাতির যে সকল উপাধি লিখিত হইল, উহা শাস্ত্রীয় বর্ণানুমত নহে। বর্ণ ও জাতি এক কথা নহে। প্রথমতঃ গুণ কর্ম্মানুসারে যেমন বর্ণাশ্রমের বিভাগ হইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিটি নাম করণ হইয়াছিল, তৎকালেই এই চারিটি বর্ণের চারিটি উপনামও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। এই উপনামও গুণ-কর্ম্মানুমত। ব্রাহ্মণের শর্ম্মা, ক্ষত্রিয়ের বর্ম্মা, বৈশ্যের গুপ্ত ও শূদ্রের দাস। (গুপ্তদাসাত্মকং নাম প্রশস্তং বৈশ্যশূদ্রয়োঃ ইতি বিষ্ণুপুরাণম্)। শৃ ধাতুর উত্তর মন্ প্রত্যয়ে শর্ম্মন্ শব্দ সিদ্ধ। শর্ম্মন্ শব্দের অর্থ সুখ বা শান্তি। ব্রাহ্মণগণ বাহেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব বিষয়ে অনাসক্ত চিত্ত হইয়া, অন্তরে শান্তিসুখ লাভ করিবেন, এবং পরব্রহ্মে সমাহিত যুক্তাত্মা

হইয়া, ব্রহ্মানন্দরূপ অক্ষয়সুখ ভোগ করিবেন, (বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্। সব্রহ্ম যোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ইতি গীতা ৫ অঃ ২১ শ্লোঃ) এবং অন্য জাতিকেও সেই সুখের পথ প্রদর্শন করাইবেন বলিয়া, তাঁহাদের উপনাম শর্ম্মন্ শব্দের প্রথমার একবচনে শর্ম্মা। ক্ষত্রিয়জাতি বর্ম্ম, চর্ম্ম, ধারণপূর্ব্বক অনার্য্য অর্থাৎ বেদাচার বহিষ্কৃত দুষ্টগণকে দমন করিয়া, সনাতন আর্য্য ধর্ম্মকে বিস্তার করিবেন বলিয়া, তাঁহাদের উপনাম (বৃ+মন্) বর্ম্মন্ শব্দের প্রথমার একবচনে বর্ম্মা। গুপ্ ধাতুর উত্তর ত প্রত্যয়ে গুপ্ত পদ সিদ্ধ। গুপ্ ধাতু রক্ষণে হয়। কৃষ্যুৎপাদিত অন্ন দ্বারা দেব, পিতৃ ও মানবগণের প্রাণ রক্ষা হয়। 'কৃষির্ধন্যা কৃষির্মেধ্যা জন্তূনাং জীবনং কৃষি'। অতএব,—ক্ষত্রিয়োহপি কৃষিং কৃত্বা দেবাং পিতৃংশ্চ পূজয়েদিতি। বৈশ্যগণ কৃষি কর্ম্ম দ্বারা জগত্ রক্ষা করিবেন বলিয়া তাঁহাদের উপনাম গুপ্ত। এই বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যাত্মক দাসত্ব করিবে বলিয়া শূদ্রের উপনাম দাস। চারিবর্ণের উপনাম কথিত হইল। এই চারিবর্ণের অন্তর্গত যত জাতি বিদ্যমান আছে, তাঁহাদেরও তত্তৎ বর্ণানুমত উপনাম ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত। ব্রাহ্মণের মধ্যে বহু শ্রেণীবিভাগ থাকিলেও নামের শেষে শর্ম্মা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ক্ষত্রিয়ের মধ্যেও অনেক শ্রেণী বিভাগ হইলেও, তাঁহারা সকলেই বর্ম্মা এই উপনাম ধরণের অধিকারী। তদ্রূপ বৈশ্য শ্রেণীর জাতিগণও বৈশ্যোচিত গুপ্ত এই উপনাম ধারণে অধিকারী।

অম্বষ্ঠগণ ব্রাহ্মণের বিবাহিতা বৈশ্যাভার্য্যাজাত বলিয়া এবং মাহিষ্যগণ ক্ষত্রিয় বিবাহিতা বৈশ্যাভার্য্যাজাত বলিয়া, মাতৃজাত্যনুমত (অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ) গুপ্ত এই উপনাম ব্যবহারে অধিকারী। অম্বষ্ঠগণের মধ্যে অনেকেরই গুপ্ত উপনাম ব্যবহার আছে। আবার তাঁহাদের দাস উপাধিও প্রচলিত আছে। কবিরাজ বিনোদলাল সেন মহাশয়ের প্রকাশিত বৈদ্যকুলতত্ত্বে লিখিত আছে যে, অশ্বিনী কুমারের 'সিদ্ধ বিদ্যা' নাম্নী কন্যার গর্ভে অমৃতাচার্য্যের, গুপ্ত, সেন, ও দাস নামে তিন পুত্র জন্মে, তাঁহারাই মূল। তাঁহাদিগ্ হইতে, দত্ত, দেব, ধর, কর, রক্ষিত প্রভৃতি ত্রয়োদশ প্রকার অম্বষ্ঠ বংশ বিস্তার হইয়াছে। এস্থলে বুঝিতে হইবে যে এই সেন, দাস, ধর, কর, প্রভৃতি উপনাম মাত্র; ইহারা প্রত্যেকের নামী ব্যক্তি ছিলেন। গুণ কর্ম্মানুসারে প্রত্যেকের ঐ প্রকার বিভিন্ন উপনাম হইয়াছিল। সেন, কর, ধর প্রভৃতি উপনাম না হইয়া নামী ব্যক্তি হইলে, কায়স্থদিগের মধ্যে সেন, কর, ধর দত্ত প্রভৃতি উপনাম থাকা হেতু উভয় জাতি একবংশ হইয়া পড়ে; কিন্তু উভয় জাতি সম্পূর্ণ

পৃথক্। বোধ হয়, অম্বষ্ঠ জাতির ঐ সকল উপনামের নামী আদি পুরুষগণের মধ্যে যিনি কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তিনি গুপ্ত; যিনি সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তিনি সেন; যিনি আগ্নেয় বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন তিনি কুণ্ড এবং যিনি চিকিৎসা বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তিনি (সোমরসাদি প্রস্তুতহেতু) সোম, এই উপনামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। বৈদ্যজাতির এই চারিটিই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট বৃত্তি। এতদ্ব্যতীত যিনি তপঃ জ্ঞানাদি অবলম্বন করিয়াছিলেন তিনি দেব, যিনি ব্রাহ্মণদিগের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন তিনি দাস; এইরূপ অন্যান্য কারণে ধর, কর প্রভৃতি উপনাম হইয়াছিল। কায়স্থ জাতির মধ্যেও দেব, ধর, কর, সেন প্রভৃতি বহু উপনাম বিদ্যমান আছে। জনৈক 'কায়স্থতত্ত্ব' লেখক, তাঁহাদের (কায়স্থজাতির) দাস এই উপনামের দন্ত্য স স্থলে মূর্দ্ধণ্য ষ ইচ্ছা করিয়াছেন; ইহার দ্বারা কি উৎকর্ষতা হইবে জানি না। সেই লেখকের মতে, দেবতা বিশেষের উপাসনা করায়, তত্তৎদেবতার নামানুমত কায়স্থগণের ঘোষ, বসু, গুপ্ত, প্রভৃতি উপাধি হইয়াছে; যেমন ইন্দ্রের উপাসক ঘোষ, বসুদেবতার উপাসক বসু ইত্যাদি। একথা নিতান্ত অসঙ্গত; যেহেতু ২।১টি ব্যতীত সমস্ত উপাধির সহিত দেবতাদের নামের প্রসিদ্ধতা নাই। গুহ একটি কুলীন কায়স্থদের প্রসিদ্ধ উপাধি। গুহ এবং গুপ্ত এই দুইটি প্রায় সমান অর্থ প্রকাশক শব্দ। গুপ্ + ক্ত = গুপ্ত; গুপ্ + যাপ্ = গুহ। গুপ্ত ও গুহ শব্দের অর্থ প্রায় সমান। রক্ষিত শব্দের ও গুপ্ত শব্দের অর্থও এক নয় কি? (গুপ্ ধাতু রক্ষণে) আবার বৈদ্য ও কায়স্থের ন্যায়, গন্ধবণিক, সুবর্ণ বণিক্ এবং নবশাখের অন্তর্ভুক্ত তাম্বুলি প্রভৃতি জাতিরও দত্ত উপাধি রহিয়াছে। অভিধানে দত্ত শব্দের অর্থও রক্ষিত দেখা যায়। তাহা হইলে গুপ্ত, গুহ, রক্ষিত ও দত্ত সমানার্থবাচক শব্দ। সবগুলিই বৈশ্যোচিত। সুবর্ণবণিক্ বৈশ্য শ্রেণী বলিয়া প্রকাশ হইতেছে। বণিক্‌গণ বৈশ্য শ্রেণী হওয়াই নিতান্ত সম্ভব। এইরূপে জানা যাইতেছে যে, অনুপনীত ও মাসাশৌচ পালনকারী অর্থাৎ শূদ্র বর্ণ বলিয়া পরিচিত বৈশ্যশ্রেণীর জাতিগণেরও বৈশ্যোচিত উপনাম ব্যবহার বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। এক্ষণে বিচার করা উচিত যে, এই জাতি-সংস্কার-যুগে, দ্বিজধর্ম্মী মাহিষ্য জাতির বৈশ্যোচিত উপনাম ধারণ করা কর্ত্তব্য কিনা? রাজকীয় বা বিত্ত সম্পর্কীয় উপাধি বাদ দিলে, ... জাতির মধ্যে দাস উপাধিই সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। অবশ্য যে দাস

উপনাম, দ্বিজধর্ম্মী বৈদ্যগণের মধ্যে এবং উড়িষ্যা দেশীয় কোন কোন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও বিদ্যমান আছে, তাহা মাহিষ্য জাতির পক্ষেও নিন্দিত নহে। কিন্তু দাস ও দাসী, শূদ্র ও শূদ্রা গণেরই শাস্ত্রীয় উপনাম; অতএব উহা শূদ্রের পক্ষেই যৌগিক। বৈশ্যাদির পক্ষে রূঢ়। নিত্য নৈমিত্তিকাদি ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠানকালে, দ্বিজধর্ম্মী জাতিদের দাস দাসী শব্দে নামোল্লেখ না করাই অবশ্য কর্ত্তব্য। বৈদ্যজাতির সেন, দাসাদি অনেক উপাধি থাকিলেও, ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান কালে, তাঁহাদের বৈশ্যোচিত উপাধিই কথিত হইয়া থাকে। 'অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ' এই শাস্ত্রীয় বিধি জন্য মাহিষ্য জাতির যেমন, কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য (কৃষি-গোরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্—গীতা ১৮শ অঃ) এই তিনটি মাতৃজাতীয় বৃত্তি; এবং মাহিষ্যগণ আবহমান কাল হইতে এই বৃত্তিই অবলম্বন করিয়া আছেন, তেমনি নামের শেষেও তাঁহাদের বৈশ্যোচিত গুপ্ত উপনাম ধারণ করা অবশ্য কর্ত্তব্য। এই কর্ত্তব্যের অস্বীকার করিলে, বৃত্তির অস্বীকার করিতে হয়।

মাহিষ্যজাতি বৈশ্যধর্ম্মী কিন্তু বৈশ্য নহেন, এই বলিয়া গুপ্তশব্দ ব্যবহার করিতে যদি আপত্তি হয়, তবে অন্ততঃ কুলীন কায়স্থ বিশেষের প্রত্যয়-বিহীন গুহ্ ধাতুর প্রথমার এক বচনে গুহ উপাধির ব্যবহার ধরিয়া, মাহিষ্যজাতিরও প্রত্যয়-বিহীন গুপ্ ধাতুর প্রথমার এক বচনে সিদ্ধ 'গুপ' এই উপনামটি ধারণ করাও কর্ত্তব্য। 'গুপ' এই উপনাম মাহিষ্যজাতির পক্ষে যৌগিকও হইবে; যথা, গুঃ পৃথিবীং পাতি পালয়তি কৃষিবৃত্ত্যা ইতি শেষঃ। অর্থাৎ কৃষিবৃত্তি দ্বারা পৃথিবী পালন অর্থে মাহিষ্যের 'গুপ' এই উপনাম। গুহ বলিলে যেমন কুলীন কায়স্থ-বিশেষকে ব্যতীত অন্য কোন জাতিকে বুঝায় না, তেমনি সমস্ত মাহিষ্য জাতির 'গুপ' এই উপনাম প্রচলিত হইলেও, একমাত্র মাহিষ্যজাতি ব্যতীত অন্য কোন জাতিকে বুঝাইবে না। এ বিষয়ে সুবিজ্ঞ মাহিষ্য মহোদয়গণের মনোযোগ আকর্ষিত হইবে কি? আর ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের শর্ম্মা, বর্ম্মা ও গুপ্ত উপাধির পূর্ব্বে দেব শব্দ ব্যবহৃত হয়। দিব্ ধাতু হইতে দেব শব্দ উৎপন্ন। দিব্ ধাতু দ্যুত্যর্থে হয়। ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় উপনয়নরূপ সংস্কার-সম্পন্ন হইয়া, উপবীত ধারণ পূর্ব্বক পণ্ডা অর্থাৎ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি দ্বারা অপরবর্ণ ও অনার্য্যগণ হইতে অত্যন্ত দীপ্তিমান্ থাকেন বলিয়া, দ্যোতনার্থক দেব উপাধি ধারণ। দ্বিজধর্ম্মী হেতু

মাহিষ্যগণও যে দেব উপাধি ধারণের যোগ্য তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই। দেব শব্দের স্থলে অন্ততঃ দেও শব্দও ব্যবহার করা যাইতে পারে। সংস্কৃত ভাষার 'দেব' শব্দই প্রাকৃত ভাষায় 'দেও' হয়। যথা—দেবঘর, দেওঘর; দেবর দেওর; দেবধান, দেওয়ান; ইত্যাদি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইবার কথা এই—মাহিষ্যজাতীয়া স্ত্রীগণ নামের শেষে কি ব্যবহার করিবেন? এ কথার উত্তর এই যে,—ক্ষত্র-বৈশ্যাজাত দ্বিজধর্ম্মী মাহিষ্য-জাতীয়া স্ত্রীগণ কখনই শূদ্রা নহেন। সুতরাং মাহিষ্যগণের নামের শেষে শূদ্রার্হা দাসী শব্দ ব্যবহারও হইতে পারে না। মাহিষ্যকুলে, রাজর্ষি ময়ূরধ্বজের বংশপত্রিকায় (কোষ্ঠিনামায়), রাণী চন্দ্রা দেই ও রাণী মৃগয়া দেইর নাম আছে। নবাবদের আমলেও বাঙ্গালার কোন কোন জেলায়, ছাড়পত্রে মাহিষ্যদেব্যা এইরূপ লিখন প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। ইহা ১৩১৭ সালের মাহিষ্য-সমাজ পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সময়ে শিখি মাহিতির ভগিনী মাধবী দেবীর কথা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। দেবী বা দেই এক কথা। দেবী সংস্কৃত ভাষা; দেই বা দেঈ প্রাকৃত ভাষা। ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের স্ত্রীগণের নামান্তে কেবল মাত্র দেবী শব্দই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কয়েকজন মাহিষ্যনারীর দেই বা দেবী শব্দ ব্যবহারের যখন প্রাচীন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন সমস্ত মাহিষ্য-নারীর ইহা ব্যবহারে আপত্তির কারণ দেখা যায় না। ইদানীন্তন অনেক মাহিষ্য-ভদ্র মহোদয়গণ স্ত্রীগণের নামান্তে স্বামীর উপাধি ব্যবহার করাইতেছেন, কিন্তু ঐ উপাধি বৈষয়িক কার্য্য ব্যতীত কোন ধর্ম্ম-কর্ম্মের সংস্রবে ব্যবহার করা যায় না। পত্র লিখনাদি কালে স্ত্রীগণের নামান্তে স্বামীর উপাধি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু রত্নমণি বা ঐরূপ কোন কোন নাম, স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই বুঝায়। ঐরূপ স্থলে স্বামীর উপাধি ব্যবহারে স্ত্রীত্ব বোধ কঠিন হইয়া পড়ে। তবে অবিবাহিতা কন্যার নামান্তে, পিতার উপাধির পর 'জা' এবং বিবাহিতা হইলে, স্বামীর উপাধির পরে 'জায়া' এই প্রকার লিখিলে মন্দ হয় না। যেমন অবিবাহিতা কন্যা শ্রীকুসুমকুমারী রায়জা, বিবাহিত হইলে, শ্রীকুসুমকুমারী চৌধুরীজায়া ইত্যাদি।

আমার এতগুলি কথা বলিবার অভিপ্রায় এই যে, শাস্ত্র বিচারসিদ্ধ প্রমাণ মতে মাহিষ্য জাতি যখন দ্বিজধর্ম্মী তখন আমাদের মধ্যে দাস, রায়, মণ্ডল বিশ্বাস প্রভৃতি যাঁহার যে উপাধিই থাকুক, কিন্তু নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কালে, পুরুষগণের নামান্তে গুপ্ত এবং সাধারণতঃ স্ত্রীগণের নামান্তে দেবী বা দেই শব্দ ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীদুর্গানাথ দেও রায়।

সমাজ-সঙ্গীত।

গরিমা-কিরণ রঞ্জিত যার কীর্ত্তি-আলোক-পুঞ্জ,
কত কবি-ঝঙ্কার-গুঞ্জিত যার কল্পনা-কানন-কুঞ্জ,
কত রাজা মহারাজা জন্মিল যাহে কত সুধী অগ্রগণ্য,
ক্ষত্রিয়-বৈশ্যা-সম্ভূত যে জাতি সে জাতি আমার ধন্য!

আর্য্যপূজ্য তাম্রধ্বজ যে জাতির রবি-গৌরব
তাম্রলিপ্ত পূরিল যার কীর্ত্তি-কুসুম-সৌরভ,
বিষ্ণু-মন্দির স্থাপিল উৎকলে
অনঙ্গ যার ভীম বাহুবলে
ভারতে খ্যাত আমি সে জাতির, সে জাতি আমার ধন্য!

হলকর্ষণ আর্য্য করে এ নহে নূতন আজি,
ক্ষত্রিয় সমাজ রহে তবে কোথা কুরু হলধরে ত্যজি,
জনক রাজর্ষি ধরিল যে হল
উদিল সীতা জগত-মঙ্গল
পুণ্য সে হলচিহ্নিত জাতি ভারতে মাহিষ্য ধন্য!

বেদ-শাস্ত্র-শিল্প-চর্চ্চা যে জাতির নিত্য কর্ম্ম,
স্বার্থত্যাগ আর্ত্ত-রক্ষা যে জাতির নিত্য ধর্ম্ম
সে জাতি আমার জাগুক পুলকে
আবার প্রভাত গরিমা-আলোকে
আবার হউক আমার জাতি পুণ্য ভারতে ধন্য!

জাতীয়-উন্নতি জীবনের পণ আবার করুক সবে
অমর অক্ষয় মাহিষ্যকীর্ত্তি আবার ভারতে রবে
হিংসা-দ্বেষ-ভেদ-শূন্য
হউক চির-মঙ্গলময় আমার জাতি ধন্য।

শ্রীবটকৃষ্ণ দাস।

মাহিষ্য-মণ্ডল।

(১)

পালি ভাষার পুস্তকে "মাহিষ্য-মণ্ডল" নামে কোন একটী দেশ বৌদ্ধ সম্রাট্‌গণের সময়ে বৌদ্ধ মধ্যদেশের সীমান্তে অবস্থিত ছিল বলিয়া উল্লেখ আছে। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দের গ্রেট বিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালে ৮১৬ পৃষ্ঠায় মিঃ ফ্লিট সাহেব ঐ "মাহিষ্য-মণ্ডল" দেশ নর্ম্মদা নদীর তীর দেশে অবস্থিত ছিল বলিয়াছেন। মিঃ রাইস 'মাহিষ্য মণ্ডল' বর্ত্তমান মহীশূর রাজ্যের দক্ষিণ দিকবর্ত্তী বলেন, কিন্তু মিঃ ফ্লট উহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বিগত ১৯১২ অব্দের জানুয়ারী সংখ্যা জর্ণালে পুনঃ লিখিয়াছেন—

"The Mahisha-mandala of the Pali books may be safely identified as being the territory of which the capital was 'Mahishmati', the modern 'Mandhata'. It lay just on the south of a part of the Vindhya range, and so (whether it was or was not in the dominions of Asoka) it was a border-land of the Buddhist Madhyadesha or Middle Country" —(J. R. A. S. of Great Britain and Ireland—Jan., 1912. Page 246) "অর্থাৎ যে প্রদেশের রাজধানী মাহিষ্মতী বা বর্ত্তমান মান্ধাতা, সেই প্রদেশ, "পালি গ্রন্থসমূহে বর্ণিত মাহিষ্য-মণ্ডল বলিয়া, নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। ইহা বিন্ধ্য পর্ব্বতশ্রেণীর ঠিক দক্ষিণ দিকেই পড়ে এবং (অশোকের রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী হউক বা না হউক) ইহা বৌদ্ধ মধ্যদেশের সীমান্তভূমি ছিল।"

আমরা মহাভারতে যে মাহিষ্মতী রাজ্যের উল্লেখ দেখিতে পাই, মিঃ ফ্লিট সেই মাহিষ্মতী দেশের রাজধানী মাহিষ্মতী নগরীকেই মাহিষ্য-মণ্ডলের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মাহিষ্মতী দেশই মাহিষ্য-মণ্ডল বা মাহিষ্মণ্ডল। মাহিষ্মতীর বর্ত্তমান নাম 'মান্ধাতা' বলিয়াও ফ্লিট সাহেব উল্লেখ করিয়াছেন।

স্বামী ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় তাঁহার 'সিদ্ধান্ত-সমুদ্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে ১০৯ পৃষ্ঠায় উক্ত মান্ধাতা নগর সম্বন্ধে (১৩০৯ সালে) লিখিয়াছেন :—

"মাহিষ্যের জন্মস্থান।—সম্ভবতঃ মধ্য ভারতের (Central India) অন্তর্গত নিমাড় (Nimar) জেলার অধীন সুপ্রসিদ্ধ ওঁকার দ্বীপ মাহিষ্যের

জন্মস্থান। ঐ দ্বীপ এক্ষণে মান্ধাতা-ওঁকার বলিয়া খ্যাত। এস্থানে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের থানা, ডাকঘর, অনারেরি ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত প্রভৃতি বর্ত্তমান আছে। ইহা নর্ম্মদা নদীতটে অবস্থিত। এই দ্বীপকে মাহিষ্যের জন্মস্থান বলিবার কতকগুলি কারণ আছে; তদ্যথা (১ম কারণ) আমাদের দেশে বিশ্বকর্ম্মা পূজার ন্যায় তদ্দেশে প্রতি বৎসর মহাসমারোহে মাহিষ্যেশ্বরের পূজা হইয়া থাকে। (২য় কারণ) সেখানকার লোকেরা ওঁকার দ্বীপকে মাহিষ্যের জন্মস্থান বলিয়া পরিচয় দেয়। (৩য় কারণ) আমাদের দেশে পত্রের প্রথমে যেমন শ্রীদুর্গা শরণং প্রভৃতি লেখা হয়, সে দেশে 'মাহিষ্য শরণং' এই শব্দদ্বয় অদ্য পর্য্যন্ত পত্রের প্রথমে উল্লিখিত হইয়া থাকে, (৪র্থ কারণ) তদ্দেশে অনেক মাহিষ্য রাজা ও মাহিষ্য-রাজত্ব ছিল (৫ম কারণ) তদ্দেশের পাণ্ডারা তদ্দেশকে মাহিষ্যের আদি রাজ্য বলিয়া পরিচয় দেয়, (৬ষ্ঠ কারণ) ওঁকার দ্বীপে 'মাহিষ্য' এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া লোকে শপথ করে।..........
......১৩০৯ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকায় ওঁকার দ্বীপ সম্বন্ধে আমি যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, কৌতূহলাক্রান্ত পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন। এই ওঁকার দ্বীপ বঙ্গের হালিক কৈবর্ত্তের পক্ষে এমন পবিত্র যে আমার বিবেচনায় ইহা তাহাদের তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য হইতে পারে।" 'বৈদ্যজাতিতত্ত্ব' পুস্তকে ডাক্তার ভুবনেশ্বর মিত্র মহাশয় লিখিয়াছেন—"পশ্চিম প্রদেশে স্থানে স্থানে এখনও মাহিষ্য জাতি ও মাহিষ্য উপাধি দেখা যায়।"

মিঃ ফ্লিট নর্ম্মদা তীরস্থ 'মান্ধাতা' যে মাহিষ্মতীর বর্ত্তমান নাম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই সঙ্গত। মহাভারতী মহাশয়ও মান্ধাতা বা ওঁকার দ্বীপকে মাহিষ্য জাতির আদি জন্মস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই উভয় মান্ধাতা যে একই, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে নির্গত নর্ম্মদা নদীর উভয় তীরে মাহিষ্য জাতির প্রাথমিক ক্রীড়াভূমি ছিল বলিয়া বোধ হয়। এই জন্যই নর্ম্মদা প্রদেশের রাজধানী মাহিষ্মতী নাম ধারণ করিয়াছিল। পালিগ্রন্থ-সমূহে বর্ণিত মাহিষ্য-মণ্ডলও মাহিষ্মতীর নামান্তর বলিয়াই নিশ্চিত বোধ হয়। মাহিষ্য + বতী = মাহিষ্যমতী = মাহিষ্মতী। উহা মাহিষ্যদিগেরই (মাহিষ্য-মণ্ডল রাজ্যের) প্রাচীন রাজধানী। ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর প্রসঙ্গে কালিদাস বলিয়াছেন:—"অয়ি সুভগে! তুমি এই রাজাকে বরণ করিতে পার, ইনি মাহিষ্মতীর অধিপতি। যাহা মাহিষ্মতী নগরীর বপ্রকাঞ্চীস্বরূপ অসংখ্য অট্টালিকায় প্রতিবিম্বিত, যাহার জলবেণী রমণীয়, সেই

রেবা (নর্ম্মদা) সঙ্গে দেখিবার ইচ্ছা থাকে, তবে ইহাকে বরণ কর"। এই মাহিষ্মতীই পালিগ্রন্থে মাহিষ্মণ্ডল বা মাহিষ্য-মণ্ডল বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

১৮৯১ খৃঃ মেদিনীপুরের ডিষ্ট্রিক্ট সেন্সাস্ রিপোর্টে লিখিত আছে—মাহিষ্যগণ সরযূতট হইতে বাহির হইয়া বিন্ধ্যপর্ব্বতের অধিত্যকার পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া, মেদিনীপুরে প্রবিষ্ট হইয়া উহা অধিকার করেন। লেখক ১০০০ এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ঘটনা ঘটে বলিয়া লিখিয়াছেন, কিন্তু এই অংশ ভ্রান্ত। যে কালে এই বাঙ্গলা দেশ পর্ব্বতাধিবাসী অনার্য্যগণ কর্ত্তৃক অধ্যুষিত ছিল, সেই সময়ে আর্য্য জাতির যে প্রথম তরঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহারাই বর্ত্তমান সুগঠিত-নাসিক অথচ কৃষ্ণবর্ণ সাওতাল জাতি। ইহার পর দ্বিতীয় তরঙ্গে কতিপয় ক্ষত্রিয় রাজন্যগণের এই দেশ আক্রমণ ও রাজ্য স্থাপনের চেষ্টা। তৎপরে যে তৃতীয় একটী প্রকাণ্ড তরঙ্গ আসিয়া এই দেশ হইতে অনার্য্যগণকে সরাইয়া দেয়, এই তৃতীয় তরঙ্গই সরযূতট হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রান্ত দিয়া মাহিষ্য বাহিনীর আগমন। ইহা মহাভারতীয় যুগের পূর্ব্বের ঘটনা। সেন্সাস রিপোর্টের লেখক খুব তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন সন্দেহ নাই, এই জন্যই তিনি সরযূতট হইতে মাহিষ্যদিগের আগমনের পথ গঙ্গাতীর নির্দ্দেশ না করিয়া মধ্যভারতীয় অধিত্যকার পূর্ব্ব প্রান্ত নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কলিঙ্গ দেশে আসিবার পূর্ব্বে বিন্ধ্য পর্ব্বতের অধিত্যকার পূর্ব্ব প্রান্তেই নর্ম্মদাতটবাসী কতক গুলি মাহিষ্যের পক্ষে কোশল রাজ্য হইতে প্রচলিত বিরাট মাহিষ্য-প্রবাহে মিলিত হওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। এই পবিত্র সঙ্গম-স্থানই মধ্য ভারতীয় অধিত্যকার পূর্ব্ব প্রান্ত। এই পবিত্র সঙ্গমের ফলে নর্ম্মদাতটবর্ত্তী মাহিষ্য-মণ্ডল, মাহিষ্মতী বা রত্নাবতী ও শিখিধ্বজসহ তাম্রলিপ্তি, ময়ূরধ্বজ কৃষ্ণার্জ্জুন ও তাম্রধ্বজ জিষ্ণুহরিতে মিশামিশি এবং একে অন্যের ভ্রম জন্মিবার প্রচুর উপকরণ জন্মিয়াছে। অন্ততঃ তাম্রলিপ্তও একতর মাহিষ্মতী, মাহিষ্যবতী বা মাহিষ্যমণ্ডল। নর্ম্মদা, মাহিষ্য-মণ্ডল, মাহিষ্মতী, রত্নাবতী, তাম্রলিপ্তি, ময়ূরধ্বজ তাম্রধ্বজ, কৃষ্ণার্জ্জুন, সরযূতট, অযোধ্যা, দক্ষিণসাগর, বেলাকূল (তমলুক), মান্ধাতা বা ওঁকার দ্বীপ প্রভৃতি সকলই একসূত্রে গ্রথিত। বাঙ্গলার অন্যান্য হিন্দু জাতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবরণ এই বিরাট ইতিহাসের কুক্ষিগত বস্তু বিশেষ।

☞ কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রত্নতত্বের অনুসন্ধান করিবেন। পালিগ্রন্থ সমূহে মাহিষ্য-রাজত্বের বিবরণ পাওয়া যাইতে পারে। উচ্চশিক্ষিত ইতিহাস-প্রিয় মাহিষ্য-সন্তান পূর্ব্বপিতৃকুলের গৌরবময় তথ্যের সন্ধান লইবেন—ইঁহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

বিবিধ প্রসঙ্গ * ।

রাজভক্তি।—শ্রীহট্ট জেলার সুনামগঞ্জস্থ পরগণা আটগাঁও—নেয়ামতপুর গ্রামনিবাসী ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত চৌধুরী মহাশয় যে ভাবের একটী রাজভক্তিমূলক দানকার্য্য করিয়াছেন, তাহা শুনিলে সহৃদয় মাত্রেরই মনে একটা বিপুল আনন্দ-উৎস প্রবাহিত হইবে সন্দেহ নাই। বিগত দিল্লীতে সাম্রাজ্যাভিষেকের দিনেই তিনি নিজ বাটীর একাংশে গোবিন্দজী নামক বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া সেবার্থে আড়াই হাজার টাকা মূল্যের ভূমি দান করিয়াছেন। দানপত্রের সর্ত্ত এই যে, উক্ত ভূমির উপস্বত্ব দ্বারা ভারতের রাজরাজেশ্বর ও তদীয় মহিষীর এবং তদ্বংশীয় সম্রাট্গণের শুভার্থে প্রতিদিন সঙ্কল্পপূর্ব্বক উক্ত বিগ্রহ সমীপে তুলসী দান ও পূজা চিরদিন চলিবে। তিনি বা তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ উক্ত কার্য্য যথাবিধানে না চালাইলে, গভর্ণমেণ্ট উক্ত ভূমি স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক, সম্রাট্ বংশের কল্যাণার্থে মাহিষ্য-যাজী গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিয়া বিগ্রহের পূজা ও তুলসীদান করাইবেন। কি অতুলনীয় রাজভক্তি ও সাত্ত্বিক দান!! ইঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ আটগাঁও পরগণার মূল মালিক ছিলেন। ইনি এখনও উক্ত পরগণার অংশী মালিক। ইনি সুনামগঞ্জ মাহিষ্য-সমিতির কার্য্য-নির্ব্বাহক সমিতির অন্যতম সদস্য ও একজন পৃষ্ঠপোষক।

হাওড়া মাহিষ্য সমিতির প্রতিবাদ।—বিগত ১০ই মার্চ্চ, ২৭শে ফাল্গুন, কলিকাতা জানবাজারস্থ শ্রীযুক্ত অমৃত লাল দাস মহাশয়ের বাটীতে মাহিষ্যজাতীয় পক্ষাশৌচধারীদিগের সহিত কলিকাতার মাসাশৌচ-ধারিগণ সমাজিক সম্পর্ক রাখিবেন কি না তাহার আলোচনার জন্য যে সভা হইয়াছিল, ঐ সভায় হাওড়া মাহিষ্য-সমিতির তিনজন প্রতিনিধি নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত হইয়া ছিলেন। হাওড়া মাহিষ্য-সমিতির প্রতিনিধিগণকে কোন কথা কহিতে দেওয়া হয় নাই। যে মুদ্রিত-ব্যবস্থাপত্র উক্ত সভায় প্রচারিত হইয়াছে, তাহা "যথাশাস্ত্র বা শাস্ত্রসঙ্গত" নহে, পক্ষাশৌচ-গ্রহণ কেবল

---

* আমরা বিভিন্ন স্থান হইতে সভা সমিতির বিবরণ, পক্ষাশৌচ-গ্রহণের প্রতিজ্ঞাপত্র ও প্রতিবাদ পত্র প্রভৃতি যাহা পাই, তাহা বিস্তৃত ভাবে লিখিত বলিয়া, স্থানাভাব বশতঃ সম্পূর্ণ প্রকাশ করা অসম্ভব। সংক্ষিপ্ত বিবরণ মুদ্রিত হইয়া থাকে। তজ্জন্য পত্র প্রেরকগণের নিকট আমরা ত্রুটী স্বীকার করিতেছি।—প্রকাশক।

মাত্র কয়েকজন পণ্ডিতের মতের বিরোধী মাত্র—তাহাই উহা হইতে বুঝা যায়। সভায় কতক গুলি মন্তব্যের পর মন্তব্য পঠিত ও সর্ববাদিসম্মত বলিয়া অভিহিত হইতে লাগিল। দুঃখের বিষয়, মন্তব্য গুলিতে উপস্থিত সভ্যগণ কেহ স্বাক্ষর করিলেন না। হাওড়া সমিতির প্রতিনিধিগণ উক্ত মন্তব্য অনুমোদন করেন নাই। পক্ষাশৌচ-পালন মাহিষ্যের পক্ষে শাস্ত্র-সঙ্গত ইহা হাওড়ার মাহিষ্যগণ বুঝেন। পক্ষাশৌচ ও মাসাশৌচ ধারিগণ পরস্পর সমাজিক কার্য্যে মিলিয়া কার্য্য করিবেন—দলাদলি সৃষ্টি করিবেন না—ইহাই হাওড়া মাহিষ্য-সমিতির অভিমত ও সভায় অনেকের তাহাই মত ছিল।—শ্রীবামাচরণ মাঝী, সম্পাদক, হাওড়া-মাহিষ্য-সমিতি।

গৌড়াদ্য-বৈদিক ও মাহিষ্য-সভা।—

(১) জেলা হাওড়া—উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত হীরাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ আগমরত্ন মহাশয়ের বাটীতে বিগত বাসন্তী পূজা উপলক্ষে মাহিষ্য-জাতির পক্ষাশৌচ সম্বন্ধে মাহিষ্য ও গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ সভাধিবেশন করিয়াছিলেন জেলা ২৪ পরগণা ও হাওড়ার অন্তর্গত চাকদা, বাণেশ্বরপুর, হায়েৎনগর, উদয়রামপুর, বরাতে, বোরহানপুর, বাখ্‌রা, বৃন্দাবনপুর, গুটিনাগড়, ময়নাপুর, পাথরবেড়িয়া, দেউলি, সেহাই, ইটালী, রাইপুর, ভেড়ামী, বুড়ুল, শ্যামসুন্দরপুর, রাজারামপুর প্রভৃতি গ্রামের বহু গণ্য মান্য ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন যে, তাঁহারা পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিবেন ও করাইবেন।

(২) জেলা মেদিনীপুর দাসপুর থানার মহেশপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ভাগবত চন্দ্র কোলের বাটীতে গৌড়াদ্য-দ্রাবিড়-বৈদিক সমিতির অধিবেশন ৮ই চৈত্র ১৩.৮ সাল। ধর্ম্মসাগর সমাজ এবং বৃন্দাবন ও বাঁকাকুল শাখা সমাজস্থ সমাজপতি মাহিষ্য ও মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত হইয়াছিলেন। মাহিষ্যগণের পক্ষাশৌচগ্রহণ-ব্যবস্থা পত্র লিখিত হইয়াছে। সভাপতি শ্রীযুক্ত উদয় চন্দ্র ঘোষ নায়েব সমাজপতি মহাশয়। শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত কোলে মহাশয় সম্পাদক।

(৩) ত্রিমোহনা কলোড়া গৌড়াদ্য-বৈদিক ও মাহিষ্য-পল্লী সমিতির অধিবেশন—১৩ই ফাল্গুন ১৩১৮। মেদিনীপুর জেলার চেতুয়া পরগণায় পক্ষাশৌচ প্রচলন সম্বন্ধে উপস্থিত মাহিষ্যগণ ও গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর

করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত কুমরনারায়ণ চৌধুরী (জমিদার বাজুয়া) ও শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মণ্ডল (জমিদার গৌরা) মহাশয়দ্বয় সহকারী সভাপতি।

(৪) জেলা মেদিনীপুর—দাসপুর থানার অন্তর্গত জোতজীবনপুর গ্রামে সমাজ-পতি শ্রীযুক্ত অখিল চন্দ্র জানা মহাশয়ের বাটীতে পঙ্ক্তিশৌচ গ্রহণ সম্বন্ধে বিগত ১৩১৮ সালের ১৯শে ফাল্গুন তারিখে সভা হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীউপেন্দ্রনাথ বেরা মহাশয়। সম্পাদক শ্রীঅখিল চন্দ্র জানা।

পঙ্ক্তিশৌচগ্রহণ।

(১) জেলা হাওড়া উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত কালিনগর গ্রামে শ্রীহরিচরণ সাউয়ের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ—৬ই চৈত্র। (২) হীরাপুর গ্রামের গোপালচন্দ্র খাটার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ—২৬শেচৈত্র। (৩) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত দাসপুর থানার অধীন নিজলালপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীদ্বারিকানাথ ভৌমিকের মাতৃশ্রাদ্ধ—২৭শে ফাল্গুন। (৪) জেলা যশোর বনগ্রাম মহকুমার ঝিকিটিপোতা গ্রামের শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র সরকারের ভ্রাতৃবধূর শ্রাদ্ধ—৩১শে চৈত্র। হাওড়া জেলার বড়দাবাড় সংস্কৃত টোল হইতে শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ মিশ্র মহাশয় লিখিয়াছেন (৫) প্রেমচাঁদ মাইতির মাতৃশ্রাদ্ধ মাঘ মাসে (৬) যতীন্দ্র বেরার পিতৃশ্রাদ্ধ ফাল্গুন মাসে ও (৭) কালীপদ জানার পিতৃশ্রাদ্ধ চৈত্র মাসে বৈশ্যাচারে সম্পন্ন হইয়াছে। (৮) সীতাপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মাইতি তালুকদার মহাশয়ের তিনটী আত্মীয়ের শ্রাদ্ধ (৯) দিড়াচক গ্রাম নিবাসী ৺কুমারনারায়ণ ঘোড়ার আদ্যশ্রাদ্ধ—২১শে বৈশাখ (১০) জেলা হুগলী ভুরশিট পরগণা বিনগ্রাম নিবাসী অখিল চন্দ্র রাউথের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ—২রা বৈশাখ, (১১) ঐ পরগণার বৃন্দাবন চক্ নিবাসী প্রাণকৃষ্ণ মাঝীর পুত্রের জন্মে ২৯ শে চৈত্র (১২) সুন্দরুস গ্রামে চণ্ডীচরণ কোলের ভ্রাতৃজায়ার শ্রাদ্ধ—২০শে চৈত্র। (১৩) মেদিনীপুর—তমলুক মহকুমার ডাক্তারবেড়্যা গ্রাম নিবাসী ৺নটবর মণ্ডলের শ্রাদ্ধ—৩রা বৈশাখ। এই গ্রামের শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দাস ও শ্রীযুক্ত কার্ত্তিক চন্দ্র করণ ইহার উদ্যোগী।

সাহিত্য-সুহৃদের প্রশ্ন—সাহিত্য-সুহৃদে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতি, সাহিত্য-সমাজ, ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম প্রভৃতি সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন করা হইয়াছে, তদুত্তরে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক, দয়া করিয়া সমিতির আফিসে আসিয়া খাতাপত্র দেখিয়া যাইবেন। সমিতির যে হিসাব প্রকাশিত হইয়াছে, উহা

মোটামুটি হিসাব। মাহিষ্য সমাজে ইহা লইয়া বাদ প্রতিবাদ করা উচিত নহে বলিয়া আমরা বিবেচনা করি।

নববর্ষ। গ্রাহক অনুগ্রাহকগণের অনুকম্পায় ও ভগবানের আশীর্ব্বাদে মাহিষ্য সমাজ বিগত এক বৎসর কাল সমাজের সেবা করিয়া দ্বিতীয় বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। বিগত বর্ষে যেরূপ গ্রাহকগণ ঔৎসুক্য প্রকাশপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র পত্রিকার জীবন রক্ষার জন্ত কৃপাদৃষ্টি রাখিয়াছিলেন, আশা করি, বর্ত্তমান বর্ষেও তদ্রূপ ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। পুরাতন গ্রাহকগণ নববর্ষের মূল্য প্রেরণ ও নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে সহায়তা করিবেন—এই আমাদের বিনীত প্রার্থনা।

মাহিষ্য-সমাজ কার্য্যালয়ে বিক্রেয় পুস্তকের তালিকা।

—:•:—

সুকবি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাস প্রণীত বিবাহিত যুবকযুবতীর শিক্ষার জন্ত দুই খানি নূতন গ্রন্থ :—(১) **দাম্পত্য-চিত্র**—অপূর্ব্ব নাট্যকাব্য মূল্য ৸৹ বার আনা, সুন্দর বাঁধাই ১।৹ টাকা মাত্র। (২) **বৌ-কথা-কও**—সরল সামাজিক গদ্যকাব্য মূল্য ।৵৹ আনা।

কবি শ্রীযুক্ত দেবজীবন রায় প্রণীত নূতন ধরণের সামাজিক কাব্যগ্রন্থ (৩) **প্রেমের স্বপন**—মাহিষ্য জাতিকে উদ্বোধিত করিবার জন্ত উদ্দীপনাময় জাতীয় সঙ্গীত। মূল্য ।৹ চারি আনা।

(৪) **মাহিষ্য-বিবৃতি**—জাতি-তত্ত্বের অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ, মূল্য ৸৹ আনা।

(৫) **ভ্রান্তি-বিজয়**—বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাসের সমালোচনা—মূল্য ৸৹ আনা, বাঁধাই ১৲ এক টাকা মাত্র।

(৬) "THE MAHISHYAS"—ইংরাজী পুস্তক। মূল্য ১৲ টাকা।

(৭) **মাহিষ্য-সমাজ**—সামাজিক পুস্তক—১৩১৭ সালে প্রকাশিত ১২ খণ্ডের মূল্য ॥৹ আট আনা মাত্র। সেন্সাসে মাহিষ্য নাম লিখিবার জন্ত গবর্ণমেণ্টের আদেশ ও মুরশিদাবাদ মাহিষ্য সমিতির মোকদ্দমা ও মহামান্য হাইকোর্টের বিচার ফল প্রভৃতি ইহাতে আছে (৮) **মাহিষ্য-সমাজ**—সমাজোন্নতিমূলক মাসিক পত্র—১৩১৮ সালের প্রথম ভাগ (পুরাতন ফাইল) ১২ খণ্ড একত্রে মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র।—(৯) মহিষাদল-রাজবংশ ॥৹ (১০) ব্রাহ্মণ-সংহিতা ৷৹ (১১) মাহিষ্য-প্রদীপ ৵৹। (১২) মাহিষ্য-প্রকাশ ১॥৹ (১৩) দিয়াশলাই প্রস্তুত প্রণালী ৵৹। জাতি-তত্ত্ববিষয়ক অন্যান্য পুস্তক পত্রিকাদি।

মাহিষ্য-সমাজ।

[২য় ভাগ, ২য় সংখ্যা—জ্যৈষ্ঠ ১৩১৯]

হিন্দুধর্ম্ম (২)।

(প্রথম ভাগের ২৩৫ পৃষ্ঠার পর হইতে)

উপাসনা।

যিনি এই বৈচিত্র্যময় বিশ্বের একমাত্র আদি কারণ, যিনি প্রকাশমান বিশ্বের অন্তরে ও বাহিরে অবস্থিত, যিনি ভক্তের মনোঽভিলায় চরিতার্থের জন্ত সাকাররূপ গ্রহণ করেন, সেই অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি ভক্তি বা প্রীতি প্রদর্শনের জন্ত নানাবিধ কার্য্যানুষ্ঠানই উপাসনা নামে অভিহিত।

মন্ ধাতু হইতে মনু এবং মনু হইতে মানব শব্দের উৎপত্তি। মন্ ধাতুর অর্থ মনন বা চিন্তা করা। চিন্তা করা মানবের স্বাভাবিক ধর্ম্ম অর্থাৎ মানবমাত্রেই অল্পাধিক চিন্তাশীল। মানব তাহার স্বাভাবিক শক্তির—চিন্তাশক্তির উন্নতি সাধন দ্বারাই শ্রেয়ঃ লাভে সমর্থ হয়। সেই জন্ত সকল কার্য্যের মূল চিন্তাশক্তির গতি হিন্দুধর্ম্মের কোন নৈতিক বা সামাজিক নিয়ম দ্বারা প্রতিহত হয় নাই। অনেক ধর্ম্মে জনসাধারণের জন্ত উপাসনার একটী নির্দ্দিষ্ট পন্থা বিধিবদ্ধ থাকাতে অনেকের চিন্তাশক্তির স্বাধীনতা লোপ করা হইয়াছে। সেই নির্দ্দিষ্ট উপাসনাপদ্ধতি সাধারণের চিন্তাশক্তি ধারণা করিতে সক্ষম হউক বা না হউক সকলকে বাধ্য হইয়া তাহার অনুসরণ করিতে হয়। অনেক ধর্ম্মে একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনাই প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা যে কিরূপ অদ্ভুত বস্তু, তাহা চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। নির্গুণ ব্রহ্ম কখনও উপাসনার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। উপাসনার জন্ত গুণের আবশুক; কারণ মন কোনরূপ অবলম্বন না পাইলে স্থির থাকিতে পারে না এবং মন স্থির না হইলে কোন বিষয় ধারণা করা যায় না।

সগুণ ব্রহ্মই উপাসনার বিষয়। তিনি সকল প্রার্থনা শ্রবণ করেন এবং সকল ধ্যান তাঁহার দিকেই ধাবিত হয়। তিনি শিব, বিষ্ণু, দুর্গা, কালী, অগ্নি, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ প্রভৃতি যে কোন নামে বা মূর্ত্তিতে উপস্থিত হউক না কেন, সকল অবস্থাতে তিনিই—সেই সগুণ ব্রহ্মই একমাত্র উপাসনার বিষয়; নাম বা বিভূতি উপাসনার বিষয় নহে।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র বেদ পুরাণ, স্মৃতি, দর্শন প্রভৃতিতে কখন শিবকে কখন বিষ্ণুকে কখন শক্তিকে, কখন বা অন্য কোন দেবতাকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন পূর্ব্বক তাহার উপাসনা একমাত্র কর্ত্তব্য এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইহা হইতেই হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি। হিন্দুধর্ম্মে এইরূপ অসংখ্য উপাসক-সম্প্রদায় হইতেই অনেক সময় অনেকের মনে কাহার উপাসনা করিব, কোন্ দেবতা শ্রেষ্ঠ? এইরূপ সন্দেহজনক প্রশ্ন উদিত হয়। উপাসকদিগের মনে রাখা উচিত যে, বিভিন্ন-নামধেয় এবং বিভিন্ন মূর্ত্তিধারী দেবদেবী সকলেই সেই এক অনন্ত শক্তির বিভিন্ন রূপ। আমরা যে কোন দেবতার উপাসনা করি না কেন, তাহা সেই সর্ব্বশক্তি-মানেরই উপাসনা করা হইবে। তবে অনেক সময় এরূপ প্রশ্নও শ্রুত হয় যে, সকলের জন্য কোন একটী নির্দ্দিষ্টরূপের উপাসনা বিধিবদ্ধ হইল না কেন? তাহার উত্তর এই যে, শারীরিক ও মানসিক প্রকৃতির বিভিন্নতা হেতু সকলের নিকট সকল পদার্থ সমানভাবে গৃহীত হয় না। একটী পদার্থ অনেকের নিকট পরম রমণীয় বোধে আদরণীয় হইতেছে, আবার তাহাই অনেকের নিকট বিষবৎ পরিত্যাজ্য হইতেছে। সেই জন্য হিন্দুধর্ম্মে কোন একটী নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তির উপাসনা বিধিবদ্ধ হয় নাই। যাঁহার মনে যেরূপ ভাল লাগে তিনি সেই রূপের ধ্যান করিতে পারেন। তবে দুই এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৈষ্ণব শক্তিকে এবং শাক্ত বিষ্ণুকে ঘৃণা করেন এবং শাক্ত ও বৈষ্ণবদিগের মধ্যে একটী দ্বেষভাব বিদ্যমান আছে, তাহার কারণ মূর্খতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাঁহারা ভগবানের উপাসনা না করিয়া কোন একটী নির্দ্দিষ্ট মূর্ত্তির—জড়পদার্থের—উপাসনা করেন তাহাদের মধ্যে ঐরূপ বিদ্বেষ দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, যদি শক্তি ও বিষ্ণু অভেদ, তবে শক্তিকে বিষ্ণুর মতে উপাসনা করা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য এবং তাহা না করিলে প্রত্যবায় আছে। এই কথার উল্লেখ করিয়া অনেকে ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের ভক্তি একদেশী বলিয়া তাঁহাকে উচ্চ আসন প্রদানে অনিচ্ছুক হন। এই বিষয়টী প্রকৃতপক্ষে কত দূর সত্য তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। প্রহ্লাদ বিষ্ণুকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া জানিয়া ছিলেন এবং তিনি সেই বিষ্ণুমূর্ত্তির পূজা

করিতেন। তিনি যে দুর্গার উপাসনা এমন কি দুর্গানাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিতে অস্বীকৃত হইয়া ছিলেন তাহার কারণ বিদ্বেষ নহে। দুর্গানাম তাঁহার নিকট বিষ্ণুনামের মত মধুর মনোমুগ্ধকর ও শান্তিপ্রদ বলিয়া বোধ হইত না। ইহার জন্য তিনি দায়ী নহেন—দায়ী তাঁহার প্রকৃতি। মানসিক প্রকৃতির পার্থক্য অনুসারে সকলের নিকট এক জিনিস নানাবিধ ভাবে গৃহীত হয়। আর যদি ইহা দোষ বলিয়া গণ্য হয়, তাহা হইলে যে শ্রীরাধিকা, শ্রীচৈতন্যদেবও উক্ত দোষে দোষী। যখন চৈতন্যদেব নীলাচল (পুরীতে) রথারূঢ় জগন্নাথের সমক্ষে—"সেই ত পরাণনাথ পাইনু, যাহার লাগি মদন দাহনে দহি গেনু"—এই সঙ্গীত গান করিতে করিতে দুই প্রহর যাবৎ নৃত্য করিয়াছিলেন, তখন তিনি সঙ্গীতের মধ্যে মধ্যে—

> "যঃ কৌমারহরঃ স এবহি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
> স্তে চোন্মীলিত মালতী সুরভয়ঃ প্রৌঢ়া কদম্বানিলাঃ
> না চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপার লীলাবিধৌ
> রেবা রোধসি বেতসী তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে।"

এই শ্লোকটী আবৃত্তি করিয়া ছিলেন। শ্লোকটীর অর্থ ;—কোন নায়িকা কহিয়াছিলেন, যিনি আমার কৌমার কাল হরণ করিয়াছেন—আমাকে বিবাহ করিয়াছেন, আমার বর—অভিমত সেই পতি, সেই চৈত্রমাসের রজনী, সেই বিকসিত মালতীর সৌরভসংযুক্ত কদম্বকাননের মন্দ মন্দ সমীরণ, আর আমিও সেই রহিয়াছি, তথাপি সেই রেবানদীর তীরবর্ত্তী বেতসী তরুতলে সুরতলীলা বিধানার্থ আমার চিত্ত নিতান্ত উৎকণ্ঠিত হইতেছে।

স্বয়ং চৈতন্যদেব জগন্নাথ দেবের সম্মুখে প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে করিতে কি জন্য মধ্যে মধ্যে উক্ত শ্লোক উচ্চারণ করিতেছিলেন, তাহা কেহই স্থির করিতে পারিলেন না। কেবল শ্রীরূপ গোস্বামী উহার কারণ ও শ্লোকের ভাবার্থ নির্ণয় করিয়া একটী শ্লোক বলিলেন। যথা ;—

> "প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্র-মিলিত-
> স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গম-সুখম্
> তথাপ্যন্তঃ খেলন্মধুর মুরলী পঞ্চম জুষে
> মনো মে কালিন্দী-পুলিন-বিপিনায় স্পৃহয়তি।"

অর্থাৎ শ্রীরাধিকা কহিতেছেন, সহচরি! আমার সেই প্রণয়াস্পদ শ্রীকৃষ্ণ এই কুরুক্ষেত্রে আসিয়া মিলিত হইয়াছেন, আমিও সেই রাধিকা; উভয়ের মিলন-

জনিত সুখও সেই; তথাপি আমার মন সেই যমুনাপুলিনবর্ত্তী বিপিনের—যাহার অভ্যন্তরে মুরলীর মধুর পঞ্চমতান খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে—সেই বিপিনের জন্য ব্যাকুল হইতেছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর অধিকাংশ সময় রাধাভাব উপস্থিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ-দর্শন অথবা তাঁহার অদর্শনজনিত সুখ দুঃখে রাধার যেরূপ অবস্থা হইত, গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুরও সেইরূপ অবস্থা হইত। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনের রথে সারথীরূপে অবস্থিত শ্রীকৃষ্ণের সেই বীরভাব যেমন শ্রীরাধিকার মনপ্রাণ মোহিত করিতে সক্ষম হয় নাই সেইরূপ শ্রীজগন্নাথদেব সুশোভিত রথে আরোহণ করিয়া তাঁহার ঐশ্বর্য্য ভাবের দ্বারা শ্রীচৈতন্যদেবের অন্তরে পূর্ণশান্তি প্রদান করিতে পারে নাই। উভয়েই ভগবানের মাধুর্য্যরূপের রসাস্বাদনের জন্য ব্যাকুল হইত। ঐশ্বর্য্য ভাব তাঁহাদের প্রীতিকর হইত না। যাঁহারা পার্থিব ভোগ-বিলাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সংযতমনে সেই শ্রীপদের চিন্তা জীবনের সারব্রত করিয়াছিলেন, যাঁহারা মনোময় কোষের উর্দ্ধে বিজ্ঞানময় কোষে আত্মাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই যখন পরব্রহ্মের সকলরূপ সমানভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম হন নাই, তখন সাধারণ মানব—যাহার মন অনবরত পার্থিব ঐশ্বর্য্যের দিকে ধাবমান— কিরূপে তাঁহারা সকল বিভূতিকে সমানভাবে গ্রহণ করিবে? যখন সকলই সেই অনন্তশক্তির বিভূতি তখন যে কোন মূর্ত্তির বা যে কোন ভাবের উপাসনা করিলে তাঁহারই উপাসনা করা হইবে। সান্ত মানবের পক্ষে 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই ভাব ধারণা করা সম্ভবপর নহে; এবং তাহাতেও কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। গীতায় উক্ত হইয়াছে—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।' যে যেরূপে আমাকে আশ্রয় করে আমি তাহাকে সেই রূপে ভজনা করি।

হিন্দুধর্ম্মে উপাসনার বিভিন্ন প্রণালী নির্দ্দিষ্ট আছে। অনেকে বলেন, যখন ঈশ্বর এক এবং উপাসনার উদ্দেশ্যও সেই এক ঈশ্বরপ্রাপ্তি, তখন উপাসনার পথ এক না হইয়া বিভিন্ন হইল কেন? তাহার কারণ এই যে, এই সংসারে নানাবিধ লোক, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা—ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি; কেহ সংসারী, কেহ সংসারত্যাগী। যেমন একটী এণ্ট্রান্স স্কুলের সকল ছাত্রের শেষ লক্ষ্য প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া, কিন্তু ছাত্রগণের বুদ্ধিবৃত্তির তারতম্য অনুসারে তাহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া পৃথক পৃথক পুস্তক পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট করা হয়; সেইরূপ এই ব্রহ্মবিদ্যালয় রূপ বিশ্বে সকলের চরম লক্ষ্য ব্রহ্মপ্রাপ্তি

হইলেও তাহাদের মানসিক প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে বিভিন্নরূপ সাধন-প্রণালী বিহিত হয়। কেহ ইন্দ্রিয়সংযম-পূর্ব্বক মুদিতনয়নে স্থিরাসনে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শনে আনন্দে বিভোর হইয়া আছেন; কেহ দিবানিশি তাঁহার নাম জপ করিতেছেন; কেহ বহু আড়ম্বরের সহিত প্রতিমা গড়িয়া ভক্তিভাবে তাঁহার সম্মুখে স্তুতিপাঠ করিতেছেন।* প্রণালীর বিভিন্নতায় কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আসল জিনিষ ভক্তি এবং ইহাই উপাসনার প্রধান উপকরণ। যতক্ষণ মন বাসনার বশবর্ত্তী হইয়া ইন্দ্রিয়-চরিতার্থতার জন্য পার্থিব পদার্থে আকৃষ্ট হয়, ততক্ষণ ভক্তি মনে স্থান পায় না এবং চঞ্চল মন স্বরূপদর্শনে সক্ষম হয় না। ইন্দ্রিয়সংযমপূর্ব্বক মনকে আয়ত্ত করিয়া মনোময় কোষের উর্দ্ধে অবস্থিত হইতে পারিলে স্বরূপদর্শন হয় এবং তাহার ফলে পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। অতএব ইন্দ্রিয়-সংযমের জন্য প্রথমে পার্থিব ভোগবিলাস ত্যাগের কথায় কেহ শিহরিয়া উঠিবেন না। পূর্ণ আনন্দ বাহিরে নাই, ভিতরে। বাহিরের অস্থায়ী, দুঃখযোনি, খণ্ড আনন্দ পরিত্যাগ করিয়া, নিরবচ্ছিন্ন পূর্ণানন্দের জন্য মনকে বহির্মুখী হইতে না দিয়া অন্তর্মুখী করাই সকলেরই কর্ত্তব্য।

"মনের সহিত, করিয়া পীরিতি, রহিব স্বরূপ আশে;
স্বরূপ প্রভাবে ও রূপ মিলিবে, দ্বিজ চণ্ডিদাসে ভাবে।"

হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ধ্যান, জপ, স্তুতি, প্রতিমাপূজা সন্ধ্যাবন্দনাদি সকল গুলিই সকাম উপাসনা এবং গৌণ ভক্তির লক্ষণ। অনুন্নত সাধারণ মানবের পক্ষে, অধিকার-ভেদে, এ গুলি অবশ্য পালনীয় এবং বিশেষ উপকারী। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উন্নত তাঁহারা নিষ্কাম উপাসনার অধিকারী এবং তাঁহারা সকল কর্ম্ম ভগবানে সমর্পণ করিতে অভ্যাস করিবেন।

"তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥"

হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন প্রকার সাধনপ্রণালীর কোনটীই হেয় বা অপকারী নহে। অধিকারী ভেদে সকল গুলিই অত্যাবশ্যকীয় এবং পরম উপকারী। সর্ব্বপ্রকার মনুষ্যের উন্নতির জন্য এরূপ সহজ পথ আর কোন ধর্ম্মে কথিত হয় নাই।

শ্রীঅধরচন্দ্র কয়াল,
আমিড়া—শান্তিকুঞ্জ।

রাণী রাসমণির কালীবাটী।

ভাগিরথীর শ্যামল-কাননচ্ছায়া-বহুল তটদেশ শোভা করিয়া গত শতাব্দীতে কত না ভক্তের ঐকান্তিক বাসনা আকার ধারণ করিয়া আজ আমাদের নয়ন চরিতার্থ করিতেছে। ইহার কূলে পরিভ্রমণ করিতে করিতে যে সকল উদ্যানবাটিকা বা দেবমন্দির আজও পথিকের চক্ষে পড়ে, রাণী রাসমণির কীর্ত্তি উহাদের মধ্যে একটী। আজ যে রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটী এক তীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে, প্রথমে তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনীর দুই একটা উল্লেখ করিব।

রাসমণি দরিদ্রের কন্যা। পিতা হরেকৃষ্ণ দাস হালিসহরের নিকট কোণা গ্রামে বাস করিতেন। সেই সময়ে কলিকাতা জানবাজারের প্রীতরাম দাস ব্যবসাদারি ও মুৎসুদ্দিগিরী করিয়া ধনী হইয়াছিলেন। এই প্রীতরামের দ্বিতীয় পুত্র রাজচন্দ্রের তৃতীয় পক্ষের পত্নী রাসমণি। রাসমণির বিবাহের পূর্ব্বে প্রীতরামের প্রথম পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় মৃত হন, দ্বিতীয় পুত্রও এতদিন নিঃসন্তান, সেই জন্য রাসমণি বিবাহ হইয়া অবধি অত্যন্ত আদরের পুত্রবধূ হইয়াছিলেন। সেই আদরে তাঁহার হৃদয় ও মনে যে সকল গুণ ছিল তাহা প্রস্ফুটিত হইতে থাকে।

যদিও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, উদারতা ও দানশীলতা প্রভৃতি গুণ সকল বিধবাবস্থাতেই প্রকাশ পায়, তথাপি সধবাবস্থাতেও তাহার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল। তাঁহার পিতার মৃত্যুর চতুর্থদিবসে গঙ্গায় স্নান করিতে গিয়া দেখিলেন ঘাটে নামিবার বড় কষ্ট। সুবিধা মত একদিন পতিকে এই কথা জানাইয়া তাঁহাকে সাধারণের জন্য একটী ঘাট করিয়া দিতে বলিলেন ও সেই ঘাট প্রস্তুত হইল। ইহাই রাজচন্দ্র দাসের ঘাট বা 'বাবুঘাট' বলিয়া বিখ্যাত। যে রাস্তা এখনও "রাণী রাসমণি কুঠী" হইতে এই ঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত তাহাও বিস্তর খরচে রাজচন্দ্র বাবু প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, ও এখনও বাবুরোড বলিয়া উহা পরিচিত।

১২৪৩ সালে রাসমণি বিধবা হন। ধনী হিন্দুর বিধবা ব্রত পর্ব্ব তীর্থযাত্রা ইত্যাদিতে মন দিলেন। এক দিকে বৈষয়িক তত্ত্বাবধান করিতেন অপরদিকে দান ধ্যানে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিতেন। তাঁহার প্রকৃতি কিরূপ ছিল, তাঁহার

জানবাজারের জমিদার বাবুদের রূপার রথ আছে অনেকেই জানেন। ১২৪৫ সালে রাণী রাসমণি এই রথোৎসব আরম্ভ করেন। তাঁহার রৌপ্যরথ নির্ম্মাণের অভিলাষ জানিয়া জামাতারা এক ইংরাজ স্বর্ণকার হ্যামিল্টন কোম্পানিকে রথ নির্ম্মাণের ভার দিবার উদ্যোগ করেন। তিনি তাহা শ্রবণ করিয়া বলেন—ফিরিঙ্গিদের সঙ্গে আমাদের কি সম্বন্ধ? আমাদের দেশে কি আর স্বর্ণকার নাই? তখন সময় অতি অল্প আছে বলিয়া জামাতারা আপত্তি করেন। কিন্তু শাশুড়ী ঠাকুরাণীর কথানুসারেই চলিতে হইল—দেশীয় স্বর্ণকারে রথ নির্ম্মাণ করিল।

এক বৎসর ধুমধামের সহিত দুর্গোৎসব আরম্ভ হইল। সপ্তমীর প্রাতে কলা-বৌ স্নান করাইতে যাইতে হইবে। জানবাজারের রাস্তা দিয়া জয়ঢাক বাজাইয়া স্নান যাত্রা হইল। একজন ফিরিঙ্গি তাহার বাটীর সম্মুখে ঢাক বাজাইতে নিষেধ করে। রাসমণির নিকট এই সংবাদ আসিলে তিনি সে নিষেধ মানিবার আবশ্যকতা নাই বলিয়া আদেশ দেন। পুলিসে খবর গেল। পর দিবস রাসমণি আদেশ করিলেন—পঞ্চাশ জন ঢাকী তাঁহার বাটী হইতে গঙ্গা পর্য্যন্ত ঢাক বাজাইয়া যাইবে। পুলিস্ বিজ্ঞাপন দিল—বিনা পাশে যাইতে পারিবে না। ইহা হইতেই পাশের সৃষ্টি। রাণী কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন। জানবাজার বাবুরোড তাঁহার রাস্তা। তিনি সে রাস্তা হইতে অন্য রাস্তার যাতায়াতের পথ বন্ধ করিয়া দিলেন। তখন কোম্পানি অনুরোধ করিয়া পথ খোলাইলেন—রাণীর প্রতিজ্ঞা রহিল। রাণী শেষকাল পর্য্যন্ত ঐ রাস্তা তাঁহার খাসে রাখিয়াছিলেন। এই ঘটনা লইয়া সে সময় একটী ছড়া চলিয়া গিয়াছিল—"অষ্ট ঘোড়ায় গাড়ী দৌড়ায় রাণী রাসমণি—রাস্তা বন্ধ কর্‌তে পার্‌লে না কোম্পানি।"

এই সময় গঙ্গার মাছ ধরিবার জন্য সরকার হইতে এক কর আদায় করিবার প্রস্তাব উঠে। ধীবরেরা উত্যক্ত হইয়া তাঁহার আশ্রয় লয়। তিনি তাহাদের অভয় দান করিলেন। জামাতাদের আদেশ করিলেন—হিসাব করিয়া দেখ, কাশীপুর হইতে মেটিয়াবুরুজ পর্য্যন্ত গঙ্গার কত খাজনা দিতে হইবে। হিসাব হইলে সরকারে দশ হাজার টাকা জমা দিলেন ও রেজেষ্টারী করা পাট্টা লইলেন। কয়েকদিন যায়—এক দিন হঠাৎ রাণী আদেশ দিলেন—আজ নদীতে জাহাজ ষ্টীমার বা অন্য কিছু যাইতে দিও না—

পুলিশের সহিত গোল বাধিল, মোকদ্দমা উঠিল। সরকার বাহাদুর বুঝিলেন—এ বড় কঠিন ঠাঁই। গঙ্গার জলকর রহিত হইল।

সিপাহীদিগের হাঙ্গামার সময় একদিন রাণী রাসমণির দৌহিত্রেরা বাড়ীর বারেন্দায় বৈকালে বসিয়া আছেন, দেখিলেন, কয়েকজন গোরা সম্মুখের দোকানে উৎপাত করিতেছে। তাঁহারা দ্বারবানদিগকে আদেশ করিলেন, উহাদের তাড়াইয়া দাও। তাড়াইতে যাইয়া সেই গোরা কয়টী প্রহৃত হয়। তাহারা ফিরিয়া এক দল সৈন্য আনিয়া রাসমণির বাটী অবরোধ করে। দ্বারবানেরা ভয়ে দ্বার রুদ্ধ করিল। অন্তঃপুরে ক্রন্দনধ্বনি উঠিল। অন্তঃপুরবাসিনী সকল রমণী পিছনের দ্বার দিয়া মান্না বাবুদের বাটীতে প্রস্থান করিলেন। রাসমণি কিন্তু গৃহ পরিত্যাগ করিলেন না। কতকগুলি চাবি ও একখানা তরবারি হস্তে লইয়া নিজ গৃহে বসিয়া রহিলেন। এদিকে গোরারা বহির্বাটীতে প্রবেশ করিয়া দ্বারবান দুই এক জনকে আহত করিতে লাগিল ও আসবাব আদি অনেক নষ্ট করিতে লাগিল। জামাতা মথুরামোহন তখন বাটীতে ছিলেন না। তিনি আসিয়া কর্ণেলকে বলিয়া সৈন্যদিগকে নিবৃত্ত করেন। সে দিনের উৎপাত থামিল বটে, কিন্তু ভবিষ্যৎ উৎপাতের আশঙ্কায় রাণী রাসমণি আদেশ করেন, বার জন গোরা তাঁহার বাটীতে পাহারায় নিযুক্ত থাকিবে। সেই সময় হইতে প্রায় দুই বৎসর তাঁহার বাটীতে এইরূপ পাহারা নিযুক্ত ছিল। ইহাতেও তিনি সন্তুষ্ট হয় নাই। তাঁহার যে সব আসবাব নষ্ট হইয়াছিল সে সমস্তের ক্ষতিপূরণ বাবদ সমস্ত টাকা সরকার হইতে আদায় করিয়াছিলেন।

তাঁহার জমিদারী মকিমপুর পরগণায় নীলকরের উৎপাত হয়। উৎপীড়িত প্রজার কষ্ট শুনিয়া তিনি পঞ্চাশ জন দ্বারবান পাঠাইলেন এবং স্বাক্ষরিত পত্র দ্বারা নায়েবকে উপদেশ দিলেন, অত্যাচারী নীলকর সাহেবকে সমুচিত শাস্তি দিবে। নীলকর ডোনাল্ড যে উত্তম মধ্যম শিক্ষা পায়, তাহাতে মৃতপ্রায় হয়। মোকর্দ্দমা হয়, কিন্তু মোকর্দ্দমা ডিস্‌মিস্ হয়। সেই অবধি সেখানে নীলকরের উৎপাত স্থগিত হইল। রাণী রাসমণি ১২৬৭ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

এই সহৃদয়া, তেজস্বিনী, কীর্ত্তিমতী, ঐশ্বর্য্যশালিনী বঙ্গমহিলার জীবনের আরও অনেক আখ্যান আছে। সেই আখ্যান-মালার দুই একটা তবক ধরিয়া তুলিয়া দেখিলে বেন পুষ্পরাশির সৌরভ ছুটিয়া উঠে। তাহারই সুমিষ্টতম বিকাশ—দক্ষিণেশ্বর কালী বাড়ীতে। ইহার প্রতিষ্ঠায় হিন্দুস্থাপত্য বিদ্যার মহিমা রক্ষিত হইয়াছে, তখনকার শিল্পিচাতুর্য্য প্রকৃষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে, হিন্দুর

ঐশ্বর্য্যভোগের সার্থকতার আদর্শ পরিস্ফুট হইয়াছে। আর ভোগের সহিত ত্যাগের, সম্পদের সহিত নিস্পৃহতার, বিষয়ের সহিত সাধনার, লীলার সহিত শ্মশানের, রাধাবল্লভের সহিত শিব-শিবানীর সম্মিলন যে এখনও হিন্দুর দেশে সম্ভব, তাহা ঐ মন্দিরের পাদমূলে গঙ্গার তরঙ্গরাজি গাহিয়া গাহিয়া বহিয়া যাইতেছে।

রাণী রাসমণি অনেক তীর্থপর্য্যটন করেন। নানা তীর্থভ্রমণের পর তাঁহার বারাণসী যাইবার অভিলাষ হইল। পঁচিশখানি বজরা সজ্জিত হইল, লোক জন পরিজন আমলা ডাক্তার বৈদ্য গাভী সঙ্গে লইবার আয়োজন হইল। সেই সময় বাঙ্গালায় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী উপস্থিত। রওনা হইবার পূর্ব্বরাত্রিতে রাসমণি স্বপ্ন দেখিলেন বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণা তাঁহার সম্মুখীন হইয়া দরিদ্র বিপন্নদিগকে অন্নদান আর গঙ্গাতীরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে বলিতেছেন। প্রত্যূষে উঠিয়া গঙ্গাতীরে যাইয়া যাহা কিছু দ্রব্যসম্ভার কাশীধামে লইয়া যাইবার জন্য সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা সমস্তই অন্নপূর্ণার নামে উৎসর্গীকৃত করিয়া দান করিতে আদেশ দিলেন, আর জামাতাদিগকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিয়া কালীপ্রতিষ্ঠার জন্য গঙ্গাতীরে ভূমির সন্ধান করিতে বলিলেন। জামাতা মথুরামোহন, কলিকাতার তিন ক্রোশ উত্তরে এক শত বিঘা জমি ক্রয় করিলেন। এই জমি লইয়া মোকদ্দমা হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যবসায় বলে রাসমণি সকল বাধা বিঘ্ন দূর করিয়া ফেলিলেন।

১২৫৯ সালে স্নানযাত্রার দিন দেবালয় প্রতিষ্ঠা হইল। ইহা প্রস্তুত ও প্রতিষ্ঠা করিতে নয় লক্ষ টাকা ব্যয় হয়। প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কান্যকুব্জ, বারাণসী ও উড়িষ্যা প্রভৃতি নানাদেশ হইতে অনেক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ সমাগত হন। তাঁহারা যথাযোগ্য সমাদরে সৎকার লাভ করেন।

এই দেবালয়ের উত্তরে বৃহৎ পুষ্পোদ্যান। পুষ্পোদ্যানের মধ্যে পঞ্চবটীর প্রতিষ্ঠা আছে। গঙ্গার গর্ভ হইতে এক সুপ্রশস্ত ঘাট উঠিয়া চাঁদনী পর্য্যন্ত গিয়াছে। চাঁদনীর উত্তরে ও দক্ষিণে ছয় ছয় করিয়া দ্বাদশ মহাদেবের মন্দির। আর চাঁদনীর পূর্ব্বে বিস্তৃত প্রাঙ্গণ। এই প্রাঙ্গণ দশ বিঘা পরিমাণ হইবে। প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে ঐ দ্বাদশ শিবমন্দির আর তিন পার্শ্বে পরিচারক পূজারী প্রভৃতির থাকিবার স্থান। নবরত্ন মন্দির মধ্যস্থলে অবস্থিত। এই মন্দিরেই নৃমুণ্ডমালিনী কালীমূর্ত্তি। মন্দিরের ভিতরে

বাহিরে কারুকার্য্যনিপুণ শিল্পীর চারু কৃতিত্বের পরিচয়। মন্দিরের উত্তরে গোপীনাথের যুগলমূর্ত্তি, দক্ষিণে নাটমন্দিরের প্রশস্ত দালান।

এখানে সদাব্রত আছে। তাহার জন্য প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি আছে। রাণী নিজেই এই সমস্ত সম্পত্তি দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত করিয়া যান। ইহাই রাণী রাসমণির প্রধান কীর্ত্তি। দানেই ইঁহার বীরত্ব। প্রকৃতই এমন দানশীলা নারী যে এই সেদিন বঙ্গদেশে জন্মিয়াছিলেন, আমাদের বাঙ্গালী রমণীর হৃদয়ে যে এমন তেজ, এমন বুদ্ধি, এমন অধ্যবসায়, এমন সহৃদয়তা ফুটিতে পাইয়াছিল, ইহা ভাবিয়া কেবল কি তাহার বংশধরগণই গৌরবমণ্ডিত হইবেন—না সমস্ত বঙ্গবাসীও গৌরব বোধ করিবেন? যে কেহ এই কীর্ত্তি দেখিয়াছেন, তিনিই বলিবেন যে, এই গঙ্গাতীরবর্ত্তী দেবালয়ে মহত্বের প্রতিষ্ঠা আছে—সুকৃতির সৌরভ আছে। আর তাহা না হইলেই কি আর এখানে রামকৃষ্ণের মত ফুল ফোটে?

বাল্য-বিবাহ।

এ যাবৎকাল শাস্ত্রের দোহাই দিয়া হিন্দুসমাজ বাল্যবিবাহ সমাজে এরূপ ভাবে প্রচলিত করিয়াছে যে, বর্ত্তমান শিক্ষিত-সমাজ এই কুপ্রথাকে সমাজ হইতে দূরীভূত করিবার জন্য নানারূপ চেষ্টা করিয়াও কোনরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছেন না। কোন প্রথার একবার প্রচলন হইলে উহাকে দূর করা প্রভূত সময় ও চেষ্টা সাপেক্ষ। বাল্য বিবাহ যে ঘোরতর অনিষ্টকর, তাহা সমাজ বুঝে; কিন্তু বুঝিয়াও কোনমতে ছাড়িতে পারিতেছে না। ব্যক্তিগত ভাবে কোন কু-অভ্যাস যেমন সহজে ত্যাগ করা যায় না, সমষ্টিভাবেও সেইরূপ সমাজের পক্ষে কোন বদ্ধমূল কুপ্রথা একেবারে ত্যাগ করা সুকঠিন।

"বলবান জাতিগঠন-পক্ষে যতগুলি প্রতিবন্ধক আছে, বাল্যবিবাহ তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ইহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে, পরন্তু শাস্ত্রনিষিদ্ধ এবং জাতীয় দুর্ব্বলতার মূল কারণ। যে জাতি প্রাচীন কালে শৌর্য্য, বীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে জগতে স্বীয় অতুল গৌরব বিস্তার করিয়াছিল, সেই জাতি যে দিনে দিনে দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে ইহার একটী কারণ বাল্যবিবাহ। আমাদের দেশের স্ত্রীলোক সাধারণের মূর্খতা ইহা হইতেই প্রসূত; এবং যুবক ও 'বালিকামাতা'

ও তাহাদের সন্তান সন্ততির অকালমৃত্যুর আর দ্বিতীয় কারণ নাই। বাল্য-বিবাহ আমাদের জাতীয় উন্নতির প্রতিবন্ধক ও পতনের একমাত্র কারণ। যে কুপ্রথাতে এতগুলি দোষ বর্ত্তমান তাহাকে সমাজ কিরূপ দৃঢ়বন্ধনে রক্ষা করিতেছে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। ভ্যামপায়ার (Vampire=রক্ত শোষক বাদুড় বিশেষ) নামক রক্তশোষক পিশাচের ন্যায় ইহা জাতির জীবন-শোণিত প্রতিদিন শোষণ করিতেছে এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির নিকট উপহাসাস্পদ করিয়া তুলিয়াছে।"

অধুনা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির অবনতির কারণ বলিয়া যে শত্রুকে সমাজ হইতে দূর করিবার প্রয়াস হইতেছে, সেই শত্রু বাঙ্গালীর মধ্যে কোন্ জাতিকে বিশেষরূপে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, দেখিতে গেলে, সর্ব্ব প্রথমে এই দুর্ভাগ্য মাহিষ্যসমাজের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। কিন্তু মাহিষ্য-সমাজ স্থির অটলভাবে এই শত্রুকে গৃহের উপাস্য দেবতারূপে গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিতেছে। সেই জন্য মাহিষ্য-সমাজকে এই বাল্য-বিবাহের দোষগুণ দেখাইয়া সমাজ হইতে এই সকল অনিষ্টের মূল বহুকালব্যাপী এই কুপ্রথাকে দূর করা যে যুক্তিযুক্ত তাহা বুঝাইয়া দেওয়াই এই প্রবন্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বাল্য-বিবাহের সাপক্ষে বলিবার কিছু না থাকিলেও সমাজ কেবল নিজ-মতকে বজায় রাখিবার জন্য বলিয়া থাকে যে, এতদিন ধরিয়া যে প্রথা সমাজে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহাকে অকস্মাৎ ঘোরঅনিষ্টজনক মহাশত্রু জ্ঞান করা যুক্তিযুক্ত নহে। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ বাল্য-বিবাহকে কুপ্রথা মনে করিলে কখনও তাহাকে সমাজে স্থান দিতেন না। একথা কিন্তু যথার্থ নহে। বহুকাল পূর্ব্বে অর্থাৎ হিন্দু রাজন্যবর্গের রাজত্বকালে স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডল, বি, এল।

৺গৌরাঙ্গ দাস মহাশয়ের প্রভাব ও কীর্ত্তি।

ধন, জন, কুল, মান, কিছুই চিরদিন থাকে না; কিন্তু কীর্ত্তি চিরদিন থাকিয়া যায়। এই জন্যই প্রাচীন পণ্ডিতগণ লিখিয়া গিয়াছেন—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" কীর্ত্তিমান্ মহাত্মগণ ভারতের সেই সপ্ত চিরজীবীর ন্যায় অমর হইয়া থাকেন। আজ মাহিষ্য-সমাজের একজন কীর্ত্তিমান্ ব্যক্তির জীবন

সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি। এই মহাত্মার নাম গৌরাঙ্গ দাস—চলিত ভাবে ইনি গৌরাঙ্ দাস নামে লোকের মুখে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। এক শত বৎসর অতীত হইতে চলিল, ইনি পরলোকে গমন করিয়াছেন।

ঢাকা নগরীর দক্ষিণেই পূর্ব্ববাহিনী বুড়িগঙ্গা নদী। এই নদীর দক্ষিণ তীর হইতে অল্প কতিপয় মাইল দক্ষিণ পূর্ব্বেই বেয়রা নামক একখানা গণ্ডগ্রাম অবস্থিত। এই গ্রামেই গৌরাঙ্গ দাস মহাশয়ের বসতি ছিল। এই গ্রামের যে সকল প্রাচীন ভদ্রাভদ্র লোক বিদ্যমান আছেন তাঁহাদের মধ্যে দুইটী বংশ গ্রামের মৌলিক তালুকদার ও নেতৃ স্থানীয়। এই গ্রামের সর্ব্ববিধ পুরাতন কাহিনী ও সুখদুঃখের অশ্রুধারার সঙ্গে এই দুইটী বংশ চিরজড়িত। এই দুই বংশই এখন সেই প্রাচীন প্রভাব ও সম্পদ হইতে কাল কর্ত্তৃক বঞ্চিত-প্রায়। এই দুই বংশের একটী জাতিতে বৈদ্য, যাঁহাদের পাড়াকে "বড় সেন পাড়া" বলে। ঢাকার সুপরিচিত উকীল ৺রাম চন্দ্র সেন মহাশয় এই বংশের একজন অলঙ্কার ছিলেন। অন্যটী জাতিতে মাহিষ্য-দাস গ্রামে সাধারণতঃ 'দাসবংশ'—'দাসগোষ্ঠী' বলিয়া পরিচিত।

ইঁহারা উভয়েই এই গ্রামের মৌলিক তালুকদার ও নেতা ছিলেন। শেষ অবস্থায় গ্রামের ষোল আনা নেতৃত্ব দাসবংশেই ন্যস্ত হইয়াছিল—ইঁহারাই শেষে গ্রামের সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া উঠিয়া ছিলেন। এই বংশেই ৺গৌরাঙ্গ দাস মহাশয় জন্মগ্রহণ করেন। যে সময়ে ৺গৌরাঙ্গ দাস ও তদীয় ভ্রাতৃবর্গের "জয়ময়", ঠিক সেই সময়েই বড় সেনবংশে ৺শ্যাম সেন মহাশয়ের প্রভাব দেদীপ্যমান ছিল। গৌরাঙ্গ দাস মহাশয়ের অন্যতম ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ কবিরাজ একজন জনপ্রশংসিত কবিরাজ ছিলেন। সেনবংশের তদানীন্তন নেতা শ্যাম সেন মহাশয় উভয় বংশের বন্ধুতা ঘনীভূত করিবার জন্য সমারোহের সহিত রাজকৃষ্ণ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে "বন্ধুতা" পাতাইয়া ছিলেন। এই আত্মীয়তা উভয় বংশে চারিটি পুরুষ সমাজে অব্যাহত ছিল। পুরাতন কালের বন্ধুতা কত গভীর ছিল, ইহা তাহার একতর নিদর্শন।

দাসবংশের গৃহে পার্শি শিক্ষা দানের জন্য একজন মৌলবী বাস করিতেন। ইঁহার নিকট সকলেই পার্শি শিক্ষা করিতেন। পার্শিবিদ্যা ব্যতিরেকে তখন অর্থ উপার্জ্জন ও সম্মান নির্জ্জন করা সহজ ছিল না। তখন ঢাকার দেওয়ানী আদালত এবং ঢাকার ওমরাহগণের সেরেস্তায় পার্শীবিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন এবং সমাদর ছিল। পার্শী-শিক্ষার্থী যুবকদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রতিভাসম্পন্ন

ছিলেন, তাঁহাদিগকে তখন "পার্শি বাঙ্গালার মূর্ত্তিমান্" বলিয়া প্রশংসা করা হইত। গৌরাঙ্গ দাস মহাশয় তখন "পার্শি বাঙ্গালায় একজন মূর্ত্তিমান্" লোক হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার এক ভ্রাতা কান্ত মুন্সী ঢাকার উকীল হইয়াছিলেন, কান্ত মুন্সীর জ্যেষ্ঠপুত্র লোকনাথ উকীল হইয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তাঁহার এক ভ্রাতা রাজকৃষ্ণ কবিরাজ একজন বিখ্যাত কবিরাজ ছিলেন। তৎকালে যদিও শব-ব্যবচ্ছেদ অতীব নিন্দনীয় কার্য্য ছিল, তথাপি রাজকৃষ্ণ কবিরাজ মহাশয় অস্ত্রচিকিৎসায় পারদর্শিতা-লাভের জন্য আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ দেখিয়া গোপনে ঢাকার পূর্ব্বদিকস্থ শ্যামপুরের জঙ্গলে ডোম দ্বারা শব উঠাইয়া নির্জ্জনে ব্যবচ্ছেদ করিতেন। শ্যামপুর অঞ্চলে এখনও তাঁহার নাম জাগ্রত্ আছে। তাঁহার এক ভ্রাতা কৃষ্ণদাস ঢাকায় মোক্তার ছিলেন, দেবপ্রসাদ তদানীন্তন মোগল সরকারের কার্য্য করিতেন। তখন এই পরিবারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর যুগপৎ দৃষ্টি পতিত হইয়াছিল—গ্রামে, গ্রামান্তরে, পথে, ঘাটে সর্ব্বত্রই দাসবংশের জয়কারের কথা।

গৌরাঙ্গ দাস মহাশয় অতীব তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও দক্ষ লোক বলিয়া ঢাকা নগরীতে পরিচিত হইয়াছিলেন। তিনি ঢাকাস্থ বহুতর আমীর ওমরাহের বুদ্ধিসচিব হইয়াছিলেন। অনেক বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ অপেক্ষা করিত। এই সময়ে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হইতে আরম্ভ করে। একটী ঘটনার দ্বারাই ঢাকায় তাঁহার তদানীন্তন প্রভাবের আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

ঢাকার বর্ত্তমান ফরাসগঞ্জস্থ সিপাহী নিবাসের লগ্ন উত্তর পূর্ব্ব গলীতে স্বরূপ খাজাঞ্চী নামক একজন বড় ধনী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার ত্যক্ত প্রশস্ত দোতালা দালান এখনও বিদ্যমান। গৌরাঙ্ দাস মহাশয়ের বুদ্ধি ছাড়া ইনি কোন কাজই করিতে সাহসী হইতেন না। ইনি প্রথমতঃ গরীব অবস্থার লোক ছিলেন; কিন্তু গৌরাঙ্দাস মহাশয়ের পরামর্শ ও সহায়তায় ঢাকার তদানীন্তন বিখ্যাত আমীর মির্জ্জা ইশরাফ্ আলী সাহেবকে জামিন দিয়া তেরজুরীর খাজাঞ্চী নিযুক্ত হন। তখন বৎসরান্তে তেরজুরীর তহবিল মিল করা হইত। স্বরূপ খাজাঞ্চী ইত্যবসরে তেরজুরী হইতে ইচ্ছামত টাকা বাহির করিয়া লগ্নি করিতেন। তিনি সমস্ত বৎসর এইরূপে সরকারী টাকা লগ্নি করিয়া তহবিল মিল দেওয়ার তারিখের পূর্ব্বেই তহবিলে টাকা আনিয়া রাখিয়া দিতেন। তহবিল মিল হইয়া গেলে আবার টাকা বাহির করিয়া লগ্নি করিতেন। এই উপায়ে স্বল্পকাল মধ্যেই তিনি বড় ধনী হইয়া উঠিলেন। শুনা যায়,

মুরশিদাবাদের জগৎশেঠ বংশও এই প্রণালীতে নবাব সরকারের তেরজুরীর টাকা লগ্নি করিয়া অসাধারণ ধনী হইয়া পড়িয়াছিলেন। কোন কারণে একবার মির্জ্জা সাহেবের সদর খাজনার টাকা টান পড়িল। তিনি খাজাঞ্জির জামিন, খাজাঞ্জি তাঁহার জামিনতায় পর্য্যাপ্ত টাকা উপার্জ্জন করিতেছে। কাজেই তিনি খাজাঞ্জিকে অনুরোধ করিলেন—তিনি সদর খাজানার টাকা পাঠাইতে পারিতেছেন না, পরে পাঠাইবেন, সম্প্রতি সদর খাজনার টাকা কালেক্টরীর খাতায় জমা করিয়া লওয়া হউক। খাজাঞ্জি তাহাই করিলেন; কিন্তু অদ্য কল্য করিয়া আর টাকা পাঠান হইল না। দ্বিতীয় বার আবার সেইরূপ অনুরোধ ও সেইরূপে টাকা জমা দেওয়া হইল; কিন্তু অদ্য কল্য করিয়া টাকা প্রেরিত হইল না। খাজাঞ্জি ভারি চিন্তিত। পরের বারও সেইরূপ অনুরোধ করা হইল, এইবার খাজাঞ্জি টাকা না পাইয়া টাকা জমা দিতে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন। এই কথা শুনিয়া মির্জ্জা সাহেব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া কালেক্টর সাহেবের নিকট যাইয়া জানাইলেন, তিনি আর খাজাঞ্চীর জামিন থাকিবেন না, তহবিল মিল করিয়া লওয়া হউক। কালেক্টর তৎক্ষণাৎ মির্জ্জা সাহেবকে লইয়া তেরজুরীতে ধাবমান হইলেন। খাজাঞ্জি ইতিমধ্যেই লোকমুখে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়া নিজেকে নিরুপায় স্থির করিলেন, কেননা এই সময়ের মধ্যে বাহিরের জমীর টাকা আনিয়া জমা দেওয়া এবং মীর্জ্জা সাহেবের বাকী সদর জমা পূরাইয়া তহবিল মিল দেওয়া অসম্ভব। খাজাঞ্জি ঐ সময়ে মির্জ্জা সাহেবের শেষ কিস্তীর টাকার মধ্যে এক টাকা বাকী রাখিয়া বাকী টাকা জমা দিয়া সাহেব আসিবার পূর্ব্বেই গবাক্ষ দ্বার দিয়া পলায়ন করিলেন এবং বাড়ী যাইয়া গৃহস্থিত ধন দৌলতরাশি বাড়ীর চতুর্দ্দিকস্থ বাড়ীসমূহে লোষ্ট্রবৎ নিক্ষেপ করিলেন, এবং দুই কন্যা গৌরমণি ও ভুবনমণিকে বাড়ীতে রাখিয়া পলায়ন করিলেন।

এদিকে কালেক্টর তেরজুরীতে আসিয়া খাজাঞ্চীকে অনুসন্ধানে না পাইয়া তাঁহাকে ধরিবার জন্য সিপাহী পাঠাইলেন। সহরে হৈ চৈ পড়িয়া গেল। কালেক্টর সদর খাজনার বাকীদারের হিসাব মিলাইয়া দেখিলেন মীর্জ্জা সাহেবের এক টাকা খাজনা বাকী। তিনি ঐ এক টাকার জন্য তাহার প্রকাণ্ড জমিদারী নীলামে উঠাইয়া বিক্রয় করিলেন, মীর্জ্জা সাহেব অভিমানভরে নীলাম ডাকিলেন না; তিনি নীলাম ফিরাইবেন, কিন্তু শেষে শত চেষ্টায়ও নীলাম ফিরিল না। মির্জ্জা ইশরাফ-আলী একদিনেই সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। এইরূপে ঢাকার তদানীন্তন একধর আমীর ও একধর ধনী যুগপৎ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলেন।

গৌরাঙ্ দাস মহাশয় পূর্ব্ববন্ধুস্বরূপ খাজাঞ্চীকে এই বিপদ-সময়ে পরিত্যাগ করিলেন না; তিনি সিপাহী ও গুপ্তচরের ভয় অগ্রাহ্য করিয়া খাজাঞ্চীকে একটা বিছানার মধ্যে জড়াইয়া নিজ বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং বাড়ীর পিছাড়ায় জঙ্গলমধ্যে কতককাল লুকাইয়া রাখিলেন—পরিশেষে গুপ্তচর ও সিপাহীর উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় তিনি খাজাঞ্চীকে ৺বৃন্দাবনধামে, জাঠরাজ্যে পাঠাইয়া দিলেন। সেই স্থানেই খাজাঞ্চীর মৃত্যু হইল। এই আখ্যান দ্বারা সহরে গৌরাঙ্ দাস মহাশয়ের কতটা প্রভাব ছিল, অনেকাংশে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও এই কাহিনী অনেকের মুখে নৃত্য করিত।

গৌরাঙ্ দাস মহাশয় অত্যন্ত দাতা ও সৎকর্ম্মী লোক ছিলেন। তিনি বহুতর ব্রাহ্মণকে কন্যাদায় হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। বিবাহ ও উপনয়নের খরচ দিয়াছিলেন। জলাশয় খননের জন্য, বাস্তুভিটা রক্ষার জন্য অকাতরে অর্থ দান করিয়াছিলেন। এই ভাবেই তাঁহার সঞ্চিত অর্থরাশি ব্যয় করিয়াছিলেন। তিনি সাধারণের সুবিধার জন্য স্বগ্রামের মধ্য দিয়া ঢাকার বুড়ীগঙ্গা নদী পর্য্যন্ত এক বিস্তীর্ণ খাল খনন করাইয়াছিলেন এবং উক্ত খালের পূর্ব্বপার দিয়া ঢাকার নদীর তীর পর্য্যন্ত উচ্চ সড়ক বান্ধিয়া দিয়াছিলেন। গ্রাম হইতে প্রায় এক মাইল দূরে ঐ খালের পূর্ব্বপারে ভ্রাতুষ্পুত্র রাধানাথের নামে 'রাধানগর' নামে পল্লী ও বাজার বসাইয়া পুষ্করিণী খনন করাইয়াছিলেন। এই খাল, সড়ক, বাজার ও পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠায় গৌরাঙ্ দাস মহাশয় তদানীন্তন কালের পঞ্চাশ হাজার টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই খালকে "গৌরাঙ্গ খালী" এবং সড়ককে "গৌরাঙ্গ দাসের আইল" বলে। সড়ক ও খাল এখন তাঁহার উত্তরাধিকারী-দিগের স্বত্ব-দখলীয়, কিন্তু লোক্যাল বোর্ড দ্বারা সংস্কৃত হইয়া থাকে।

গৌরাঙ্ দাস মহাশয়ের সময়ে গ্রামে তিনটী টোল ছিল। উহার একটীতে ন্যায়শাস্ত্র, একটিতে ব্যাকরণ, একটীতে পুরাণশাস্ত্র অধীত হইত। তিনটী টোলই তাঁহার বাড়ীর প্রায় লগ্ন উত্তরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের বাটীতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই তিনটী টোলে প্রায় একশত "পঠনীয়া" (ছাত্র) পড়িত। গৌরাঙ্ দাস মহাশয় অবলীলাক্রমে এই ছাত্রগুলির সমগ্র আহারের ব্যয় যোগাইতেন। ইহা ছাড়া নানা পর্ব্বে, উৎসব-ক্রিয়ায় পর্য্যাপ্ত অর্থদান করিতেন। এই দানের প্রতিদান এই—যতক্ষণ গৌরাঙ্ দাস মহাশয় বৈঠকখানায় বসিবেন, ততক্ষণ টোলের কতিপয় প্রধান ছাত্র ও একজন পণ্ডিত উপবেশন করিয়া শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ বলিবেন এবং পুরাতন ও নূতন শ্লোক শুনাইবেন। এই নিয়মের অন্যথা

হইবার উপায় ছিল না। এই শাস্ত্রাস্বাদজনিত সুখলাভের জন্যই তিনি এত ব্যয়ভার বহন করিতেন। ইহা সামান্য সহৃদয়তার কথা নহে।

তাঁহার মজলিসে তিনটী লোক নিয়ত উপস্থিত থাকিতেন, গৌরাঙ্গ দাস মহাশয় তাঁহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন। এই তিনজন লোক তাঁহাকে বাঙ্গালা কবিতা ও গান রচনা করিয়া শুনাইতেন। ইঁহাদের নাম যথাক্রমে কালিদাস গুপ্ত, কালিদাস দত্ত ও কালিদাস চক্রবর্ত্তী। গৌরাঙ্গ দাস মহাশয় গুপ্ত ও দত্তকে পূর্ণ কলিদাস আখ্যা দিয়াছিলেন, চক্রবর্ত্তীকে অর্দ্ধ কালিদাস বলিতেন। গুপ্ত ও চক্রবর্ত্তী কালিদাস তাঁহার স্বগ্রামবাসী। দত্ত কালিদাস আরাকুল গ্রামবাসী ছিলেন। ইঁহারা স্ব স্ব রচিত পয়ার ও গান দ্বারা গৌরাঙ্গ দাস মহাশয়ের কাব্য রস পিপাসা প্রশমিত করিতেন। এই জন্য তাঁহার চতুর্দ্দিকের লোকে বলিত—"গৌরাঙ্গ দাসের আড়াই কালিদাসের সভা"!! সেই পার্শি বাঙ্গালার দিনে এরূপ বিচিত্র কাব্যপিপাসা ও সহৃদয়তার কথা চিন্তা করিলে আনন্দে বিহ্বল হইতে হয়। কালিদাস-ত্রয়ের কোন রচনাই রক্ষিত হয় নাই! গুপ্ত কবির একটী কবিতা আমাদের মনে আছে, তাহা গৌরাঙ্গ দাস মহাশয়ের মৃত্যুর পর রচিত বলিয়া বোধ হয়।—"গুপ্ত হলেন লুপ্ত, দাস হলেন কাস"।

গৌরাঙ্গ দাস মহাশয়ের প্রতিপালিত ন্যায়ের টোলে সিদ্ধান্তবাগীশের পুত্র সর্ব্বেশ্বর তর্কবাগীশ শেষে অধ্যাপক হইয়াছিলেন! ইনি ন্যায়ের ষোল আনা পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারই পুত্র ৺ভগবানচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। ইঁহার পুত্র সন্তান নাই।

গৌরাঙ্গ দাস মহাশয়ের পারিবারিক গৃহাঙ্গণ দীর্ঘকাল পণ্ডিতগণের উচ্চারিত সংস্কৃতধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় এই পরিবারস্থ লোকদিগের মধ্যে কিরূপ একটা পণ্ডিতীভাব জন্মিয়াছিল। গৌরাঙ্গ দাস মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী, রাজকৃষ্ণ কবিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা, স্বর্গীয়া লক্ষ্মী, যিনি প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে অশীতি বর্ষ বয়সে গঙ্গাতীরে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, একজন বিদুষী ছিলেন—তিনি চৈতন্যচরিতামৃতের ন্যায় কঠিন গ্রন্থ অবলীলাক্রমে পাঠ করিয়া শুনাইতেন ও ও বুঝাইতেন। ইনি লেখকের জ্যেষ্ঠা মাতৃস্বসা ছিলেন। লেখকও গৌরাঙ্গদাস ও রাজকৃষ্ণ কবিরাজ মহাশয়ের গৃহাঙ্গণে ভূমিষ্ঠ ও প্রতিপালিত। গৌরাঙ্গ দাস মহাশয়ের প্রতিপালিত তর্কবাগীশের পুত্রই লেখকের হস্তে প্রথম লেখনী সংযুক্ত করিয়া দেন এবং তাঁহার টোলস্থ ছাত্রগণই তাঁহার বালসখা ছিলেন।

গৌরাঙ্গদাস মহাশয়ের বংশতন্তু এখন অতীব নিষ্প্রভ ও বিলুপ্তপ্রায়—তাঁহাদের সে প্রভাব, সে জনবল, সে ধনবল আর নাই। এই লুপ্তপ্রায় বংশের একতর বংশধর শ্রীমান্ প্রাণবন্ধু দাস ঢাকার একজন প্রশংসিত পুলীশ সব-ইন্‌স্পেক্টর।

শ্রীবসন্তকুমার রায়, এম-এ, বি-এল।

ব্রাহ্মণ-বংশাবলী।

(১)
ভক্তিরাম শিরোমণি
কার্ত্তিকচন্দ্র তর্কবাগীশ
বেচারাম বিদ্যালঙ্কার
রামকান্ত বিদ্যানিবাস
তিলকরাম তর্কালঙ্কার
রামপ্রসন্ন
রামলোচন
রাম
তপস্বীরাম বিদ্যাবাগীশ
রামমোহন
রামচন্দ্র
যদুনাথ
সীতানাথ বিদ্যাভূষণ
বৃন্দাবন
বিহারী
শশধর
কৃত্তিবাস ভট্টাচার্য্য
রঘুনাথ
পরেশ
বৈকুণ্ঠ
সুধাকর
রামনাথ
বিপিন
বিজয়
হৃষীকেশ
কেশব
শক্তিচরণ বেদান্তবাগীশ
রামনাথ শিরোমণি
রামহরি তর্কালঙ্কার
সীতারাম
ভোলানাথ সার্ব্বভৌম
বাসুদেব বাচস্পতি
অনন্তরাম শিরোমণি
ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি
রামব্রহ্ম
প্রসন্ন চূড়ামণি
গোপাল
উমেশ
পূর্ণচন্দ্র
সুরেন্দ্র
নগেন্দ্র
শ্যামাচরণ
জিতেন্দ্র
প্রমথ
মন্মথ
অনাথ
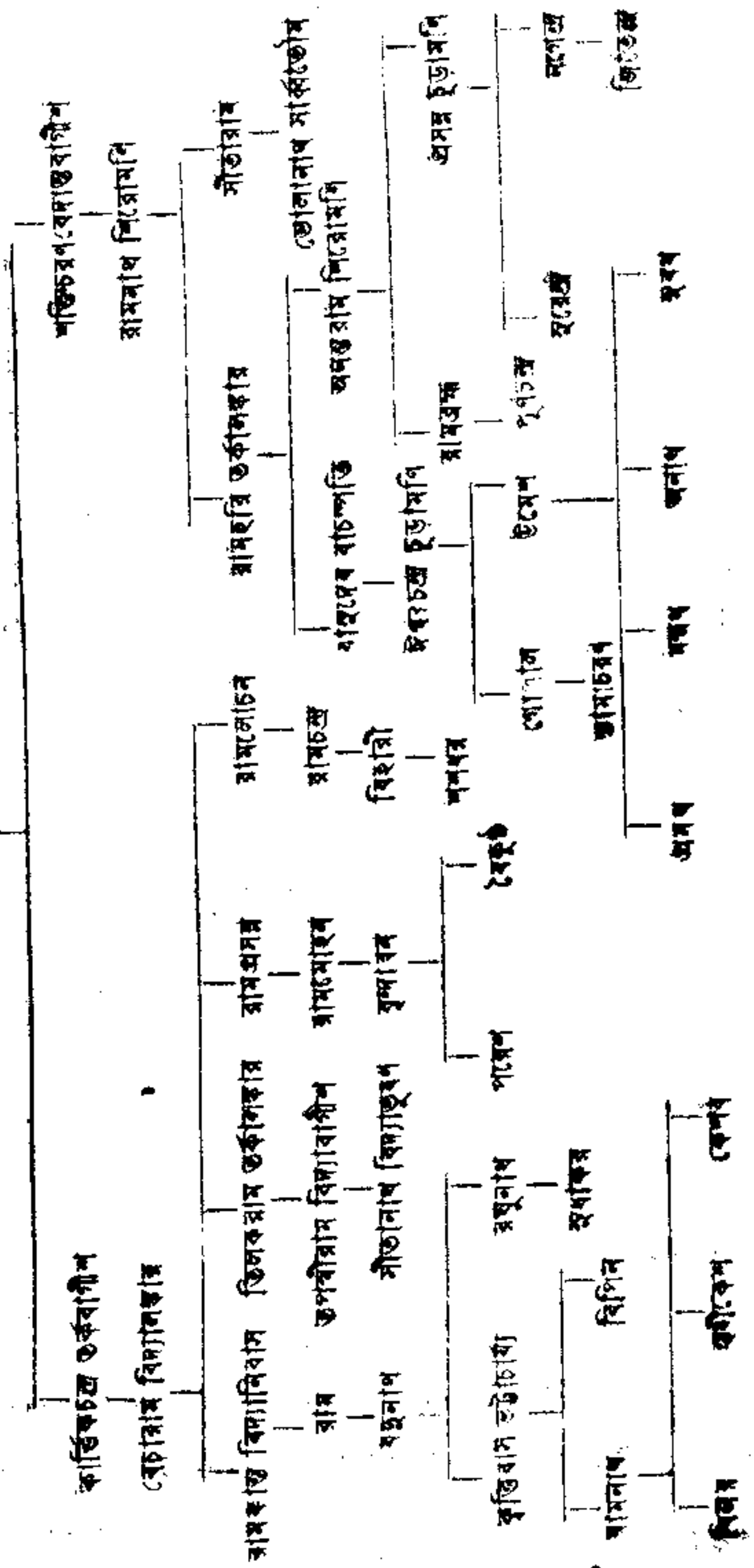
অভিরাম শিরোমণি মহাশয়ের বংশ শুকদেব—রঘুঋষি-গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত। উঁহারা উত্তরদেশস্থ চতুর্থভাগ ও আট পরগণার ব্রাহ্মণ ও মাহিষ্য-সমাজের সমাজ-রক্ষক দেওয়ান এবং আচার্য্য। অভিরাম শিরোমণি পরম বিষ্ণুভক্ত ছিলেন, তিনি সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত বলরামবাটী গ্রামে কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺দামোদর বিষ্ণু স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার পুত্রদ্বয় কার্ত্তিকচন্দ্র তর্কবাগীশ ও শক্তিচরণ বেদান্তবাগীশ বিদ্যাবলে দেশপূজ্য হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি ৺কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের নিকট হইতে ৬৫/০ বিঘা নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হন, তায়দাদ নং ২০,৬৮৫। উক্ত বংশে বেচারাম বিদ্যালঙ্কার, তিলকরাম তর্কালঙ্কার, রামহরি তর্কালঙ্কার, ভোলানাথ সার্ব্বভৌম প্রভৃতি মহা মহাপণ্ডিতগণ জন্ম গ্রহণ করিয়া গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। ঈশ্বরচন্দ্র চূড়ামণি একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন, ইঁনি কলিকাতা জানবাজারস্থ ভূম্যধিকারিণী স্বর্গীয়া রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় ভিন্ন সাম্প্রদায়িক মহামহাপণ্ডিতগণের সহিত বহু শাস্ত্রীয় তর্কবিতর্কের পর বিদ্যাবলে পূজিত এবং মাননীয় ৺মথুরা নাথ বিশ্বাস কর্ত্তৃক উক্ত যজ্ঞকার্য্যে আচার্য্যপদে বৃত হইয়া বিশেষ সম্মানার্হ হইয়াছিলেন। উক্ত চূড়ামণি মহাশয়ের পুত্র খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত উমেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও পৌত্রগণ শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ ও মন্মথনাথ প্রভৃতি ভ্রাতৃচতুষ্টয় বিদ্যোৎসাহী ও স্বজাতি-সেবানুরক্ত। ভ্রান্তি-বিজয়ে উক্ত বংশের উল্লেখ আছে।

(২)

বর্দ্ধমানরাজ-প্রদত্ত ৪/০ বিঘা জমীপ্রাপ্ত জেলা হুগলী বৈকুণ্ঠপুর-নিবাসী

গদাধর সান্ন্যাকী (চক্রবর্ত্তী)

(শাণ্ডিল্য গোত্র)

(৩)
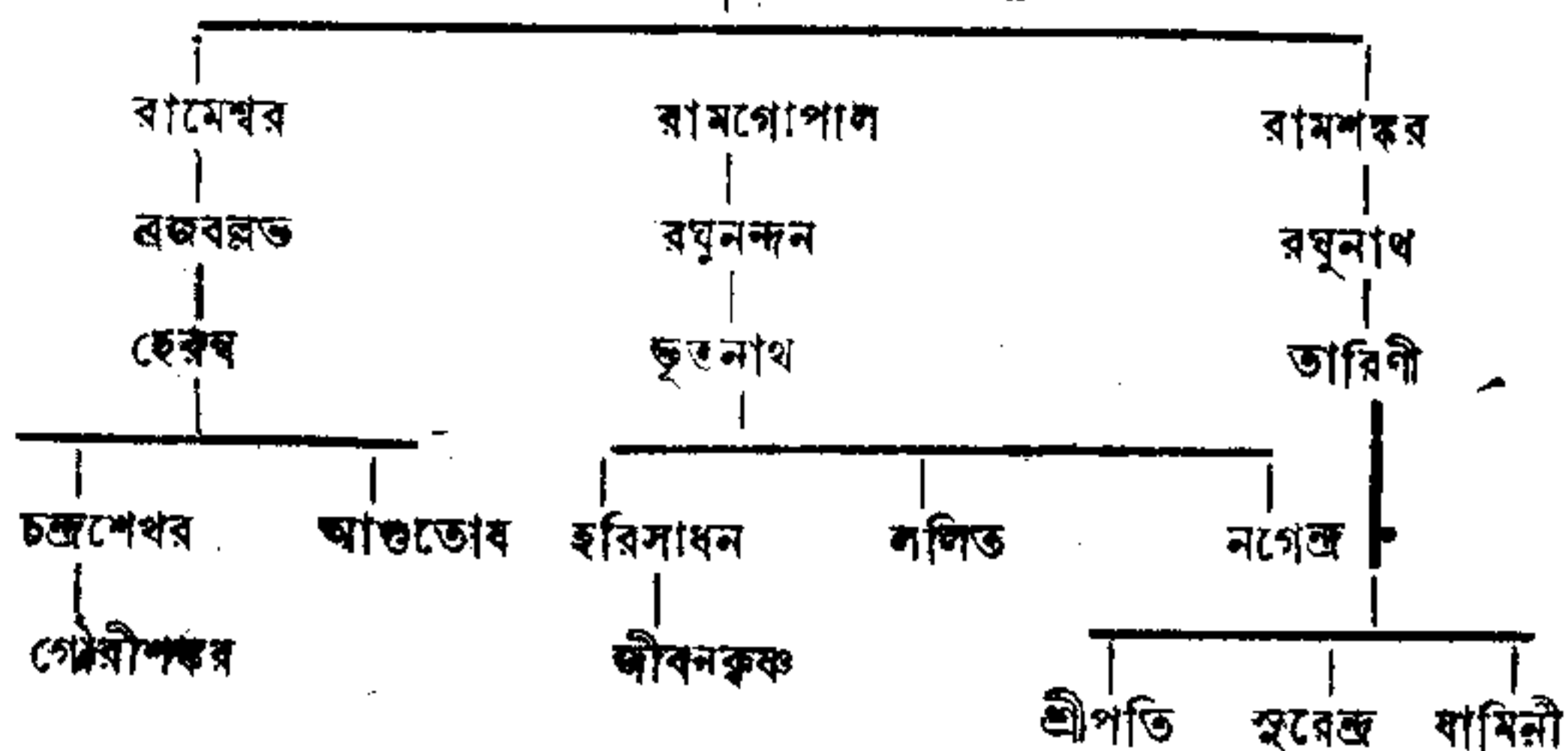
বৰ্দ্ধমান রাজ-প্রদত্ত ৪/• জমিপ্রাপ্ত
জেলা মেদনীপুর, দীঘলগ্রামনিবাসী
রামচরণ সান্ধ্যকী (চক্রবর্ত্তী)

(শাণ্ডিল্যগোত্র)
|
রামশঙ্কর
|
গোবিন্দ
|
যজ্ঞেশ্বর
|
সন্তোষকুমার

(৪)

বৰ্দ্ধমানরাজ প্রদত্ত ৩৩/• জমিপ্রাপ্ত
জেলা হুগলি শ্রীমন্তপুরনিবাসী
কেশবরাম মিশ্র (চক্রবর্ত্তী)

পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ যেন দয়া করিয়া তাঁহাদের বংশতালিকা পাঠাইয়া দেন। যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ এইরূপ আরও ব্রহ্মোত্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, কোন্ রাজা বা জমিদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত, তাহা যেন উল্লেখ করেন। ব্রাহ্মণ বংশাবলী সংগ্রহ করিবার জন্য বহুদিন হইতে চেষ্টা হইতেছে, দুঃখের বিষয় আজও আশানুরূপ কার্য্য হয় নাই।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

সদ্‌ব্রাহ্মণের যাজ্য কি না?—চাষী কৈবর্ত্ত অর্থাৎ মাহিষ্য জাতি যাজী ব্রাহ্মণ সদ্‌ব্রাহ্মণ কি না?—এই প্রশ্নের উত্তর পাইবার জন্য বিশেষ অনুসন্ধান চলিতেছে, আমরা আগামী বারে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করিব। পূজনীয় ব্রাহ্মণগণ ও মাহিষ্য সাধারণ, যাঁহার যতদূর জানা আছে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আমাদিগকে জানাইয়া বাধিত করিবেন—(১) গৌড়াদ্য-

রাখেন নাই ? (২) গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণের পরিচালিত টোল-চতুষ্পাঠীর তালিকা (৩) গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বা নবশাখ জাতীয় শিষ্য রাখেন কি না এবং পৌরহিত্য করেন কি না ? (৪) ভিন্ন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণগণের সহিত সামাজিকতা কিরূপ ? (৫) বিবাহাদি আদান প্রদান আছে কি না ? (৬) সদ্ব্রাহ্মণের গুণ কি কি ? সেই সমস্ত গুণগুলি গৌড়াদ্য-বৈদিকের আছে কি না ? (৭) ব্রহ্মোত্তরপ্রাপ্তির তালিকা, ইত্যাদি ॥

ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে দান।—জেলা রাজসাহী নওগাঁর নিবাসী শ্রীযুক্ত অধরচন্দ্র দাস মহাশয় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রাধিকামোহন দাসের সহিত শ্রীযুক্ত শ্রীশচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয়ের দ্বিতীয়া কন্যার শুভ বিবাহ উপলক্ষে ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমের ফণ্ডে এককালীন ১০৲ দশ টাকা দান করিয়াছেন।

রিসার্চ্চ-বৃত্তি।—মেদিনীপুর জেলার বিরুলিয়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র জানা, এম্-এস্-সি, গত বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন শাস্ত্রের পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি বর্ত্তমান বৎসর হইতে মাসিক ১০০৲ একশত টাকা হিসাবে ৩ বৎসর কাল রসায়ন শাস্ত্রের গবেষণা-বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন।

শোক-প্রকাশ।—জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত কিশোরচক-নিবাসী স্বনামধন্য জমিদার অক্ষয় কুমার চৌধুরী মহাশয় বিগত ২৮শে বৈশাখ ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। ইনি সাহিত্য-সমাজের উন্নতিকল্পে বহুবিধ সদনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে ঐ জেলার চেতুয়া পরগণার অন্তর্গত চেঁচুয়া নিবাসী মধুসূদন ভূঁইয়া মহাশয়ও পরলোকগমন করেন। চেঁচুয়া গ্রামে ভূঁইয়া মহাশয়ের বহু কীর্ত্তি আছে। দেবদ্বিজে ও স্বজাতির প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে ভগবান শান্তি প্রদান করুন।

বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির—সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার জন্য প্রত্যেকের যত্ন করা উচিত। সমগ্র বঙ্গদেশ হইতে বাৎসরিক ১৲ এক টাকা হিসাবে প্রত্যেক সভ্যের চাঁদা বহু পরিমাণ সংগৃহীত হওয়া বাঞ্ছনীয়। আমরা ইতিপূর্ব্বে বার্ষিক অধিবেশনের সংবাদ প্রকাশ করিবার সময় উল্লেখ করিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতি বিবিধ কার্য্যের জন্য বহু পরিমাণ টাকা

এখন মোট ঋণ ৪৬৬৲১৫ টাকা। সাধারণের বিশেষ চেষ্টা থাকিলে এই ঋণ শীঘ্র শোধ করা যাইতে পারে। বিগত ৩।৪ বৎসরে কিরূপ শোধ করা হইয়াছে দেখুন :—

দেনা		আদায়	
মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর নিকট ঋণগ্রহণ ১৯০৩ ও ১৯০৬ খৃঃ অব্দ—	৮৭৬৷৶০	১৯০৬ সালে মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর নিকট আদায়—	২৪৲
		১৯০৭ সালে ঐ—	৪০৲
১৯১১ খৃঃ পুনশ্চ—	৩১৮/১০	১৯০৮ সালে ঐ—	৯৬৲
১৯১১ সালের এপ্রেল হইতে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত হাওলাত—	৩৩৵০	১৯০৯ সালে ঐ—	১৪২৲
		১৯১০ সালে ঐ—	১৭৩৷/১৫
	৯৪১৷৵১০		৪৭৫৷/১৫

অতএব এখনও—৯৪১৷৵১০
৪৭৫৷/১৫
৪৬৬৲১৫ ঋণ

মহেশ্বরপুর মাহিষ্য সভা—হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত মহেশ্বর পুর গ্রামে বিগত ২১শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে অধিবেশন। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রমানাথ ভট্টাচার্য্য মহোদয়। আলোচ্য বিষয়—পক্ষাশৌচ। এই সভায় গাজোনকোল, আয়মা, গোয়ালপেড়ে, মাতাপাড়া, ভবানীপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্ত্তী ৮।১০ খানি গ্রামের মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ ও বহু প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত মাহিষ্য উপস্থিত ছিলেন। নানা বাদপ্রতিবাদের পর সকলেই শাস্ত্র-সঙ্গত পক্ষাশৌচ গ্রহণে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। সম্পাদক—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সাহ্মাকী।

বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—ম্যাট্রিকুলেশন, আই-এ, বি-এ, বি-এস্-সি, এম-এ, এম্-এস্-সি প্রভৃতি পরীক্ষায় যে সকল মাহিষ্য ছাত্র যে যে স্কুল কলেজ হইতে পাশ হইয়াছে তাহার তালিকা সংগৃহীত ও প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। পাঠকগণ এইরূপ তালিকা সংগ্রহপূর্ব্বক পাঠাইলে বাধিত হই।

পাত্রী আবশ্যক।—মাহিষ্য-জাতীয়া সুন্দরী, লেখাপড়া জানা ও বয়স্থা পাত্রী আবশ্যক। পাত্র সদ্বংশজ, বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম্-এ উপাধিধারী। সবিশেষ বিবরণ কলিকাতা ৭।১ নং মার্কাস ষ্ট্রীটে মাহিষ্য-সমাজ-সম্পাদকের নিকট

পঙ্কাশৌচ গ্রহণ।

(১) জেলা হাওড়া থানা আমতার অন্তর্গত খড়দহ গ্রামে শ্রীরাধা নাথ মান্নার স্ত্রীর শ্রাদ্ধ—২৩শে চৈত্র ১৩১৮ ও (২) শ্রীমতিলাল মান্নার পুত্র বধূর শ্রাদ্ধ—২৫শে চৈত্র ১৩১৮ (৩) শ্রীগোবর্দ্ধন ঘোড়ুয়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ—১৫ই বৈশাখ ১৩১৯ (শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ আগমরত্ন মহাশয়ের বিশেষ যত্নে)। (৪) হাওড়া জেলার শ্যামপুর থানার অন্তর্গত শীতলপুর গ্রামের শ্রীসাগর চন্দ্র মহাপাত্রের জ্যেষ্ঠতাত-পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ—১লা বৈশাখ। (৫) ঐ গ্রাম নিবাসী ঝড়ু চরণ মাইতির মাতৃশ্রাদ্ধ—২৭শে জ্যেষ্ঠ। (৬) ডিহিবেড়িয়া গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় মধুসূদন বেরার আদ্য শ্রাদ্ধ—১০ই বৈশাখ। (৭) দুর্গাপুর গ্রাম নিবাসী পরলোক গত যাদব চন্দ্র কুতির আদ্যশ্রাদ্ধ—১৭ই জ্যৈষ্ঠ। (৮) জেলা ২৪ পরগণার বজ বজ থানার অন্তর্গত বাওয়ালীর সন্নিকট দেউলী গ্রামে শ্রীযুক্ত বিহারী লাল মাঝীর পত্নীর শ্রাদ্ধ—২৩শে বৈশাখ। (৯) ঐ জেলার বিষ্ণুপুর থানার রামচন্দ্রনগর গ্রামে শ্রীযুক্ত ননীলাল ভুঁইয়ার পত্নীর শ্রাদ্ধ—২৫শে বৈশাখ ও (১০) শ্রীঅম্বিকাচরণ মণ্ডলের মাতৃশ্রাদ্ধ—২৭শে বৈশাখ। (১১) মেদিনীপুর জেলার পাঁচকুড়া থানার অন্তঃর্গত কিশোরচক গ্রাম নিবাসী শ্রীঈশান চন্দ্র সাঁতরার পত্নীর আগু শ্রাদ্ধ। (১২) উক্ত গ্রাম নিবাসী রাজেন্দ্র নারায়ণ সামন্তের আদ্যশ্রাদ্ধ। (১৩) ঐ গ্রাম নিবাসী জমিদার অক্ষয় রাম চৌধুরীর আদ্যশ্রাদ্ধ—৭ই জ্যৈষ্ঠ। (১৪) ঐ গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ চৌধুরীর বাটীস্থা জনৈকা বৃদ্ধার আদ্যশ্রাদ্ধ—৭ই জ্যৈষ্ঠ। (১৫) উক্ত থানার অন্তর্গত বাহারপোতা গ্রাম নিবাসী বৈকুণ্ঠনাথ সাহুর আদ্যশ্রাদ্ধ। (১৬) জেলা মেদিনীপুর চেতুয়া পরগণার অন্তর্গত চেচুঁয়া গ্রাম নিবাসী মধুসূদন ভুঁইয়ার আদ্যশ্রাদ্ধ—২৫শে বৈশাখ। বিরুলিয়ানিবাসী শ্রীযুক্ত আশুতোষ জানা মহাশয় লিখিয়াছেন:—
(১৭) জেলা মেদিনীপুর, সবডিভিজন কাঁথি, পরগণা লাড় মুঠার ২৫ খানি গ্রামের লোক বিগত ১৬ই চৈত্র তারিখে বায়েন্দা হাটে একটি সভার আয়োজন করেন এবং তথায় উক্ত সমূহ গ্রামের মাহিষ্যগণ পঙ্কাশৌচ গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। উক্ত সভার পর ৫।৬টি পঙ্কাশৌচ সম্পন্ন হইয়াছে প্রত্যেক কর্ম্ম উপলক্ষে বহুসংখ্যক ব্যক্তি পরিতোষ সহকারে ভোজন করিয়াছেন।

জানা তাঁহার জেঠাই মার আদ্যশ্রাদ্ধ পঙ্কাশৌচে সম্পন্ন করিয়াছেন। (১৯) কেওড়ামাল পরগণার লাক্ষী গ্রামের শ্রীযুক্ত ভোলানাথ সামন্ত তাঁহার খুড়ীর মৃত্যু হওয়ায় পক্কাশৌচে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। যথাসময়ে সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয় নাই এমন কয়েকটী নিম্নে বিবৃত হইতেছে।—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত জিঞ্জাদা গ্রামে (২০) ভজহরি জানার পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ ৫ই আশ্বিন। (২১) ঐ গ্রামে হরিচরণ মাইতির পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ১৫ই পৌষ। (২২) ঐ গ্রামে শিবু মণ্ডলের মাতার আদ্যশ্রাদ্ধে ১৫ই চৈত্র। (২৩) ঐ গ্রামে কোকিল চন্দ্র নায়েকের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ৯ই পৌষ। ঐ জেলার অন্তর্গত সিদ্ধ গ্রামে (২৪) কুমেদচন্দ্র সামন্তের আদ্যশ্রাদ্ধ ১০ই মাঘ। (২৫) রাখালচন্দ্র সামন্তের আদ্যশ্রাদ্ধ ৯ই ফাল্গুন। (২৬) চন্দ্র মহাপাত্রের ভ্রাতৃশ্রাদ্ধ ১০ই চৈত্র। ঐ জেলার অন্তর্গত আয়মাচক্ গ্রামে (২৭) শশী পালের পিতার ও খুড়ার আদ্যশ্রাদ্ধ ১০ই ঐ ফাল্গুন। ঐ জেলার অন্তর্গত সিধরবসান গ্রামে (২৮) প্রিয়নাথ খাঁটার পিতৃশ্রাদ্ধ ১০ই পৌষ।

সমালোচনা।

ব্যবস্থা-পঞ্চবিংশতি।—মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত গুমগড় পরগণার তাজপুর গ্রাম নিবাসী স্বর্গীয় নরহরি জানা মহাশয় মাহিষ্যজাতির তত্ত্ব ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণকল্পে শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতগণের যে সকল ব্যবস্থাপত্রী গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, ঐ সকল ব্যবস্থার অনুলিপি সাধারণে প্রচারার্থ তদীয় পত্নী শ্রীমতী পঞ্চমী দেই মহোদয়ার অর্থানুকূল্যে শ্রীসতীশচন্দ্র মাইতি দ্বারা প্রকাশিত। জেলা মেদিনীপুর মৈশাদল পরগণার অন্তর্গত পোষ্ট লক্ষ্যা, সাং দারিবেড়্যা গ্রামে সতীশবাবুর নিকট প্রাপ্তব্য। ইহা মাহিষ্য মাত্রেরই অবশ্য পাঠ্য।

মাহিষ্য মর্য্যাদা।—মহিষাদল, বকসীচক-নিবাসী শ্রীনবগোপাল মাইতি দ্বারা প্রকাশিত। ১৩১৮ সালের ১৬ই চৈত্র তারিখের হিতবাদী পত্রিকায় পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন লিখিত 'কৈবর্ত্ত' শীর্ষক প্রবন্ধের প্রতিবাদ। ইহা কবিতা পুস্তক। দারিবেড়্যা নিবাসী শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র মাইতি মহাশয়ের সুললিত

মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি।—মাহিষ্য-জাতির পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ, উৎপত্তি, সামাজিক মর্য্যাদা ও অন্যান্য বহুবিধ নূতন জ্ঞাতব্য বিষয়ে পুস্তক খানির কলেবর পূর্ণ। শাস্ত্রবিধি কুলাচার অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ, গ্রন্থকার তাহা বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার হেড়িয়া পোষ্ট, বিক্রনিয়া গ্রামবাসী আমাদের পরমশ্রদ্ধের বন্ধু, বিজ্ঞান-তত্ত্ব-বিৎ শ্রীযুক্ত আশুতোষ জানা মহাশয় এই পুস্তকের প্রণেতা। মূল্য ৸৹ বার আনা মাত্র। এই ধরণের জাতীয় পুস্তকের বহুলপ্রচার বাঞ্ছনীয়।

হৃদয়-লহরী।—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের; রচিত অতি উৎকৃষ্ট কতিপয় সঙ্গীত একত্রে মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মূল্য।৹ চারি আনা। ১৪ নং মদন বড়ালের লেন, লীলা প্রিন্টিং ওয়ার্কস আফিসে প্রাপ্তব্য। ইহাতে ভাবের তরঙ্গ, কবিত্বের সঞ্জীবনী শক্তি ও ভাষার উন্মাদনাময়ী লহরী খেলিয়াছে। এই প্রকার সঞ্জীবনী-সঙ্গীতের সুললিত তানে প্রাণ মাতোয়ারা করে—হৃদয়তন্ত্রী নৃত্য করিতে থাকে।

আর্য্য-কায়স্থ-প্রতিভা।—১৩১৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা। এই সংখ্যায় নানাবিধ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ প্রবন্ধই ভাল লাগিল। "কবীন্দ্র রামানন্দ রায়" শীর্ষক প্রবন্ধের লেখক বিদ্যানগরাধিপ মহাত্মা রামানন্দ রায়কে কায়স্থ বলিতেছেন। পট্টনায়ক রামানন্দ কায়স্থ নহেন, পরন্তু মাহিষ্য-জাতীয়। 'সেবিকা' মাসিক পত্রের ১৩০৯ ভাদ্র, মাঘ; ১৩১১ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। 'ভক্তি' মাসিক পত্রেও মাহিষ্য বলিয়া উল্লেখ আছে। ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সমুদ্রেও ঐ কথা আছে।

মাহিষ্য-সমাজ।

২য় ভাগ, ৩য় সংখ্যা—আষাঢ়, ১৩১৮]

চতুষ্পাঠী-স্থাপন।

দেবভাষা সংস্কৃতই হিন্দুদিগের মূল এবং আদি ভাষা। হিন্দুর যাবতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইদানীং পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের অনাস্থাবশতঃ বৈদিক ক্রিয়াকর্ম্মাদি লুপ্তপ্রায় হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও নিতান্ত অবনতি হইয়াছে। পুরাকালে হিন্দুরা হিন্দু-ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য যবনের শত শত অত্যাচার অবাধে সহ্য করিয়াছেন। কিন্তু এক্ষণে সমাজ ও শিক্ষার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মেরও অবনতি হওয়ায়, হিন্দুধর্ম্মের প্রধান উপকরণ সংস্কৃত ভাষার প্রতি লোকের আস্থা নিতান্ত হ্রাস পাইয়াছে। পূর্ব্বে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি লোকের প্রগাঢ় ভক্তি ছিল, এ কারণ স্থানে স্থানে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল বা চতুষ্পাঠী স্থাপিত ছিল। ব্রাহ্মণ-তনয়েরা সে সমস্ত চতুষ্পাঠীতে বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, উপনিষৎ প্রভৃতি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া এক এক জন সুপণ্ডিত হইতেন; তাঁহাদের যশোরাশি দেশবিদেশে বিক্ষিপ্ত হইত। ঐ সমস্ত চতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার সংকুলানের জন্য দেশীয় রাজা, জমিদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ বিশেষরূপ সাহায্য করিতেন। চতুষ্পাঠী পরি-চালনের জন্য অধ্যাপকগণ বিস্তর ভূসম্পত্তি ও বৃত্ত্যাদি প্রাপ্ত হইতেন। বৃত্তিলব্ধ অর্থের দ্বারা সংসার-যাত্রা ও ছাত্রদিগের অধ্যাপন-ব্যয়-ভার নির্ব্বাহ করিতেন। কিন্তু হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতি লোকের আসক্তি যতই কমিয়া আসিতে লাগিল, ততই তাঁহারা এবিষয়ে উদাসীন হইতে লাগিলেন; অধ্যাপকগণও সাধরণের সাহায্য ও সহানুভূতির অভাবে অধ্যাপন-ব্যয়-ভার বহন করিতে না পারায় ক্রমশই চতুষ্পাঠীসমূহ লোপ পাইতে লাগিল। সুতরাং ব্রাহ্মণ সন্তানদিগেরও ক্রমশঃ সংস্কৃত-শিক্ষার প্রতি আস্থা কমিয়া আসিতে লাগিল।

হিন্দুদিগের যাবতীয় দৈব ও পৈত্র কার্য্য যথাশাস্ত্র সম্পন্ন করিতে হইলে

সুশিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিতের আবশ্যক; নতুবা ক্রিয়াগুলি অসম্পূর্ণ থাকে ও মঙ্গলপ্রদ হয় না। কিন্তু আজকাল দেখিতে পাওয়া যায়, অনেকেই অর্থ-ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইয়া দৈব কার্য্যাদি সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের দ্বারা সম্পন্ন না করাইয়া মূর্খ শাস্ত্রজ্ঞানহীন যজমান-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সম্পন্ন করাইয়া থাকেন। কিন্তু পূর্ব্বে এরূপ প্রথা ছিল না। লোকে চেষ্টা করিত, কি উপায়ে ক্রিয়াগুলি যথাশাস্ত্র সম্পন্ন হয়; ঐ কারণ পুরোহিতেরাও সুশিক্ষিত না হইয়া কোন কার্য্যে নিযুক্ত হইতে সাহস করিতে পারিতেন না। কাজে কাজেই পুরোহিতদিগকে বাধ্য হইয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিতে হইত। অধুনা যজমানদিগের আর সে বিষয়ে লক্ষ্য না থাকায়, পুরোহিতগণ প্রশ্রয় পাইয়াছেন। মূর্খ পুরোহিত ‘নামো বিষ্ণবে’ স্থানে ‘নমো বিষ্টায়’ বলিয়া গেলেন, যজমানের তাহাতেই স্বীকার। সুতরাং পুরোহিত ঠাকুরের সুশিক্ষিত হইবার প্রয়োজন কি?

বর্ত্তমান বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজের মধ্যে বহু গণ্য মান্য ধনাঢ্য ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহারা মনে করিলে নানাবিধ বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদির অনুষ্ঠান করিয়া শত শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে প্রতিপালন করিতে পারেন, কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, তাঁহারা সে দিকে ভ্রূক্ষেপও করেন না। সুতরাং ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসা করিয়া উদর-পোষণ ও সংসার-প্রতিপালন করা ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে, কাজে কাজেই শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়া আসিতেছে। গত চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে এই গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ সমাজে যে সমস্ত ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন আজকাল তাদৃশ একজনও নাই। গোগুলপাড়া নিবাসী বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন, খোষালপুর-নিবাসী রামকান্ত বিদ্যাভূষণ, বাজেপ্রতাপনিবাসী রামজীবন স্মার্ত্তবাগীশ, অনন্তরামপুর নিবাসী কার্ত্তিক চন্দ্র ন্যায়রত্ন, গুষকরা নিবাসী মধুসূদন তর্কালঙ্কার, বলরামবাটী নিবাসী মদীয় পিতামহ ৺ঈশ্বর চন্দ্র চূড়ামণি, গোপালনগর নিবাসী গণেশচন্দ্র সিদ্ধান্ত-বাগীশ প্রভৃতি কত শত শত মহা মহাপণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়া এই ব্রাহ্মণ সমাজকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন।

উপসংহারে বক্তব্য, যদি বৈদিক ক্রিয়াকলাপাদি যথাশাস্ত্র সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি দেবভাষা সংস্কৃত ও হিন্দুধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি থাকে, যদি নিঃসহায় গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ পুরোহিত-তনয়গণকে সুশিক্ষিত

করিয়া দেশ বিদেশে যশস্বী ও সমাজের মুখোজ্জ্বলকারী করিবার মানস থাকে, তাহা হইলে স্থানে স্থানে চতুষ্পাঠী-স্থাপন প্রভৃতি সংস্কৃত শিক্ষার উপায় উদ্ভাবন করুন। আশা করি, এই সদুদ্দেশ্যসাধনার্থ বঙ্গদেশীয় সমগ্র মাহিষ্য ও তদ্‌যাজী ব্রাহ্মণ সমাজ যত্নবান হইতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ধনাঢ্য মাহিষ্যগণ সাধ্যানুসারে এক একটী বিদ্যার্থী পুরোহিত-তনয়কে বিদ্যাদানপূর্ব্বক সর্ব্বপাপ-বিনির্ম্মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হউন, ইহাই মঙ্গলময় দামোদর-চরণ-প্রান্তে আমার একান্ত প্রার্থনা।

"ভূমিদানাৎ পরং দানং বিদ্যতে নেহকিঞ্চন।
অন্নদানং তেন তুল্যং বিদ্যাদানং ততোঽধিকম্॥
যো ব্রাহ্মণায় শান্তায় শুচয়ে ধর্ম্মশালিনে।
দদাতি বিদ্যাং বিধিনা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥"

কূর্ম্মপুরাণে দানধর্ম্মে ২৬।১৫,১৬।

হে গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ মহোদয়গণ! আপনাদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় একমাত্র কারণ বিদ্যাহীনতা, অতএব এই ব্রাহ্মণ-সমাজকে অধঃপতনের গভীরতম কূপ হইতে পুনরুদ্ধৃত করিতে একমাত্র বিদ্যাবলে সক্ষম হইবেন, কারণ বিদ্যাই সর্ব্বহিতের মূল।

"বিদ্যয়া বর্দ্ধতে জ্ঞানং জ্ঞানাদ্ধর্ম্মোবিবর্দ্ধতে
ধর্ম্মাদ্ধি জায়তে সৌখ্যং বিদ্যাভ্যাসং ততঃ কুরু
প্রাপ্নুবন্তি নরা নিত্যং বিদ্যয়ৈব সুনিশ্চিতম্
ধনং মানং যশোভীষ্টং দুর্ল্লভাদপি দুর্ল্লভং।"

শ্রীমন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী।

অবনতির ইতিহাস (২)।

২। লেখাপড়া ও সরকারী চাকুরির কথা।

লেখাপড়া সম্বন্ধেও প্রথম হইতেই ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। মুসলমান রাজত্বের প্রথম সময়ে হিন্দু-সমাজে ধর্ম্ম-প্রবণতা অধিক ছিল, এ কথা সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। ধর্ম্মশাস্ত্র সমুদয় সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। সুতরাং ধর্ম্মপ্রবণতার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের আলোচনাও অধিক থাকারই কথা।

বস্তুতঃ সেকালে গ্রামে গ্রামে এবং নবদ্বীপাদির ন্যায় হিন্দুবহুল নগরে সংস্কৃতের বিশেষ আলোচনা ও প্রতিপত্তি ছিল। কাজেই শুধু ব্রাহ্মণ কেন, ভদ্রজাতীয় লোকমাত্রেই অল্পবিস্তর সংস্কৃত না জানিলে সকলের নিকট নিন্দা ও অনাদরের ভাগী হইতেন। আজকাল কিছু ইংরেজী না জানিলে সহরে যেরূপ হংস মধ্যে বকের ন্যায় থাকিতে হয়, সে কালে সংস্কৃতে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান, অন্ততঃ চাণক্যের কয়েকটী নীতিশ্লোক কণ্ঠস্থ না থাকিলে, সামাজিক সভায় সেরূপ ভয়ে ভয়ে পশ্চাতে থাকিতে হইত। সংস্কৃতের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা ভাষারও প্রসার ছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবতাদি বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীর প্রাচীন বাঙ্গালা অনুবাদ ও ঘটকগণের কুলজী গ্রন্থাদি পড়িয়া তখনকার সমাজে বাঙ্গালা ভাষার কিরূপ অনুশীলন ছিল বুঝা যায়। পুরাণ-পাঠক, কথক, কবি ও যাত্রাওয়ালাদিগের যত্নেও সমাজে বাঙ্গালা ভাষার সমাদর ও চর্চ্চা হইতে থাকে। জমিদারী ও মহাজনী সেরেস্তার কাজকর্ম্ম বাঙ্গালায় নির্ব্বাহ হওয়াতে চাকুরী-জীবী লোকেও বাঙ্গালা শিখিতে মনোযোগ দিয়াছিল। এদিকে নবাব সরকারের যাবতীয় কার্য্যে পারসী ও উর্দ্দু ভাষার প্রচলন ছিল। কাজেই জমিদার, মহাজন, ধনী, নির্ধন, সকলেই নবাব ও আমীর ওমরাহদিগের দরবারে যাতায়াত এবং 'আদব কায়দা' শিক্ষার জন্য কিছু কিছু পারসী ও উর্দ্দু ভাষা আলোচনা করিতে বাধ্য হইতেন। সহরের অধিকাংশ লোকেই ক্রমে ক্রমে ঐ দুই ভাষায় অল্পাধিক শিক্ষা পাইতে লাগিল। সহরের চাকুরীজীবিগণও সযত্নে পারসী ও উর্দ্দু ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিল।

অতএব দেখা যাইতেছে, সংস্কৃত, বাঙ্গালা, এবং পারসী বা উর্দ্দু এই কয়েকটী ভাষাই সেকালে শিক্ষা দেওয়া হইত। লোকে প্রয়োজন মত একটী দুইটী বা তিনটী ভাষা শিখিত। শিক্ষার জন্য এখনকার মত কোনও স্কুল বা কলেজ ছিল না। টোল, মাদ্রাসা, চৌপাঠী প্রভৃতি স্থানে বালকগণকে শিক্ষা দেওয়া হইত। বাঙ্গালা বা পারসী কয় বৎসর এবং কতদূর পর্য্যন্ত পড়িলে বিদ্বান্ হওয়া যায় তাহা স্থির না থাকায় ঐ ঐ ভাষায় কথাবার্ত্তা বলা ও চিঠিপত্রাদি লিখিবার উপযোগী জ্ঞান থাকিলেই লোকে তাহাকে বিজ্ঞ বলিয়া সমাদর করিত। আর যাঁহারা পরিশ্রম করিয়া রীতিমত অধ্যয়নদ্বারা জ্ঞানলাভ করিতেন তাঁহারা পণ্ডিত বা মৌলবীরূপে সকলের পূজার পাত্র হইতেন। নিজ নিজ অধ্যবসায় ও ক্ষমতানুসারে কেহ অল্প সময়ে কেহ বা অধিক দিনে শিক্ষা

জাতীয় ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায়, ব্রাহ্মণগণ প্রায়ই সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মতত্ত্বে ব্যাপৃত থাকিতেন। এরূপ ব্রাহ্মণের সংখ্যা সমাজে অধিক ছিল। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অনেকে আবার ম্লেচ্ছভাষা শিখিয়া নবাব সরকারে কাজ করিতেন। জমিদার ও মহাজনের সেরেস্তায়ও ঐরূপ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখা যাইত। মহর্ষি মনুর সময় হইতেই এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ শাস্ত্রচর্চ্চা ছাড়িয়া ঐরূপ কার্য্য করিয়া আসিতেছেন। ইঁহারা রাজ-মন্ত্রীত্ব হইতে সাধারণ মুহুরির কাজ পর্য্যন্ত কিছুই ছাড়িতেন না। অনেক ব্রাহ্মণ এইরূপে শ্ববৃত্তি অবলম্বনে অর্থ সঞ্চয় ও নাগরিক জীবন যাপন করিতেন।

বৈদ্যজাতির চিকিৎসা ব্যবসায় শিখিতে সংস্কৃত আলোচনা দরকার। এজন্য আমরা প্রাচীনকালেও বৈদ্য জাতির কবি ও সুধীপুরুষদিগের আবির্ভাব দেখিতে পাই। উঁহারা ব্রাহ্মণ বালকদের ন্যায় শিশুকাল হইতেই সংস্কৃত শিখিয়া চরক সুশ্রুতাদি কবিরাজী গ্রন্থ পাঠ করিতেন এবং চিকিৎসা ব্যবসায়ের সঙ্গে সঙ্গে অবসর মত শাস্ত্রালাপ ও ধর্ম্মচর্চ্চা করিতেন। এই হেতু বৈদ্যজাতীয় অনেক প্রাচীন সাধু ও ভক্তগণের পরিচয় পাওয়া যায়।

কায়স্থ জাতি লিপি-ব্যবসায়ী। তাঁহাদের মধ্যে কোন খ্যাতনামা কবি কিম্বা সাধুভক্ত বা পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন না বলা যায়। আর 'কায়েতী নাগরী' 'কায়েতী পারসী,' 'কায়েতী বাঙ্গলা' প্রভৃতির প্রচলন থাকাতে তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষার কথাও বেশ বুঝা যায়।

নবশাখ ও তন্নিম্ন নীচ জাতীয় লোকের মধ্যে বিদ্যাচর্চ্চা কোনকালেই নাই বলিতে হইবে। উহাদের মধ্যে কতিপয় লোক স্বাভাবিক প্রতিভা বলে শিক্ষার পথে অগ্রসর হইয়াছিল। তাহাতে সেই সেই জাতিতে শিক্ষার প্রসার ছিল বলা যায় না।

মাহিষ্য আগুরি প্রভৃতি সামরিক জাতি সেকালে জমিদারী ও যুদ্ধ-বিভাগে কাজ করিতেন। কাজেই নানাকারণে তাহাদিগকে পারসী উর্দ্দু ভাষা কিছু কিছু শিক্ষা করিতে হইত। মাহিষ্য-সমাজে সেকালে পারসী উর্দ্দু ভাষায় অনেকেই সুপণ্ডিত ছিলেন। আর দেব-দ্বিজ-ভক্ত মাহিষ্য-সমাজে সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার বিশেষ অনুশীলন ছিল:এ কথা বলা বাহুল্য। বহু মাহিষ্যমহিলাও এই সময়ে সংস্কৃত ও বঙ্গভাষায় সুশিক্ষিতা হইয়াছিলেন। এই সময়ে মাহিষ্য জাতিতে যে সকল কবি, পণ্ডিত ও ভক্তগণ প্রাদুর্ভূত হন আমরা নানাস্থরে তাঁহাদের পুণ্যকথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। বস্তুতঃ উচ্চজাতীয়

হিন্দুদিগের মধ্যে মাহিষ্য জাতি সেকালীন শিক্ষায় সকলের সমকক্ষ ছিলেন। তখনকার হিসাবে মাহিষ্য জাতিকে কেহই নিরক্ষর বা অশিক্ষিত বলিতে পারিতেন না। ইতিপূর্ব্বে গ্রাম্য সমাজের যে চিত্র দিয়াছি তাহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে প্রকৃতপ্রস্তাবে মাহিষ্য জমিদারদিগের সুশাসন ও বিদ্যোৎসাহিতার ফলেই দেশে লোকে শান্তিভোগ ও বিদ্যাচর্চ্চা করিতে পারিতেন। বিক্রমাদিত্যের সভাতেই কালিদাসের প্রতিষ্ঠা হয়, আর রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাতেই ভারতচন্দ্র আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

তার পর মুসলমান রাজত্বের শেষ কাল আসিল। দেশে মাহিষ্য জমিদার দিগের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জাতির উন্নতি হইতে থাকিলেও লেখাপড়ার সীমা নির্দ্দিষ্ট না হওয়াতে মাহিষ্য জাতিকে কেহই উহাতে পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই। তখন দেশে পারসীর আদর ক্রমেই অধিক হইতেছিল। এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু শিক্ষার রীতি নীতি পূর্ব্ববৎ থাকাতে কাহারও বিশেষ অসুবিধা হয় নাই। কাজেই কোম্পানীর রাজ্যের প্রথম ভাগেও মাহিষ্য জাতি শিক্ষিত ও সম্মানিত ছিল। 'নিরক্ষর', 'কৃষক' ইত্যাদি বিশেষণ তখন মাহিষ্য নাম কলঙ্কিত করিতে পারিত না। তবে কৃষিবৃত্তি অনেকেই অবলম্বন করাতে বিদ্যাচর্চ্চা কতকটা কমিয়া আসে।

তার পর ইংরাজ রাজত্ব দৃঢ় হইলে দেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হইল। গবর্ণমেণ্ট শিক্ষা বিভাগ সৃষ্টি করিলেন। স্কুল ও পাঠশালা স্থাপিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল স্থানে নির্দ্দিষ্ট কয়েক বৎসর পড়িয়া পরীক্ষা পাশ করিবার নিয়ম হইল। কাজেই শিক্ষিত হইতে হইলে সকলকেই লেখাপড়ায় একটী নির্দ্দিষ্ট সীমা পর্য্যন্ত যাইতে হইল। এই সময় হইতেই মাহিষ্য জাতির পতন আরম্ভ হইল। এই পতন কেন হইল? এ বিষয়ে আলোচনা করিবার পূর্ব্বে 'পতন' বলিতে কতদূর পতন তাহা বুঝা দরকার। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রাহ্মণ বৈদ্য, মাহিষ্য, আগুরি, কায়স্থ এই কয়টী হিন্দুজাতিতেই লেখা-পড়ার চর্চ্চা ছিল বলা যায়। ব্রাহ্মণ চিরকালই শীর্ষস্থানীয়। অপর কয়েকটী জাতির মধ্যেই প্রতিযোগিতা চলিত। পতন বলিতে লেখা পড়ায় এই কয়টী জাতির নিয়ে পতন বুঝিতে হইবে।

এদেশে যখন সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী ভাষা শিক্ষার স্কুল স্থাপিত হয়, তখন লোকে, ইংরেজী শিখিলে জাতি ধর্ম্মনাশ হইবার ভয়ে, উহাতে প্রবেশ করিত না। বিশেষতঃ ঐ সময়ে কতিপয় ইংরেজী-শিক্ষিত দেশীয় যুবক

খৃষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করাতে এ ধারণা আরও বদ্ধমূল হইয়া যায়। জাতি-ধর্ম্মনাশের ভয় সহরে ও মফঃস্বলে লোকমুখে প্রচার হইতে লাগিল! সহরের অধিকাংশ লোক এবং মফঃস্বলের প্রায় ষোল আনা লোকেই ইংরেজী-শিক্ষাকে ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিল। মাহিষ্যজাতির অধিকাংশই গ্রামবাসী—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংরক্ষক। তাহারা গ্রামে গ্রামে এই ধর্ম্মনাশের কথা শুনিয়া স্কুলগুলি কি আকারের বস্তু তাহা না দেখিয়াই উহার প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব পোষণ করিতে লাগিলেন। তারপর স্কুলের ছাত্রদিগের নানাবিধ অহিন্দু আচরণের গল্প গ্রামে পৌঁছিয়া সেই ভয় ও ঘৃণা আরও বর্দ্ধিত করিয়া দেয়। কাজেই খৃষ্টান হইয়া যাইবে—এই ভয়ে মাহিষ্য বালকদিগকে ইংরেজী শিখিতে দেওয়া হয় নাই। মুসলমানদের অবস্থাও কতকটা ঐরূপ হওয়াতে তাহারও ঘৃণা ও ভয় করিয়া স্কুলে আসে নাই। এই ভাবে কতক দিন চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে কোম্পানীর বাঙ্গালী কর্ম্মচারীদিগের দুই একটী ছেলে সহরের স্কুলে ইংরেজী শিখিয়া বড় বড় কাজ পাইল। কাজেই আরও অনেকের লোভ হইল। ফলে অনেক কর্ম্মচারীই আপন আপন পুত্র দিগকে স্কুলে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। সেদিনে কিছু ইংরেজী জানিলেই একটী বড় চাকুরী পাওয়া যাইত; সুতরাং চাকুরিজীবিগণ আর সংযত থাকিতে পারিল না। ক্রমে সহরের অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই অল্পে অল্পে বালকদিগকে ইংরেজী বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিতে লাগিল।

এদিকে মফস্বল হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বা গোঁড়া হিন্দু কার্য্যোপলক্ষে সহরে আসিতেন তাঁহারা নিজ নিজ দেশের দুই একটী ছেলের ইংরেজী শিক্ষার কথা শুনিয়া রাগে গর্ গর্ করিতে করিতে বাড়ী ফিরিতেন এবং দেশে দেশে ছেলের পিতার কুৎসা রটাইয়া তাহাকে সমাজে বর্জ্জনের ভয় দেখাইতেন। এই সমুদয় কুৎসার ও সামাজিক শাসনের ছড়াছড়ি দেখিয়া গ্রামবাসী ধর্ম্মভীরু মাহিষ্যগণ ইংরেজী শিক্ষা করার ইচ্ছা হৃদয় হইতে দূর করেন; এবং পুত্র-দিগকে নিজ নিজ বাটীতে থাকিয়া জমিদারী ও কৃষি সংরক্ষণ করিয়া জীবন যাপনের উপদেশ দিতে লাগিলেন। ইংরেজী-শিক্ষায় দেশে যে এত গুরুতর পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাইবে তাহা একবারও তাঁহাদের মনে স্থান পায় নাই।

যতই দিন যাইতে লাগিল, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত প্রভৃতি গোঁড়া হিন্দুগণের কথার মূল্য ততই কমিতে লাগিল। সহরবাসী অনেক ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, এবং কায়স্থ জাতীয় লোকই বড় বড় চাকুরির আশায় ছেলেদিগকে ইংরেজী শিখাইতে

লাগিল। ক্রমে ক্রমে গ্রাম হইতে আত্মীয়স্বজনগণের সন্তানসন্ততি দিগকেও সহরে আনিয়া কিছু ইংরেজী শিখাইয়া জীবিকা অর্জ্জনের উপায় করিয়া দিতে লাগিল। মাহিষ্য সমাজের তখনও নিদ্রাভঙ্গ হইল না। তখনও তাঁহারা চিরকাল গ্রামে থাকিয়া নির্ভাবনায় জীবন কাটাইবার স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। পঞ্চবংশ লক্ষ মাহিষ্যের মধ্যে কতিপয় যুবক কোনরূপে সহরের বাতাস পাইয়া ইংরেজী শিখিয়াছিলেন। এখন গ্রামবাসী মাহিষ্যভ্রাতৃগণ চক্ষু মেলিয়া যে দিকে চাহেন, কেবল ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থাদি জাতীয় হাকিম ডাক্তার, উকীল, মোক্তার, মুহুরি, কেরাণী, দারগা, পুলিশ প্রভৃতি দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া যান। সহরে আসিলে ঐ সকল জাতীয় নব্যশিক্ষিতের সম্মুখে ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়েন এবং আপনাদিগকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন! এই ত জাতীয় অবস্থা!

মাহিষ্যগণ ইংরেজীশিক্ষায় পশ্চাৎপদ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ এই যে, সর্ব্বপ্রথম স্কুলগুলি সহরে স্থাপিত হইয়াছিল। যাহারা সহরে বাস করিত তাহারাই ছেলেদিগকে স্কুলে পড়াইতে পারিত। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সহরে মাহিষ্য অধিবাসী অধিক থাকিত না। বিদেশে পড়িবার জন্য বালকদিগকে পাঠাইবার সাহস বা ইচ্ছা সেকালে কোন জাতিরই ছিল না। বয়স্ক ব্যক্তিগণ সহরে আসিলেই বাটীর সকলে ভাবনায় কান্দিয়া আকুল হইতেন। এমতাবস্থায় বালকদিগকে অন্যত্র প্রেরণ একরূপ অসম্ভব ছিল। বিশেষতঃ সেকালে সহরে উপযুক্ত ছাত্রাবাসও ছিল না; কাজেই বালকেরাও ভয় পাইত। যদিও আজকাল সর্ব্বত্র স্কুল কলেজের সহিত ছাত্রাবাসের বন্দোবস্ত হইয়াছে, এবং ঐ সকল স্থানে বালকদিগের খুব সুবিধা ও পড়াশুনার জন্য বিশেষ যত্ন লওয়া হইয়া থাকে তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, এখনও গ্রামের স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিলে বালকদিগকে সহরে পাঠাইতে অভিভাবকগণ ভাবিয়া চিন্তিয়া, এমন কি কান্দিয়া আকুল হইয়া পড়েন! কাজেই এক শত বৎসর পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, পাঠক তাহা অনুমান করিবেন।

তার পর সহর ছাড়িয়া গ্রামে গ্রামে স্কুল স্থাপন আরম্ভ হইল। তখন গ্রামবাসীদিগের যত্নেই গ্রামে স্কুল বসিত। মাহিষ্যনেতৃগণ নানাবিধ কুসংস্কারবশে সে সময়ে নিজ নিজ গ্রামে স্কুল স্থাপনের কোনও চেষ্টা করেন নাই। অন্যান্য জাতীয় শিক্ষিত লোকে চেষ্টা করিয়া নিজ নিজ গ্রামে স্কুল স্থাপন

পল্লীগুলি শিক্ষার আলোক পাইল না। যে যে গ্রামে স্কুল স্থাপিত হইল তথাকার দুই চারিটী মাহিষ্য বালক কিঞ্চিৎ লেখা পড়া শিখিতে লাগিল বটে, কিন্তু অন্য গ্রাম হইতে পরিশ্রম করিয়া, হাটিয়া আসিয়া, পড়াশুনা করা সকলে ভাল বুঝিলেন না! আজিও অনেকের চক্ষু মুদ্রিত।

তৃতীয়তঃ মাহিষ্যমাত্রেরই যৎসামান্য ভূসম্পত্তি আছে। সে দিনে আরও কিছু অধিক ছিল। লেখা পড়া না শিখিলেও কৃষিবৃত্তি জীবিকার উপায় হইত। সুতরাং দুরন্ত বালকদিগকে শাসন করিলে অনেক অভিভাবকই "আমার ছেলে চাষ ক'রে খাবে" বলিয়া রোদনরত বালককে সাদরে গৃহে রাখিতেন। ছেলে বয়স্ক হইলে, তাহাকে কেবল পৈত্রিক জমীজমা অবলম্বনে কায়ক্লেশে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়। এদিকে কতিপয় জাতীয় লোকের পক্ষে লেখা পড়া না শিখিলে উপবাস থাকিবার ভয় ছিল। চাকুরি না জুটিলে পরিবার অনাহারে দিনযাপন করিবে, এই ভয়ে ঐ সকল জাতীয় বালকগণ অর্থোপার্জ্জনের নিমিত্ত ইংরেজী শিখিতে প্রাণপণ করিতে থাকে। বস্তুতঃ এই চাকুরির লোভেই এদেশে প্রকৃতপক্ষে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার সংঘটিত হয়। সাধারণ বাঙ্গালা জ্ঞানে এবং পাঠশালা বা ছাত্রবৃত্তি স্কুলে বহু মাহিষ্য বালক পূর্ব্বাবধি রীতিমত শিক্ষা পাইতেছে। কিন্তু উদর পূরণের জন্য পৈত্রিক বিত্ত থাকাতে, মাহিষ্যগণ চাকুরির জন্য লালায়িত হয় নাই; কাজেই ইংরেজী শিক্ষার জন্য আগ্রহ বা উৎসাহও তদ্রূপ হয় নাই। এখন চাকুরিজীবী জাতীয় অনেকেই ভূসম্পত্তি ক্রয় করিয়াছে এবং চাকুরি ব্যতীত জীবিকা ধারণে সমর্থ। তথাপি একবার শিক্ষার আস্বাদ অনুভব করিতে পারায় তাহাদের মধ্যে শিক্ষা যেন উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছে। এরূপ দেখা যায় যে, মাহিষ্য বালকগণের শিক্ষার কথা বলিলে কোন কোন অভিভাবক কিঞ্চিৎ বিরক্তভাবে বলিয়া উঠে, "বাবু—লেখা পড়া শিখিলে কি হইবে? এই ধরুন, এণ্ট্রান্স পাশ করাইতে ছেলের পিছে হাজার টাকা ব্যয়। পাশ করিলে ২০।২৫ টাকা মাসিক জুটিবে। ছেলে তখন বাবু হইয়া যাইবে, আর কৃষি করিতে চাহিবে না। কাজেই পৈত্রক ভূমি বিক্রয় বা বন্দোবস্ত করিয়া কোনও রূপে দেশে দেশে ঘুরিয়া উদর পূরণ করিবে। বরং যদি লেখাপড়া না শিখাইয়া ঐ হাজার টাকা কৃষিকার্য্যে খাটান যায়, তবে ছেলেরা আজীবন বাড়ী ঘরে সুখে স্বচ্ছন্দে দধিদুগ্ধে উদরপূরণ করিতে পারিবে।" এইত আমাদের হিসাব! কথাটা অনেক অংশে ঠিক, সন্দেহ নাই, কিন্তু লেখাপড়া কি শুধু চাকুরীর জন্যই? আমরা ক্রমে এবিষয়ে আলোচনা [illegible]রিতেছি।

শ্রীবিজয় কুমার রায়।

মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ সদ্‌ব্রাহ্মণ।

(১)

উৎপত্তি, জাতি, দেহ বা বর্ণ ব্রাহ্মণ নহেন। জ্ঞানময় কর্ম্মাহ´ ব্যক্তিগণই ব্রাহ্মণ। কর্ম্ম বা ঈশ্বরজ্ঞানই ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ। ব্রাহ্মণগণই হিন্দুসমাজের নেতা, মস্তক ও ধর্ম্ম-জ্ঞান-শিক্ষার মূল। বেদ, স্মৃতি, সদাচার, আত্মপ্রীতি এবং সম্যক্ সঙ্কল্পজনিত অবিরুদ্ধ কামনা যে ধর্ম্মজ্ঞানের মূল, যাঁহারা তাহাতে সম্যক্ অলঙ্কৃত, তাঁহারাই বেদাধ্যয়ন করিয়া ব্রাহ্মণ হইয়াছেন। 'ব্রহ্মবিৎ স ব্রাহ্মণঃ'। যাঁহারা ব্রহ্মকে জানিয়াছেন তাঁহারাই ব্রাহ্মণ।

ব্রাহ্মণ কাহারা ?

মানব-ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতা ভগবান মনু কহিয়াছেন :—

"জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সুকর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরোনিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যব্রতঃ সর্ব্বো ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥"

অর্থাৎ যাঁহাদিগের ব্রহ্মজ্ঞান হইয়াছে, এবং যাঁহারা দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া শুচিনিষ্ঠ, বিদ্যার্থী, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী, ধর্ম্মনিষ্ঠ ও সত্যবাদী তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্ক, ১১শ অ, ১৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে,—শুদ্ধ কুল ও শুদ্ধ আচারে পরিশুদ্ধ যে সকল দ্বিজাতি, তাঁহাদিগের যজন, অধ্যয়ন, দান ও ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রোমোচিত ক্রিয়া বিহিত। "ইজ্যাধ্যয়নদানানি বিহিতানি দ্বিজন্মাম্। জাতকর্ম্মাবদাতানাং ক্রিয়াশ্চাশ্রমচোদিতাঃ॥"—"তিলকং যজ্ঞসূত্রঞ্চ ত্রিসন্ধ্যা বিষ্ণুপূজনং। গায়ত্র্যাদি জপেন্নিত্যমিতি ব্রাহ্মণ-লক্ষণং॥" প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে কথিত হইয়াছে, তিলক ও যজ্ঞসূত্র ধারণ ত্রিসন্ধ্যোপাসনা, বিষ্ণু আরাধনা, গায়ত্রীপাঠ প্রভৃতি নিত্যানুষ্ঠানই ব্রাহ্মণের লক্ষণ। মনু বলিয়াছেন :—"অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।

দানং প্রতিগ্রহশ্চৈব ব্রাহ্মণানাম্ কল্পয়ৎ॥"

সদ্‌ব্রাহ্মণের লক্ষণ কি ?

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহাই সদ্‌ব্রাহ্মণের লক্ষণ। 'জপেৎ গায়ত্রীং নিয়তং ত্রিসন্ধ্যাসু বিশেষতঃ। অস্থান্ উপগতান্ বিপ্রান্ পূজয়েদবিরোধতঃ॥'—নৃসিংহপুরাণে কথিত হইয়াছে,

নিয়ত গায়ত্রী জপ করিবে, বিশেষতঃ ত্রিসন্ধ্যায় জপ করিবে। সমীপাগত বিপ্রের অবিরোধে সেবা করিবে। ইহা ব্রাহ্মণ-কর্ত্তব্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। 'শমোদমস্তপঃ শৌচং সন্তোষং ক্ষান্তিরার্জ্জবম্। জ্ঞানং দয়াচ্যতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণং॥'—শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে—শম, দম, তপস্যা, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষমা, ঋজুতা, জ্ঞান, দয়া, ঈশ্বরপরায়ণতা এবং সত্যতা প্রভৃতি ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

পুরাকালে এক বেদ, এক প্রণব, এক ঈশ্বর, এক অগ্নি ও এক বর্ণ ছিল। তৎকালে ঐ সকলের দ্বিত্ব বা তৃত্ব থাকিলে ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ মধ্যে বেদ, প্রণব, উপাসনা ও বর্ণ ভেদ বিষয়ের ভূরি ভূরি প্রমাণ ধর্ম্মশাস্ত্রে লিখিত হইত; এবং ধর্ম্মশাস্ত্র প্রমাণে জানা যাইতেছে, তাঁহারা নৈমিষারণ্য প্রভৃতি তীর্থে সময়ে সময়ে সমবেত হইয়া, ঈশ্বরোপাসনা করতঃ ভারতীয় ভাগ্যের শুভাশুভ সমালোচনা করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেন, তাহাতে আত্মপরতার ছায়ামাত্র প্রকাশ পায় নাই। কালক্রমে যুগধর্ম্মে ত্রিকালদর্শী ঋষিগণকর্তৃক বেদাদি বিভাগ হয় এবং ব্রাহ্মণগণের শ্রেণীবিভাগ হইয়া থাকে।

সদ্‌ব্রাহ্মণের যে যে লক্ষণের কথা উল্লিখিত হইল, তাহা বর্ত্তমান বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ-সমাজে সম্যক্ পরিদৃষ্ট হয় কি? ব্রাহ্মণের সে শম দম তিতিক্ষা কই? যে গুণে রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ সদ্‌ব্রাহ্মণ বলিয়া বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজে আদৃত, সেই গুণগুলি মাহিষ্য-পুরোধা গৌড়াদ্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণের আছে কি না—তাহা দেখিলেই ত বুঝিতে পারা যাইবে যে, গৌড়াদ্য-বৈদিকগণ সদ্‌ব্রাহ্মণ কি না?

জাতকর্ম্মাদি দশবিধ সংস্কার ব্রাহ্মণের করণীয়। রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি উচ্চ-শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ন্যায় গৌড়াদ্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণগণ যথানিয়মে দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হন। গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাত-কর্ম্ম, নামকরণ, নিষ্ক্রমণ, অন্নাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বিবাহ—দেহশুদ্ধির জন্য এই দশবিধ সংস্কারে গৌড়াদ্য-বৈদিকগণ যথানিয়মে সংস্কৃত হন—'জন্মনা জায়তে শূদ্রো সংস্কারা দ্বিজোচ্যতে। বেদপাঠে ভবেৎ বিপ্রো ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ॥'

দশবিধ সংস্কার।

গৌড়াদ্য-বৈদিকগণের নিষ্ঠা আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিশেষ প্রশংসনীয়। পাশ্চাত্য বিদ্যার আলোক এখনও অতি অল্পমাত্রায় ইঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে,—রাঢ়ী বারেন্দ্র সমাজের অনেকেই বিলাতযাত্রা প্রভৃতি হিন্দুধর্ম্ম-

বিরুদ্ধ কার্য্যে হিন্দু-সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছেন, কিন্তু গৌড়াদ্য-বৈদিক সমাজের একটীও হিন্দুধর্ম্ম-পরিভ্রষ্ট হন নাই। ইহাঁরা নিত্যব্রতী, বিদ্যার্থী ও সত্যবাদী। উকীল, মোক্তার, দারোগা প্রভৃতি সতত-অনৃতসেবী ইহাঁদের মধ্যে খুব কমই আছেন। হিন্দুর নিত্যনৈমিত্তিক দোলদুর্গোৎসব প্রভৃতি কার্য্য ইহাঁরা অতি যত্নের সহিত ও নিষ্ঠাসহকারে সম্পন্ন করিয়া থাকেন। সেরূপ অন্য শ্রেণীর মধ্যে অতি বিরল। ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক গায়ত্রী প্রভৃতি অন্য শ্রেণীর উচ্চ ব্রাহ্মণের ন্যায় ইহাঁরাও করিয়া থাকেন। সামাজিক, বৈষয়িক ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয়, কি অন্য সকল বিষয়েই ইহাঁরা ব্রাহ্মণোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত।

অধ্যাপন, অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ষট্ কর্ম্ম ব্রাহ্মণের করণীয়। এতদ্সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করার প্রয়োজন। গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণগণ টোল বা চতুষ্পাঠী রক্ষা করিয়া অধ্যাপনা এবং আগ্রহ সহকারে বেদাদি অধ্যয়ন করেন। বঙ্গদেশে প্রাচীন ও আধুনিক ইহাঁদের যে সকল টোল ছিল বা আছে তাহার কয়েকটীর মাত্র তালিকা পরে প্রদত্ত হইতেছে। যজন ও যাজন ইহাঁদের নিত্যকর্ম্ম। দানধর্ম্মে ইহাঁরা মুক্তহস্ত। প্রতিগ্রহ অর্থাৎ ব্রহ্মোত্তর দেবোত্তর প্রাপ্তির নিদর্শনও বহুল আছে।

ষট্কর্ম্ম।

মহাভারত পুরাণাদি গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছে, অধুনা যে সমস্ত প্রদেশ লইয়া বাঙ্গলা দেশ, সেন বংশীয় রাজগণের পূর্ব্ব হইতে তাহা গৌড়দেশ নামে আখ্যাত ছিল। মহাভারতীয় যুগে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ প্রভৃতি বিভিন্ন বিভিন্ন দেশ ছিল। এই সকল দেশে তৎকালে ব্রহ্মণ্যধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল—বেদপারগ ব্রাহ্মণগণেরও বসতি হইয়াছিল। বঙ্গীয় মাহিষ্যজাতি, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের প্রাগৈতিহাসিক যুগ, এদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া দীর্ঘকাল শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে এই জাতীয় প্রাচীন রাজবংশগুলিই তাহার প্রমাণ স্বরূপ দেদীপ্যমান। তাঁহাদের আশ্রয়ে বহু দেবতা ব্রাহ্মণ রক্ষিত হইয়াছিল। সেই প্রাচীন যুগের ব্রাহ্মণগণ সে সময়ে বেদমন্ত্রে বঙ্গদেশ সঞ্জীবিত করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ্যতেজে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে মহারাজ জন্মেজয় সর্পযজ্ঞে আহ্বান করিয়াছিলেন তাঁহাদের সজাতীয়গণ এখনও 'গৌড়তগা'নামে অভিহিত হইয়া পশ্চিমাঞ্চলে বাস করিতেছেন, সেই গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণসন্তানগণ (পরাশর, ব্যাসোক্ত, দ্রাবিড়, গৌড়বৈদিক) এখন কালমাহাত্ম্যে মুহ্যমান ও নিষ্প্রভ। অনেকে এই

মাহিষ্যযাজীকে এক জাতির পুরোহিত দেখিয়া বর্ণ ব্রাহ্মণের তুল্য মনে করেন, কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, বর্ণ ব্রাহ্মণ মাত্রেই রাঢ়ী শ্রেণী হইতে পতিত —মাহিষ্য-যাজীর সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব বা মিলন নাই। সারস্বত ব্রাহ্মণ-গণ যেমন কেবলমাত্র ক্ষত্রিয় যাজন করেন, সেইরূপ গৌড়াদ্য-বৈদিকগণ কেবল-মাত্র মাহিষ্য (চাষী কৈবর্ত্ত) যাজন করেন। মাহিষ্য জাতির পৃথক পুরোহিত থাকা হীনত্বের লক্ষণ নহে বরং উহা গৌরবের বিষয়। যেমন কতকগুলি শোত্রিয় ব্রাহ্মণ অন্ত্যজ অস্পৃশ্যজাতির যাজন করিয়া পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, সেইরূপ চাষী কৈবর্ত্ত জাতির পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ বর্ণ ব্রাহ্মণ * নহেন। মাহিষ্যজাতি জন্মতঃ কর্ম্মতঃ ধর্ম্মতঃ উৎকৃষ্ট বলিয়া—বৈধ অনুলোম বিবাহক্রমে ক্ষত্রিয়পিতা ও বৈশ্যামাতা হইতে এই জাতি উদ্ভূত বলিয়া—ইহাদের জলাচার বর্ত্তমান আছে। ইহারা উচ্চ হিন্দু, মাতৃধর্ম্মানুসারে বৈশ্য বর্ণের অন্তর্গত। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের পণ্ডিতগণ এই চাষী-কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্য জাতির পক্ষাশৌচ ব্যবস্থা দান করিয়াছেন—ময়না পরগণায় অস্মরণীয় কাল হইতে বৈশ্যাচার ও পক্ষাশৌচ বর্ত্তমান আছে।

---

* সমাজে দুই প্রকার কৈবর্ত্তের মধ্যে চাষী-কৈবর্ত্ত অর্থাৎ মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত উৎকৃষ্ট জলাচরণীয় আর জেলে-কৈবর্ত্ত অন্ত্যজ—জল-অনাচরণীয়। জেলে-কৈবর্ত্তের পুরোহিত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ—তাঁহারাই পতিত বর্ণব্রাহ্মণ। 'কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ পতিত'—এই কথা জেলে-কৈবর্ত্তের পক্ষে।

স্থানীয় অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে:—

জেলে-কৈবর্ত্ত	তৎপুরোহিত
শ্রীরমেশ চন্দ্র বিশ্বাস,	শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়, সাং মির্জ্জাপুর—কলিকাতা।
শ্রীঅভয় জালিয়া,	শ্রীপ্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
অভয় চন্দ্র ওঝার নিকট হইতে সংগৃহীত।	শ্রীনারায়ণ চন্দ্র কমতি, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন।
	শ্রীহরিচরণ মুখোপাধ্যায় কৃষ্ণ লাহার লেন।
	শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীউদয় চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শাঁকারিটোলা লেন, বহুবাজার কলিকাতা।

অন্যান্য কতকগুলি জেলেকৈবর্ত্তের পুরোহিতের নাম ধাম।—

শ্রীউমাচরণ কবিরত্ন—মলঙ্গা লেন। উমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—ইটালী। শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,—বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন। শ্রীকুমুদচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়—রমানাথ কবিরাজের লেন। শ্রীবরদাচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—মাণিকতলা। শ্রীপার্ব্বতীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—লেবুতলা লেন। শ্রীউদয় চাঁদ মুখোপাধ্যায় অক্রুর দত্তের গলি। শ্রীক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়—উইলিয়মস লেন। শ্রীপঞ্চানন

শূদ্রের যাজনে, শূদ্রের দানগ্রহণে ব্রাহ্মণের পাতিত্য আইসে, মাহিষ্য জাতি ব্রহ্মার পাদদেশ হইতে উদ্ভূত হন নাই—মাহিষ্য শূদ্র নহে, মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণও শূদ্রযাজী নহেন—পরন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ। নবশাখ-যাজী বহুশূদ্রের যাজন করিয়াও যদি সদ্‌ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হন, তবে মাহিষ্য-যাজী কেন সদ্‌ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হইবেন না ?

মাহিষ্য শূদ্র নহে, মাহিষ্য-যাজীও শূদ্রযাজী নহেন।

সেনরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে মাহিষ্য-জাতিই বাঙ্গালার আধিপত্যকারী জাতি ছিল। সেনরাজগণ বাহুবলে তাহাদের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। তদবধি উভয়ের মধ্যে জেতাজিত-ভাব বহুদিন বর্ত্তমান ছিল। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ সন্তানগণের বিদ্যাব্রাহ্মণ্যে দেশ উদ্ভাসিত হইলে ও রাজশক্তি তাঁহাদের পশ্চাতে থাকায় গৌড়ীয় আদি বৈদিকগণ মুহ্যমান হইয়া পড়েন। ধীরে ধীরে বাঙ্গলার অন্যান্য জাতি প্রাচীন যাজক পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন যাজককে পুরোহিত পদে বসাইলেন, কিন্তু মাহিষ্য জাতি পূর্ব্ব গৌরবের স্মৃতি ও পুরোহিত ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিবশতঃ প্রাচীন যাজক পরিত্যাগ করেন নাই। যাঁহাদের পুরোহিত ভাল ছিল, তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, যাঁহাদের ভাল ছিল না, তাঁহারাই নূতন পুরোহিত লইলেন।

মাহিষ্যজাতির পুরোহিত ভাল ছিল, কাজেই পরিত্যাগ করেন নাই—সেই গৌড়ীয় আদি বৈদিক ব্রাহ্মণ-সন্তানগণ আজিও মাহিষ্য জাতির পুরোহিত। মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ কোন অংশেই রাঢ়ী বা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা হীন নহেন। নিম্ন কয়েকটী বিষয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বুঝা যায়।

(১) মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ মাহিষ্য ব্যতীত অন্যান্য উচ্চ হিন্দু—ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কায়স্থ প্রভৃতি মহারাজা রাজা জমিদারগণের নিকট হইতে ব্রহ্মোত্তর ভূমি দানপ্রাপ্ত হইয়াছেন। বর্দ্ধমানের ক্ষত্রিয় মহারাজা, নাটোর ও মহিষাদলের ব্রাহ্মণ রাজা, মুড়াগাছার ক্ষত্রিয় জমিদার, বারুইপুরের কায়স্থ জমিদার ও নবদ্বীপের মহারাজা প্রভৃতি এই মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে সেবিকা ও মাহিষ্য-সমাজে এবং ভ্রান্তি-বিজয়ে তাহার কতকগুলি তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। আগামী বারে আমরাও কতকগুলি প্রদর্শন করিব। প্রাচীন সনন্দও দেখাইতে পারা যায়।

(২) মাহিষ্য-পুরোহিত গৌড়াদ্য-বৈদিক শ্রেণীর অধ্যাপকগণের টোল বা চতুষ্পাঠীর কয়েকটী মাত্র নাম এখানে প্রদত্ত হইতেছে। সদ্‌ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মের

মধ্যে অধ্যাপনা একটী। অধ্যাপকগণ প্রাচীনকালে দেশীয় রাজা জমিদার প্রভৃতির নিকট হইতে সাহায্য পাইতেন, অধুনা সেই রূপ সাহায্যের অভাবে বহু সংখ্যক টোল বন্ধ হইয়া গিয়াছে; বিশেষতঃ সংস্কৃত শিক্ষার প্রতি অধুনা ব্রাহ্মণগণের তেমন আগ্রহ পরিদৃষ্ট হয় না।

অধ্যাপকগণের নাম ও চতুষ্পাঠীর ঠিকানা—

১। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রোহিণী কুমার কাব্যতীর্থ, ধনবেড়িয়া, ডায়মণ্ড হারবার, ২৪ পরগণা।
২। ,, ,, বরদা প্রসাদ বেদান্তবাগীশ, গোপালপুর, মেদিনীপুর।
৩। ,, ,, ভগবতীচরণ কাব্যভূষণ, ধান্দা ,,
৪। ,, ,, গোকুলকৃষ্ণ ভাগবতভূষণ, গোদাগরী রাজসাহী।
৫। ,, ,, নিত্যতারণ স্মৃতিরত্ন, মহানন্দ চতুষ্পাঠী, বারসত চন্দননগর।
৬। ,, ,, রামনারায়ণ বিদ্যাভূষণ, গাব্দুরা, নদীয়া।
৭। ,, ,, শ্রীহরি স্মৃতিরত্ন চাকদা, ,,
৮। ,, ,, নারায়ণ চন্দ্র কাব্যরত্ন, উগারদহ, হুগলী।

(৩) জানবাজারের রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বর কালী মন্দির প্রতিষ্ঠার সময়ে ও অন্যান্য কার্য্যে বিভিন্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের সহিত এই গৌড়াদ্য-বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ একযোগে কার্য্য করিয়াছেন। রাণী রাসমণির বংশধর জানবাজারের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু চণ্ডীচরণ চৌধুরী ও শ্রীযুক্তা গিরিবালা দাসী, জেলা নদীয়া দারিয়াপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হীরালাল বিশ্বাস ও মহিষাদলের রাজষ্টেটের ম্যানেজার রায় নীলমণি মণ্ডল বাহাদুরের পুত্র শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ মণ্ডল প্রভৃতি মহাশয়গণের বাটীতে, রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রভৃতি ভিন্ন শ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণগণের সহিত, সমান মর্য্যাদাস্বরূপ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ সমান বিদায় পাইয়া থাকেন। মহিষাদলের রাজবাটীতে ও অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ সমান বিদায়ের ব্যবস্থা আছে।

(৪) রাঢ়ী প্রভৃতি উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ মাহিষ্য-পুরোহিত গৌড়াদ্য-ব্রাহ্মণকে দেবোত্তর ভূমিসহ তাঁহাদের প্রতিষ্ঠিত দেবতার সেবাইত নিযুক্ত করিয়াছেন। ইহাও সদ্‌ব্রাহ্মণ্যের নিদর্শন। অনুসন্ধান করিলে বহুতর দেখান যাইতে পারে, তন্মধ্যে কয়েকটী উল্লিখিত হইল :—

প্রতিষ্ঠিত দেবতার নাম	যাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ও মন্দিরাদি নির্ম্মিত	মাহিষ্য-যাজী গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ সেবাইতের নামধাম
(ক) শ্যামাঠাকুরাণী ১২/০ বিঘা দেবোত্তরসহ	নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র	৺শ্রীকান্ত শর্ম্মাকে প্রদত্ত, বর্ত্তমান সেবাইত রাজকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য, কাঙ্কিয়ারা, ২৪ পরগণা
(খ) পঞ্চানন্দ	খিদিরপুর ভূকৈলাশ রাজা	হেমচন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, দুল্লে হাওড়া, পঞ্চানন্দ চক্রবর্ত্তী, খিদিরপুর।
(গ) কালীর মন্দির (বেহালা)	কৃষ্ণধন মুখোপাধ্যায়	কিশোরীমোহন চক্রবর্ত্তী, বেহালা।
(ঘ) শীতলা মন্দির (গড়পার)	বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত, জগন্নাথ দত্তের লেন, গড়পার	ভুবনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও অম্বিকা চরণ চক্রবর্ত্তী।
(ঙ) বিশালাক্ষী মন্দির (সন্তোষপুর মঠ)	তারকেশ্বর, মহান্ত-মহারাজ	মাধবচন্দ্র চক্রবর্ত্তীদিগর সন্তোষপুর, হুগলী।
(চ) শ্যামসুন্দর মন্দির	হরিপালের কায়স্থ রায় পরিবার	দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী বাসুদেবপুর, হরিপাল, হুগলী।
(ছ) গড়চণ্ডী মন্দির রসপুর আমতা	রসপুরের কায়স্থ রায় পরিবার	সূর্য্যকান্ত চক্রবর্ত্তী, রসপুর, হাওড়া,
(জ) পঞ্চানন্দ মন্দির মৌরী, হাওড়া	আন্দুলের কায়স্থ জমিদার নগেন্দ্রনাথ মল্লিক	রামপদ চক্রবর্ত্তীদিগর আন্দুল, হাওড়া
(ঝ) কালী মন্দির শশাবেড়িয়া	ত্রিবেণীর কায়স্থ জমিদার	নীলকান্ত চক্রবর্ত্তী শশাবেড়িয়া উলুবেড়িয়া হাওড়া।
(ঞ) পঞ্চানন্দ মন্দির রাজপুর, ২৪ পরগণা	জেলা ২৪ পরগণা, বারুই-পুরের কায়স্থ জমিদার চৌধুরী বংশ	৺পণ্ডিত শ্যামাচরণ শর্ম্মা বর্ত্তমান সেবাইত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী।

(৫) ১৩০৮ সালের আশ্বিন মাসের সেবিকা (মাসিক) পত্রে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বিশুদ্ধ কেন? তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। উহা বাঙ্গলার ছোটলাট বাহাদুরের নিকট সেই সময়ে দাখিল করা হইয়াছিল। তাহাতে দশম যুক্তি এই যে,—ভিন্নশ্রেণীস্থ বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণের সহিত ইহাঁদের যৌন সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। যে সমস্ত রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য বৈদিকের কন্যা গ্রহণ করিয়াছেন ও কন্যা দান করিয়াছেন, তাহার বিস্তৃত তালিকা ১৩০৯ সালের সেবিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ভ্রান্তি-বিজয়ের সপ্তম অধ্যায়ে উহা উদ্ধৃত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে এখনও যৌনসম্বন্ধ পরিদৃষ্ট হয় না, কিন্তু নৈকষ্য কুলীনের আবাস বিক্রমপুর অঞ্চলে এই বিবাহ হইয়াছে। সম্প্রতি জেলা ত্রিপুরা - কুমিল্লার ৬ষ্ঠ মুন্সেফী আদালতে ১৯১১ খৃঃ অব্দের ৫৩৬ নং স্বত্বসম্বন্ধীয় একটী মোকদ্দমায় এইরূপ বিবাহের একটী নিদর্শন পাওয়া যায়। জেলা ঢাকার অন্তর্গত বিক্রমপুর পরগণার দরহাটা নিবাসী ৺কালীপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীসারদাপ্রসন্ন চক্রবর্ত্তী রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, থানা দাউদকান্দি সাং বড়কোটা নিবাসী কৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নামে তাঁহার মাতামহ মাহিষ্যযাজী গৌড়াদ্য-বৈদিক শ্রেণীর ৺উমাকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিষয় প্রাপ্তির দাবীতে নালিশ করিয়াছেন। মাহিষ্যযাজী সদ্‌ব্রাহ্মণ না হইলে এরূপ যৌনসম্বন্ধ চলিত না। (৬) সামাজিক এক পংক্তিতে ভোজনাদি বিষয়ে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, দাক্ষিণাত্য বা পাশ্চাত্য বৈদিকগণের যখন পরস্পর চল নাই, তখন গৌড়াদ্য-বৈদিকেরও সেরূপ হইতে পারে। (৭) শাতাতপ সংহিতায় কথিত হইয়াছে ঃ—

"অব্রাহ্মণস্তু ষট্‌প্রোক্তা ঋষিণা তত্ত্ববেদিনা ;
আদ্যো রাজভৃত্যস্তেষাং দ্বিতীয় ক্রয়বিক্রয়ী,
তৃতীয়ো বহুযাজী স্যাৎ চতুর্থো গ্রামযাজকঃ
পঞ্চমস্তু ভৃত্যস্তেষাং গ্রামস্য নগরস্য চ ॥
অনাগতান্তু যঃ পূর্ব্বাং সাদিত্যাঞ্চৈব পশ্চিমাং।
নোপাসীত দ্বিজঃ সন্ধ্যাং স ষষ্ঠোহব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ ॥"

(১ম) রাজনিযুক্ত কর্ম্মচারী, (২য়) ক্রয়বিক্রয়কারী, (৩য়) বহুযাজী, (৪র্থ) গ্রাম-যাজী, (৫ম) নিযুক্ত নগর বা গ্রাম-শাসিতা, (৬ষ্ঠ) ত্রিসন্ধ্যারহিত,—এই ছয় ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ অর্থাৎ সদ্‌ব্রাহ্মণ নহেন। মাহিষ্যযাজী এই ছয়প্রকারের কোনও একটী দোষযুক্ত নহেন; পরন্তু বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ।

প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধানকল্পে বঙ্গীয় গবর্ণমেন্ট এই পবিত্র ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতেছেন। আশা করি, উপরিবর্ণিত প্রমাণগুলি বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে কর্ত্তৃপক্ষগণ প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হইতে পারিবেন।

মাহিষ্যজাতি আবহমান কাল ব্রাহ্মণশাসন মানিয়া চলিয়া আসিতেছেন। মাহিষ্য রাজাধিরাজগণের দ্বারা বহু দেবমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, গো-ব্রাহ্মণাদি রক্ষিত হইয়াছে ও হইতেছে। অতএব মাহিষ্যজাতি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংরক্ষক ও সদ্‌ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যাজিত।

১৯১২ খৃঃ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ মাহিষ্য ছাত্রগণের নাম।

গোষ্ঠবিহারি দাস—সব্‌-এসি-সার্জ্জন, ক্যাম্বেল।

ম্যাট্রিকুলেশন।

প্রথম বিভাগ।—অতুলচন্দ্র দাস—খেলাতচন্দ্র ইনষ্টিটিউশন কলিকাতা। খগেন্দ্রনাথ হাজরা—ডায়মণ্ড হারবার; পুলিনবিহারী হালদার—হট্টগঞ্জ; সারদাপ্রসাদ হালদার—জয়নগর ইন্; উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জী—তালতলা; রামচন্দ্র মাইতি—পার্ব্বতিপুর; ভোলানাথ মণ্ডল—ডায়মণ্ড হারবার; হরিপদ প্রামাণিক—ডায়মণ্ড হারবার; সুশীল প্রামাণিক—ডায়মণ্ডহারবার; মণীন্দ্র নাথ সামন্ত—সাউথ সুবার্ব্বন। অঘোর নাথ সেনাপতি—তমলুক হামিল্টন বঙ্কিমচন্দ্র ঘড়ুই—ঐ, গজেন্দ্রনাথ ভুঁইয়া—ঐ, ব্রজেন্দ্রনাথ দাস—ঐ, ফণীভূষণ দাস—ঐ, সতীশচন্দ্র খাটুয়া—ঐ, প্রফুল্লকুমার রাউৎ—ঐ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ রায়—ঐ, পুলিনবিহারী সাহু ঐ, বনবিহারী জানা—কাঁথী, যোগেশ্বর জানা—ঐ, পরেশ-চন্দ্র মাইতি—ঐ, প্রফুল্লকুমার মাইতি—ঐ, ভূপেন্দ্রনাথ পাত্র—ঐ, পদ্মলোচন সাহু—ঐ, উপেন্দ্রনাথ করণ—মহিষাদল, গজেন্দ্রনাথ করণ—ঐ, হারাধন অধিকারী—ঐ। শশিভূষণ পাত্র—পার্ব্বতিপুর। মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, পাবনা ইন্। শরচ্চন্দ্র দাস—কাঁথী। সুশীলকুমার সামন্ত—কালিঘাট, রাজকৃষ্ণ গোস্বামী—সিঙ্গুর। খগেন্দ্রনাথ খাঁড়া—শশাটী; ব্রজেন্দ্রনাথ মণ্ডল—ঐ, অনুকুলচন্দ্র সেনাপতি—ঐ। প্রফুল্লকুমার মণ্ডল—রাজসাহী কলেজিয়েট।

দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—ঐ। হৃষীকেশ সরকার—রাজসাহী একাডমী; বিহারী-লাল প্রামাণিক—ঐ। সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—কৃষ্ণনগর কলেজিয়িট্‌, অরুণোদয় প্রামাণিক ঐ। শ্রীপতিনাথ সরকার—মেহেরপুর। মণিমোহন মণ্ডল—বাওয়ালী, নিলয়কিশোর মণ্ডল—ঐ। প্রফুল্লকুমার বিশ্বাস—হরিনারায়ণপুর। প্রমথনাথ মণ্ডল—মুরশিদাবাদ নবাব ইন্। অমৃতলাল খাঁ—মুরাগাছা। রামদাস বিশ্বাস—শীলস্ ক্রী। শরদিন্দু বিশ্বাস—খাগড়া। ভূপতি নাথ জানা—ঘাটাল। উপেন্দ্রনাথ মাজা—ঐ, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—ঐ। সুরেন্দ্রনাথ জানা—মেদিনীপুর।

দ্বিতীয় বিভাগ।—উপেন্দ্রনাথ দাস, সরিশা। নগেন্দ্রনাথ হালদার, ধানকুড়িয়া। বিনয়ভূষণ হাইত—তমলুক হামিল্টন; নবকুমার খাটুয়া—ঐ নিবারণ পট্টনায়ক—ঐ; মতিলাল সামন্ত—ঐ, মন্মথনাথ রায়—ঐ, প্রভাত-কুমার দিন্ডী—কাঁথী, আশুতোষ মাইতি, ঐ, সরোজকুমার মাইতি, ঐ। কেদারনাথ মাইতি, মহিষাদল রাজ। সুরেন্দ্রনাথ জানা, পার্ব্বতিপুর পতিত-পাবনী। নগেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—কৃষ্ণনগর কল। রতিকান্ত দাস, গাইবান্ধা। বামাপদ দাস, চকদীঘি। প্রভাসচন্দ্র সাহানা, ঐ। সুরেন্দ্রনাথ মণ্ডল, শশাটী। কৃষ্ণমোহন রায়, কালীঘাট। ভূপতিলাল জানা, ঘাটাল। প্রভাসচন্দ্র বিশ্বাস—কৃষ্ণনগর সি, এম, এস,। শরৎ কুমার রায়—নওগাও। প্রসাদ গোবিন্দ মণ্ডল—জয়পুর। কোকিল চন্দ্র জানা—চন্দ্রকোণা।

তৃতীয় বিভাগ।—মুরারীমোহন মাইতি—পার্ব্বতিপুর। শ্রীপতিচরণ রায় শশাটী।

ইণ্টার-মিডিয়েট্ আর্টস্।

প্রমথনাথ বিশ্বাস, রাজসাহী। হীরালাল দাস, সিটী। প্রিয়নাথ দাস, মেদিনীপুর। মন্মথনাথ রায়—কৃষ্ণনগর, গৌরচন্দ্র বিশ্বাস—ঐ। হিঙ্গুহরি শাসমল—বঙ্গবাসী। হরিপদ হালদার, রিপণ কলেজ। হেমচন্দ্র, ঐ; গিরিশচন্দ্র পুরকাইত, মেট্রো, ক্ষিতিভূষণ পুরকাইত ঐ, গতিমাধব ঘড়ুই ঐ। দেবেন্দ্রনাথ সরকার, রাজসাহী, দেবেন্দ্রনাথ দাস—ঐ। পাঁচকড়ি দাস, সিটী। পঞ্চানন দাস, মেট্রো। পরেশনাথ মাইতি, বহরামপুর। সুরেন্দ্রনাথ আদক—ঐ, তীর্থরাম পালুই, ঐ। ভুবনচন্দ্র মহিষ, বর্দ্ধমান। দিবাকর বারিক, বাঁকুড়া। বিপিন-বিহারী মাইতি, রিপণ। খগেন্দ্রনাথ মাজী, সিটি। জ্ঞানেন্দ্রকৃষ্ণ দাস, বঙ্গবাসী।

ইণ্টার-মিডিয়েট্ সায়ান্স্।

খগেন্দ্রনাথ বেরা—প্রেসিডেন্সি, নকুলচন্দ্র ধাড়া—ঐ, ভূতনাথ সাহু, ঐ। যোগেন্দ্রনাথ দাস—রাজসাহী। ক্ষুদিরাম বিশ্বাস বহরামপুর মন্মথনাথ বিশ্বাস—ঐ। ব্রজেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—কৃষ্ণনগর। বিভূতিলাল জানা-প্রেসি, গোবর্দ্ধন দাস—সিটী। উদয়চাঁদ হালদার—সেণ্ট জেভিয়ার। ভূতনাথ প্রামাণিক—সিটী। পঞ্চানন তরফদার—কৃষ্ণনগর।

বি, এ।

পুণ্ডরীকাক্ষ রায়, মেট্রো। অশ্বিনীকুমার বিশ্বাস, বহরামপুর। আশুতোষ মণ্ডল রিপণ কলেজ। কেদারনাথ মাইতি—কটক। মহীতোষ চৌধুরী—রিপণ, উপেন্দ্র নাথ সাউ—সিটি।

বি, এস্ সি।

ভাগ্যধর মল্লিক, প্রেসিডেন্সি। তারাপদ শিকদার, বহরামপুর। খিরোদ চন্দ্র মাইতি—সেণ্ট জেভিয়ার

গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ।

সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি এস সি, রাজসাহী। বিপিনবিহারী ভট্টাচার্য্য কাব্য মধ্য। নারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা, বেদ আদ্য। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ব্যাকরণ মধ্য, বগুড়া রায়কালী চতুস্পাঠী। নীরময় চক্রবর্ত্তী, কাব্য-মধ্য, সংস্কৃত কলেজ। এককড়ি লাল রায়, কাব্য-মধ্য চকদীঘি। ভক্তিভূষণ চক্রবর্ত্তী ব্যাকরণ মধ্য, চকদীঘি। রামকৃষ্ণ গোস্বামী, ম্যাট্রিকুলেশন। জিতেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য—ম্যাট্রিকুলেশন। যতীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী—ম্যাট্রিকুলেশন—আন্দুল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ-সমিতি।—বিগত ১৬ই আষাঢ় রবিবার দিবস হুগলি জেলার সিঙ্গুর পোষ্ট ও থানার অন্তর্গত বলরামবাটী গ্রামে দেওয়ান শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটীতে পূজনীয় ভূদেববর্গের একটী মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। হুগলি, হাওড়া, ২৪ পরগণা ও বর্দ্ধমান জেলা হইতে বহুসংখ্যক গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত যোগদান করিয়াছিলেন। ওয়াদিপুর-

প্রসাদ চূড়ামণি সহকারী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র কাব্যরত্ন মহাশয়, মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ যে সদ্ব্রাহ্মণ তাহা নানাবিধ পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা সুচারুরূপে মীমাংসা করেন। যাহাতে উক্ত সমিতিতে একটী পুস্তকালয় স্থাপন; জাতীয় উন্নতিমূলক পুস্তক ও কাগজ পত্রাদির প্রকাশ এবং চতুষ্পাটী স্থাপন হয়, সে বিষয়ে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। বলরামবাটী নিবাসী খ্যাতনামা ডাক্তার শ্রীযুক্ত কৃত্তিবাস ভট্টাচার্য্য কোষাধ্যক্ষ, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত এককড়ি চক্রবর্ত্তী পরীক্ষক; শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী পরিদর্শক ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানের গণ্যমান্য ও শিক্ষিত ১২ জন ব্রাহ্মণ পরিচালকবর্গ নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। ব্রত, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি বৈদিক ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষে উক্ত সমিতির জন্য বৃত্তি স্থাপিত হইয়াছে। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি অনুমোদিত ও গৃহীত হইল:—

(১) এই সভা সেন্সাস্ কর্তৃপক্ষের নিকট প্রার্থনা করিতেছে যে, চাষী কৈবর্ত্ত অর্থাৎ মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ যেমন ১৯০১ খৃঃ অব্দে পতিত ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, এবারে যেন সেরূপ না হয়। (২) এই সভা প্রার্থনা করিতেছে যে, মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ন্যায় সদ্-ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচিত হন। (৩) এই সভা বিশেষভাবে প্রদর্শন করিতেছে যে, চাষী-কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যগণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংরক্ষক—তাঁহারা প্রাচীনকালে দেশের অধিপতি ছিলেন ও বহুসংখ্যক হিন্দু দেবদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা ও সদ্-ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়া ছিলেন। (৪) এই সভা দেখাইতে সমর্থ যে, মাহিষ্যজাতি সৎজাতি এবং শাস্ত্রানুসারে বৈশ্য—শূদ্র নহে; সুতরাং মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ বহুশূদ্র নবশাখ-যাজী ব্রাহ্মণ অপেক্ষা—নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণগণ যাঁহাদিগকে শূদ্রযাজী বলিয়া পতিত মনে করেন,—কোন অংশেই হীন নহেন। (৫) গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃপক্ষের নিকট এই প্রস্তাব গুলির প্রতিলিপি প্রেরিত হউক।

নাড়াজোল-রাজের উদারতা।—আমাদের শ্রদ্ধের বন্ধু শ্রীযুক্ত রেবতী-রঞ্জন রায় মহাশয় মেদিনীপুর জেলায় পরিভ্রমণ উপলক্ষে নাড়াজোলপতি সদেশাপ-গৌরব-রবি সহৃদয় রাজা শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রলাল খান্‌বাহাদুরের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার রচিত "প্রেমের স্বপন" এক কপি উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। "প্রেমের স্বপন"—মাহিষ্যজাতির অতীত গৌরবের মধুর নিক্কণ—বাঙ্গালীর অতীত স্বাধীনতার আদর্শ ছবি—উদ্দীপনাময়ী ভাষায়

কবি অতীত যুগের সুন্দর চিত্র দেখাইয়া, অবসাদগ্রস্ত সাহিত্যজাতিকে উদ্বোধিত করিতেছেন। উদারচেতা রাজাবাহাদুর ভিন্নসম্প্রদায়ভুক্ত হইলেও পুস্তক পাঠে অত্যন্ত প্রীত হইয়া দরিদ্র গ্রন্থকারকে এককালীন ১০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

সমাজ-সেবকের কার্য্য।—প্রবন্ধ-প্রকাশ ও পুস্তক মুদ্রাঙ্কণের সাহায্যকল্পে নদীয়া জেলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত সাহিত্য-পল্লীসমিতি হইতে বিগত জ্যৈষ্ঠমাসে হাবাশপুর-নিবাসী শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস ও কুর্শানিবাসী শ্রীযুক্ত রাখালকৃষ্ণ বিশ্বাস মহাশয়দ্বয়ের যত্নে যে সাহায্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার তালিকা প্রকাশিত হইল। এই টাকা সুদর্শনবাবুর নিকট রক্ষিত আছে, কার্য্যান্তে খরচ হিসাব প্রকাশিত হইবে। এইরূপে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কার্য্য করিলে সমাজের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়।

১। পাইকপাড়া সাহিত্য সমিতি

রায়সাহেব তারকব্রহ্ম বিশ্বাস	৫৲
শ্রীযুক্ত গৌরচন্দ্র সরকার	১৲
,, সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস	১৲
,, মহিমচন্দ্র বিশ্বাস	১৲
,, মন্মথনাথ সরকার	১৲
,, যোগেন্দ্রনাথ সরকার	১৲
অন্যান্য খুচরা	১৷৵৹
	১২৷৵৹

২। কুর্শা সাহিত্য-সমিতি

শ্রীযুক্ত মুরারিমোহন জোয়ারদার	৫৲
,, শ্রীহরি জোয়ারদার	৫৲
,, বিপিনবিহারী বিশ্বাস	১৲
,, রাখালকৃষ্ণ বিশ্বাস	১৲
,, দেবেন্দ্রনাথ জোয়ারদার	১৲
,, রামেশ্বর প্রামাণিক	॥৹
	১৩॥৹
	২৬৷৵৹

জের	২৬৷৵৹

৩। বাড়াদী সাহিত্য-সমিতি

শ্রীযুক্ত বঙ্কুবিহারী বিশ্বাস ও ,, শ্রীপতি বিশ্বাস মাং	১০৲

৪। সাহেবপুর সাহিত্য-সমিতি

শ্রীযুক্ত হরিমোহন বিশ্বাস মাং	৫৲

৫। কালিদাসপুর সাহিত্য-সমিতি

শ্রীযুক্ত শ্রীনাথ ভৌমিক মাং	২৲

৬। জেহালা সাহিত্য-সমিতি

শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মুন্সেফ	৪৲
,, হরিনাথ বিশ্বাস	২৲
,, নরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস	১৲
,, বিপিনবিহারী চৌধুরী	১৲
খুচরা আদায়	৩।৵৹
	১১।৵৹

মোট	৫৪৸৹

পক্কাশৌচ সংবাদ।—আমরা বঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে এক্ষণে পক্কাশৌচ গ্রহণের বহুসংবাদ পাইতেছি। তন্মধ্যে মেদিনীপুর হুগলী, হাওড়া, মুরশিদাবাদ, যশোহর ও ২৪ পরগণা উল্লেখযোগ্য। মেদিনীপুর জেলাই পক্কাশৌচ-গ্রহণে অগ্রণী। এই জেলার ভুঁঞ্যামুঠা পরগণার বড়বেড়িয়া গ্রামের প্রসিদ্ধ জমিদার রুদ্র নারায়ণ হাজরা মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ পক্কাশৌচে সম্পন্ন হইয়াছে। তৎপুত্র নবকুমার বিগত ১৯শে আষাঢ় বৈশ্যাচারে শ্রাদ্ধের কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। স্থানাভাবে অন্যগুলি এবারে প্রকাশ করা হইল না।

সমালোচনা।

গৌড়াদ্য বৈদিক-ব্রাহ্মণ-পরিচয়।—জেলা হুগলী, পোষ্ট সিঙ্গুর—বালরামবাটী গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত—১ ফর্ম্মা ডিমাই ৮ পেজ। মূল্য /০ এক আনা। মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণগণের সংক্ষিপ্ত সামাজিক পরিচয়। প্রত্যেকের পাঠ করা উচিত। মাহিষ্যগণ যেন দুই চারি খানা করিয়া ক্রয় করতঃ তাঁহাদের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণকে পড়িতে দেন, ইহাই আমাদের অনুরোধ। এক সঙ্গে ১৲ এক টাকার লইলে ১৭ খানা। মাহিষ্য-সমাজ কার্য্যালয়ে পাইবেন।

ভ্রান্তি-বিজয়।—শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত, বঙ্গীয়-ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের সামাজিক ইতিহাসের সমালোচনা। ইহা প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্য-পাঠ্য। মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণের সামাজিক ইতিবৃত্ত ইহাতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছে। মাহিষ্য-যাজী ব্রাহ্মণ যে সদ্‌ব্রাহ্মণ তাহা সুন্দররূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ভাষা ও যুক্তি অতি হৃদয়গ্রাহী। ছাপা সুন্দর। সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল এই পুস্তক পাঠে অতীব আনন্দিত হইয়া প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

মাহিষ্য-সমাজ।

২য় ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা—শ্রাবণ, ১৩১৯।

এস বাঙ্গালী—কর্ম্মক্ষেত্রে।

ভারতবর্ষের মধ্যে বঙ্গদেশে বিদ্যাশিক্ষার ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে, কিন্তু দেশের উন্নতি হয় না কেন? এইটি একবার দেখিবার বিষয়। আমরা বিদ্যা-শিক্ষা করি কেন? প্রধান উদ্দেশ্য চাকুরী; তৎপর ওকালতী, ডাক্তারী প্রভৃতি কয়েকটি মামুলী কার্য্যের জন্য। এর উপর একটা মার্কামারা কাজ আছে—ব্যারিষ্টারী। কাহারও পুত্র ডেপুটির পদ পাইলে পিতা মাতা হাতে হাতেই স্বর্গসুখ প্রাপ্ত হন। ব্যারিষ্টারী, ওকালতী, মোক্তারী, ডাক্তারী ছাড়া পুলিশের দারোগা গিরী পদে একটা চাকুরী আছে—এ চাকুরীটিকে একটি রাজার রাজ-ধানী করা বলিলেও চলে। এক একটী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী তাঁহার অধীনস্থ স্থানটির উপর রাজত্ব করিয়া থাকেন। চৌকীদাররূপী সৈন্য সামন্ত সর্ব্বদা দারোগার আজ্ঞায় কাঠচেরা, ঘোড়ার ঘাস কাটা, দারোগা বাবুর মধুর অঙ্গে তৈলমর্দ্দন করান প্রভৃতি যুদ্ধকার্য্যে সর্ব্বদা ব্যস্ত। লেখা পড়া শিখিয়া বা না শিখিয়া এম রাজধানীতে রাজত্ব করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এক্ষণে দেখা গেল, আমাদের দেশের অনেক শিক্ষিত ছেলে ঐ প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসা অবলম্বন করিয়া কেহ কেহ ভাগ্যক্রমে অর্থোপার্জ্জনের সুবিধা এবং পক্ষান্তরে কেহ কেহ অসুবিধায় পড়িয়াছেন।

মাঝে মাঝে আমরা যে পাশ্চাত্য দেশের বিদ্যাশিক্ষার তুলনা করিয়া আমাদের সৌভাগ্য বা অদৃষ্টের আলোচনা করিয়া থাকি, সেটা কেবল সময়ের অপব্যয় নিবারণ জন্য। যখন কোন কাজ না থাকে, তখন সমাজ বা সাধারণকে একটা উপদেশ দিবার জন্য মাথা ঘামাইয়া উঠে। ভারতবর্ষ যখন সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে সভ্য ও জ্ঞান-চর্চ্চার প্রধান ছিল, তখন ইংলণ্ড ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লোক অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়াছিল। যাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ কেবলমাত্র

বায়ুর সাহায্যে সমুদ্রে অর্ণবপোত পরিচালনা করিত, আজ তাহাদের বংশধরগণ সামান্য নদী বা খাল দেখিলে ভয়ে কাঁপিয়া উঠে। এখনও সেই ভারতবর্ষ আছে ও সেই সুসভ্য আর্য্য বংশধরগণ জীবিত আছেন, তথাপি ভারতের লোক ক্রমেই অধঃপাতে যাইতেছে কেন? বাঙ্গালীরা বুদ্ধিবৃত্তিতে শ্রেষ্ঠ—এটা প্রায় সকল জাতিই স্বীকার করিয়া থাকে, কিন্তু সেই বুদ্ধি বাহ্য আড়ম্বরে ও অনুকরণ প্রিয়তায় প্রায় শেষ হইয়া যায়, তন্মধ্যে যে অতি অল্পমাত্র অবশিষ্ট থাকে, খবৃত্তি বা চাকুরীতে তাহার চূড়ান্ত মীমাংসা হয়। বাঙ্গালীর বুদ্ধি জমা অপেক্ষা খরচই অধিক হয়, **সে জন্য বুদ্ধির সদ্ব্যবহার কোথা হইতে হইবে?**

পাশ্চাত্য দেশের লোক কর্ম্মবীর, সে জন্য তাহারা লক্ষ্মীর বরপুত্র। তাহারা বুদ্ধিবলে দুস্তর মহাসাগর অবলীলাক্রমে পার হইয়া বাণিজ্যদ্রব্যের বিনিময়ে দেশ বিদেশের ধনরত্ন সব জাহাজ বোঝাই করিয়া লইয়া যাইতেছে। আমরা সোণার বিনিময়ে পিত্তল, হীরার বদলে কাচ ও মুক্তার বদলে জল কিনিয়া বিলাস লালসা পরিতৃপ্ত করিতেছি। আমাদের দেশে কাপড়ের বাহার ও আড়ম্বর যার যত বেশী, সে তত বড় দরের লোক, পাশ্চাত্য দেশে বিদ্যার অনুরূপ বিদ্বানের আদর। চক্ষু মেলিয়া এই তফাৎটা একবার দেখ না কেন? দেখ—তোমারই পূর্ব্বপুরুষগণ বলিয়া গিয়াছেন,—

> "উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
> দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
> দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
> যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোহত্র দোষঃ॥

হে বাঙ্গালি, তোমরা এক্ষণে উদ্যোগ হারাইয়া কেবল ভাগ্যমাত্র আশ্রয় করিয়া অপদার্থ কাপুরুষ হইয়াছ। তোমরা বিদ্যাশিক্ষার সদ্ব্যবহার না করিয়া ভিন্ন পথে পরিচালিত হইয়াছ। পদার্থবিদ্যা, রসায়ণ, ভূতত্ত্ব প্রভৃতি শিক্ষালাভ করিয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর হইতে চাকরীরূপ পুষ্পমালা গলায় পরিয়া সব বিদ্যা বিসর্জ্জন দাও। তোমার বিদ্যা পুঁথিগত, দেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন জন্য নহে। তোমার শিক্ষা দীক্ষা কেবলমাত্র চাকুরীর জন্য সীমাবদ্ধ হওয়ায় তুমি বিজ্ঞান শাস্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করিতে পার না। উপাধি লাভের আশায় কেবল-মাত্র পরীক্ষা সমুদ্র পার হইবার চেষ্টা করিয়া থাক ও উপাধিলাভের পর তোমার পুঁথিগত বিদ্যাও ব্যারিষ্টারী উকালতী বা চাকরীর চাপে [illegible]

যায়। অথচ এ দিকে তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিলাভ করিয়াছ বলিয়া একেবারে 'সবজান্তা' হইয়া বসিয়া থাক, সর্ব্বপ্রকার কূটতর্কে অভ্যস্ত হইয়া অপদার্থের পরিচয় দাও। বিজ্ঞানালোচনা দ্বারা অন্যান্য দেশের লোকে শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে। তুমি বিদ্যাশিক্ষা কর বাবু সাজিতে, কিন্তু পাশ্চাত্য দেশের লোকে বিদ্যাশিক্ষা করে দেশে ধনাগমের পথ প্রশস্ত করিতে—এইখানে দিনরাত্রির তফাৎ দেখ। পাশ্চাত্যদেশের শিক্ষিত যুবকগণ সমুদ্রে জাহাজ চালাইতেছে, ঢালাইখানায় (foundry) প্রচণ্ড অগ্নিতাপে অক্লান্তভাবে কাজ করিতেছে, কলকব্জা প্রস্তুতের জন্য কঠিন শ্রম করিতেছে, রৌদ্রবৃষ্টি উপেক্ষা করিয়া খনির কার্য্যে নিযুক্ত আছে, স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করিতেছে, এমন কত শত কঠিন শ্রমসাধ্য কার্য্যে দিবারাত্রি নিযুক্ত আছে। হে বাঙ্গালি, তোমরা বাবু সাজিয়া গৃহকোণে বসিয়া আছ ও বাক্যমাত্র সম্বল করিয়া কূটতর্কে নিযুক্ত আছ!! তোমার শিক্ষাই তোমার সর্ব্বনাশ করিতেছে। তুমি পুঁথিগত বিদ্যার উপর উপাধি লইয়া চাকরীর বাজারে স্থান পাও না, আর বাল্যাবধি পরিশ্রম-বিমুখ হওয়ায় শ্রমসাধ্য কার্য্যে মহাভীত হও। এদিকে তুমি গোপনে গোপনে অর্দ্ধাশনে বা অনশনে দিন কাটাইয়া সাধারণের নিকট আস্ফালন করিতেছ। তোমার দেশে—পল্লীগ্রামে শতকরা ৯০ জন লোক দিন দুইবেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না, শীতকালে বস্ত্রাভাবে অতি দীনভাবে জীবন যাপন করে, তুমি তাহা দেখিয়াও দেখিতে পাও নাই। এস বাঙ্গালী, তোমায় একবার পল্লীচিত্র দেখাইয়া আনি। তোমার দেশের অধিকাংশ লোক কাপড় পরিতে পায় না, অথচ কেন তুমি পোষাক পরিচ্ছদের আড়ম্বর কর। তোমার দেশের হাজার হাজার গরীব শাকভাজা খাইবার জন্য এক বিন্দু তৈল পায় না, কেন তুমি আতর এসেন্সে কাপড় চোপর ভিজাও? মুনি ঋষির কথা বলিলে মানিতে চাহিবে না, কারণ তোমার মত 'সবজান্তা' আদমীর নিকট তাহারা অসভ্য ছিল মাত্র—তাই তোমার সুসভ্য ও বর্ত্তমানকালে তোমাদের ঋষি সাহেবের কথা বলিতেছি শুন—"Plain living and high thinking" অর্থাৎ মোটা মুটিভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবে ও মহান্ আদর্শ চিন্তা করিবে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, তুমি সবদিকেই বিপরীত কার্য্য করিয়া থাক। আহা! রুষের মহাপুরুষ মহাত্মা কাউণ্ট টলষ্টয় সামান্যভাবে জীবন যাপন করিতেন, রাজপথে মোট লইয়া যাইতেন, শেষে জীর্ণ কুটীরে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন। আমাদের দেশের প্রাতঃস্মরণীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কি ভাবে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন ভাবিয়া

দেখ। ইংলণ্ডের মহামন্ত্রী গ্লাডষ্টোন রেলগাড়ীর তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতেন। আরও কত শত দৃষ্টান্ত আছে। বর্ত্তমান কালে ইহাঁদের মত কয়জন লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে! ইহাঁরা জগতের সমক্ষে যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন কয় জন তাহা দেখিল! বাঙ্গালি, তুমি পরিশ্রমে অভ্যস্ত হও, কর্ম্মবীর হও নতুবা তোমার জীবন ধারণের উপায় নাই। দেশের লোক না খাইয়া মারা যাইতেছে, এইটি একবার ভাব ভাব! তাহাদের মুখে অন্ন দিবার জন্য দেশে দেশে কারখানা স্থাপন কর। হে বাঙ্গালি, তুমি আলস্য পরিহার পূর্ব্বক উদ্যমকে আশ্রয় করিয়া পুরুষসিংহ হও। হে শিক্ষিত যুবকদল, আর ঘুমায়ো না! তোমাদের সাহায্য না হইলে কল কারখানা স্থাপন হয় না, কৃষিকার্য্যের উন্নতি সাধন হয় না—তাই তোমায় ডাকিতেছি, এসো ভাই—একবার এসো, মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দেশের অন্নাভাব দূর করিবার চেষ্টা করি এস! তোমাদের দেশে শতকরা ৯২ জন লোক অন্নচিন্তার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া কি কঠোর শ্রম করিতেছে দেখ। তোমার আমার লজ্জা কি! হে ভাই, তুমি চুড়াধড়া দূরে ফেলিয়া দাও, মিহি ধুতি চাদর প্রভৃতি বিলাস উপকরণ ছিঁড়িয়া প্রদীপের সলিতা কর, মোটা কাপড় পরিতে শিখ, পদাঘাতে আতর এসেন্স দূরে নিক্ষেপ করিয়া গৃহের বাহির হইয়া **এসো কর্ম্মক্ষেত্রে।** কর্ম্মক্ষেত্রের সফলতালাভ তোমার ভাবনার বিষয় হউক, দারিদ্রের অন্নাভাব দূর করিবার বাসনা তোমার চিন্তার বিষয় হউক, পরোপকার রূপ মহাব্রত তোমার শিরোভূষণ হউক—তবেই তুমি মনুষ্য নামে পরিচিত হইবে, ও দীনদুঃখীর ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র হইবে। হে ভাই, তখন বুঝিতে পারিবে তোমার উকালতী, মোক্তারী বড়—কি এই কর্ম্মক্ষেত্র বড়। বাঙ্গালার শিক্ষিত যুবক-দলের রৌদ্র-বৃষ্টি-অগ্নিতাপে তাপিত ক্লান্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া দীন দরিদ্রগণ আনন্দিত হইবে, দেশের হিতাকাঙ্ক্ষিগণ দুই হাত তুলিয়া তোমাদের আশীর্ব্বাদ করিবে। এই সোণার ভারতে কত প্রকার কার্য্য আছে দেখ—দেখ!! তোমরা দলে দলে বিভক্ত হইয়া কেহ বাণিজ্যে, কেহ ইঞ্জিনিয়ারিং, কেহ খনির কার্য্যে, কেহ কৃষিকার্য্যে, কেহ ঔষধ প্রস্তুত কার্য্যে বিভক্ত হইয়া যাও ও তদুপোযোগী কল কারখানা স্থাপন করিয়া দরিদ্রের অন্নচিন্তা নিবারণের উপায় কর। পাশ্চাত্য দেশে যে প্রকার বিজ্ঞান-চর্চ্চার উন্নতি হইয়াছে, তোমরা তাহা পারিবে না কেন? তোমরাও চেষ্টা করিলে নূতন নূতন তথ্য

তোমায় ডাকিতেছি—এসো বাঙ্গালি এসো, সকলে মিলিয়া **উন্মেষ-শালিনী উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিই এসো।**

বাঙ্গালা দেশের অধিকাংশ ধনী জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কখন কোনও কার্য্য করে না। কেবল আহার ও নিদ্রায় মূল্যবান সময় নষ্ট করে। এই শ্রেণীর লোক রাশি রাশি অর্থ লৌহ-সিন্দুকের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে। এই স্থূলকায় মাংসপিণ্ড গুলির দ্বারা দেশের কোনও উপকার হয় না। এই শ্রেণীর শত শত ব্যক্তি মটোর গাড়ী কিনিয়া কত লক্ষ টাকা বিদেশে দিল! সেই টাকায় এই দেশে একটা বৃহৎ মটোর গাড়ী নির্ম্মাণের কারখানা প্রস্তুত হইতে পারিত। একবার কেহ তাহা ভাবিবার অবকাশ পাইল না। মটরগাড়ী হাঁকিয়া যাইতে পারিলে মান বাড়িবে, এই আশায় রাশি রাশি অর্থ জাহাজ বোঝাই হইয়া বিদেশে চলিয়া গেল! মান কি মটরে চাপিলে আসে না বাড়ে? এই কলিকাতায় শত শত বাঙ্গালীর মটোর আছে, কিন্তু কয়জনের নাম কয়জনে জানে বল? যাহারা এখন মটোরে চড়িয়া বাহার দিতেছে, তাহারা পূর্ব্বে ঘোড়ার গাড়ী চাপিয়া হাওয়া খাইয়া বেড়াইত। তখন তাহার যে মান ছিল এখনও তাহাই আছে; সুতরাং মটরে মান মর্য্যাদা বাড়িল কৈ? লাভের মধ্যে রাশীকৃত অর্থ বিদেশে চলিয়া গেল! বাঙ্গালী এখন নাকি খালি পায়ে হাঁটিতে পারে না, সে জন্য গাড়ীর দরকার। ইহারা এখন ক্রমেই পায় না হাঁটিয়া হাতের সাহায্যে চলিবার কাজ সারিতেছে; কিছু দিন পরে হয় ত হাতে হাঁটিতে হইবে। এই দেখ না—বাঙ্গালী ট্রামে উঠে হাতের জোরে, গাড়ীতে উঠে গাড়ীর চামড়া বা হাতল ধরিয়া, মটোরে চড়ে লাঠিতে ভর দিয়া ও রেলগাড়ীতে উঠে কপাট ধরিয়া। পায়ের জোরটা ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে। প্রতি বৎসর মটোরে অনেক টাকা যাইতেছে, এ ছাড়া ধনী লোকের ছেলের বিবাহ ও অন্নপ্রাশনে হাজার হাজার টাকার আতসবাজী পুড়িয়া যায়! সেই সব টাকায় দেশের বহু অভাব মোচন হইতে পারিত। যে সব ধনী সন্তান বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন, তাঁহারাও কি ঐ বিষয়টী ভাবিয়া দেখিয়াছেন? হে বাঙ্গালি, তোমার শিক্ষা দীক্ষার পরিণাম কি! ধনী সন্তানগণ! এস, ফিরিয়া এস! ঐ অর্থ অপব্যয়ের স্রোত ফিরাও। অর্থ দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন জন্য ব্যয় কর, দেখিবে মটরগাড়ী চড়িয়া ও আতসবাজী পুড়াইয়া তুমি যে মান কিনিবার বৃথা চেষ্টা করিয়াছিলে, তাহার চেয়ে দরিদ্র

টাকার বাজী পোড়াইয়া তুমি দশ মিনিটের জন্য আনন্দসাগরে ভাসিয়াছিলে, কিন্তু সেই দশ হাজার টাকা মূলধনে একটা কারখানা বা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার সফলতা দর্শনে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত আনন্দসাগরে ভাসিবে, সুতরাং **কেন তুমি ক্ষণিক সুখের জন্য লালায়িত হইয়া রাশি রাশি অর্থ নষ্ট কর?**

হে বাঙ্গালি, তুমি ক্রমেই দৃষ্টিশক্তি হারাইতেছ। তুমি অনুকরণ করিয়া সাহেব সাজিতে চাও ও প্রয়োজন মত স্ত্রীকে মেম সাজাইয়া থাক; কিন্তু সাহেবের দলে 'ঠাঁই' পাও না। তথাপি তোমরা সে মোহন বেশ পরিয়া সভ্য হইতে চেষ্টা করিতে ছাড়িবে না। তোমাদের দেশের লোকের পক্ষে সাহেব বা মেমের পোষাক আবহাওয়ার সম্পূর্ণ বিরোধী। দারুণ গ্রীষ্মে ষ্টকিং বুট পায় দেওয়া, মোটা গঞ্জী বা কোট গায়ে দেওয়া, কোমরে কসিয়া বেল্ট বাঁধা, গলায় বগলেশ বাঁধা, মাথায় টুপি দেওয়া প্রভৃতি দেহের আপাদ মস্তক বাঁধিয়া ছাঁদিয়া রাখিলে রক্ত সঞ্চালনের ক্রিয়াটা কোথা হইতে হইবে বল? এর উপর অনেকের মদমাংস ত আছেই। স্বভাবের বিরুদ্ধজনক কার্য্যদ্বারা বিরুদ্ধ ফল অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তুমি অল্পরসে দৃষ্টিশক্তি হারাইবে, তাহার আর সন্দেহ কি! দরিদ্র শ্রমজীবীরা জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত সহ্য করিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহারা কদাচিৎ চশমার সাহায্যে দর্শন কার্য্য সম্পন্ন করে। পক্ষান্তরে সভ্য বাবুদের ছেলেরা ৫ বৎসর বয়ঃক্রম কালে চশমা না হইলে দেখিতে পায় না! তাহার কারণ, বিপরীত দেখিয়া দৃষ্টিশক্তিও বিপরীত দিকে গিয়াছে। **স্বাস্থ্যের উপর অত্যাচার করিলে সুন্দর স্বাস্থ্য কোথা হইতে পাইবে?**

হে বাঙ্গালী ডাক্তার, তুমি মফঃস্বল ছাড়িয়া সহরে মান পাইবার জন্য আসিয়াছ। তোমার মান কোথায় জান? ঐ যে—শ্মশান-ক্ষেত্রে। তোমার কত শত ভ্রাতা রোগের উপযুক্ত ঔষধ না পাইয়া অকালে মানবলীলা সম্বরণ করিতেছে, কাহারও কাহারও সংসার একেবারে ডুবিয়া যাইতেছে, শত শত ব্যক্তি মহামারীতে শমন-সদনে প্রেরিত হইতেছে, একবার দেখ। এসো শ্মশান-ক্ষেত্রে—আমি তোমায় দেখাইয়া দিতেছি। তুমি সহজে রোগী না পাইয়া মান পাইবার জন্য সময় সময় সাহেব সাজিয়া পাড়ায় পাড়ায় বাহার দাও, অথচ মফঃস্বলে শত শত রোগী চিকিৎসা অভাবে মারা যাইতেছে, তাহা

ভাবিবার অবকাশ পাও না। তোমার ডাক্তারী-শিক্ষা কি ঐ জন্য? তুমি শ্রান্ত হইয়াছ—ঘরে ফিরিয়া—যথায় দীনদুঃখী ঔষধ ও চিকিৎসার অভাবে জীর্ণ কুটীরে পড়িয়া মৃত্যুযন্ত্রণায় অধীর হইতেছে, তথায় একবার এমন সব দরিদ্রকে বাঁচাইতে পারিলে তোমার মান ভগবান দিবেন, তোমাকে সাহেব সাজিয়া মান লইতে হইবে না। তুমি অতুল কীর্ত্তি ও যশের অধিকারী হইবে। দেশের দরিদ্র লোক ঐ প্রকার প্রতি বৎসর হ্রাসপ্রাপ্ত হইলে তোমার পোড়া দেশের উন্নতি কোথায়? আহা! প্রতি বৎসর এরূপে চিকিৎসার অভাবে হাজার হাজার লোক মারা যাইতেছে, কেহ একবারও ভাবিল না—দেখিল না!! তুমি বক্তৃতার সময় বল হিন্দু মুসলমান সবাই আমার ভাই, কিন্তু ঐ কথাটা বাড়ী ফিরিয়া আসিলে আর মনে থাকে না! সুতরাং **তোমার ধর্ম্ম বা উচ্চশিক্ষার পরিণাম কোথায়?**

বাঙ্গলা দেশের লোকে মোকদ্দমা-প্রিয়, এই কথাটা অন্যান্য অনেক দেশের লোক বলে। এর কারণ—তোমাদের এণ্ট্রেন্স হইতে এম-এ পাশ করা ছেলেরা প্রায় সবই উকীল মোক্তার সাজিয়া আদালতে যাত্রার দলের জুড়ির মত বাহার দিতেছে। মামলা মোকদ্দমা না হইলে এদের সংসার চলে কিসে বল? পূর্ব্বে যে সব গ্রামে আদৌ মোকদ্দমা ছিল না এখন তথায় ভাগ্যক্রমে উকীল মোক্তারের সৃষ্টি হওয়ায় গ্রামবাসীরা মোকদ্দমা ও উকিলের আমলে আসিয়া ক্রমেই সভ্য লইয়া ধন্য হইতেছে। গ্রামবাসীরা পূর্ব্বে সহর দেখিবার সুযোগ বা হ্যাটকোট-বিভূষিত কালো বাঙ্গালী সাহেবরূপী হাকিমের শ্রীমুখের দুইটা মিঠেকড়া সম্বোধন শুনিয়া চরিতার্থ লাভ করিবার সুযোগ আদৌ পাইত না। তাহারা যেমন সভ্য হইতেছে তেমন সাধারণের অর্থ শোষণ করিয়া উকীল মোক্তারের ভুঁড়ি মোটা হইতেছে; সুতরাং মন্দটা আর কিসে হইল? এসো বাঙ্গালি, একবার সভ্য জগতের দিক চাহিয়া দেখি! যে দেশে যে শ্রেণীর লোকের সংখ্যা অধিক তথায় সেই শ্রেণীর প্রাধান্য বেশী। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইংলণ্ড আমেরিকা প্রভৃতি দেশের স্কুল কলেজগুলিতে শতকরা ৯০ জন ছাত্র বিজ্ঞান শিক্ষা করে, সে জন্য সে সব দেশে কল কারখানার এত উন্নতি, পক্ষান্তরে আমাদের দেশে শতকরা ৯০ জন ছাত্র ওকালতি বা মোক্তারী ব্যবসা অবলম্বন করিয়া কোন প্রকারে কষ্টে সৃষ্টে পৈত্রিক প্রাণটা রক্ষা করিয়া থাকে। দেশের শিক্ষিত

মামলা মোকদ্দমার সংখ্যা না বাড়িবে কেন? উচ্চ-শিক্ষার কি সুন্দর ফল দেখ! যাহার ফলে দেশ ছাড়খার হইয়া যাইতেছে—কত সুখের সংসার শ্মশানে পরিণত হইতেছে। শিক্ষিত যুবকদল যদি ঐ প্রকার বৃত্তি ছাড়িয়া কলকারখানার দিকে মনঃসংযোগ করিতেন তাহা হইলে দেশে তাহার সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া ধনাগমের পথ প্রশস্ততর হইত। উকীল মোক্তারের ব্যবসা মোকদ্দমা করা—বিজ্ঞান আলোচনা নহে, ফলে মোকদ্দমার সংখ্যাবৃদ্ধি সুতরাং অধঃপাতের সুন্দর উদাহরণ! হে বাঙ্গালি একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ, তুমি বল দেশের জিনিস দেশে উৎপন্ন করিতে, কিন্তু তোমার শিক্ষাদীক্ষা তাহার বিপরীত পথ প্রদর্শন করিতেছে। তোমার উদরান্নের জন্য মামলা মোকদ্দমার যোগাড়ে তাহারা সময় কাটাইবে, কি দেশী জিনিস প্রস্তুতের চেষ্টা করিবে? শেষোক্ত কার্য্যটি অবলম্বন করিলে তোমার জুড়িগাড়ী ও বাবুগিরি একদিনেই শেষ হইয়া যাইবে। হে বাঙ্গালি, তোমার ঐ পথে যাইবার আবশ্যক কি, তোমার সাহেব সাজিবার বা অনশনে সহরে বাস করিবার আর প্রয়োজন নাই। এস, ফিরিয়া এস। মক্কেলের প্রতীক্ষায় ও তৎসহ অন্ন-চিন্তায় তোমার মাথা গরম হইয়া গিয়াছে, এজন্য মস্তকে স্নিগ্ধ তৈল সিঞ্চনের আবশ্যক নাই। তুমি ঠাণ্ডা হইবার স্থান পাও না—তোমার ঠাণ্ডা হইবার স্থান বিজ্ঞান-সরোবর দেখাইয়া দিতেছি, এস। সেই মনোরম সরসীতটে উপবেশন করিলে বারিশীকরসম্পৃক্ত সুশীতল সমীরণস্পর্শে তুমি বিগতক্লম হইবে। দেখ—দেখ, ঐ মনোরম সরসীতে কতপ্রকার মানবের দুঃখনাশকারী পদ্ম ফুটিয়া আছে। তুমি ঐ পদ্ম চয়ন করিয়া হার গাঁথিয়া গলায় পর। তোমার ক্ষুধা নিদ্রা দূরে যাইবে। ঐ পদ্মের মনপ্রাণহারী সুগন্ধের নিকট তোমার ওকালতি-রূপ শেফালিকা পুষ্প হারি মানিয়া যাইবে। ঐ দেখ লক্ষ্মী সরস্বতী সরোবরে পদ্মের উপর বিরাজিত। বাগ্‌দেবীর স্বর্গীয় বীণাঝঙ্কার একবার শুন—শুন! ঐ দেখ আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জাপান আদি সরোবরের বিভিন্ন পদ্মের হার গলায় পরিয়া কেমন সুন্দর সাজে সাজিয়া সরসীতটে দাঁড়াইয়া আছে! ঐ দেখ—তাহারা উদ্যোগী পুরুষ বলিয়া লক্ষ্মী সরস্বতী দুই হাত তুলিয়া তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। হে বাঙ্গালি, তুমি এখনও সরোবরের বহু দূরে আছ, তাই তোমায় ডাকিতেছি—তুমি একবার শুন—একবার ফিরিয়া দেখ! ওকালতী ও মোক্তারিরূপ পর্ব্বত তোমায় বাধা দিতেছে, আলস্যরূপ

করিয়া তোমায় মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তোমার এই অবস্থা দেখিয়া কর্ম্মদেবী মলিন বসন পরিয়া রোদন করিতেছেন,—দেখ একবার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখ! হে ভাই! ঐ বিবেক-অসি তোমার নিকট পড়িয়া আছে, তদ্দ্বারা বিলাসিতা বিনাশ কর, সম্মুখে মৃৎপাত্রে অমৃত রহিয়াছে পান কর, পর্ব্বত উল্লঙ্ঘন কর, মরুভূমি পার হইয়া এস বাঙ্গালি, এস ঐ সরোবর তটে! আমরাও ঐ পদ্মের হার গলায় পরি।

হে বাঙ্গালি, তুমি আর গল্প লিখিও না। প্রেমের পসরা হাটে লইয়া যাইও না। তুমি গল্প লিখিয়া ও পাঠ করিয়া অনর্থক সময় নষ্ট করিতেছ। পাশ্চাত্য সভ্য দেশের লোক নাটক নভেল পড়ে, তাহাদের সময় ভাল ও সে স্ফূর্ত্তির তুলনা আমাদের দেশে নাই। প্রেমিক প্রেমিকার বিরহ বা বিচ্ছেদের হা-হুতাশ আমাদের ন্যায় দরিদ্র জাতির শুনিয়া বা পাঠ করিয়া কাজ নাই। যত প্রকার বিজ্ঞান শাস্ত্র আছে, সবই বিভিন্ন ভাষায় লিখিত, বাঙ্গালা ভাষায় উপযোগী পুস্তক একখানিও নাই। সংবাদপত্র মহল হইতে রাশি রাশি পচা কাগজের বস্তা উপহারস্বরূপে মফঃস্বলে বিতরিত হইতেছে, সেইগুলি গল্পের পরিবর্ত্তে কার্য্যকরী পুস্তক হইলে দেশের বহু উপকার করিতে পারিত। হে বাঙ্গালি, তুমি গল্প লিখিয়া "প্রসিদ্ধ উপন্যাস লেখক" বলিয়া পরিচিত হইবার আশা ছাড় ; তোমার ঐ আশাটী ঘোড়ার ডিমের ন্যায় একটি কাল্পনিক জিনিস—একবার ভাবিয়া দেখ। তাই বলি হে ভাই, আর গল্প লিখিও না। তোমার বা তোমার রচিত প্রেমিক প্রেমিকার তপ্তশ্বাসে বঙ্গ-মরুভূমির উত্তাপ আর বৃদ্ধি করিও না। ঐ পথ হইতে তুমি ফিরিয়া এস। গল্পের পরিবর্ত্তে কার্য্যকরী পুস্তক লিখিয়া দেশে জ্ঞানচর্চ্চার পথ প্রশস্ত কর। হে ভাই বাঙ্গালি, তোমার হৃদয় থাকে ত একবার ভাবিয়া দেখ, কর্ণ থাকে ত শুন, চক্ষু থাকে ত একবার দেখ—দেখ! চিন্তা করিবার শক্তি থাকে ত একবার অনুধ্যান করিয়া দেখ, দেশের অবস্থা কি হইয়াছে। তাই তোমায় ডাকিতেছি, **এস বাঙ্গালী এস, একবার কর্ম্মক্ষেত্রে এস।**

শ্রীআশুতোষ জানা।

মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সদ্ব্রাহ্মণ।

(২)

মন্ত্রকৃৎ বা বেদস্তোতা ঋষিগণই ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন। পরিচয় স্থলে ব্রাহ্মণের কোন্ গোত্র কোন্ প্রবর বলিতে হয়। সৃষ্টির পর ক্রমশঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেখিয়া, ঋষিগণ নৈকট্য-বিবাহ নিষেধ উদ্দেশ্যে বংশের পরিচয় নিমিত্ত গোত্র কল্পনা করিয়া, সগোত্র-বিবাহ নিষেধ করিয়া দিলেন। তাহাতেও অভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় প্রবর সৃষ্টি করিয়া আরও বাঁধাবাঁধি করিলেন। কুলদীপিকাধৃত ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্ম-প্রদীপে সর্ব্বসমেত ৪২টী গোত্রের উল্লেখ আছে। ধারাবাহিক ঐ সকল গোত্রপ্রবর সঞ্জাত পুত্রগণ ঋষিযুগের অবসানে আদর্শপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির পৃথিবী ত্যাগ করিলে, সকলেই জাতিব্রাহ্মণ হইয়া পূর্ব্বস্মৃতি রক্ষার্থে স্ব স্ব আদি পুরুষ ও ঐ বংশীয় আরও কতকগুলি প্রবর্ত্তক অর্থাৎ নিকট সম্পর্কীয় ব্যক্তিগণকে নিত্য স্মরণার্থ আদিপুরুষকে গোত্র ও প্রবর্ত্তকগণকে প্রবর স্বরূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিবাহ শ্রাদ্ধ তর্পণাদিতে গোত্রপ্রবর ব্যবহৃত হইয়া থাকে। মাহিষ্য-ক্ষত্রিয়-যাজী ব্রাহ্মণের গোত্রপ্রবরের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন, তাঁহারা ১ শাণ্ডিল্য, ২ গৌতম, ৩ হংসঋষি, ৪ ঘৃতকৌশিক, ৫ কর্ণঋষি, ৬ রঘুঋষি ৬ দালভ্য, ৮ পুণ্ডরীক, ৯ কাত্যায়ন, ১০ আলাম্যায়ন, ১১ মৌদ্গল্য, ১২, সাবর্ণি, ১৩ ভরদ্বাজ, ১৪ কাশ্যপ, ১৫ বাৎস্য, ১৬, বশিষ্ঠ, ১৭ পরাশর, ১৮ কাঞ্চন, ১৯ বিষ্ণু, ২০ কৃষ্ণাত্রেয়, ২১ আঙ্গিরস, ২২ শক্তি, ২৩ কৌণ্ডিল্য, ২৪ সৌপায়ন—এই সমস্ত গোত্রের ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ উক্ত মহর্ষিগণের বংশধর, তাঁহারা আজিও কোন শূদ্র-যাজন বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম-বিগর্হিত কোন কার্য্যই করেন নাই, অথচ সমাজে নবশাখযাজী অপেক্ষা না কি হীন! এ সকল কথা বর্ত্তমান অবসাদগ্রস্ত ও ঈর্ষাপরতন্ত্র সমাজেই স্থান পায়!!

গোত্র প্রবর

কায়স্থকুলভূষণ শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয় তাঁহার অমিয়-নিমাই-চরিত গ্রন্থের ।/০ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে,—"চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালে নবশাখের অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল, ব্রাহ্মণগণ তাহাদের জলপান করিলে কৃতার্থ মনে করিত। তাহাদিগকে মন্ত্রদীক্ষা দিলে কি আমন্ত্রিত হইয়া তাহাদের বাটীতে গেলে ব্রাহ্মণগণ পতিত হইতেন।"—অতএব শিশির বাবুর মতে চারিশত বৎসর পূর্ব্বে নবশাখগণ সমাজে অচল ছিল ও সদ্ব্রাহ্মণ তাহাদের বাটীতে

যাওয়া মাত্র পতিত হইতেন। এক্ষণে রাঢ়ীবারেন্দ্রগণ এই নবশাখ যাজন করিয়া পতিত নহেন, আর দ্বিজধর্ম্মী বিশুদ্ধ চাষীকৈবর্ত্ত (মাহিষ্য) যাজন করিয়া বৈদিক ব্রাহ্মণগণ পতিত ?—ইহা অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয়। লাল-মোহন বিদ্যানিধি মহাশয় সম্বন্ধ-নির্ণয়ের ১৫৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন,—"কায়স্থের পুরোহিত ও নবশাখের পুরোহিত এক। যাঁহারা শূদ্র যাজক, শূদ্র শিষ্য রাখেন ও শূদ্রের দান গ্রহণ করেন, তাঁহারা বিশিষ্ট বংশসম্ভূত হইলেও অশূদ্রপ্রতিগ্রাহীর নিকট মর্য্যাদাসম্পন্ন নহেন, সামান্যকুল ব্যক্তির কথা সুদূর-পরাহত।"—সুতরাং কায়স্থ বা নবশাখ যাজী ব্রাহ্মণগণ অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী নৈকষ্য কুলীন ব্রাহ্মণের নিকট সমান মর্য্যাদা পাইবেন না।

অম্বষ্ঠ-দর্পণ প্রণেতা লিখিয়াছেন—"এমন কি বৈদ্যজাতি সমগ্র বাঙ্গালা দেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিলেও উক্ত ব্রাহ্মণগণ (মাহিষ্য যাজী) অজানিত অপরিচিত বৈদ্যজাতির পৌরহিত্য করিতে অসম্মত হন, সুতরাং আদিশূরের সময় পর্য্যন্ত বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি পুরোহিত-বিহীন ছিলেন। তখন আদিশূর অনন্যোপায় হইয়া কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলে অযাজ্য জাতির যাজন করিয়া পতিত হইয়াছেন বলিয়া, তাঁহাদের আত্মীয়েরা তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করেন। তখন তাঁহারা নিরুপায় হইয়া পুনরায় বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসিলেন। এবং অদ্যাবধি তাঁহারা পুরুষানুক্রমে বঙ্গদেশে বাস করিতে-ছেন। ইঁহারাই কুলীন, শ্রোত্রিয় ও গৌণ নামে খ্যাত। এই পতিত ব্রাহ্মণগণই বৈদ্য ও কায়স্থের পুরোহিত বা যাজক!"—"কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণ বহুকাল পর্য্যন্ত এই পতিত ব্রাহ্মণগণকে কন্যাদান করেন নাই। ইদানীং তাঁহারা জাতীয় গৌরব ত্যাগ করিয়া বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গদেশে মাত্র শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সহিত কন্যা আদান প্রদান করিতেছেন।"

উপরোক্ত উক্তি বৈদ্যকুলাবতংস অম্বষ্ঠ-দর্পণ প্রণেতার—এক্ষণে সত্য ও ন্যায়ের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া বিচার করিয়া বলুন,—মাহিষ্য-কৈবর্ত্তযাজী পতিত কি নবশাখযাজী পতিত ?

যে দিন বঙ্গীয় হিন্দু-সমাজ বঙ্গদেশীয় প্রাচীন রাজন্যকুলকে ও তদ্‌পুরোধা ব্রাহ্মণগণকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়াছেন, যে দিন আত্মম্ভরিতায় ও আভ্যন্তরিক হিংসাদ্বেষের ফলে ঘৃণার তরঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে, সেই দিন হইতে বাঙ্গালীর অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছে। সামাজিক অন্তর্বিগ্রহে বাঙ্গালী-জাতির হৃদয় হইতে বিশ্বপ্রেমের সার্ব্বজনীন মহানুভাবত দূরে পলায়ন

করিয়াছে—জাতীয় জীবন সমাজ-বিপ্লবের ভীম তরঙ্গাঘাতে দুর্ব্বল ও শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে।

ব্রহ্মোত্তর।—মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণ যে সকল ব্রহ্মোত্তর জমি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহার কয়েকটী এস্থলে উল্লিখিত হইতেছে—

(১) জেলা ২৪ পরগণার ডায়মণ্ডহারবারের অন্তর্গত মুড়াগাছার ক্ষত্রিয় জমিদার কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী, রঘুনাথ ও মনোহর রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক ৫৫॥৪ বিঘা জমি, উক্ত পরগণার মহিষগোঠ নিবাসী মহাদেব চক্রবর্ত্তী উত্থাসনী মহাশয়কে প্রদত্ত হয়। ১৭৭০ সালে ১৯শে মার্চ্চ তারিখে উইলিয়ম ইয়ং সাহেবের নং ৫৭৫ ছাড়ে অনুমোদিত। (২) ঐ মুড়াগাছার জমিদার কেশবচন্দ্র রায় চৌধুরী কর্ত্তৃক ডায়মণ্ডহারবার বাহাদুরপুর নিবাসী অযোধ্যারাম শর্ম্মা তস্যপুত্র হরিশচন্দ্র সর্ব্বভৌম মহাশয়গণকে প্রদত্ত। সন ১১৭৭ সালের ১২ই শ্রাবণ ইংরাজী ১৭৭০ ২৫শে জুলাই। ইয়ং সাহেবের ১৪৬৫ নং ছাড়ে অনুমোদিত, ছাড়ের নিম্ন অংশ ছিঁড়িয়া যাওয়ায় মোট জমির পরিমাণ বুঝা যায় নাই। উক্ত হরিশ্চন্দ্রের প্রপৌত্র বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য এক্ষণে ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত ধনবেড়ে গ্রামে বাস করিতেছেন ও ঐ ব্রহ্মোত্তরের কিয়দংশ আজও ভোগ করিতেছেন। (৩) নরোত্তম চক্রবর্ত্তী ঐরূপ ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন। অদ্যাপি তাঁহার প্রপৌত্র-পুত্র রামগোবিন্দ ও নগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী জেলা ২৪ পরগণা ফলতা থানার কোদালিয়া গ্রামে বাস করিতেছেন। ১১৯০ সালের জরিপী চিঠার ৩০০ দাগে ও ৩০২ দাগে এই ব্রহ্মোত্তরের কিয়দংশ জরিপ হইয়াছে। (৪) ১১৬৪ সালের ৭ই মাঘ তারিখে নদীয়ার মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কর্ত্তৃক কাটিয়ারা নিবাসী শ্রীকান্ত শর্ম্মাকে ১২/০ বিঘা। (৫) ১১৬১ সালের ১২ই চৈত্র তারিখে কাটিয়ারা নিবাসী রামজীবন শর্ম্মাকে উক্ত মহারাজ কর্ত্তৃক ৩/০ বিঘা। (৬) ১২৬৫ সালের ১৫ই শ্রাবণ তারিখে কালিপ্রসাদ দত্ত কর্ত্তৃক জয়কৃষ্ণ নগর নিবাসী দয়াল চাঁদ চক্রবর্ত্তীকে ২/১ বিঘা। (৭) ১৩০৫ সালের ২৩শে ভাদ্র তারিখে কলিকাতা, গড়পার, জগন্নাথ দত্ত লেনের বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্ত্তৃক বেণীমাধব চক্রবর্ত্তীকে বাটী সমেত /২/০ কাঠা। (৮) মণিখালী কৃষ্ণনগরের জমিদার কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বৈকুণ্ঠনাথ চক্রবর্ত্তীকে /৩ কাঠা। (৯) বর্দ্ধমান মহারাজ কর্ত্তৃক হাওড়া জগদ্বল্লভপুরবাসী রামতারণ চক্রবর্ত্তীকে ৮২।৶০ কাঠা, তায়দাদ নং ৩৩৬১২ হুগলী কালেক্টর। (১০) বর্দ্ধমান-মহারাজ তেজচন্দ্র

১২৫৫৮। (১১) বর্দ্ধমান-মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর কর্ত্তৃক হুগলী…বলরাম বাটীবাসী কার্ত্তিকচন্দ্র তর্কবাগীশকে ৬৪৷২ বিঘা, তায়দাদ নং ২০৬৮৫। (১২) ১১৬৪ সালে নদীয়া কৃষ্ণনগরের রাজা রামজীবন রায় কর্ত্তৃক লক্ষ্মীনারায়ণপুর নিবাসী রামনারায়ণ শর্ম্মাকে ১২/০ বিঘা। (১৩) মহিষাদলের কণোজ ব্রাহ্মণ রাজা আনন্দচন্দ্র উপাধ্যায় ও রাণী জানকী দেবী কর্ত্তৃক হাওড়া খোষালপুর নিবাসী রামকান্ত বিদ্যাভূষণকে ২০০/০ বিঘা, বর্ত্তমান দখলীকার যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। (১৪) বর্দ্ধমান-মহারাজ তেজচন্দ্র বাহাদুর কর্ত্তৃক উক্ত খোষালপুরের রামকান্ত বিদ্যাভূষণের পিতা গোবর্দ্ধন ভট্টাচার্য্যকে ১/০ বিঘা, বর্ত্তমান দখলীকার যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। (১৫) উক্ত তেজচন্দ্র বাহাদুর কর্ত্তৃক উক্ত রামকান্ত বিদ্যাভূষণকে ১৫৷৷০ বিঘা, বর্ত্তমান দখলীকার উক্ত যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। (১৬) বারুইপুরের কায়স্থ জমীদার রামচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক রাজপুর (২৪ পরগণা) নিবাসী শ্যামাচরণ চক্রবর্ত্তীকে ১১৪৬ সালে প্রদত্ত ।০ কাঠা, ১২২৯ সালে রিসিভার কর্ত্তৃক অনুমোদিত বর্ত্তমান দখলীকার অন্নদাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। (১৭) বারুইপুর কায়স্থ জমীদার কর্ত্তৃক বারুইপুর জয়কৃষ্ণনগর নিবাসী রামশঙ্কর চক্রবর্ত্তীকে ২/১ বিঘা ১২৬৫ সালে অনুমোদিত। (১৮) ২৪ পরগণা ভাঙ্গর পাইঘাটী নিবাসী বৈদ্যকুলজ দুর্গাপ্রসাদ সেন কর্ত্তৃক জয়কৃষ্ণনগরনিবাসী রামদুলাল ও রামরাম চক্রবর্ত্তীকে ১১৮৬ সালে ১৷৷০ বিঘা, বর্ত্তমান দখলীকার হরিপদ চক্রবর্ত্তী, বোদরা—২৪ পরগণা। ইত্যাদি।

চতুষ্পাঠী।—আষাঢ় মাসের মাহিষ্য-সমাজে কয়েকটী টোল ও অধ্যাপকের নাম প্রকাশিত হইয়াছে; এবারেও কয়েকটী তালিকা প্রদত্ত হইতেছে।—অধ্যাপনা ও অধ্যয়ন সদ্‌ব্রাহ্মণের ষট্‌কর্ম্মের অঙ্গীভূত।

১। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র শর্ম্মা—টোল—কাঁকুড়দা, মহিষাদল।
২। ,, ,, রামহরি তর্করত্ন ,, দুর্গাপুর, হাওড়া।
৩। ,, ,, দেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ,, বরদাবাড়, হাওড়া।
৪। ,, ,, নগেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি ,, সুপেবাড় হাওড়া।
৫। ,, ,, রামদেব ভট্টাচার্য্য ,, ডিঙ্গাখোলা ,,
৬। ,, ,, ঈশানচন্দ্র শিরোমণি ,, গোতলা ২৪ পরগণা।
৭। ,, ,, কেদারনাথ তর্কালঙ্কার ,, ,, ,,
৮। ,, ,, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য—ইটালী, বিক্রমপুর, ঐ

জাতীয় প্রতিষ্ঠিত দেবতার সেবাইত আছেন, এরূপ দৃষ্টান্ত আষাঢ় মাসের মাহিষ্য-সমাজে প্রদর্শিত হইয়াছে, এবারেও দুই একটী প্রদর্শিত হইতেছে ঃ—

(১) জেলা হাওড়ার অন্তর্গত মণ্ডলঘাট পরগণার কুশবেড়িয়া ৺বাণেশ্বর মহাদেবের সেবাইত শ্রীপ্রমথনাথ গোস্বামী। বর্দ্ধমান-মহারাজ, মহিষাদল-রাজ ও অন্যান্য জমিদার কর্ত্তৃক প্রদত্ত ৩০০/ বিঘা জমি দেবোত্তর আছে। (২) জেলা হাওড়ার অন্তর্গত থানা বাগনান, পূর্ণাল গ্রামের ৺ভীমকরকায়স্থ প্রতিষ্ঠিত পঞ্চানন্দ দেবের সেবাইত শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গোস্বামী। (৩) জেলা মেদিনীপুর ডিহি গুমাই গ্রামে ৺দক্ষিণাকালী মন্দিরের সেবাইত শিবনারায়ণ অধিকারী; মহিষাদলের রাজ প্রদত্ত দেবোত্তর আছে ও বার্ষিক বৃত্তি প্রদত্ত হইয়া থাকে। (৪) মেদিনীপুর জেলার ভবানীপুর গ্রামে ৺ঝিঙ্গলেশ্বরী পাষাণ মূর্ত্তির সেবাইত গৌড়াদ্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ, মহিষাদল-রাজ-প্রদত্ত দেবোত্তর আছে।

যে জাতি আর্য্য মাতাপিতার সন্তান, তাঁহাদের ধমনীতে যে পবিত্র আর্য্য-শোণিত প্রবাহিত হইতেছে, তাহার স্বতন্ত্র প্রমাণ প্রয়োগের আবশ্যক করে না। সেই প্রাচীন আর্য্যযুগের বেদমন্ত্রকৃৎ সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের বংশধরগণ যে, তাঁহাদের পবিত্রতা রক্ষা করিয়া আজও সদ্‌জাতির যাজন করিয়া আসিতেছেন, পবিত্র ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণোচিত গুণে বিভূষিত আছেন, অধ্যয়ন অধ্যাপনা দান প্রতিগ্রহ প্রভৃতি ষট্‌কর্ম্মে অবস্থিত রহিয়াছেন, তাহার প্রমাণ তাঁহাদেরই পবিত্রতা। মাহিষ্য জাতির পিতা ও মাতা উভয়েই দ্বিজাতি ও আর্য্য; সুতরাং তাঁহাদের সন্তানও দ্বিজাতি বা দ্বিজধর্ম্মী ও আর্য্য এবং সদ্-ব্রাহ্মণের যাজ্য। দ্বিজাতি বা দ্বিজধর্ম্মীর পুরোহিত ব্রাহ্মণ কখনই পতিত হইতে পারেন না। যজন যাজন ইত্যাদি ব্রাহ্মণের বৃত্তি আশ্রয় করিয়া যাজ্য জাতির যাজন করা ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম। সুতরাং মাহিষ্যযাজী সদ্‌ব্রাহ্মণ এবং মাহিষ্যজাতি সদ্‌ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক যাজিত।

গুপ্তেশ্বর মহাদেব।

বিহারের উত্তর-পশ্চিমাংশে সাহাবাদ (আরা) জেলার অন্তর্গত শশারাম মহকুমার দক্ষিণ দিক দিয়া ভারতবর্ষের মধ্যস্থিত যে বিন্ধ্যাচল-মালা প্রসারিত হইয়াছে, সেই গিরির নিম্নদেশে এক রমণীয় স্থানে বহুল আম্র, মহুয়া, কেন্দু, পিয়াল ও অন্য অন্য বৃহৎ বৃক্ষ সকলের অটবী আছে এবং তাহার মধ্য দিয়া

একটি অপ্রশস্ত প্রবাহিনী কুলকুল শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। এই স্থান বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের অসহ্য গ্রীষ্মের সময় বড়ই শীতল ও স্নিগ্ধ। এখানে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত শিবরাত্রি হইতে পরবর্ত্তী দুই অমাবস্যার সময় শিবরাত্রের উৎসব হয়—এবং তদুপলক্ষে অনেক সাধু সন্ন্যাসী এবং দেশীয় লোকের সমাগম হইয়া একটি ছোট রকমের মেলা হয় ও তাহা প্রত্যেকবারে দুই তিন দিন থাকে। এই মেলা-স্থানের সম্মুখে এক গিরি-গহ্বর আছে তাহার প্রবেশ দ্বার উচ্চতায় প্রায় ২০ ফুট হইবে এবং প্রসারেও সেই পরিমাণ। তাহার নিম্নভাগ সমতল। তথায় মেলার সময় নৃত্যগীত, প্রধানতঃ বাইজীর নাচ—যাহা বিহার অঞ্চলে প্রায় সকল উৎসবেই প্রচলিত—হইয়া থাকে। গহ্বরের সুড়ঙ্গ ক্রমান্বয়ে পর্ব্বত-মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। ইহার নিম্নদেশ কর্দ্দমে পরিপূর্ণ এবং উপর হইতে অহরহঃ টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়ে। গহ্বরের মুখের কিঞ্চিৎ দূরে গাঢ় অন্ধকার—যতদূর যাওয়া যায়, তাহার দৈর্ঘ্য প্রায় একচতুর্থ মাইল হইবে। ইহার মধ্য দিয়া সহজে চলিতে পারা যায় না। কোন একস্থানে উচ্চ ও সঙ্কীর্ণ তথায় দুইজন বসিয়া কষ্টে যাইতে পারে। এই সুড়ঙ্গের অপর প্রান্তে মহাদেবের মূর্ত্তি বিরাজমান আছেন। এই স্থানটি প্রকৃত গুপ্ত, এইজন্য মহাদেব 'গুপ্তেশ্বর' নামে খ্যাত। মূর্ত্তির চতুর্দ্দিকের স্থানটি কিঞ্চিৎ প্রশস্ত, কিন্তু সুড়ঙ্গের অপর অংশের ন্যায় অন্ধকারময়। এই স্থান দীপমালায় আলোকিত করা হয়—দেবতার ব্রাহ্মণ পুরোহিত নাই—পর্ব্বতবাসী খারওয়ার অসভ্যজাতীয় জনৈক লোক দেবতার উদ্দেশে প্রদত্ত পয়সা ও দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে। যাত্রীরা গিয়া মূর্ত্তিটীর নিকট প্রণাম করিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করে। প্রবাদ যে, কালাপাহাড় ও আরঙ্গজীব সব শিবলিঙ্গের অঙ্গ ভগ্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু এখানে তাহাদের সুদীর্ঘ হস্ত প্রসারিত করিতে পারে নাই। এইজন্য শিবলিঙ্গের মহত্ত্ব এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। গহ্বরে প্রবেশ করিবার সময় প্রত্যেক দলের একজন লোক একখণ্ড গুগ্‌গুল কাষ্ঠ জ্বালাইয়া লয়। এই কাষ্ঠ এইখানে অনেক পাওয়া যায়—তাহার আলোকে পথ প্রদর্শিত হয়। সঙ্কীর্ণ স্থানে অনেক লোকের জনতা প্রযুক্ত ভয় হয়—যেন নিশ্বাস রোধ হইবে। তথাকার লোকের বিশ্বাস যে, সুড়ঙ্গ কাশীধাম পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে; কিন্তু সুড়ঙ্গ দিয়া কেহ এ পর্য্যন্ত কাশী যাইতে চেষ্টা পায় নাই। মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ফিরিবার সময় আশঙ্কা হয় যে, যদি অপ্রসস্ত স্থানটী রুদ্ধ হইয়া গিয়া থাকে, তাহা হইলে আর বাহির হইতে পারিব না—এবং তথায় জীবন্তে সমাধি হইবে। মূর্ত্তি সচরাচর

উপরিভাগ দেখিলে, বোধ হয়, যেন পাঁচ ছয় শিবলিঙ্গ একত্র জড়িত হইয়া আছে। শিবলিঙ্গের উপরে সুড়ঙ্গের ছাদ হইতে ক্রমান্বয়ে টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়ে। অন্য শিবলিঙ্গের উপর চৈত্র বৈশাখ মাসে জল দিবার জন্য জলপূর্ণ কলস বান্ধিয়া রাখিতে হয়, কিন্তু এখানে সে কৃত্রিম উপায়ের দরকার নাই। এই জন্য পুরোহিত যাত্রীদিগকে বুঝাইয়া দেয় যে গুপ্তেশ্বর মহাদেব স্বর্গ হইতে তাঁহার জলশেচনের বন্দোবস্ত করিয়াছেন। মূর্ত্তিটী দেখিলে, বোধ হয়, ইহা একটি ষ্টালাকটাইট (stalactite) গুড়ঙ্গের উপরিভাগের পর্ব্বত হইতে অনবরত চূণ ও প্রস্তরাংশ জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া পড়াতে ষ্টালাকটাইট গঠিত হইয়াছে এবং তাহাই শিবলিঙ্গরূপ ধারণ করিয়াছে। সুড়ঙ্গের ছাদে অনেক ষ্টালাকটাইট লম্বিত আছে দেখিতে পাওয়া যায়। গুড়ঙ্গটি মনুষ্যকৃত কি স্বাভাবিক তাহা আলোর অভাবে ঠিক করিতে পারা যায় না—সম্ভব স্বাভাবিক। কিন্তু সুড়ঙ্গের মুখ মনুষ্যে প্রস্তুত করিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। গুপ্তেশ্বর মহাদেব দর্শনে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাস ভিন্ন অন্য সময়ে যাওয়া একরূপ অসাধ্য; কারণ অন্য সময়ে গহ্বর জলে পূর্ণ থাকে এবং কোন লোকও তথায় থাকে না, নিকটে পল্লীও নাই। গহ্বরের নিকট দুইধারে বৃক্ষমণ্ডিত পর্ব্বত এবং সম্মুখে কিঞ্চিৎ নিম্নে কল্লোলিনী গিরি-নির্ঝরিণী প্রবাহিতা। এই স্থানে উপস্থিত হইলে মনে হয়—যেন পৃথিবীর বাহিরে আসিয়াছি এবং মহান্ পুরুষের সম্মুখে উপস্থিত হইতে যাইতেছি—এখানে ঈশ্বর বিশ্বাসী মাত্রেই তাঁহাকে মনে না করিয়া থাকিতে পারে না। এই স্থানটি দেখিবার যোগ্য কিন্তু এখানে যাওয়া কষ্টসাধ্য। ইহা গয়া—মোগলসরাই লাইনের শশারাম কিম্বা কুদ্রা ষ্টেশন হইতে ৯।১০ ক্রোশ হইবে। একায় কিছুদুর যাওয়া যায়, তৎপর পদব্রজে পাল্কী হস্তী কিম্বা অশ্বে যাইতে হয়।

শ্রীবজ্রেশ্বর বিশ্বাস—আরেরিয়া, পূর্ণিয়া।

শাসন।

[একটী দশবছরের বালিকা এবং একটী আট বছরের বালকের কথোপকথন শ্রবণে লিখিত।]

অমিয় কহিল ভাইটীরে তার স্নেহমাখা রোষভরে,—
"ওরে হতভাগা, লেখাপড়া ফেলে' এখনি যে এলি ঘরে?"
তিরস্কারে ভীত নম্র হ'য়ে জিতেন সবিনয়ে হাসি' কয়,—

একথা শুনিয়া　　অমিয় জিতুর,　　কাণে ধরি কহে কড়া,—
"রেখে দে জেঠামি 'শিখিয়াছি সব!　　সোজা বুঝি লেখাপড়া ?'
দেখ দেখি বাবা　　কত জানে শোনে　　কয়টা দিয়াছে পাশ ;
তবু রাত দিন　　বই নিয়ে থাকে,　　পড়িয়ে মিটে না আশ।
মনে বুঝি নাই　　সে দিন যে বাবা　　বুঝালেন কত ক'রে—
লেখাপড়া সম　　কঠিন কিছুই　　নাহিকো এ ধরা'পরে।
যতদিন বাঁচি　　ততদিন শিখি,　　শিক্ষার কি আছে শেষ ?
কি মুখে বলিস্　　'শিখিয়াছি সব'　　বিদ্যা তোর হবে বেশ!!"
দিদির বচনে　　না দিয়ে উত্তর　　জিতু যেয়ে পাঠঘরে,
নূতন পুরাণ　　পাঠ পুনঃ পুনঃ　　মনযোগ সহ পড়ে।

শ্রীমতী সুভাষিণী রায়—নান্নার, ঢাকা।

সাভার।

(১৩১৯ আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত)

(ধামরাই ও সুয়াপুর হইতে ৩।৪ ক্রোশ দূরে ধলেশ্বরীর রক্তবর্ণ প্রাকারাকার প্রায় ক্রোশব্যাপক তীরদেশ আশ্রয় করিয়া সাভার গ্রাম অবস্থিত।) এখানে ধলেশ্বরীর ভৈরবীমূর্ত্তি পদ্মাকেও পরাস্ত করিয়াছে। ঝড় থাকুক বা না থাকুক এই নদীতে উত্তাল তরঙ্গের বিরাম নাই। কিন্তু সাভারের রক্তবর্ণ ও সুদৃঢ় তীর তরঙ্গের এই উৎকট আঘাত সহ্য করিয়া অটুট রহিয়াছে। এই সুরঞ্জিত উচ্চ তটভূমির উপর গুবাক ও নারিকেল বৃক্ষের পঙ্ক্তি সূর্য্যাস্তের প্রভায় বড় সুন্দর দেখায়; সমস্ত দৃশ্যটী যেন চিত্রাঙ্কিত বলিয়া মনে হয়। সাভারের মতন প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বোধ হয় বঙ্গদেশের আর কোথাও নাই। সুপ্রসার নদীতীরে অবস্থিত এই পল্লী স্বভাবতঃই যেন বাণিজ্যের কেন্দ্রভূমি হইবার যোগ্য। প্রকৃতি যেন স্বয়ং রাজরাণীর সিন্দুর ইহার ললাটে পরাইয়া দিয়াছেন। দূর হইতে এই স্থান সিন্দুরমণ্ডিত বলিয়া ভুল হয়। সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজার কোটবাড়ীর অর্থাৎ দুর্গের ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। এই হরিশ্চন্দ্রের দুই কন্যা অদুনা ও পদুনাকে পটিকানগরের রাজা বিখ্যাত গোবিন্দ চন্দ্র (গোপীচন্দ্র) বিবাহ করেন।* ইঁহারা খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে

* See Martin's Eastern India.

বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেছিলেন। যে অদুনা পদুনার নাম এক সময়ে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ভাট, যোগী ও চারণগণের গাথায় প্রচারিত হইত, সে দিনও বোম্বাই হইতে যাঁহাদের চিত্র রবিবর্ম্মা অঙ্কন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যে যে বঙ্গীয় রাজা ও তাঁহার মহিষীদের করুণ-প্রসঙ্গ লইয়া এখনও নাটক রচিত ও অভিনীত হইয়া থাকে, এবং উত্তরপশ্চিমে লক্ষ্মণদাসপ্রমুখ বহুসংখ্যক কবি যাঁহাদের গুণগাথা গাহিয়াছেন, এবং যাঁহাদের সম্বন্ধীয় গীতি এক সময়ে বাঙ্গলাদেশ ও উড়িষ্যার ঘরে ঘরে শ্রুত হইত, সেই গোপীচন্দ্র ও তাঁহার মহিষীদ্বয়ের প্রেম-মিলন এই সাভারেই হইয়াছিল। এই স্থানের রক্তবর্ণ ধূলিতে এক সময়ে অদুনা ও পদুনা বাল্য-ক্রীড়া করিতেন। হরিশ্চন্দ্র রাজা রঙ্গপুরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাঁকে অনেকে হরিশপাল বলিয়া জানেন। হরিশ্চন্দ্রের সমাধি এখনও বিদ্যমান। অদুনা ও পদুনার ন্যায় রূপবতী তখন ভারতবর্ষে আর কেহই ছিলেন না। আশ্চর্য্যের বিষয়, ইহাঁদের পুত্র হবচন্দ্র নির্বুদ্ধিতার জন্য প্রবাদস্থানীয় হইয়া আছেন। সাভারে হরিশ্চন্দ্র পালের বাড়ী ছাড়াইয়া আরও উত্তরে শিশুপালের বাড়ী। ধামরাই হইতে ৬।৭ মাইল দূরে যশোপালের রাজধানী মাধবপুর, এখন গাজীবাড়ীতে পরিণত হইয়াছে। আরও উত্তরে কামদেব নামক রাজা রাজত্ব করিতেন। পালবংশের ধ্বংসের পর এই স্থানে চণ্ডালজাতীয় প্রতাপ ও প্রসন্ননামক ভ্রাতৃদ্বয় কতকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মহাপ্রতাপশালিনী ভগিনীর নাম ছিল যোগ্‌গী। সাভারে এখনও "থাইডা ডোস্কা" নামক রাজার নাম শোনা যায়। কলিকাতা, সিমলা, ১৬ নং সাগর ধর লেন নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, এই "থাইডা ডোস্কা" রাজার সম্বন্ধে ভাটের গান সংগ্রহ করিয়াছেন। তাহাতে তিনি "কায়েৎ" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু জনশ্রুতি ও নাম পর্য্যালোচনায় ইনি যে তিব্বতদেশীয় ছিলেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ নাই। "থাইডা ডোস্কা" কায়স্থ জাতির সঙ্গে মিশিয়া যাইতে চাহিয়াছিলেন—ভাট-পরিচয়ে ইহাই প্রতিপন্ন হয়। ভাওয়াল ও চন্দ্রপ্রতাপের ইতিহাস বিক্রমপুরের ইতিহাস হইতেও প্রাচীনতর। যেখানে সেনরাজারা রাজত্ব করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তাঁহাদের কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও বিদ্যমান। কিন্তু তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজগণের কীর্ত্তি অধিকাংশই ভূপ্রোথিত হইয়া গিয়াছে। ভাওয়াল চন্দ্রপ্রতাপ পরগণার বহুসংখ্যক স্তূপের ভগ্নাবশেষ, পুষ্করিণী, দুর্গ ও গড়-খাইয়ের চিহ্ন প্রাচীনতর রাজকুলের কীর্ত্তিগাথা মৌনভাবে প্রচার করিতেছে। পালরাজগণ কোন্-

জাতীয় ছিলেন বলা যায় না। তাঁহারা যে জাতীয় থাকুন না কেন, পরে যে ইহাঁরা রাজবংশী ও কোচগণের সঙ্গে স্থানে স্থানে মিশিয়া গিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।• সাভারের হরিশ্চন্দ্র পালের বংশধর ভারতচন্দ্র রায় এখন নিকটবর্ত্তী কোণ্ডাগ্রামে বাস করিতেছেন। ইহাঁরা মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াসী। ভাওয়ালের কাপাসিয়া খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে জগৎপ্রসিদ্ধ মস্‌লিনবস্ত্রের জন্মভূমি ছিল। যে রাজগণ এই বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন, তাঁহাদের রাজধানীর চিহ্ন ভাওয়াল ও চন্দ্রপ্রতাপের সর্ব্বত্র পড়িয়া আছে। "বায়ান্ন বাজার ও তিপ্পান্ন গলি"-যুক্ত প্রাচীন "বাঙ্গলা" নামক নগর সম্ভবতঃ ইহাদের অন্যতম রাজধানী ছিল। এখনও ঢাকার "বাঙ্গলা" বাজার সেই লুপ্ত রাজধানীর নাম বহন করিতেছে। হে পূর্ব্ববঙ্গের শিক্ষিত যুবক, একবার সচেষ্ট হইয়া এই প্রদেশের পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধান কর। যে সকল সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ও বিলয় হইয়াছে, তাহাদের গৌরবের শেষ শিখা তোমারও ললাট স্পর্শ করিতেছে, বুঝিতে পারিবে। ইতিহাসের মৌন ভারতী অনেক সাধ্য সাধনায় তোমার সহিত কথা কহিবেন; তখন বুঝিবে, তুমি যে স্থানকে নগণ্য ভাবিয়া উপেক্ষা করিতেছ, তাহা এক সময়ে পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী বীর, সমুদ্রযাত্রী নাবিক ও শত শত জগদ্‌বিহারী বণিকের লীলাক্ষেত্র ছিল; সেখানে জগদ্‌গুরু ধর্ম্মপ্রচারকগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং অপূর্ব্ব আত্মোৎসর্গের কথা প্রতি ধূলিরেণুতে অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন।"

"ঢাকাজেলার কয়েকটী প্রাচীন স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধ—শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

মাহিষ্য-সমাজের ১৩১৮ চৈত্র সংখ্যায় "সর্ব্বেশ্বর নগরের রাজা হরিশ্চন্দ্র ও তদ্‌বংশীয়গণ" শীর্ষক প্রবন্ধে এই সাভারের রাজা হরিশ্চন্দ্রের বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। দীনেশবাবু রাজা হরিশ্চন্দ্রকে হরিশ পাল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং তিনি কোন্ জাতীয় ছিলেন তাহা ঠিক করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার বংশধর ভারতচন্দ্র রায় এখনও বিদ্যমান এবং "তাঁহারা মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় দিতে প্রয়াসী"—এই বলিয়া একটু শ্লেষ করিয়াছেন। গৌড়রাজমালার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন—"এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগ আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে।" মাহিষ্য-সম্রাট্‌গণের চেষ্টায় যে সকল সাম্রাজ্যের উৎপত্তি ও বিলয় হইয়াছে, তাহাদের গৌরবের শেষশিখা এখনও বাঙ্গালীর ললাট স্পর্শ করিতেছে! ইতিহাসের মৌন ভারতী তাহা অস্ফুট তানে গান করিতেছে!! পুরাতত্ত্বের অনুসন্ধানে সেই সকল গৌরবময় ঐতিহাসিক চিত্র উদ্‌ঘাটিত হইলে দীনেশবাবুর ন্যায় সাহিত্যিক তাহা অনুকূলচক্ষে সন্দর্শন করিবেন কি?—মা, স, সম্পাদক।

পাশের খবর।

(পূর্ব্বপ্রকাশের পর)

গোপীমোহন চক্রবর্ত্তী—ম্যাট্রিকুলেশন [গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ]

মেট্রিকুলেশন।—পূর্ণচন্দ্র বিশ্বাস—আমলা সদরপুর [প্রেসিডেন্সী বিভাগের সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া ১৫৲ টাকা মাসিক বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন]। কালীপদ বিশ্বাস—সিকারপুর। তারাপদ বিশ্বাস—শিবনিবাস। উপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস—শিকারপুর। যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী—খাগড়া। উপেন্দ্র নাথ বিশ্বাস—চট্টগ্রাম। মণীন্দ্রনাথ বিশ্বাস—সিকারপুর, যতীন্দ্রনাথ ভৌমিক ঐ। নরেন্দ্রনাথ সরকার চট্টগ্রাম। **আই-এ, ও আই-এস্-সি**।—গৌরসুন্দর বিশ্বাস—কৃষ্ণনাথ কলেজ, পঞ্চানন তরফদার ঐ, নরেন্দ্র নাথ সরকার—ঐ। কালীপদ বিশ্বাস—দৌলতপুর। ব্রজগোপাল বিশ্বাস—কৃষ্ণনগর। **বি-এস্-সি**।—প্রমথ নাথ শিকদার—কৃষ্ণনাথ কলেজ বহরমপুর।

পক্ষাশৌচ সংবাদ।—(১) মেদিনীপুর জেলার গোবর্দ্ধনপুর নিবাসী শ্রীসুবলচন্দ্র মাইতির স্ত্রীর আদ্যশ্রাদ্ধ। (২) ঐ জেলার কুমড়িয়াবাড়ী শ্রীসূর্য্যনারায়ণ সামন্ত—জননাশৌচ। (৩) ঐ গ্রামের রুদ্রনারায়ণ গায়েনের ভ্রাতৃ-পুত্রের জননাশৌচ। (৪) রঘুনাথচক মৌজার কমলাকান্ত বেরার ভ্রাতার আদ্যশ্রাদ্ধ—২৭শে চৈত্র ১৩১৮। (৫) কসবা মৌজার শিবপ্রসাদ দাসের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ ৩০শে চৈত্র ১৩১৮। (৬) কেশাদীঘী মৌজার রামপ্রসাদ মাইতির আদ্যশ্রাদ্ধ—৭ই বৈশাখ। (৭) দক্ষিণ বাত্রন্দা মৌজার গৌরহরি মাইতির পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ—১৪ই বৈশাখ। (৮) পাথরবেড়ে মৌজার লক্ষ্মীনারায়ণ গিরির পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ—১১ই আষাঢ়। (৯) আঙ্গারবেড়ে মৌজার গদাধর সাঁতারার পত্নীর আদ্যশ্রাদ্ধ—১১ই আষাঢ়। (১০) কেশবচক গ্রামের শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনারায়ণ পাত্রের মাতৃশ্রাদ্ধ—২৩শে জ্যৈষ্ঠ। (১১) গোবিন্দনগর নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভৌমিকের মাতৃশ্রাদ্ধ—২৫শে বৈশাখ। (১২) জেলা যশোহর বনগ্রাম কুলপালা গ্রামে চাকদহ নিবাসী শ্রীযুক্ত শ্রীহরিভূষণ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আগ্রহে ও ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত তুটচরণ মণ্ডলের পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ—২রা আষাঢ় (১৩) জেলা হাওড়া শ্যামপুর থানার অন্তর্গত গাজনকোল গ্রামের মহেশচন্দ্র জানার শ্রাদ্ধ। (১৪) গাজনকোল গ্রামে দুই তিনটী জননাশৌচ (১৫) ঐ গ্রামের গোবিন্দজানার মাতৃশ্রাদ্ধ ১লা শ্রাবণ (১৬) জেলা হাওড়া গঙ্গাধরপুর পোষ্ট দেউলপুর নিবাসী শ্যামচরণ গলুই মহাশয়ের উদ্যোগে এবং শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত অন্নদাচরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়দিগের ব্যবস্থানুসারে শ্রীযুক্ত নিবারণ চন্দ্র হালদারের মাতৃশ্রাদ্ধ।

মন্তব্য।—মাসাশৌচধারী ও পক্ষাশৌচধারী উভয়মতাবলম্বীর মধ্যে যেন কোন বিশৃঙ্খলা বা মনোমালিন্য না ঘটে। তাহাতে সমাজের অনিষ্ট প্রবক্তাবী। মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবেন

মেদিনীপুর মাহিষ্য-অনাথ ভাণ্ডার —মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত সারদাবসান নিবাসী কবিরাজ শ্রীকৃত্তিবাস দাস গোস্বামী, সুজাগঞ্জবাসী মোক্তার শ্রীপ্রবোধচন্দ্র চৌধুরী ও মেদিনীপুর রেলওয়ে ষ্টেশনের শ্রীশশিভূষণ ভুঞ্যা মহাশয়গণের উদ্যোগে দরিদ্র অসহায় মাহিষ্য ছাত্রগণের বিদ্যাশিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য এই অনাথ ভাণ্ডার স্থাপিত হইয়াছে। উদারচেতা মাহিষ্য ভ্রাতৃগণের সাহায্য ও সহানুভূতি প্রার্থনীয়। মাহিষ্য-প্রধান বঙ্গদেশে, বিশেষতঃ মেদিনীপুরে, অসংখ্য মাহিষ্য বাস করেন, প্রত্যেকে যদি এই অনাথ-ভাণ্ডারে বার্ষিক ৫ এক পয়সা করিয়াও সাহায্য করেন তাহা হইলে অনেকগুলি মাহিষ্য বালকের বিদ্যাশিক্ষার উপায় হয়। অনাথ-ভাণ্ডারে সামান্য মুষ্টি-ভিক্ষাও গৃহীত হইবে। যাহার যেমন অবস্থা তিনি এই অনাথ ভাণ্ডারে যৎসামান্য দান করিয়া পুণ্য অর্জ্জন করিতে পারেন। ভিক্ষার টাকা, পয়সা, মুষ্টিভিক্ষা, ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাসিক বা বার্ষিক হিসাবে ডাকের টিকিট সংযোগে মণিঅর্ডার দ্বারা বা কোন উপায়ে পাঠাইতে পারেন। এই অনাথ ভাণ্ডারের কার্য্য পরিচালন জন্য একটী কার্য্য নির্ব্বাহক সভা সংগঠিত হইয়াছে। এই ভাণ্ডারের কার্য্যালয় মেদিনীপুর সহরে, মেদিনীপুরের জজ কোর্টের প্রখ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মাইতি বি-এল্ সভাপতি এবং জমিদার শ্রীযুক্ত আশুতোষ ভুঞ্যা সহকারী সভাপতি, উকীল শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দাস বি-এল্ মহাশয় সম্পাদক উকীল শ্রীযুক্ত প্রতাপ চন্দ্র মণ্ডল বি-এল্ মহাশয় কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছেন। এই ভাণ্ডার হইতে প্রায় ১১/১২ জন ছাত্র সাহায্যপ্রাপ্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। আশা করা যায়, সমধিক সাহায্য ও উৎসাহ প্রাপ্ত হইলে আগামী বৎসরে এই অনাথ ভাণ্ডারের কার্য্য নির্ব্বাহক সভা আরও অধিক সংখ্যক বালকের বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে সমর্থ হইবেন।—কলিকাতার সারস্বত-ভাণ্ডারের কার্য্য কি প্রস্তাবেই পর্য্যবসিত হইবে? মফস্বলে মহকুমায় মহকুমায় মেদিনীপুর মাহিষ্য-অনাথ-ভাণ্ডারের ন্যায় অনুষ্ঠান হইলে ও প্রত্যেক ভাণ্ডার হইতে সারস্বত-ভাণ্ডারের সাহায্য আসিলে দরিদ্র মাহিষ্য ছাত্রগণের উচ্চ-শিক্ষার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে। মাহিষ্য-ধনকুবেরগণ কি এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করিবেন?

আর্য্য-প্রভা।—পণ্ডিত ভগবতী চরণ প্রধান সঙ্কলিত। মূল্য ১৲ এক টাকা। ইহাতে মাহিষ্য কৈবর্ত্ত জাতির অনেক নূতন তত্ত্ব আছে।

দেশের সম্রাট ও বিখ্যাত বিখ্যাত ব্যক্তিগণের অভিমত। **মাহিষ্য রাজবংশের ইতিহাস**—মেদিনীপুর, যশোহর, নদীয়া, ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলার মাহিষ্য রাজবংশের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে; সম্রাট দরায়ুস, সেকেন্দার, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক, গ্রীক ও চীন দেশীয় পরিব্রাজকগণ কর্ত্তৃক মাহিষ্য-প্রশংসা (২৫০০ হাজার বৎসর পূর্ব্বের বিবরণ); মাহিষ্য-জাতির সামাজিক সম্মান কিরূপ দেখাইবার জন্য সর্ব্বজাতির উৎপত্তি বিবরণ ও বৃত্তি (জাতিমালা) প্রদত্ত হইয়াছে। আরও অনেক বিষয় অখণ্ডনীয় শাস্ত্রীয় ও ঐতিহাসিক প্রমাণ দ্বারা বিস্তৃতরূপে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত—মাহিষ্য-জাতির চারি হাজার (৪০০০) বৎসরের ঐতিহাসিক বিবরণ। মাহিষ্য রাজার বঙ্গদেশে রাজত্ব স্থাপন, উড়িষ্যা জয় ও শ্রীশ্রী৺জগন্নাথ দেবের বিশাল মন্দির নির্ম্মাণ; মাহিষ্য বীরগণের দিগ্বিজয়ে যাত্রা ও ভারতের নানাস্থানে রাজত্বস্থাপন, অর্ণবপোতে সমুদ্রযাত্রা ও নানা দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন, সমরক্ষেত্রে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ; **অশ্বপৃষ্ঠে মাহিষ্য-বীরাঙ্গনার লোমহর্ষণ অপূর্ব্ব সমর** ও মাহিষ্য সেনাপতি মহাবীর মোহনলাল প্রভৃতি যোদ্ধৃগণের রণভূমে সিংহনাদ ও ক্ষত্রিয়োচিত অদ্ভুত শৌর্য্যবীর্য্যের শত শত পরিচয় ও গৌরব কাহিনী পাঠ করিয়া পাঠক বিস্মিত ও চমকিত হইবেন। অতীত কীর্ত্তির শত শত জ্বলন্ত চিত্র দেখিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইবেন। অতীত ও বর্ত্তমান অবস্থার তুলনা করিতে পারিবেন। স্বার্থপর ও হিংসাপরায়ণ ব্যক্তিগণের সর্ব্বপ্রকার তর্কের উত্তর দিতে সমর্থ হইবেন।

পণ্ডিতগণের বিচার—মাহিষ্য-জাতি হালিক কৈবর্ত্ত কি না ও মাহিষ্য জাতির অশৌচ সম্বন্ধে দেড়শত বৎসর হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ছয় সহস্রাধিক নিখিল-শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিতের চূড়ান্ত বিচার ও মীমাংসা সম্বলিত ৪৪টি ব্যবস্থা পত্রের অনুলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাদ্বারা মাহিষ্য কি প্রকার জাতি এ সম্বন্ধে সুন্দর মীমাংসা দেখিতে পাইবেন।

বিশেষ কথা,—পাঠকগণ এক্ষণে বিবেচনা করিয়া দেখুন, ৮০ বার আনা মাত্র মূল্যে আপনি জাতিতত্ত্বের কি প্রকার একখানি পুস্তক পাইতেছেন। এক এক খানি ব্যবস্থাপত্র সংগ্রহ করা কিরূপ কষ্টসাধ্য বিবেচনা করুন। আপনি বাড়ীতে বসিয়া এইরূপ ৪৪ খানি ব্যবস্থাপত্রের সার মর্ম্ম পাঠ করিবার সুযোগ পাইবেন। পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত সারগর্ভ বিষয়ে পূর্ণ দেখিলে প্রত্যয় হইবে। সংবাদপত্র ও বিখ্যাত বিখ্যাত পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রশংসিত।

মাহিষ্য পাঠকগণ! সামান্য অর্থ ব্যয় করিয়া স্বজাতি-তত্ত্ব জানিবার জন্য চেষ্টিত হউন। আপনারা সকলে সামান্য অর্থের মায়া পরিত্যাগ না করিলে জাতীয় তথ্য কিরূপে প্রচারিত হইবে?—পত্র লিখিলে ভিঃ পিঃতে পুস্তক প্রাঠান হয়।

প্রাপ্তিস্থান—শ্রীআশুতোষ জানা, বিরুলিয়া, হাঁড়িয়া পোঃ, মেদিনীপুর।

মাহিষ্য-সমাজ।

২য় ভাগ, ৫ম সংখ্যা—ভাদ্র, ১৩১৯।

আত্মবিস্মৃত ব্রাহ্মণ।

এখন আর আমাদের সমাজ নাই। কালস্রোতে ব্রাহ্মণ্য লুপ্ত হওয়ায় সমাজ অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমীর শ্রেষ্ঠবর্ণ, রাজ্যের মঙ্গলকামী ব্রাহ্মণ বেদবুদ্ধি-বিরহিত হইয়া উপহাসের পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন। সমাজ তাঁহার কথা অবনত মস্তকে মানিতে চাহিতেছে না। ব্রাহ্মণও যেন আজ একটা কিম্ভূতকিমাকার জীব বিশেষ হইয়াছেন। তাঁহার না আছে ধর্ম্মজ্ঞান, না আছে কর্ম্মানুষ্ঠান, না আছে পূর্ব্বস্মৃতি। ব্রাহ্মণ বুঝিতে পারিয়াছেন যে, তাঁহার অধঃপতন ঘটিয়াছে। ব্রাহ্মণ-সন্তান আর বেদপাঠে মনসংযোগ করেন না; বেদান্তে বিশ্বাস করেন না। তাঁহার সেই পুণ্যাশ্রয় গুরুগৃহ নাই। যে ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ-তারার উপর আধিপত্য করিতে পারিতেন, যে ব্রহ্মচর্য্য বলে স্বর্গের দেবতা ব্রাহ্মণের আজ্ঞাকারী হইয়া থাকিতেন, সেই ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হইয়া বেদমাতা গায়ত্রীর অপমান করিতেছেন। তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি শম-দম-তিতিক্ষার অধিকারী নহেন—আছে কেবল তাঁহার মিথ্যা জাত্যাভিমান। তাঁহার সব গিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়াছে, কর্ম্ম গিয়াছে, নিষ্ঠা গিয়াছে, তপ গিয়াছে—আছে কেবল বনিয়াদির অভিমান। প্রশ্ন হইতে পারে যে, সনাতন ধর্ম্মরক্ষা রাজা নাই, ব্রাহ্মণ্য রক্ষা করে কে? উত্তর—স্বয়ম্ভু সনাতন ধর্ম্ম আপনিই আপনাতে সতত সুপ্রতিষ্ঠিত রহিয়াছেন। কত যুগযুগান্তর কত বিপ্লব কত অত্যাচার ইহার উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে। বৌদ্ধের আক্রমণেই সনাতন ধর্ম্মমন্দির ভিত্তিশুদ্ধ নড়িয়া উঠে। ভ্রষ্টকারী বৌদ্ধগণই মন্দির-প্রাচীর হিমাচল ভূমসাৎ করিয়া ম্লেচ্ছাক্রমণ এবং প্রবেশপথ সহজ করিয়া দেয়। খ্রীষ্টান অথবা মুসলমান বৌদ্ধেরই রূপান্তর। সনাতন বর্ণাশ্রম দুর্গের প্রাকার বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যে ভগ্ন হইলে মুসলমানগণ ধর্ম্মতরবারী হস্তে দুর্গ সমভূমি করিয়া দেয়, দেবমন্দিরের ইষ্টদেবতা মুসলমানগণের লগুড়াঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়াছে, ধনরত্ন অপহৃত হইয়াছে, দেবমন্দিরের প্রস্তর-

গুলি মসজিদ গঠনের উপকরণ হইয়াছিল। এই দুরবস্থার সময় যদি ইংরাজ আসিয়া ভারতের কর্ণধার না হইতেন, তাহা হইলে সনাতন আর্য্যধর্ম্মের চিহ্ন তীর্থগুলি ভারত হইতে বিলুপ্ত হইত। আজও ব্রাহ্মণ-কুমার শিখাসূত্র (যজ্ঞোপবীত) পরিত্যাগ করেন নাই। যুগ যুগান্তের সেই উপলক্ষণ এখনও ঐ দেহে জন্মান্তরে ফুটিয়া উঠিতেছে। ব্রাহ্মণ্য শিখাসূত্রে অবস্থান করে না বটে, তথাপি উহা বড় আদরের। ঐ চিহ্ন ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণ নিয়ত স্মরণ করেন যে, তিনি আর্য্যজাতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুকুটমণি। অনাদি অনন্তকাল হইতে ঐ সূত্র-রেখা অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে। উহাতে বিজ্ঞান দর্শন থাকুক আর নাই থাকুক, উহা বহু পুরাতন। উহাতে কুসংস্কার সুসংস্কার যাহাই থাকুক না কেন উহা ব্রাহ্মণের অতীত গৌরবের স্মৃতি শিখা, উহা ব্রাহ্মণের, আর কাহারও নয়। অতীতের এমন জাজ্বল্যমান স্মৃতি স্মরণ করিয়া প্রকৃত ব্রাহ্মণ্য জাগরিত করিতে না পারিলে কিছুই হইবে না। বক্তৃতা করতালিতে সমাজ জ্ঞানধর্ম্মে উন্নত হইবে না।

ধর্ম্মকর্ম্ম-শৌচাচার-বিহীন আত্মবিস্মৃত ব্রাহ্মণ! আপনি যে জগদ্‌গুরু ছিলেন? এখনও কি আপনার সম্মান অল্প। আপনার সকল গিয়াছে, শুধু নাম পড়িয়া রহিয়াছে; ভাব চলিয়া গিয়াছে, শুধু ভাষা পড়িয়া আছে; আর অমৃত-প্রসবিনী নদীর জল শুকাইয়া গিয়াছে, বালুকারাশি ধূধূ করিতেছে আপনার তপজপ ব্রহ্মতেজ গিয়াছে—কেবল শিখাসূত্র আছে। এত গিয়াছে, তথাপি সামান্য কুটীর হইতে রাজরাজেশ্বরের অট্টালিকা পর্য্যন্ত ব্রহ্মতেজের স্বপ্নবৎ অনুভূতিতে কম্পিত হয়। আজ ব্রাহ্মণ-বংশধরগণ পাচক সাজিয়া হোটেলে অন্নবিক্রয় করিতেছেন, কেরাণী হইয়াছেন, মুটে মজুর কুলী প্রভৃতি কোনটীই বাকী নাই। অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী ইত্যাদি বলিয়া অনেকে অহঙ্কার করিয়া থাকেন। সাক্ষাৎ ভাবে শূদ্রের কোন দান গ্রহণ করেন না বটে, কিন্তু অন্য নিন্দনীয় বৃত্তি অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত নহেন, তথাপি তাঁহারা সমাজের শ্রেষ্ঠ বলিয়া অহঙ্কার করিয়া থাকেন। কৈ সে আপনার স্বার্থত্যাগ? যাহার জন্য ভারত আপনার উদার হৃদয়ের পূজা করিবে, আপনার আদর্শে পরিচালিত হইবে, আপনার আদেশ অবনত মস্তকে পালন করিবে। আপনি নিজে নিন্দনীয় কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া, অশাস্ত্রীয় কার্য্যে নিয়ত রত থাকিয়া, শাস্ত্রাদেশ প্রচার করিতে যাইলে কে আপনার কথা শুনিবে? আপনার মন সঙ্কীর্ণ হইয়াছে, সমাজে যাহার যাহা ন্যায্য প্রাপ্য আপনি

দেশ উৎসন্ন গিয়াছে, ইংরাজের দোষে নহে। ইংরাজরাজ ব্রহ্মগায়ত্রী সাধনা করিতে নিষেধ করেন নাই। ভারতের বহুভাগ্যফলে ইংরাজ দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছেন, নতুবা এতদিন ভারতের ভাগ্যে কি হইত বলা যায় না।

ব্রাহ্মণ! আপনার স্বধর্ম-নিরত ব্রহ্মচারী পূর্ব্বপুরুষগণের কণ্ঠ-নিঃসৃত বেদধ্বনি আজও ভারতের বাতাসে আকাশে ধ্বনিত হইতেছে; হিমাচল বিন্ধ্যাচল তাহার প্রতিধ্বনি করিতেছে, সমুদ্রমেখলা আজও সেই সামগীতি অব্যাহত গতিতে জননী জন্মভূমি কর্ম্মভূমি ভারতের পায়ে গাহিয়া গাহিয়া যাইতেছে। ভূদেবগণ! বিদ্বেষবুদ্ধি পরিহার করুন, সাম্প্রদায়িক দ্বেষ-হিংসার অগ্নিতে ফুৎকার প্রদান করিয়া সোণার বাঙ্গলা শ্মশানে পরিণত করিবেন না, চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রম-ধর্ম্মের উন্নতিতে বাধা প্রদান করিবেন না। দেখিতেছেন না, বঙ্গের সমস্ত সম্প্রদায় নিজ নিজ দলের সংস্কার ও উন্নতি বিধানে মনঃসংযোগ করিয়াছে, এই সময়ে আপনারা শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করিয়া সাধারণকে বিপথে চালিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। যদি কোন সমাজ তাহার হারান ধন ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব লাভের চেষ্টা করে, অমনি ব্রাহ্মণ খড়্গহস্ত। ব্রাহ্মণ! আপনি কোন্ আশ্রমের গুরু? চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমের না কেবলমাত্র শূদ্রসম্বলিত হিন্দু সমাজের? কারণ আপনার চক্ষে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বঙ্গে বর্ত্তমান। তাহাও তৎশতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছেন। কাহাকেও কাহারও সহিত মেলামেশা করিতে দিতেছেন না। বঙ্গদেশ হইতে ক্ষত্রিয় কোথায় গেল? অর্থকরী বৈশ্যসম্প্রদায় কোথায় লুকাইল? হিন্দু-সমাজের ভিত্তি ধর্ম্মে ও গঠন চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমে। এই চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমই জগতে হিন্দু সমাজকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল—গ্রীস, রোম, মিশর প্রভৃতি সকলের আদর্শ ও শিক্ষকরূপে অধিষ্ঠিত ছিল। চাতুর্ব্বর্ণ্যাশ্রমের নিয়ম সুশৃঙ্খলায় শিল্পনৈপুণ্যে ভারত একদিন সমগ্র জগতকে অন্নদান, বস্ত্রদান করিত—যে ভারতমাতা স্বর্ণভূষিতা হইয়া রাজরাণীর ন্যায় সমগ্র জগতকে আপনার কৃপাকণায় কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রাখিয়াছিল, আজ সেই ভারতের এত দুর্দ্দশা কেন? তাহারই সন্তান আজ অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ কেন? সে ধন, সে গৌরব, সে বীর্য্য গেল কোথায়? শিল্পবাণিজ্য দেশ হইতে অন্তর্হিত হইল কেন? কোন্ পাপে এই সমস্ত অদৃশ্য হইল?

মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি—ব্রাহ্মণের পাপে! নদীতে নৌকা নিমজ্জিত হইলে মাঝীর না দাঁড়ীর দোষ হইবে? সমাজের কর্ণধার শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণ শ্ববৃত্তি-পরায়ণ হইয়া পরপদ-সেবারত শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, কর্ম্মফলে আজ ব্রাহ্মণ ব্রহ্মজ্ঞান-চ্যুত হইয়া পরপদ-লোলুপ হইয়া পড়িয়াছেন এবং সমাজের ঘোর দুর্দ্দৈব উপস্থিত

করিয়াছেন। এত করিয়াও ক্ষান্ত হন নাই। নিজে ব্রাহ্মণ-জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, অন্য ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়কে ঘৃণা করিয়া, তাঁহাদের প্রাণে আঘাত দিতেছেন; সবল সম্প্রদায় গায়ের জোরে অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল সম্প্রদায়কে নিমজ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। ঐ শ্রবণ করুন, ব্রহ্মকটাহ ভেদ করিয়া বেদ কি বলিতেছেন?—

"সঙ্গচ্ছদ্ধং সম্বদদ্ধং সংবো মনাংসি জানতাম্।
দেবা ভাগং যথা পূর্ব্বে সংজানানা উপাসতে॥
সমানীব আকূতিঃ সমানা হৃদয়ানি বঃ।
সমানমস্তু বো মন যথা বঃ সুহাসতি॥"

তোমরা এক সঙ্গে মিলিত হও। এক সঙ্গে কথা বল, এক সঙ্গে সকলের মন সকলে জান। পুরাতন দেবতারা যেমন একমত হইয়া হবির্ভাগ গ্রহণ করেন, তোমরাও সেইরূপ একমত হও। তোমাদের সঙ্কল্প ও অধ্যবসায় সমান হউক। তোমাদের হৃদয় সমান হউক। তোমাদের মন সমান হউক, যাহাতে তোমাদের মধ্যে সুশোভন সম্মিলন প্রাদুর্ভূত হয়।

শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

কবি দয়ারাম দাস।

জগৎ পরিবর্ত্তনের নিয়মানুগামী অর্থাৎ জগতে প্রায় পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়া থাকে। একদিন যে স্থান নক্রশার্দ্দূলসেবিত পললসমাবৃত বন্য জন্তুর আবাস ছিল, আজ হয় ত সেই স্থান সৌধমালা-সুশোভিতা ভোগি-জন-বাঞ্ছিতা, নিযুত-নরকণ্ঠ-নিনাদিতা মহা নগরীতে পরিণত হইয়াছে, একদিন যে স্থান মহা নগরীতে পরিণত ছিল, আজ হয় ত সেই স্থান মহা ভীষণ জঙ্গলে পরিণত হইয়াছে এবং তদ্‌সঙ্গে ঐ মহানগরীর কীর্ত্তিকলাপও বিলুপ্ত হইয়াছে। এইরূপ অনেক মহৎ-লোকের কীর্ত্তিকলাপও এক সময়ে চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হইয়াছিল কিন্তু কালের বিচিত্র গতিতে সেই সমস্ত বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। আজ আমরা মাহিষ্য-সমাজের একজন কীর্ত্তিমান্ কবির বিলুপ্ত কাহিনী লিপিবদ্ধ

করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেই কীর্ত্তিমান্ কবির নাম "দয়ারাম দাস" সাধারণ লোকের মুখে এখনও "কবি দয়রাম" এই কথা নৃত্য করিতেছে।

মেদিনীপুর জেলার কাশীযোড়া পরগণার অন্তর্গত ভোগপুর ষ্টেশনের অনতিদূরে কিশোরচক-চণ্ডীতলা নামক একটা গ্রামে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে কবিবর দয়ারাম দাসের জন্ম হয়। কবি বাল্যকালে প্রথমে স্বগ্রামের পাঠশালায় বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার পরে কিঞ্চিৎ সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া নিজের প্রতিভাপ্রভাবে যোগ্যতার পরিচয় দেন। কেহ কেহ কেহ বলেন, তিনি লেখা পড়া জানিতেন না—দেবী কমলার বরে তিনি কবি হইয়াছিলেন। কবির নিকট অনেক ছাত্র অধ্যয়ন করিত, তাহারা আহার ও বাসস্থান পাইত। কাশীযোড়াধিপতি দানবীর ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব "রাজা নরনারায়ণ"-উঁহার উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ নিষ্কর ভূমি দান করিয়াছিলেন। কবি স্বরচিত লক্ষীচরিত্র নামক পুস্তকের বিনন্দ রাখালের পালায় তাহা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। যথা :—

কাশীযোড়া মহাস্থান,　　　নরনারায়ণ আখ্যান
　　ধন্য রাজা ধার্ম্মিক নরপতি।
হৈল তাঁর প্রতিষ্ঠিত,　　　কবিবর গায় গীত,
　　কিশোরচকে যাহার বসতি ॥

বলা বাহুল্য, বর্ত্তমান লক্ষ্মীচরিত্রগুলি কতকাংশে তাঁহার রচিত লক্ষ্মীচরিত্রের অনুরূপ, তবে কোন কোন স্থান তদপেক্ষা পরিশুদ্ধ ও পরিমার্জ্জিত।

কবির সন্তানের মধ্যে একটী কন্যা ছিলেন। তাঁহার নাম মতিদেবী। ঐ কন্যার সহিত ঐ গ্রামের ভীমাচরণ সামন্ত নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত পরিণয় হয়। কথিত আছে, ভীমাচরণ সঙ্গীতনিপুণ ছিলেন। তিনি কবির অনেক সঙ্গীতাদির তান-লয়-সংশোধনে সহায়তা করিতেন। সাধারণের অবগতির জন্য ভীমাচরণের বংশলতা নিম্নে প্রদর্শিত হইল। ইনি শাণ্ডিল্য গোত্রীয়।

এই বংশের একমাত্র বংশধর শ্রীমান্ ঈশ্বর চন্দ্র সামন্ত দীনভাবে উক্ত গ্রামে জীবন যাপন করিতেছেন। যেখানে কবির বাসস্থান ছিল, সেই স্থানটা প্রায় ৭।৮ বিঘা হইবে। উহার মধ্যে একটী পুকুর এবং উহার চারিপাশে বৃত্তাকারে একটী পরিখা বা গড় কাটা আছে। এখনও ঐ পুকুরটীকে "কবির পুকুর" গড়টীকে "কবির গড়" এবং স্থানটীকে "কবির বাড়ী" ও "কবির ভিটে" বলিয়া থাকে। কবি রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি কোন কোন পুস্তকের কোন স্থানের ভাবসংগ্রহ করিয়া পদ্যের ছন্দে অনেক পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত কলঙ্কভঞ্জন, শিবায়ণ, লক্ষ্মীচরিত্র, তরণীসেনের পালা, ধর্ম্মায়ণ, লক্ষ্মণের শক্তিশেল, সত্যনারায়ণের পাঁচালী, গোবিন্দ-মঙ্গল, মনসা-মঙ্গল, শীতলা-মঙ্গল, শিবরামের যুদ্ধ ও শব্দরূপ এই কয়খানি পুস্তক বহু চেষ্টা করিয়া ভোগপুর ছাত্র-সম্মিলনীতে সংগৃহীত হইয়াছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় সমস্তগুলিই ছিন্নভাবে বিরাজমান, আজকাল অনেক পাঁচালী-গাহক আছেন তাহারা কবির গুণ বর্ণনা করিয়া থাকেন এবং স্বীকার করেন যে, "আমরা কবি দয়ারামের অনুগ্রহে বেশ দু'পয়সা উপায় করিয়া সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি।" যদি পূর্ব্বে এখনকার মত ছাপাখানা থাকিত, তাহা হইলে তিনি আজ সকলের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিতেন। ছাপাখানার সৃষ্টির পর হইতে হস্তলিখিত পুঁথির প্রতি অনেকের ভক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। ইহার ফলে ঐ সকল পুঁথির কতকাংশ উই ইন্দুরাদির খাদ্যে পরিণত হইয়াছে।

কবি এইরূপে অক্ষয় যশঃ অর্জ্জন করিয়া অকালে ইহলীলা সম্বরণ করেন। তিনি কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন, তাহা নিম্নলিখিত কয়েকটা ঘটনা হইতে কিছু বুঝিতে পারা যায়। ইহার সম্বন্ধে আর ঘটনা সংগ্রহ হইলে বারান্তরে আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল। আশা করি, কৃতবিদ্য মহাশয়গণ এতদ্সম্বন্ধে কিছু ঘটনা জানিতে পারিলে ভোগপুর সাহিত্য-ছাত্রসম্মিলনী, পোষ্ট সাগরবাড় জেলা মেদিনীপুর—এই ঠিকানায় আমাকে জানাইয়া উৎসাহিত করিবেন।

কবি পরমসাধক ছিলেন। মেদিনীপুর জেলার পাকুড়িয়া গ্রামে একটী বিখ্যাত শীতলা মণ্ডপ আছে। কবি কোন কারণ বশতঃ সেইখানে গিয়াছিলেন এবং তথায় রাত্রি যাপন জন্য একটী বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেখানে শীতলামণ্ডপ আছে একথা, বোধ হয়, তিনি জানিতেন না। এই জন্য তিনি সেই বাড়ীতে শীতলামণ্ডপের দরজার বিপরীত পার্শ্বে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিতে

শীতলা-মণ্ডপের সেই দিকের দেওয়াল তৎক্ষণাৎ দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছিল।

তিনি সন্ধ্যার সময়ে শিষ্যাদি দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সংকীর্ত্তন করতঃ চতুর্দ্দিক কাঁপাইতেন। কবি পরলোকগমন করিলে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহার চামর ও করতাল উক্ত জেলার অন্তর্গত "কোলেমাঝা নামক গ্রামে "ধর্ম্মদেবের মন্দিরে" রাখিয়াছিলেন। উহা এ পর্য্যন্ত বিদ্যমান রহিয়া কবির সংকীর্ত্তনাদি সদনুষ্ঠানের পরিচয় দিতেছে।

"বাণিজ্যে বিস্তর দুঃখ সর্ব্বসুখ চাষে। চাকর কুকুর যেন ফিরে দেশে দেশে॥" তাঁহার রচিত—ইত্যাকার অনেক উপদেশ আজকাল অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহাকে লোকে "কমলার বরপুত্র" বলিতেন।

ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব কাশীযোড়াধিপতি "রাজা নরনারায়ণের" সভায় তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সময়ে সময়ে কবিকে উক্ত সভায় যাইতে হইত এবং স্বরচিত নূতন নূতন পুস্তক পাঠকরতঃ রাজাকে উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে হইত। রাজা ও রাজকর্ম্মচারিগণ আহ্লাদিত হইয়া ধন্যবাদ প্রদান করিতেন এবং পুরস্কার দিতেন।

ফলতঃ, তাঁহার যশঃ সৌরভে এক সময় কিশোরচকের নাম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। এখন ন্যূনাধিক একশত বয়স্ক বৃদ্ধেরা বলিয়া থাকেন,—"আমরা বিদেশে গিয়া কিশোরচকের নাম করিলে তাঁহারা কবির সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন।"

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর সামন্ত-রায়।

উত্তিষ্ঠত-জাগ্রত—উত্থান কর এবং জাগ্রত হও।

হে মাহিষ্য জাতি, উঠ এবং জাগ! তুমি ঘোর ঘুমে ঘুমাইয়া আছ, তাই বলি—উঠ ও জাগ্রত হও। একবার জাগিয়া দেখ, তোমার বিশাল বিরাট সমাজে কি হইতেছে। তুমি কুম্ভকর্ণের ন্যায় ঘোর ঘুমে ঘুমাইয়া আছ—তোমার সে ঘুম কি ভাঙ্গিবে না? তুমি উষার আলোক দেখিবে না? তোমার

সমাজে সামাজিক সংস্কাররূপ উষার আলোক দেখা যাইতেছে, সেইটি তোমার মজ্জাগত চিরকালের সংস্কার-কুমুদ-পুষ্পের বিরোধী বলিয়া কি তোমার মোহ-নিদ্রা কাটিতেছে না? কুপণ্ডিত ও কুতার্কিকগণ তোমাদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করিবার জন্য কাল্পনিক অশাস্ত্রীয় ব্যবস্থা রচনা করিয়া তোমার চক্ষে ধূলিনিক্ষেপ করিয়া তোমার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে, একবার তুমি এইটি বুঝিয়া দেখ। তোমার ভাইদের মধ্যে একদল তোমাকে ক্ষত্রিয় সন্তান বলিয়া উচ্চাসনে বসিবার চেষ্টা করিতেছে, পক্ষান্তরে তুমি সভাগত ভ্রাতার সেই উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া পণ্ডিতম্মন্য কতিপয় অনুবাদক ও দাম্ভিক ব্যক্তির প্রলোভনে ভুলিয়া মাহিষ্য জাতির ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করিতে বসিয়াছ। হে মাহিষ্য, তুমি ক্ষত্রিয়-সন্তান, কিন্তু তোমার তৈলবট-বিনোদী ব্যবস্থাদাতৃগণ তোমাকে জালিকের দলে আসন দিতেছে, তুমি তাহাদের কূটবুদ্ধি ও ষড়যন্ত্র আদৌ বুঝিতে না পারিয়া সেই শাস্ত্রবিরোধী, ঘোরতর আপত্তিজনক ও ভিত্তিহীন ব্যবস্থার বলে আনন্দে দিশেহারা হইয়াছ! কি আর বলিব বল! চারি হাজার বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া দেখ—তোমাদের পূর্ব্বপুরুষ ভারতের নানা স্থানে রাজত্ব ও ভারত-সমুদ্রের নানা দ্বীপে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া দিগ্বিজয়ী সম্রাটের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সেই সমূহ অতীত বিবরণ মহামান্য ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে লিখিত আছে এবং সম্রাট্ দরায়ুস, সেকেন্দার, খৃষ্টান ধর্ম্মযাজক, গ্রীক ও চীনদেশীয় পরিব্রাজকগণ মাহিষ্যজাতির কৃষিবাণিজ্যাদি কার্য্য ও যুদ্ধ প্রভৃতির বিষয় একবাক্যে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। মেদিনীপুর, যশোহর, নদীয়া, ময়মন-সিংহ ও শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় মাহিষ্য রাজগণের কতশত প্রাচীন কীর্ত্তি এখনও বিদ্যমান আছে। সমস্ত বঙ্গদেশের ৩/৪ অংশ ও সমগ্র বঙ্গোপসাগর এক সময়ে তমলুক রাজার শাসনদণ্ডে পরিচালিত হইয়াছিল। মাহিষ্য রাজা অনঙ্গ ভীমদেব ১৪ বৎসর বিপুল পরিশ্রমে শ্রীশ্রী৺ জগন্নাথদেবের বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সমগ্র ভারতে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন! এতদ্ব্যতীত কত হাজার হাজার দৃষ্টান্ত আছে, তাহা লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে। মহাত্মা হাণ্টার সাহেব স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে, মাহিষ্যজাতির অনেকেই রাজপুত জাতির অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গিয়াছে। যে মাহিষ্য জাতি এক সময়ে ক্ষত্রিয় জাতির নিম্নেই আসন প্রাপ্ত হইয়াছিল,

অশুদ্ধ জাতিতে পরিণত হইবে? হে মাহিষ্য! তুমি আর একবার ভাবিয়া দেখ, তুমি সমগ্র ভারতের ইতিহাস অনুসন্ধান করিয়া দেখ, যাহারা ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী করিতেছে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষের এক কাঠা জায়গাও রাজত্ব ছিল না। তাহাদের পুরোহিতগণ এক সময় সমাজে নিন্দিত ছিল (সম্বন্ধ-নির্ণয় ও অম্বষ্ঠ-দর্পণ দ্রষ্টব্য)। তাহাদের কাল্পনিক ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী অধিক, কি তোমার ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী অধিক? বেদ, স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, ইতিহাস যাহাই দেখনা কেন, সর্ব্বত্রেই তোমার ক্ষত্রিয়ত্বের, আর্য্যত্বের, বিশুদ্ধতার জলন্ত প্রমাণ।

হে মাহিষ্য, তুমি কি পক্ষাশৌচ-গ্রহণকারিগণকে ভিন্ন পথে যাইতে দেখিতেছ। বিবেচনা করিয়া দেখ, ঐ পথটি ভিন্ন পথ নহে। মেদিনীপুর জেলার ময়না পরগণায় ঐ প্রথা অস্মরণীয়কাল হইতে প্রচলিত আছে। এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যায় দশাহ অশৌচ চিরকাল প্রচলিত আছে। সেই দশাহ অশৌচধারীদের সহিত মেদিনীপুরের মাসাশৌচ ও পক্ষাশৌচধারিগণের মধ্যে কন্যা আদানপ্রদান চলিতেছে। সুতরাং পক্ষাশৌচ নূতন মত নহে। পক্ষাশৌচগ্রহণ প্রথা অতি প্রবলবেগে বিস্তৃতি লাভ করিতেছে, ইহার গতিরোধ অসম্ভব। সে জন্য বলিতেছি—তুমি জাগ, তোমারই বিষয়ে বিরুদ্ধভাব পরিত্যাগ করা একান্ত আবশ্যক। যদি কেহ বিরুদ্ধভাব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা তিনি সমাজের বিষম অনিষ্ট সাধন করিবেন। তোমার চক্ষু আছে, জ্ঞান আছে, চিন্তা করিবার শক্তিও আছে। তথাপি তুমি অন্ধ হইয়াছ কি জন্য? স্বার্থপর ব্যক্তিগণ তোমাকে উত্তেজিত করিয়া তোমার ভ্রাতৃবিরোধ ঘটাইতেছে ও তামাসা দেখিতেছে—ভাবিয়া দেখ, ভ্রাতৃবিরোধের পরিণামফল একবারে বিনাশ। তোমার মান অপমান ও বিচারের শক্তিও আছে—নতুবা তোমাকে একটি কটু কথা কহিলে তুমি রাগান্বিত হইবে কেন? চাই কি আদালত পর্য্যন্ত মান উদ্ধারের জন্য যাইতে পার। তবে তুমি যে কিছুই বোঝ না এমন কথাই বা বলি কিরূপে? কিন্তু জাতি-বিচারের সময় সে বুদ্ধিটুকু কোথায় থাকে ভাই? সমগ্র মাহিষ্য-সমাজ একত্রিত হইলে মাহিষ্যবোর্ডিং বা স্কুল কলেজ স্থাপন করা অসম্ভব হইবে না। সামাজিক সংস্কার ও পরস্পর একসূত্রে গ্রথিত হইবার জন্য হে মাহিষ্য জাগ—জাগ এবং উত্থান কর। স্বার্থপর ব্যক্তির কথায় বা মোহমন্ত্রে মুগ্ধ না হইয়া পরস্পরকে ভাই বলিয়া আলিঙ্গন কর, ঘৃণা বা দ্বেষ পরিত্যাগ কর, এবং কর্ত্তব্যের মহান্ পথে অগ্রসর হও।

শ্রীআশুতোষ জানা।

পঙ্কাশৌচ-গ্রহণের আপত্তি-খণ্ডন।

বহুদিন হইতে বহু তর্ক বিতর্ক ও আলোচনায় ইহা নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে যে, আর্য্য চাষীকৈবর্ত্ত জাতি শাস্ত্রোক্ত মাহিষ্য জাতি। কেন না—

> ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।—(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণম্)
>
> বৈশ্যাশূদ্র্যোস্তু রাজন্যাৎ মাহিষ্যোগ্রৌ সুতৌ স্মৃতৌ।—(যাজ্ঞবল্ক্য)

ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক শাস্ত্রসঙ্গত বিধি পরিণীতা বৈশ্যাভার্য্যাগর্ভে উৎপন্ন সন্তান কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য নামে আভহিত। উৎকৃষ্ট আর্য্য চাষী-কৈবর্ত্তগণই মাহিষ্য ও বৈশ্যবৎ সংস্কারযোগ্য। শাস্ত্রে ও হিন্দু সমাজে আর এক প্রকার নিকৃষ্ট কৈবর্ত্ত জাতির সত্ত্বা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা প্রতিলোম বর্ণসঙ্কর ও অনার্য্য এবং অন্ত্যজ। তাহারা সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি। তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাহারা মৎস্যব্যবসায়ী ও নৌকর্ম্মজীবী। অভিধানসাম্যে অনেক সময় সাধারণের ভ্রান্তি জন্মে, মাহিষ্য-সমাজনেতৃগণ সাধারণের সেই ভ্রান্তি ও কুসংস্কারাদি অপনোদনের চেষ্টা করিবেন। যেহেতু, সমাজে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বড়ই কম পড়িয়াছে। ইহাও আমাদের অবনতির একটা প্রধান কারণ। শুধু মাহিষ্যের নয়, অনেক মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণসন্তান পর্য্যন্ত কুলমর্য্যাদা রক্ষণে যত্নশীল নহেন। কৃষিকারক কৈবর্ত্তগণ যে উচ্চজাতীয় মাহিষ্যবৈশ্য তাহা বোধ হয়, আট আনা লোকের কর্ণে প্রবেশ করে না। আশা করি, এক্ষণে সমস্ত মাহিষ্যগণ আত্মপরিচয় জানিতে পারিলেই বৈশ্যোচিত ধর্ম্ম-পালনে যত্নবান হইবেন, সন্দেহ নাই। এ স্থলে মাহিষ্য-কৈবর্ত্তজাতি বৈশ্যবৎ সংস্কারের যোগ্য কি না, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা আবশ্যক বলিয়া মনে করি।

"বৈশ্যা ক্ষত্রিয়য়োঃ পুত্রো মাহিষ্যো বৈশ্যধর্ম্মকৃৎ" (পণ্ডিত সর্ব্বস্ব)—বৈশ্যা ও ক্ষত্রিয়ের পুত্রকে মাহিষ্য বলে, সে বৈশ্যধর্ম্ম (পঙ্কাশৌচাদি) প্রতিপালন করিবে।—মহর্ষি মনুও বলিয়াছেন ;—

> "সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্‌সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ ॥
>
> শূদ্রানাস্তু সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ ॥" (মনু ১০।৪১)

সজাতীয়া ভার্য্যাজাত তিন সন্তান, এবং অনন্তর ভার্য্যাজাত তিন সন্তান, এই ছয়টী দ্বিজধর্ম্মী। ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণীজাত সন্তান, ক্ষত্রিয়ের ক্ষত্রিয়াজাত সন্তান, বৈশ্যের বৈশ্যাজাত সন্তান এই তিন পুত্র সজাতীয়। আর ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়া-জাত সন্তান, ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাজাত সন্তান এবং ব্রাহ্মণের বৈশ্যাজাত

এই তিন পুত্র অনন্তরজ; ইহাঁরা দ্বিজধর্ম্মী ও দ্বিজাতি সংস্কারের যোগ্য হইবে। যাহারা প্রতিলোমক্রমে দ্বিজাতি হইতে উদ্ভূত, সূতাদি জাতি, তাহারা শূদ্রধর্ম্মী অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারের অযোগ্য॥ মনুর এই বচনের দ্বারা জানা যাইতেছে, মাহিষ্যজাতি প্রতিলোমজ নহে; ইহাঁরা অনুলোমজ বলিয়া মাতৃবর্ণ বৈশ্যের ন্যায় দ্বিজধর্ম্মী সুতরাং বৈশ্যবৎ সংস্কারযোগ্য ও বৈশ্যাচারপালনে সম্পূর্ণ অধিকারী॥

কর্ম্মদ্বারা উৎকর্ষলাভ করা বর্ত্তমান কালে কর্ত্তব্য বলিয়া মাহিষ্যগণের বৈশ্যাচার গ্রহণ করা বিধেয়। মাহিষ্যজাতির গৌরব ও মর্য্যাদা স্মরণ করিয়া প্রত্যেক মহাত্মা সমাজপতির কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা যেন এ বিষয়ে মনোযোগ দেন।

"সমান বর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি।
অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ, প্রতিলোমাস্বার্য্যধর্ম্ম বিগর্হিতাঃ।"—(বিষ্ণুসংহিতা)

যে সকল পুত্র সমান বর্ণে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহারা সবর্ণ হইয়াছে। আর যাহারা অনুলোমক্রমে উৎপন্ন, তাহারা মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু যাহারা প্রতিলোম ক্রমে উৎপন্ন, তাহারা আর্য্যধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। বিষ্ণু-স্মৃতির এই বচনে অনুলোমজ মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণ যে মাতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাতে সংশয় থাকিতেছে না,—"আনুলোম্যেন বর্ণানাং জাতি মাতৃসমাঃ স্মৃতাঃ।" (অগ্নপুরাণ ১৫১।১০)। অনুলোম জাত পুত্রসকল মাতৃসদৃশ বলিয়া জানিও। উপরোক্ত বচন সকলের দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে, মাহিষ্যজাতি অনুলোমজ মাতৃধর্ম্মাবলম্বী, উহাদের ব্যবসায় ও অশৌচাদি বৈশ্যবৎ হইবে।

বৈশ্যবৎ আচারব্যবহার পালনের প্রধান বিষয় অশৌচকাল। বৈশ্যবর্ণের ন্যায় আচার ব্যবহার না করিলে দ্বিজধর্ম্মিত্ব হারাইয়া শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতে হয় বলিয়া মাহিষ্যের পক্ষে ভারতের নিখিল-শাস্ত্র-পারদর্শী পণ্ডিতমণ্ডলী পক্ষা-শৌচগ্রহণের ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। এবং শাস্ত্রেও উক্ত আছে; যথা,—

"ক্ষত্রস্য দ্বাদশাহানি বিশঃ পঞ্চদশৈব তু।
ত্রিংশদ্দিনানি শূদ্রস্য তদর্দ্ধং ন্যায়বর্ত্তিনাম্॥"—(যাজ্ঞবল্ক্য ৩।২২)

নির্গুণ ক্ষত্রিয়ের বারদিন, বৈশ্যের পনর দিন, শূদ্রের এক মাস ও ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ পনর দিন অশৌচ কাল জানিবে।

"ক্ষত্রিয়ো নব সপ্তাহাচ্ছুধ্যেদ্বিপ্রো গুণৈর্যুতঃ।
দশাহাৎ সগুণো বৈশ্যো বিংশাহাচ্ছূদ্র এব চ॥"—(অগ্নিপুরাণ ১৫৮।১২)

সগুণ ব্রাহ্মণের সাত দিনে, সগুণ ক্ষত্রিয়ের নয় দিনে, সগুণ বৈশ্যের দশ দিনে ও

"শুধ্যেদ্বিপ্রো দশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যপঞ্চদশাহেন শূদ্রো মাসেন শুধ্যতি॥"—(মনু ৫।৮৩)

ব্রাহ্মণ দশদিনে, ক্ষত্রিয় বারদিনে, বৈশ্য পনর দিনে ও শূদ্র একমাসে শুদ্ধি লাভ করিবে। মন্বাদিসংহিতা গ্রন্থে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রজাতির ক্রমে যেরূপ দশম, দ্বাদশ, পঞ্চদশ ও ত্রিংশৎ দিনে অশৌচান্তের নিয়ম করিয়াছেন, তাহা নিগুণের পক্ষে ব্যবহার্য্য। কলিযুগে মন্বাদি ঋষির নির্দ্ধারিত দিন হইতে আর বৃদ্ধি হইবে না। যেহেতু ;—

"ন বর্দ্ধয়েদঘাহানি প্রত্যূহেন্নাগ্নিষু ক্রিয়াঃ।
ন চ তৎকর্ম্ম কুর্ব্বাণঃ সনাভ্যোঽপ্যশুচিভবেৎ॥"—(মনু ৫।৮৪)

অশৌচ দিন বৃদ্ধি করিবে না। শ্রৌত, স্মার্ত্ত, অগ্নিহোত্রের ব্যাঘাত করিবে না। যেহেতু, তাদৃশ অশৌচ গ্রহণ করিলে হোমাদির ব্যাঘাত হয়। যদি পুত্রাদি কোন সপিণ্ড প্রতিনিধি হইয়া হোমাদি করেন, তাহাতে তাঁহারা অশুচি হইবে না। এই সকল সমালোচনা দ্বারা মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণ কৃষ্যাদি করিয়া জীবনোপায় ও পঞ্চদশ দিবসে অশৌচমুক্ত হইয়া স্মার্ত্তবৎ ক্রিয়া কলাপাদি করিবেন—ইহাই শাস্ত্রের প্রকৃতার্থ।

কেহ কেহ বিদ্বেষবশতঃ মাহিষ্য-কৈবর্ত্তকে কলিতে স্বধর্ম্মহীন জন্য শূদ্রত্ব প্রতিপন্ন করিয়া মাসাশৌচের ব্যবস্থা প্রদান করেন, তাহা শাস্ত্রানুমোদিত নহে। কলিতে সকলেই স্বধর্ম্মরহিত, কাহারও পূর্ণধর্ম্ম আচরণ নাই। কেন না, যখন বেদোক্ত ব্রাহ্মণের প্রতিও অনেক শূদ্র হইবার অনুশাসন আছে ; তবে ব্রাহ্মণ, শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া মাসাশৌচ করিবেন কি ? কখনই নহে। শূদ্রবৎ হইল বলিয়া কলিতে অশৌচের তারতম্য হইতে পারে না। যেহেতু, যে লক্ষণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে শূদ্রবৎ বলা হইয়াছে, অশৌচস্থলে তাহাকেই নিগুণ বলা হইয়াছে। কলিতে নিজ নিজ ধর্ম্ম অযাজন প্রযুক্ত যাঁহারা নিগুণ হইয়াছেন, তাঁহারাই "শুধ্যেদ্ বিপ্রোদশাহেন" এই বচনাধিকারী। যথা,—

"জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্ট সন্ধ্যোপাসনাবর্জ্জিতঃ।
নামধারক বিপ্রস্য দশাহ সূতকং ভবেৎ॥"—(পরাশর ৩।৬)

জাতকর্ম্মাদিক্রিয়া ও সন্ধ্যোপাসনাবর্জ্জিত নামধারী ব্রাহ্মণ দশদিন অশৌচ করিবেন। এ স্থলে ক্রিয়ালোপ লইয়া অশৌচের বৃদ্ধি হইতেছে না॥

পরন্তু, অশৌচকাল অযথা বৃদ্ধি করিলে কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি আছে। মনু ৫।৫৮শ শ্লোকে বলেন, শূদ্রবৎ আচারে শূদ্র হইতে হয়। মাহিষ্যজাতি

বৈশ্যধর্ম্ম প্রতিপালন না করিলে "দৈবপৈত্রাদি" কার্য্য সিদ্ধ হয় না। এবং ইহারা যাবৎ পর্য্যন্ত সৎপথে অবস্থাপিত না হইবে, তাবৎ পর্য্যন্ত পিতৃপুরুষগণকে অযথা কালের নিমিত্ত প্রেতলোকে রাখিয়া কষ্ট প্রদানের হেতু হইতে থাকিবেন। মাসাশৌচ শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্য জানিয়াও কেহ যদি অকর্ত্তব্য পথে গমন করিয়া পিতৃকার্য্যের অপব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে জ্ঞানকৃত পাপে লিপ্ত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই। যেরূপ মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতির উৎপত্তি ধর্ম্মশাস্ত্রে দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে এই জাতির মাসাশৌচ কোনমতে শাস্ত্রসম্মত নহে। পক্ষাশৌচ ইহঁাদের শাস্ত্রে বিহিত জাতীয় ধর্ম্ম॥ ময়নাগড়ে ও উৎকলে মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণ বৈশ্যের ন্যায় চিরকালই পঞ্চদশাহে শুদ্ধিবিধান করিয়া থাকেন।

যদিও কোন মাহিষ্য দেশবশে কিম্বা ভ্রমবশে শূদ্রবৎ আচারণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহারা পুনর্ব্বার বৈশ্যবৎ আচারণ করিলে তাঁহাদিগের নিজবর্ণের মর্য্যাদা রক্ষা করা হইবে। যখন স্থল বিশেষে শূদ্রেরই পনর কুড়ি দিনে শুদ্ধি হয়, তখন মাহিষ্যের পনর দিনের অধিক অশৌচগ্রহণ নীচত্বের পরিচায়ক নহে কি? পনর দিনের অধিক অশৌচধারী মাহিষ্য সগুণ শূদ্রাপেক্ষা অধম। মাহিষ্যের শূদ্রাচার কর্ত্তব্য নহে, বৈশ্যাচার পালন কর্ত্তব্য; এবং ক্রমে উন্নত আচার গ্রহণীয়।

"অনুলোমাস্থ মাতৃবর্ণাঃ" বিষ্ণুস্মৃতির এই বচনানুসারে মাহিষ্যগণ মাতৃবর্ণ প্রাপ্ত হইবে। বৈশ্যজনোচিত ক্রিয়াকলাপ মাহিষ্যগণের একান্ত অনুষ্ঠেয়। অন্যথায় কর্ম্ম দোষে পতিত বা শূদ্রমধ্যে গণ্য হইবেন এবং তাঁহাদের যাজনকারী ব্রাহ্মণগণও শূদ্রযাজী বলিয়া পতিত হইবেন। সমাজের মধ্যে কতকগুলি বিদ্যাসাগর মহাজনও দেখিতে পাওয়া যায় যে, তাহারা অগাধ অতলস্পর্শ বুদ্ধির প্রভাবে মাহিষ্যগণের বৈশ্যাচারগ্রহণ আবশ্যক মনে করেন না। এমন কোন যুক্তিনাই, যাহা ইহাঁদের বুদ্ধিভেদ করে। হতভাগ্য মাহিষ্যজাতি শূদ্রাচারের পঙ্কে নিমজ্জিত হইয়া সমাজের কিরূপ নিম্নস্তরে সন্নিবেশিত, তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াও পক্ষাশৌচগ্রহণ কতদূর আবশ্যক, তাহা এ পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিতেছেন না। তাঁহাদিগকে শাস্ত্র ও যুক্তি দ্বারা বুঝাইতে পারে, এমন লোক জন্মে নাই। এই সকল লোক যদি শুধু আপনারা শূদ্রাচারী হইয়াই সন্তুষ্ট থাকিত, তবু মন্দের ভাল ছিল; কিন্তু ইহাঁরা পদে পদে পক্ষাশৌচধারী মাহিষ্যগণের প্রতিকূলতাচরণ করিতে কিছু মাত্র লজ্জাবোধ করেন না। ধন্য তাঁহাদের

কোন কোন শূদ্রাচারী মাহিষ্যকৈবর্ত্তগণ পক্ষাশৌচধারণের যে সকল আপত্তি দেখাইয়া থাকেন, সে সকল নিতান্ত হাস্যজনক হইয়া উঠে। এ স্থানে ২।৪টি আপত্তির কথা আলোচনা করিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্টতর হইবে। অনেকে বলিয়া থাকেন, দশবিধ সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া পরে পক্ষাশৌচ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। অনুলোমজাত মাহিষ্যজাতির অধিক সংখ্যক সংস্কার বিদ্যমান আছে। দশবিধ সংস্কার আচরণ এখন আর ব্রাহ্মণ-গণের মধ্যেও পূর্ণরূপে প্রচলিত নাই। ব্রাহ্মণগণ বর্ত্তমানে যেমন বৈদিক আচারবিহীন হইয়া পড়িতেছেন, তদনুরূপ মাহিষ্যজাতিও ক্রমশঃ হীন হইয়া আসিয়াছেন। মাহিষ্যজাতির মধ্যে উক্ত দশবিধ সংস্কার প্রচ্ছন্নভাবে বর্ত্তমান আছে। উপনয়ন সংস্কার লোপ পাইয়াছে বটে, কিন্তু তান্ত্রিক বিধানানুসারে অনেকে প্রায় বিষ্ণুমন্ত্রাদি দীক্ষাদ্বারা আপনাদিগকে সংস্কৃত ও দ্বিজ মানিয়া থাকেন। যেহেতু শাস্ত্রে উক্ত আছে ;—

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংসং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥"
(শ্রীহঃ ভঃ বিঃ ধৃত-তত্ত্বসাগর বচন)

অর্থাৎ রসের বিধান অনুসারে যেমন কাংস ও খনিজাত স্বর্ণের ন্যায় বর্ণে, গুণে ও মূল্যে তুল্যতা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মনুষ্যমাত্রেই যথাবিধানে তান্ত্রিকী, বৈষ্ণবী দীক্ষাগ্রহণ করিলে দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়। উপবীত লইলে মাহিষ্যের উৎকর্ষতা আছে, কিন্তু না লইলে তাহাতে কোন ক্ষতি নাই। জ্ঞানযজ্ঞোপবীত ভিন্ন বাহ্য উপবীত অনিত্য।

কলিতে সকলেই স্বধর্ম্মরহিত, কাহারও পূর্ণধর্ম্ম আচারণ নাই। তজ্জন্যই বলি, কোন মাহিষ্য আপনাকে শূদ্রবৎ মনে করিয়া মাসাশৌচধারণ করিবেন না। শূদ্রবৎ বলিলে শূদ্রজাতি কিরূপে হইবে? ধর্ম্মানুরাগীকে বিশেষ করিবার নিমিত্ত দ্বিজাতি মাত্রেরই প্রতি 'শূদ্রবৎ' প্রয়োগ হইয়াছে। শুধু মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত কেন? বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের প্রতিও শূদ্র হইবার কারণ আছে। তাহা বলিয়া ব্রাহ্মণ শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিয়া মাসাশৌচ করিবেন কি? কখনই নহে। যেহেতু, জাতকর্ম্মাদি ক্রিয়ারহিত ও সন্ধ্যোপাসনাবর্জ্জিত নামধারী ব্রাহ্মণ দশদিনে অশৌচমুক্ত হইবেন। ইহা পরাশর সংহিতার ৩য় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে লিখিত আছে। এক্ষণে বুঝা যাইতেছে, ক্রিয়ালোপ লইয়া অশৌচের বৃদ্ধি হইতেছে

হইলেও সেই জাতি বলিয়া পরিগণিত ও তদ্‌বৎ অশৌচ করিবে; ইহা শাস্ত্রসঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত। মাহিষ্যের পক্ষে মাসাশৌচ-পালন পাপজনক ও শাস্ত্র-বিরুদ্ধ। এ বিষয়ে প্রত্যেক সদাচারী সমাজপতির কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা বিশেষ মনোযোগ দেন। বৈশ্যবৎ আচার ব্যবহার পালনের প্রধান বিষয় অশৌচ কাল। তজ্জন্যই, বোধ হয়, ভারতের শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতির মীমাংসিত ব্যবস্থাপত্রে অশৌচকাল উল্লেখ করিয়া দিয়াছেন। মাহিষ্য-বিবৃতি, উদ্দীপন, মাহিষ্যপ্রকাশ প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য॥

আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আত্মীয় স্বজন জ্ঞাতি কুটুম্বগণ যে যেখানে আছে, সকলে পঞ্চাশৌচগ্রহণ করিলে পশ্চাতে উহা গ্রহণ করিব। যেন তাঁহারা সকলের শেষে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সকলের শেষে মরিবেন; সুতরাং পঞ্চাশৌচটাও শেষে লওয়া চাই। বৈশ্যবৎ আচারব্যবহার পালনের প্রধান ধর্ম্ম যে অশৌচকাল, ইহা যে ব্যক্তিগত কর্ত্তব্য, ইহা যে শাস্ত্রোচিত জাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান, সে কথা ইহাঁরা মনে করেন না। কিন্তু ইহাঁরা যদি পরমুখাপেক্ষী না হইয়া এতদিন উন্নত সংস্কার গ্রহণ করিতেন, তবে ক্ষত্রিয় সন্তানের কার্য্য হইত॥

আবার কেহ কেহ বলেন, আমাদের আত্মীয় কুটুম্বগণ মাসাশৌচের পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে কেমন করিয়া পরিত্যাগ করিব। আমরা তদুত্তরে বলি, যে সকল আত্মীয়স্বজন ধর্ম্মাচরণের বিরোধী, তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেই বা হানি কি? ত্রেতাযুগে মহাত্মা বিভীষণ ধর্ম্মের নিমিত্ত জ্ঞাতি ভ্রাতা প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি ধর্ম্মরক্ষার জন্য আপনার প্রিয়তম পুত্র তরণীসেনের বধোপায় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রকে বলিয়া দিতে কিঞ্চিন্মাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই। আর কৌরবসমরেও মাহিষ্য-ক্ষত্রিয় যুযুৎসু অনুরূপ কারণে ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ করিয়াছিলেন। কিন্তু পরিণামে এই দুই মহাত্মাই জীবনসংগ্রামে জয়লাভ করিয়াছিলেন, একথা কাহারও অবিদিত নাই॥

কেহ কেহ আবার পিতৃ-আজ্ঞা, মাতৃ-আজ্ঞা, গুরু-আজ্ঞার দোহাই দিয়া থাকেন। পিতা, মাতা, বা গুরুর নিষেধ আছে বলিয়া যাহারা পঞ্চাশৌচ গ্রহণে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাঁহারা কি জানেন না যে, পঞ্চা-শৌচপালন শাস্ত্রসম্মত ও ধর্ম্মানুমোদিত হইলে, কি পিতৃ-আজ্ঞা, কি গুরু-আজ্ঞা কিছুই পালনীয় নহে। যেহেতু, প্রহ্লাদ পিতৃ-আজ্ঞায় হরিনাম ত্যাগ করেন নাই। ভরত মাতৃ-আজ্ঞায় অযোধ্যার সিংহাসন অধিকার করেন নাই।

বলিরাজা গুরু-আজ্ঞায় দানধর্ম্মে বিরক্ত হন নাই। পরিণামে ইহাঁরা সকলেই জয়যুক্ত হইয়াছিলেন।

সন, ১৩০৪ সালের ১২ই, ১৩ই, ১৪ই আষাঢ় দিনত্রয়ে উচ্চচেতা জমিদার ৺ নরহরি জানা মহাশয়ের বাটীস্থ "তাজপুর-জাতি-নির্দ্ধারিণী-সভায়" নবদ্বীপ ভাট্‌পাড়া, কাশী, বিক্রমপুর, চন্দ্রপ্রতাপ, পুরীমণ্ডপ, কলিকাতা-সংস্কৃত-কলেজ ও মেদিনীপুর জেলার সমস্ত পণ্ডিতগণ কি স্মার্ত্ত, কি নৈয়ায়িক, কি বৈয়াকরণ মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রবিদ্‌গণের স্বাক্ষরযুক্ত ব্যবস্থাপত্রে লিখিত আছে যে, "ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাভার্য্যায় মাহিষ্য বা আর্য্যকৈবর্ত্ত উৎপন্ন, ইহাদের সুতকে ও মৃতকে পঞ্চদশ দিন অশৌচ কর্ত্তব্য"। তখন মাহিষ্য বিদ্বেষিগণের কথায় কর্ণপাত করিবার আবশ্যক কি? আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, আমরা যদি পঞ্চদশদিনে অশৌচমুক্ত হই, তাহা হইলে মাসাশৌচধারিগণ আমাদিগকে সমাজচ্যুত করিবেন। ইহা বড়ই হাস্যজনক কথা! যাঁহারা জ্ঞানকৃত পাপে লিপ্ত, তাঁহারা সমাজচ্যুত হইবেন না? আর যাঁহারা স্বধর্ম্মপরায়ণ, তাঁহারা সমাজচ্যুত হইবেন? জাতীয় ধর্ম্ম বজায় করিতে গিয়া যদি সমাজচ্যুত হইতে হয়, তবে সেও গৌরবের বিষয়!

চিত্রকূট পর্ব্বতে শ্রীরামচন্দ্র ভরতকে বলিয়াছিলেন, "কচ্চিৎ সহস্রৈর্মূর্খাণা-মেকমিচ্ছসি পণ্ডিতম্?" অতএব সহস্র মূর্খের সহবাস অপেক্ষা একজন পণ্ডিতের সহবাসও অধিক বাঞ্ছনীয়। আর সমাজচ্যুতিই বা কিসে হইল? এক নগরে বা এক গ্রামে কি একটী জাতি একঘর বা দুইঘর বাস করে না? পক্ষাশৌচধারী মাহিষ্যগণ যদি সংখ্যায় অল্প হন, তবে তাঁহারা না হয়, সেইরূপ ভাবেই থাকিবেন! ইহার মধ্যে একটা গৌরবময় সৌন্দর্য্য আছে।

আবার কেহ কেহ মনুর ৪র্থ অধ্যায়ের ১৭৮ সংখ্যক শ্লোকের দোহাই দিয়া বলেন;—

"যেনৈস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎ সতাং মার্গং তেন গচ্ছন্ ন দুষ্যতি॥"

মনুর প্রাগুক্ত শ্লোকের দ্বারা বুঝা যাইতেছে, পিতৃপিতামহ যে পথে গিয়াছেন, সেই পথে গমন করা দোষজনক নহে। অতএব বাপ পিতামহ মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন, তামাদেরও তাহাই গ্রহণীয় *। যাঁহারা এরূপ পিতৃ-

* বৌদ্ধবিপ্লবে হিন্দু-সমাজ বিশৃঙ্খল হইয়াছিল; পুনঃ যখন হিন্দু-সমাজে সনাতন স্মার্ত্তধর্ম্মের প্রচলন হয়, সেই সময় বাঙ্গলার বহু ক্ষত্রিয় বৈশ্য জাতি শূদ্রত্বের গণ্ডীর মধ্যে পতিত হইয়া

পিতামহভক্ত তাঁহাদিগকে আমাদের শত শতবার ধন্যবাদ! তাঁহারা কি সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম বিষয়ে পিতৃপিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ করিতেছেন? তবে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের ব্যবহৃত গোল্লা ছাতাটী এখন কোথায়? কি জন্য তাঁহারা কাপড়ের বা রেশমী ছাতা ব্যবহার করিতেছেন? জগতের বিধির কি কোন পরিবর্ত্তন হয় নাই? এ পর্য্যন্ত জগতে কোন বিধি ঠিক এক ভাবে নাই ও থাকিতে পারে না। ঋতুভেদে যেমন আহার ও পরিচ্ছদের বিভেদ করিতে হয়, তেমনি অবস্থা ও কালভেদে ধর্ম্মকর্ম্মভেদের আবশ্যক হয়। যথা,—

"কৃতে তু মানবা ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং গৌতমাঃ স্মৃতাঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতাঃ কলৌ পরাশরা স্মৃতাঃ॥"

সত্যযুগে মনু ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, ত্রেতাযুগে গৌতম-ব্যবস্থাপিত ধর্ম্ম, দ্বাপরযুগে শঙ্খলিখিত ধর্ম্ম এবং কলিযুগে পরাশর-নিরূপিত ধর্ম্ম অনুসরণ করিবে।

শ্রীশ্রীচরিতামৃত গ্রন্থেও উক্তি আছে;—

অশ্বমেধং গবালম্ভং সন্ন্যাসং পলপৈতৃকং।
দেবরেণ সুতোৎপত্তিঃ কলৌ পঞ্চবিবর্জ্জয়েৎ।

অর্থাৎ অশ্বমেধ, গোমেধ, সন্ন্যাস, মাংসের দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ, দেবর কর্ত্তৃক পুত্রোৎপাদন এই পাঁচটী কলিতে বর্জ্জিত আছে। অন্যান্য যুগে যে সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম চলিয়া আসিতেছিল, কলিযুগে তাহা প্রতিপালনে নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরন্তু অতি প্রাচীনকালে আর্য্যগণ অগ্নি, জল ও সূর্য্য প্রভৃতি জড়ের উপাসনা করিতেন, ঈশ্বরজ্ঞান তাঁহাদের আদৌ ছিল না, তথাপি উহাই তখন তাঁহাদিগের সনাতনধর্ম্ম ছিল। সে সময়ে যজ্ঞে গো, মেষ, উষ্ট্রাদি হনন করা হইত। এবং ঐ সমস্ত পশুর মাংস মেধ্য বলিয়া ভক্ষিত হইত। সে সময়ে আর্য্যগণ যজ্ঞে গোহত্যা করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইলে বাধাপ্রদানকারীকে বিধর্ম্মী পাপী ইত্যাদি বলিয়া সকলে ঘৃণা করিতেন। এতদ্ব্যতীত পিতৃশ্রাদ্ধেও গবাদির মাংস ব্যবহৃত হইত। কিন্তু এখন আমরা সেরূপ করি না কেন? আমরাও ত সেই আর্য্য-

মাসাশৌচ গ্রহণ করিয়াছে। তৎপূর্ব্বে মাহিষ্য-জাতি ক্ষত্রিয়ের ন্যায় আচরণ করিতেন, ক্ষত্রিয়-বৃত্তি; ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম প্রতিপালন করিতেন, তাহার ক্ষীণ-স্মৃতি এখনও দুই এক স্থলে দৃষ্ট হয়—মুরশিদাবাদ ও অন্যান্য অঞ্চলে দুই একটী পরিবারে ক্ষত্রিয়ের ন্যায় দ্বাদশাহাশৌচ পালনেরও ব্যবহার দেখা যায়। যাহা হউক, সাধারণ মাহিষ্যগণ তখন যে পঞ্চাশৌচ পালন করিতেন তাহারও প্রমাণ আছে। মাহিষ্যের পিতামহগণ যে দ্বাদশাশৌচ ও পঞ্চাশৌচ করিতেন! কেবল মধ্যযুগের বিশৃঙ্খলতায় বর্ত্তমান পরিবর্ত্তন!!—সম্পাদক।

সন্তান। দ্বাপরযুগে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুন মাতুল ভগিনী কে বিবাহ করিয়াছিলেন; আমরাই বা এখন তাহা না করি কেন? আর আমাদের কুলললনাগণই বা দেবর দ্বারা পুত্র উৎপাদনে বিরত থাকেন কেন? তাই বলি, কোন বিধি কখন চিরস্থায়ী হয় না। জ্ঞানধর্ম্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যে ভ্রান্তি কুসংস্কারাদি দূরীভূত হয়, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। যাঁহারা দ্বিজধর্ম্মী মাহিষ্য-সন্তান বলিয়া পরিচয় দিয়া পক্ষাশৌচের বিরোধী, তাঁহাদিগকে আমরা বাতুল বলিয়া মনে করি।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—দেশাচার, কুলাচার এবং শাস্ত্রবিধি মধ্যে পরস্পর বিরুদ্ধ হইলে কোন পন্থা অবলম্বন করা শ্রেয়স্কর?

দেশাচার হইতে শাস্ত্রাচার বড়, কি শাস্ত্রাচার হইতে দেশাচার বড়—এ কথার মীমাংসক যখন শাস্ত্র, তখন শাস্ত্র ছাড়িয়া মনুষ্যসমাজের কোন ধর্ম্ম স্থান পাইবার উপায় নাই। এতদ্‌সম্বন্ধে শাস্ত্রকারগণের মত এই;—

"ন যত্র সাক্ষাদ্ বিধয়ো ন নিষেধাঃ শ্রুতৌ-স্মৃতৌ।
দেশাচার কুলাচারৈস্তত্রধর্ম্মো নিরূপ্যতে॥"—(স্কন্দপুরাণ)

যে বিষয়ে বেদে, স্মৃতিতে বা পুরাণে, সাক্ষাৎ বিধি বা নিষেধ নাই, সে বিষয়ে দেশাচার কুলাচার দ্বারা ধর্ম্ম নিরূপণ করিবে। আর যে বিষয়ে বেদে স্মৃতিতে বা পুরাণে সাক্ষাৎ বিধি বা নিষেধ আছে, সে বিষয়ে দেশাচার বা কুলাচার শ্রেষ্ঠ হয় না; অর্থাৎ শাস্ত্রবিধি উলঙ্ঘন পূর্ব্বক দেশাচার বা কুলাচার লইয়া ধর্ম্ম নিরূপণ করিবে না। যেহেতু শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন;—

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিং॥"—(গীতা ১৬।২৩)

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি ত্যাগ করিয়া ইচ্ছামত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে সিদ্ধি, শান্তি ও মোক্ষ প্রাপ্ত হয় না। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, পক্ষাশৌচ-পালনই মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত জাতির পক্ষে শাস্ত্রবিধি। শাস্ত্রবিধিই দেশাচার ও কুলাচার হইতে শ্রেষ্ঠ, সুতরাং শাস্ত্রবিধি অবশ্যই গ্রহণীয়। পুনশ্চ শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন;—

"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥"—(গীতা ১২।১০৮)

অতএব ইহা কার্য্য কি অকার্য্য, এইরূপ অবস্থাতে শাস্ত্র বিধানোক্ত জানিয়া কার্য্য কর। যদি কোন স্থানের, কোন দেশের বা কোন বংশের অবলম্বিত আচার ব্যবহারাদি শাস্ত্র-বিধির বিরোধী হয়, তাহা হইলে উহা পরিত্যাগ

করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যেহেতু শাস্ত্রের উক্তি আছে;—"দেশাচারকুলাচারয়ো শাস্ত্রবিধির্বলবান্॥" অর্থাৎ দেশাচার কুলাচার মধ্যে শাস্ত্রের বিধিই প্রধান। অতএব পক্ষাশৌচ পালন মাহিষ্যজাতির পক্ষে শাস্ত্রবিধি জানিবে। যেহেতু ঋষি-বাক্য যখন সর্ব্বথা গ্রাহ্য, তখন শাস্ত্রবিধি প্রতিপালন করা মানব-জীবের পরম ধর্ম্ম। নচেৎ অধর্ম্ম আক্রমণ করিবে।

আবার সমাজে এই একটা বিষম অন্তরায় দেখিতে পাওয়া যায়, পুরোহিত সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধতা। কতকগুলি পুরোহিত পিতৃপিতামহের আমল হইতে দ্বিজ-ধর্ম্মী মাহিষ্যগণকে শূদ্র মনে করিয়া তাহাদের যাজন ক্রিয়া করিয়া আসিতেছে। সুতরাং শূদ্রযাজন ইঁহাদের মজ্জাগত হইয়া গিয়াছে। এখন ইঁহারা আর সহজে তাহা ত্যাগ করিতে পারিতেছেন না। মাহিষ্যগণ বৈশ্যাচার অবলম্বন করিলে নামের সহিত "দাস দাসী" শব্দ ব্যবহার করিবে না। প্রণবপুটীত মন্ত্র সকল উচ্চারণ করিবে; এবং মাসাশৌচ পরিত্যাগ করিবে; সুতরাং বিদ্যাবাগীশ পুরোহিত মহাশয়ের শূদ্রযাজনের পৈশাচিক সুখে বঞ্চিত হইবেন। এই জন্য এই পুরোহিত পক্ষাশৌচের বিরোধী। এই শ্রেণীর পুরোহিতগণ হিন্দু শাস্ত্রানুসারে বর্জ্জনীয়। যেহেতু কালিকাপুরাণে লিখিত আছে;—

"কাণং ব্যঙ্গম পুত্রং বানভিজ্ঞমজতেন্দ্রিয়ম্।
ন হ্রস্বং ব্যাধিতং বাপি নৃপং কুর্য্যাৎ পুরোহিতং॥"

অর্থাৎ যাঁহারা অনভিজ্ঞ বা অজিতেন্দ্রিয় সে সকল ব্যক্তিকে পুরোহিত পদে বরণ করিতে সুস্পষ্টভাবে নিষেধাজ্ঞা রহিয়াছে। এখন যে সকল পুরোহিত মাহিষ্যের বৈশ্যোচিত কর্ম্মে যাজন করিতে অসম্মত; এবং এই জাতির বৈশ্যোচিত সকল কার্য্যে অধিকার আছে, ইহা জানিয়া শুনিয়া যাঁহারা ঈর্ষা-কলুষিত-মনে মাহিষ্যের বৈশ্যাচার পালনে বাধা দিতে সমুৎসুক, সে সকল পুরোহিত মাহিষ্যের একান্ত পরিত্যাজ্য। যাঁহারা সম্মত, তাঁহাদিগকে পৌরহিত্যে নিযুক্ত করা উচিত।

বঙ্গের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, পল্লীর শাসনভার সে সময়ে সমাজপতিগণের হস্তে ন্যস্ত থাকিত। পল্লীস্থ ন্যায়পরায়ণ, শিক্ষিত, জ্ঞানী, সমদর্শী, ত্যাগশীল, বুনিয়াদী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণই সমাজ পরিচালনা করিতেন। সমাজের মধ্যে যাহাতে কুরীতি, কুনীতি এবং কুভাব প্রবিষ্ট হইতে না পারে, তৎপক্ষে সমাজপতিগণ বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। বহু দিবস হইতে এই সমাজ-পতির কার্য্যটী বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সমাজ যেন পাপ ও অধর্ম্মের লীলা ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে যে সকল সদ্গুণ

সম্পন্ন ব্যক্তিগণ সমাজ শাসন করিতেন, অধিকাংশ স্থলে তাহাদিগের অশিক্ষিত বর্ব্বর বর্ত্তমান বংশধরগণ তাহাদিগের বংশবর্ত্তমানতার সাক্ষ্য দিতেছেন মাত্র। ইহারা সমাজপতির আসনের দাবী করেন, কিন্তু সেরূপ কোন গুণ নাই।

সামাজিক ধর্ম্ম-বিপ্লবে বা রাজ অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া যাঁহারা আচার ভ্রষ্টভাবে এতকাল দিনযাপন করিতেছিলেন, তাঁহারা যদি পুনরায় তাহাদিগের পিতৃ বা মাতৃবংশের সদাচার নিষ্ঠা প্রভৃতি স্মরণ করিয়া আত্মোৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হন, তাহাতে কোনরূপ প্রতিকুলাচরণ না করিয়া সহায়তা করাই সমাজ-হিতৈষী মাত্রেরই কর্ত্তব্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের দেশে যাহারা প্রধান বা সমাজের নেতা বলিয়া পরিচিত, এ বিষয়ে তাহাদের সহায়তা করা দূরে থাকুক, পদে পদে প্রতিকূলতাচরণ করিবার জন্য বদ্ধপরিকর। ইতঃপূর্ব্বেই বলিয়াছি, পূর্ব্বে যে বংশে সদ্‌গুণসম্পন্ন সমাজপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহার বংশে কুলাঙ্গার কুপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়া সমাজপতির আসন কলঙ্কিত করিতেছেন মাত্র। এই সকল শাস্ত্রানভিজ্ঞ অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ কুবুদ্ধিপ্রভাবে বিষম সমাজ-বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছেন। ইহাদের সমাজোন্নতি-কল্পে প্রবৃত্তি নাই, অথচ কোন ব্যক্তি সমাজ-হিতকর কার্য্যে ব্রতী হইলে, তাহার প্রতিবন্ধকতাচরণ করিতে একটুমাত্রও লজ্জাবোধ করেন না। তাহা বলিয়া সমাজে সুবিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত সমাজপতি নাই, এরূপ কথা আমরা বলিতে চাহি না। সমাজহিতৈষী সমাজপতি মাত্রেই আমাদের বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র, সন্দেহ নাই।

মাতৃবর্ণানুসারে মাহিষ্য বৈশ্য, কদাচ শূদ্র নহে। হে মাহিষ্য ভ্রাতৃগণ! এ ভুল কি আপনারা একবার ভাবিবেন না? হৃদিক্ষেত্রে কি আত্মসম্মানের বীজ অঙ্কুরিত হইবে না? প্রকৃত মাহিষ্যের মত কার্য্য করিতে আরম্ভ করুন, উচ্চহৃদয়ের পরিচয় দেন, পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করুন, স্বজাতি-বৎসল হউন, শূদ্রাচার পরিত্যাগ করুন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি, কোন কোন স্থলে মাহিষ্য-কৈবর্ত্তগণ যাহাতে পক্ষাশৌচ গ্রহণ না করেন, সে জন্য কতকগুলি নীচ-প্রকৃতি ব্যক্তি সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে! এজন্য আমাদের সকলেরই সাবধান হইয়া প্রতীকার-চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে কি?

পক্ষাশৌচ লইয়া পরস্পর মনোবিবাদ, মনোমালিন্য উপস্থিত করা কি এ সময় বাঞ্ছনীয়? কখনই নহে। তাই বলি ভাই! গ্রাম্যঝগড়া, দলাদলি, হিংসা, দ্বেষ ও গোঁড়ামী পরিত্যাগ করিয়া জাতীয় কাজ নিষ্কামভাবে করিয়া যান। তাহা হইলে বহুকালের বিলুপ্ত গৌরব-রবি মাহিষ্য-সমাজে পুনঃ প্রকাশিত হইবে।

ডাক্তার শ্রীবসন্তকুমার ভৌমিক।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

তমলুক-গোপালপুর ও মহিষাদল-বক্সিচক চতুষ্পাঠীর কথা।—মেদিনীপুর—তমলুক ও মহিষাদল অঞ্চলে এই দুইটী চতুষ্পাঠী বিশেষ যোগ্যতার সহিত পরিচালিত হইতেছিল। সম্প্রতি সাধারণের সহানুভূতির অভাবে দুইটী টোল উঠিয়া যাইবার সম্ভব হইয়াছে। মাহিষ্য-সমাজের বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণের বিশেষ দৃষ্টি এদিকে আকর্ষণ করা যাইতেছে। বিগত কয়েক বৎসরে বেদ, বেদান্ত, ব্যাকরণ, উপনিষৎ প্রভৃতি বিষয়ে ছাত্রগণ কিরূপ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছিল, তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে। তৎপ্রতি প্রণিধান করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে টোল দুইটীর কিরূপ উন্নতি হইতেছিল। আশা করি, স্থানীয় মহাত্মগণ এবিষয়ে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিবেন।

বক্সিচক চতুষ্পাঠীর ফল।—১৩১৫।—ব্যাকরণ প্রথম ৪ জন, বেদান্ত প্রথম ১ জন, সামবেদ প্রথম ১ জন, উপনিষদ্ দ্বিতীয় ১ জন। ১৩১৬।—সামবেদ প্রথম ৩ জন। ১৩১৭। বেদান্ত দ্বিতীয় ১ জন, সামবেদ দ্বিতীয় ১ জন, ব্যাকরণ প্রথম ১ জন, উপনিষদ্ প্রথম ১ জন। ১৩১৮। সামবেদ দ্বিতীয় ১ জন, ব্যাকরণ দ্বিতীয় ১ জন, মীমাংসা প্রথম ১ জন, ঋগ্‌বেদ প্রথম ১ জন, উপনিষদ্ প্রথম ১ জন। ১৩১৫ সালে ২টী রৌপ্যপদক ৬৲ মাসিক গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি। ১৩১৬ সালে ১টী রৌপ্যপদক। ১৩১৭ সালে ১টী রৌপ্যপদক।

গোপালপুর চতুষ্পাঠীর ফল।—১৩১৪।—বেদান্ত প্রথম ১ জন, উপনিষদ্ প্রথম ১ জন। ১৩১৫।—ব্যাকরণ প্রথম ৫ জন। ১৩১৬।—ব্যাকরণ প্রথম ৭ জন দ্বিতীয় ১ জন। ১৩১৭।—ব্যাকরণ প্রথম ৫ জন দ্বিতীয় ৪ জন। ১৩১৮।—ব্যাকরণ প্রথম ১ জন, দ্বিতীয় ২ জন, সামবেদ প্রথম ১ জন। ১৩১৫ সালে ৪৲ টাকা মাসিক বৃত্তি। ১৩১৬ সালে ৮৲ মাসিক গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত বৃত্তি। ১৩১৭ সালে ঐ ৮৲ টাকা অধ্যাপক পাইয়াছিলেন। এ বৎসর বেদবেদান্ত ব্যাকরণ কাব্য প্রভৃতি শাস্ত্রের উপাধি পরীক্ষার্থী প্রায় ১০।১১ জন রহিয়াছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বোধ হয় আশা পূর্ণ হইবে না।

পঙ্কাশৌচ-সংবাদ।—(১) মেদিনীপুর জেলার পাঁষকুড়া থানার অন্তর্গত বাহারপোতা গ্রামের মাধবচন্দ্র প্রামাণিকের আদ্যশ্রাদ্ধ। (২) ঐ গ্রামের কৃষ্ণকান্তি মাইতির আদ্যশ্রাদ্ধ। (৩) ঐ গ্রামের হরিনাথ মাইতির পত্নীর শ্রাদ্ধ (৪) ঐ গ্রামের শিবপ্রসাদ সামন্তের মাতৃশ্রাদ্ধ (৫) ঐ গ্রামের ত্রৈলোক্য মাইতির আদ্যশ্রাদ্ধ (৬) ঐ গ্রামের বলাইচরণ বেরার পত্নীর শ্রাদ্ধ (৭) রাধারমণ মাইতির পত্নীর শ্রাদ্ধ (৮) ভোগপুর গ্রামনিবাসী গোরাচাঁদ সামন্তের আদ্য শ্রাদ্ধ (৯) জেলা যশোহর মহেশপুর থানার অন্তর্গত ঝিকরী পোতা গ্রামে ৺হারাণচন্দ্র বিশ্বাসের শ্রাদ্ধ—৩রা শ্রাবণ (১০) জেলা মেদিনীপুর, পরগণা কাশীযোড়া, বরদাবাড় গ্রামে শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার ঘড়ুইয়ের পিতৃস্বসার আদ্যশ্রাদ্ধ (১১) পদ্মপুর গ্রামের শ্রীঅখিলচন্দ্র দিণ্ডার পিতৃশ্রাদ্ধ (১২) জিঞ্যাদা গ্রামের শ্রীমহাদেব মাইতির পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ। জেলা ২৪ পরগণা পোষ্ট বিষ্ণুপুর (১৩) বরাহানপুর সাকিমের শ্রীনারায়ণচন্দ্র সামন্তের খুড়ীমাতার আদ্যশ্রাদ্ধ—২০শে শ্রাবণ, (১৪) শ্রীকৃষ্ণপুর নিবাসী শ্রীধর্ম্মদাস মণ্ডলের জ্যেঠাই মার শ্রাদ্ধ ২৭শে শ্রাবণ (১৫) বজবজ, পোষ্ট বাওয়ালী বৃন্দাবনপুর গ্রামের নন্দলাল মান্নার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ—২৩শে শ্রাবণ (১৬) বিষ্ণুপুর থানার মহামায়াপুর গ্রামের শশিভূষণ খাড়ার আদ্যশ্রাদ্ধ—১৬ই বৈশাখ।

সমালোচনা।

মানস-কুঞ্জ।—শ্রীযুক্ত মুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী প্রণীত কবিতা পুস্তক—মূল্য আট আনা।—মুনীন্দ্র বাবু পূর্ব্বেও কয়েকখানি কবিতাপুস্তক লিখিয়াছেন। তাঁহার কবিতাগুলিতে একটু নূতনত্ব আছে। মানসকুঞ্জেও যে অভিনব ভাব কিছু আছে, তাহা পাঠ করিলেই বুঝা যায়। তাঁহার কবিতা-পুষ্পের সৌরভে পাঠকের হৃদয় আকুল হইয়া থাকে। ভাষা ও শব্দ সম্পদেও মুনীন্দ্র বাবু ধনী—দুই এক স্থলে অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হইলেও তাঁহার ভাষা পরিমার্জ্জিত—আবেগময়ী। মানস-কুঞ্জের কবিতাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অভিনব জিনিষ—সনেটের গুচ্ছ।—চৌদ্দটী চরণেই এক একটী সম্পূর্ণ ভাব ব্যক্ত

হইয়াছে—মুন্সীজী বাবু তাঁহাতে কৃতকার্য্য হইয়াছেন, ইহা বলিতে পারি। মাইকেলের পর আর কোনও লেখক এরূপ চতুর্দ্দশপদী কবিতা লিখিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য অলঙ্কৃত করেন নাই।

বৈষ্ণব-বিবৃতি।—শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস অধিকারী কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও জেলা হুগলী—এলাটী পোষ্ট শ্রীবৈষ্ণবসঙ্গিনী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত মূল্য ॥৵০ আনা মাত্র। ইহা প্রথম খণ্ড অন্যান্য খণ্ডও পরে প্রকাশ্য। বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে বেদ প্রতিপালিত মুখ্য ধর্ম্ম ও বৈষ্ণবজনের আচার ব্যবহার যে সম্পূর্ণ বেদবিধি সম্মত তাহা প্রদর্শন করিবার জন্যই গ্রন্থকার যথেষ্ট প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। সনাতন আর্য্য ধর্ম্মের বিভিন্ন উপাসক সম্প্রদায় মধ্যে বৈষ্ণবগণ যে উচ্চাসন অধিকার করিয়া আছেন তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। সময়ে সময়ে এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি লোকের অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতে দেখিয়া গ্রন্থকার দুঃখিত। শিক্ষা ও সদাচার অভাবেই মানব জনসমাজে হেয় ও অবজ্ঞার পাত্র হয়। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীত হইয়াছি। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

প্রার্থনা-শতক।—বৈষ্ণব দাসানুদাস শ্রীবিজয়নারায়ণ আচার্য্য কর্ত্তৃক বিরচিত শত সংখ্যক কবিতার একত্র সমাবেশ। ইহাতে চিরপ্রাচীন প্রেম-ভক্তি-রসের সুধাধারা প্রবাহিত হইতেছে। কবিতাগুলি পাঠ করিতে করিতে হৃদয়ে স্বতঃই প্রেমের সরস ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়—ভক্তির আবেশে মন প্রাণ আকুল করে। মূল্য ॥০ আনা মাত্র। শ্রীবৈষ্ণব সঙ্গিনী কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

মাহিষ্য-সমাজ।

২য় ভাগ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা—আশ্বিন, ১৩১৯।

উচ্চ শিক্ষাবিস্তারের উপায়।

সংস্কৃতে একটা কথা আছে—"বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য অবোধস্য কুতোবলং।" ইহারই প্রতিবাক্য স্বরূপ Knowledge is power এই মহাজন-বাক্যটী ব্যবহৃত হইতে পারে, এই শক্তি ভিন্ন উন্নতির উপায়ান্তর নাই। জগতে যাবতীয় উন্নতির মূলই শক্তি। উন্নতির পথ নানারূপ বিঘ্নবিপত্তি-সঙ্কুল—কুসুমাস্তীর্ণ নহে। শক্তিশালী ব্যক্তি ভিন্ন কেহ এই পথে প্রবেশ করিতে পারে না, দুর্ব্বল ব্যক্তির এই পথে পদার্পণের আশা দুরাশা মাত্র। তুমি আমি উভয়েই ঈশ্বর-প্রদত্ত দুই পদ, দুই হস্ত, দুই কর্ণ, দুই চক্ষু প্রভৃতি সম-ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট, সার্দ্ধ ত্রিহস্ত-পরিমিত মনুষ্য। তুমি, আমার এবং আমার মত শত সহস্র ব্যক্তির উপর প্রভুত্ব করিয়াও পরমসুখে কাল যাপন করিতেছ; আর আমি একমুষ্টি অন্নের জন্ত হা অন্ন, যো অন্ন করিয়া যার তার কাছে হাত পাতিয়া বেড়াইতেছি! মানুষে মানুষে এ বিস্ময়কর পার্থক্য কেন? সমদর্শী বিশ্বেশ্বরের রাজ্যে এ বিষম বৈষম্য কেন? শক্তি এই পার্থক্য এবং বৈষম্যের স্থষ্টিকর্ত্রী। তুমি শক্তিশালী বলিয়া এ হেন প্রভুত্ব ও সুখৈশ্বর্য্যের অধিকারী হইতে সমর্থ হইয়াছ; আর আমি শক্তি-হীন বলিয়া অবনতির অন্ধকূপে পড়িয়া দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিতেছি—কিছু-তেই উঠিতে পারিতেছি না। শক্তিশালী ব্যক্তির ইহজগতে অসাধ্য কি? এই শক্তির গুণেই তো চপলা সৌদামিনী চাপল্য পরিত্যাগ করিয়া মানবের দাসীত্বে নিযুক্ত হইতে বাধ্য হইয়াছে। এই শক্তির গুণেই তো অমিতবল ভীষণ পশুর উপর দুর্ব্বল মানবের এবং সামান্যের উপর অসামান্যের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছে।

শিক্ষা এই শক্তির প্রসূতি। এই শিক্ষা কি?—সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, সভ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ, এই জ্ঞানের দ্বার অবারিত—

সকলেই ইহাতে প্রবেশ করিয়া শক্তিরূপা সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন। সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে তদুপোযোগী সাধনা আবশ্যক। বিনা সাধনায় কেহ কখনও সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না। শ্রেয়ঃ বস্তু লাভের জন্য ঐকান্তিক ইচ্ছা অধ্যবসায়ই সাধনা। অতি প্রাচীনকালে ভারত সাধনা দ্বারা শক্তিরূপা সিদ্ধিলাভ করতঃ সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য সভ্যতার শীর্ষ স্থান লাভ করিয়া জগদ্বরেণ্য হইয়াছিল। এই সাধনা ভুলিয়াই তো ভারতের আজ এই দুঃখ, দুর্গতি ও অবনতি! যে কোন জাতি, যতই ঘৃণিত, লাঞ্ছিত, অবনত এবং অসভ্য হউক না কেন এই সাধনমার্গ অবলম্বন করিলে জগতের সমগ্র সভ্যজাতির দৃষ্টি এবং সম্ভ্রম আকর্ষণ করিতে পারে। পৃথিবীর ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহার ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

কালের বিচিত্র গতিতে বর্ত্তমানে মাহিষ্যজাতির পূর্ব্বের সে গৌরবান্বিত সমুন্নত অবস্থা নাই। এখন আছে কেবল দুঃখ, দুর্গতি, আত্ম-কলহ হিংসাদ্বেষ। এই দুঃখ দুর্গতি দূরীকরণোদ্দেশ্যে মাহিষ্যসমাজে এক তমুল আন্দলনের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছে, এই তরঙ্গ সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই হৃদয়ে ঘাত-প্রতিঘাত করিতেছে, তবে জড়ভরত জাতীয় হৃদয়বিহীন কতকগুলি ব্যক্তি এই তরঙ্গ হইতে এখনো অনেক দূরে রহিয়াছে। ইহা কখনো তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে কি না, বলিতে পারি না। সমাজ একটী দেহস্বরূপ। বিভিন্ন শ্রেণী ইহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। দেহের কোন অঙ্গ দুর্ব্বল বা বিকল হইলে সমুদয় শরীরটাই যেমন অবসন্ন হয়, তেমনি সমাজ-দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মধ্যে কোন শ্রেণী যদি অশিক্ষিত থাকে, তবে সে সমাজও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, তাহার শক্তি ও সামর্থ্য নষ্ট হইয়া যায় এবং ধীরে ধীরে অবসাদ আসিয়া তাহার সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গ্রাস করিয়া ফেলে। মাহিষ্য-সমাজ-দেহেরও ঠিক এই দশা উপস্থিত হইয়াছে।

জগতের যাবতীয় দুঃখ দুর্গতি দূর করিবার একমাত্র অব্যর্থ উপায়—শিক্ষা। সেদিন মহীশূরের রাজা আপন দরবারে সকলের সমক্ষে বলিয়াছেন, "মানুষের সকল দুঃখ এবং দুর্গতি দূর করিবার এক সার্ব্বজনীন প্রতীকার আছে;—সে প্রতীকার জন-সাধারণের শিক্ষা।" ভারতবন্ধু লর্ড রিপন ভারতের দুঃখদুর্গতি দেখিয়া তৎকালীন জননায়কগণকে বলিয়াছিলেন, —'ভারতের সকল দুঃখকষ্ট দূর করিবার প্রথম উপায় শিক্ষা—দ্বিতীয় উপায় শিক্ষা—তৃতীয় উপায় শিক্ষা।" অর্থাৎ শিক্ষা

ভিন্ন 'নান্যোব নান্যোব গতিরন্যথা'। সাহিত্য-সমাজের দুঃখ দুর্গতিও এই শিক্ষা ভিন্ন অন্য কোন উপায়েই দূরীকৃত হইবে না। আমাদের সুযোগ্য নেতৃবর্গ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন। বুঝিতে পারিয়া সমাজের সাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার উদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রকার উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রস্থল কলিকাতা মহানগরীতে একটী "সারস্বত-ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন করিতেছেন। সাহিত্য-সমাজের পাঠকগণ এ সংবাদ অবগত আছেন। ইতঃপূর্ব্বে "লাভক্ষতি" প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে কথঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি।

যাঁহারা সাহিত্য-সমাজের প্রতি একটু নজর রাখেন, তাঁহারা জানেন, কত ছাত্র প্রতি বৎসর ম্যাট্রিকুলেশন, ইণ্টারমিডিয়েট্ আর্ট প্রভৃতি পরীক্ষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াও দারিদ্র্য প্রযুক্ত বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী দেবী স্বরস্বতীর নিকট চির-বিদায় গ্রহণ করতঃ হতাশভাবে ক্ষুণ্ণমনে সামান্য সামান্য বিষয় কর্ম্মে প্রবিষ্ট হইয়া ম্লান জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয়। সুযোগ পাইলে ইহারা মানুষের মত মানুষ হইয়া সমাজের অলঙ্কার স্বরূপ হইতে পারিত এবং ইহাদের অনুগ্রহে আরো কত জন 'মানুষ' হইয়া মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারিত। হায়! সাহিত্য-সমাজের কত প্রতিভা এইরূপে অকালে নষ্ট হইতেছে, কত প্রতিভা একটু বিকশিত হইয়াই আর বিকাশের পথ না পাইয়া ম্লান হইয়া যাইতেছে!! এই সব প্রতিভা স্ফুর্ত্তি লাভ করিবার পথ পাইলে সাহিত্য-সমাজের অবস্থা আজ অন্যরূপ দাঁড়াইত। প্রস্তাবিত "সারস্বত ভাণ্ডার" স্থাপন ভিন্ন এই সব প্রতিভা রক্ষা এবং প্রস্ফুটিত করিবার উপায়ান্তর নাই। "মহসিন ফণ্ড" মুসলমান সমাজের প্রতিভা বিকাশের পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছে। ঐ ফণ্ডের কল্যাণে মুসলমান সমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা দ্রুতবেগে বাড়িয়া যাইতেছে। মুসলমান সম্প্রদায়ের—শুধু মুসলমান সম্প্রদায়েরই বা কেন?—সমগ্র বাঙ্গালীর গৌরব হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জষ্টিস্ আমীর আলী ঐ "মহসিন ফণ্ডের" অমৃতময় ফল। আমীর আলীর ইংলণ্ডে বিদ্যা শিক্ষার সমগ্র ব্যয় "মহসিন ফণ্ড" বহন করিয়াছিল। মহাত্মা মহসিনের ন্যায় স্বজাতি প্রেমিক ব্যক্তি খুব কমই দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি মুসলমান সমাজের শোচনীয় অধঃপতন দর্শনে ব্যথিত-হৃদয় হইয়া তৎপ্রতীকারের মানসে দেড়লক্ষ টাকার উপর বার্ষিক আয়ের তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি স্বজাতির কল্যাণে উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। এই "মহসিন ফণ্ড" প্রতিষ্ঠিত না হইলে মুসলমান সম্প্রদায় আজ শিক্ষা দীক্ষায় এতদূর অগ্রসর হইতে পারিতেন না—অনেক পশ্চাতে অন্ধকারে পড়িয়া থাকিতেন।

জনসংখ্যার অনুপাতে মাহিষ্যসমাজে শিক্ষিতের সংখ্যা আশানুরূপ সন্তোষজনক নহে। শিক্ষিতের সংখ্যা সন্তোষজনকরূপে বৃদ্ধি করিতে হইলে "মহসিন ফণ্ডের" ন্যায় একটী "সারস্বত-ভাণ্ডার" যত শীঘ্র সম্ভব প্রতিষ্ঠা করা কর্ত্তব্য। কিন্তু মাহিষ্য-সমাজে মহাত্মা মহসিনের মতন স্বজাতি-প্রেমিক ব্যক্তি কই? কালে জন্মিবে কি না—কে জানে? জন্মিলেও সে শুভকাল কত দূরবর্ত্তী—কে বলিবে? আমাদের যে "সারস্বত ভাণ্ডার" এখনই চাই! আমাদের দ্বারা কি এ মহৎ কাজ সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব? কখনই নয়। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলিতেন Impossible is a word found in the Dictionary of fools অর্থাৎ 'অসম্ভব' কথাটা কেবল মূর্খলোকের অভিধানেই পাওয়া যায়। মাহিষ্য-সমাজস্থ সব্‌জজ, ডেপুটি, মুন্সেফ, ব্যারিষ্টার, উকীল, মোক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ওভারসিয়ার, আমীন, প্রফেসর, মাষ্টার, পণ্ডিত, ডাক্তার, কবিরাজ, ষ্টেট-ম্যানেজার, নায়েব, ব্যবসায়ী, মহাজন, জমিদার, তালুকদার, গাতিদার, জোৎদার প্রভৃতি সুশিক্ষিত উচ্চশিক্ষিত এবং অল্পশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের সম্মিলিত চেষ্টায় অল্পকাল মধ্যে "সারস্বত-ভাণ্ডার" প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। কেহ বলিতে পারেন, বিংশতি লক্ষ লোক সম্বলিত মাহিষ্য সমাজে উক্ত পদস্থ শিক্ষিত এবং সম্পন্ন লোকের সংখ্যা অতি সামান্য। অধিকাংশই যে নিরক্ষর মূর্খ। সুতরাং "সারস্বত-ভাণ্ডার" স্থাপন অসম্ভব। ইহার উত্তরে আমি বলি—অসম্ভব নয়—সম্পূর্ণ সম্ভব—শত শতবার সম্ভব। কেমন করিয়া, বলিতেছি। মাহিষ্য জাতিতে জমিদার তালুকদারের সংখ্যা এগার হাজার। এই এগার হাজারের প্রত্যেকে এই শুভ কাজের জন্য অনায়াসে দুই, চারি, দশ, বিশ, শত, সহস্র বা তদূর্দ্ধ টাকা প্রদান করিতে পারেন। বিশ লক্ষ মাহিষ্য বহু পরিবারে বিভক্ত। প্রত্যেক পরিবারের লোক সংখ্যা গড়ে ১৫ জন করিয়া ধরিলে এক লক্ষ তেত্রিশ হাজার পরিবার হয়। এই একলক্ষ তেত্রিশ হাজারের প্রত্যক পরিবার হইতে এ হেন সমাজ-হিতকর শুভ উদ্দেশ্যে এক টাকা দুই টাকা বা স্থল বিশেষে ইহার অপেক্ষা অধিক হারে আদায় করা অসম্ভব নহে। কিন্তু আদায় করে কে? "সারস্বত-ভাণ্ডার" স্থাপনের প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে মাহিষ্যসমাজে সুপরিচিত বিভিন্ন জেলাস্থ কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি, ভূম্যধিকারী, মহাজন, ধনী এবং ব্যবসায়ী ব্যক্তির সম্মিলনে একটী "কার্য্যকরী সভা" গঠিত হওয়া কর্ত্তব্য। এই সভ্যগণ "সারস্বত-ভাণ্ডারে" দানের দৃষ্টান্ত অগ্রে প্রদর্শন করিবেন। এইরূপ ব্যাপারে শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের

সম্মিলন কার্য্যোদ্ধার পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। শিক্ষিত ব্যক্তির সাধারণের উপর এরূপ একটা প্রভাব আছে যে, তাহাদিগকে জোড় করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে টানিয়া আনিতে পারেন। বারোইয়ারীতে গ্রামস্থ মাতব্বর ব্যক্তিগণের নেতৃত্বে প্রতি বৎসর কত টাকা সংগৃহীত হইয়া নাচ গান, আমোদ প্রমোদ, আলোক এবং বাজি ও বারুদে ব্যয়িত হইতেছে। এমত অবস্থায় সাহিত্যসমাজের পক্ষে মহামঙ্গলজনক "সারস্বত-ভাণ্ডারের" জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে এক কালীন কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করা যে অসম্ভব হইবে, ইহা কিছুতেই আমার মনে হয় না। তবে সমাজস্থ শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের এ বিষয়ে একটু মনযোগ চাই। আর মনযোগ চাই আমাদের সমাজস্থ অবসরপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীবর্গের। তাঁহারা বার্দ্ধক্যে জীবনটা অলস ভাবে ঝিমাইতে ঝিমাইতে অতিবাহিত করিবেন— এমনটা আমরা কোনমতেই বাঞ্ছনীয় মনে করি না। তাঁহারা যে কয়দিন বাঁচেন এই অধঃপতিত সমাজের উদ্ধার সাধন উদ্দেশ্যে একটু যত্ন ও শ্রম করিয়া যান, আমাদের এইরূপ ইচ্ছা। কারণ তাঁহাদের একটু মনযোগে সমাজের অনেকের মতিগতি সুপথে আসিবে। সারা জীবন কাজ করিয়াই কাটাইলেন। স্বজাতির কাজও কিছু করিয়া যান—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

অর্থের সার্থকতা সম্বন্ধে মহাপণ্ডিত লর্ড বেকন যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের সমাজস্থ ধনীবর্গের অবগতির জন্য এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি। "ধন চিরস্থায়ী নহে, ধনের অনেক শত্রু, ধন লোহার সিন্দুক হইতেও পলায়ন করে। সুতরাং সুযোগ আসিলেই অর্থের সদ্ব্যবহার করা আবশ্যক। ঐশ্বর্য্য জাকজমকের জন্য নহে। কেবল আত্মসম্মান সংরক্ষণ, সৎকীর্ত্তি স্থাপন, সৎকার্য্যে দান ও সৎপাত্রে বিতরণ ভিন্ন ঐশ্বর্য্যের অন্য আবশ্যকতা নাই। অতুল ঐশ্বর্য্য রক্ষা করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। অতুল ঐশ্বর্য্য রক্ষণার্থে সর্ব্বদাই ব্যতিব্যস্ত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকিতে হয়, মনে কিছুমাত্র শান্তি থাকে না। অনেক অবশ্য কর্ত্তব্য গুরুতর কার্য্যের গুরুতর বিষয়ে মনোনিবেশ করিতে অবকাশ পাওয়া যায় না। ঐশ্বর্য্য এত অপর্য্যাপ্ত যে, তাহা কখনই একজনের ভোগে আসিতে পারে না। কেবল বিতরণ ভিন্ন ঐশ্বর্য্যের আর কিছু প্রয়োজন নাই। মরণেরও অবধারিত কাল নাই। হয় ত অদ্যই জীবনের শেষ দিন হইতে পারে। ব্যাঘ্র যেমন হঠাৎ আসিয়া মেষ শাবককে লইয়া যায়, মৃত্যুও তেমনি কখন আসিয়া কোন্

মনুষ্যকে হঠাৎ লইয়া যাইবে, তাহার স্থিরতা নাই। সুতরাং মৃত্যুর জন্য প্রত্যেক ব্যক্তিরই প্রস্তুত থাকা উচিত। মরণকালে ধন সঙ্গে যাইবে না। একজন অযোগ্য উত্তরাধিকারী হয় ত এই ধন সম্পত্তি অধিকার করিবে। উত্তরাধিকারীর বয়স যদি অল্প হয় এবং তাহার সদসৎ বিবেচনা শক্তি না থাকে, তবে কতিপয় ধূর্ত্ত, লম্পট তাহার সহচর জুটিয়া, এই সকল ধন সম্পত্তি লুটিয়া খাইবে; অথবা আপনার অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর পর, আপনার অবিদ্যমানে সমুচিত তত্ত্বাবধানের অভাবে, কতিপয় অর্থলোলুপ পামর আসিয়া এই সকল ধন সম্পত্তি অধিকার ও উপভোগ করিতে থাকবে। সুতরাং ধনসম্পত্তি যতক্ষণ আপনার অধিকারে আছে, ততক্ষণ দানে ও ভোগে তাহার সার্থকতা সম্পাদন করা আবশ্যক। হে সাহিত্য সমাজস্থ ধনশালী ব্যক্তিগণ! একবার সমাজের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। অর্থের সদ্ব্যবহারের বড় সুসময় উপস্থিত। "সারস্বত-ভাণ্ডার" স্থাপনের জন্য মুক্তহস্ততার পরিচয় দিয়া প্রতিভা সম্পন্ন দরিদ্র সাহিত্য ছাত্রগণের জ্ঞান-পিপাসা তৃপ্তির পথ সুগম করিয়া দিন। নতুবা সাহিত্যসমাজকে বড় পশ্চাতে পড়িয়া থাকিতে হইবে। দুদিন আগে হউক, পরে হউক, এ সাধের সংসার ছাড়িয়া যাইতে হইবে। কেবল সুকীর্ত্তি-গুণে এই মর ভবনে অমরত্ব লাভ করা যায়,—

"চলাচলমিদং সর্ব্বং কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।"

শ্রীরেবতীরঞ্জন রায়।

অবনতির ইতিহাস (৩)।

সাহিত্য-সমাজে ইংরেজীচর্চ্চা অনেক কম, তাহাতে সন্দেহ নাই। মুসলমানদিগের মধ্যেও আমাদের ন্যায় পূর্ব্বোক্ত তিনটী প্রধান কারণে ইংরেজী শিক্ষার বিস্তার হয় নাই। মুসলমান নেতৃগণ তাহা উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন এবং সমবেত জাতীয় চেষ্টায় মুসলমানজাতি শিক্ষার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। আট দশ বৎসর পূর্ব্বে স্কুলে দুই চারিটী মুসলমান বালক দেখা যাইত। এখন প্রতি শ্রেণীতেই এমন কি কলেজেও বহু মুসলমান ছাত্র অধ্যয়ন করিতেছে। তাহাদের উৎসাহ ও ঐকান্তিক যত্ন দেখিলে হৃদয়ে আনন্দের আবির্ভাব হয়। ভগবান তাহাদিগের উদ্যমে সুফল প্রদান করুন। যদি সাহিত্য-সমাজ ঐ দৃষ্টান্ত অনুকরণ না করেন, তবে ভবিষ্যৎ নিবিড় অন্ধকারে আবৃত হইবে।

চতুর্থতঃ, উৎসাহের অভাব। শিক্ষার্থীর পক্ষে জন সাধারণের, অভিভাবকের বা কর্ত্তৃপক্ষের উৎসাহ ও প্রশংসা বচন বিশেষ উপকারী। উৎসাহ না পাইলে মনে নিরাশার ও আলস্যের সঞ্চার হয়। উহাই পতনের হেতু। দেশে প্রথম ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্ত্তন কালে রাজপুরুষগণ বালকদিগকে সর্ব্বদা উৎসাহিত করিতেন। ঘন ঘন স্কুল পরিদর্শন ও বালকবৃন্দের সহিত আলাপন এবং কৃতবিদ্য যুবককে উত্তম কার্য্য প্রদান করিয়া প্রোৎসাহিত করা হইত। ইহার ফলে বালকেরাও আনন্দের সহিত তদভিমুখে ধাবিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাহিষ্য বালকগণ পূর্ব্বাপর এরূপ সুবিধা পাইতে পারে নাই। বরং অনেক স্থলে শিক্ষকগণ কর্ত্তৃক আরও নিরুৎসাহ বচন শুনিয়া ব্যর্থমনোরথে গৃহে ফিরিয়াছে। কৃতবিদ্য মাহিষ্যযুবক উচ্চ রাজপদও পাইতে পারে নাই। অন্যান্য জাতীয় লোক দ্বারা গবর্ণমেণ্ট আফিস সমূহ প্রথম হইতেই এরূপ পরিপূর্ণ এবং তাহাদের স্বজাতীয় প্রীতি এতই বলবতী যে, মাহিষ্য কর্ম্মপ্রার্থী তাহাদিগের চক্রজাল ছিন্ন করিয়া উঠিতে সম্পূর্ণ অক্ষম। শিক্ষিত যুবকের উন্নতি না দেখিয়া চতুঃপার্শ্বের অপর কেহই উৎসাহী হইতে পারেন নাই। এমন কি অনেকের মনে এই ধারণা জন্মিয়া উঠে যে, উচ্চপদ তাহাদের প্রাপ্য নহে।

পঞ্চমতঃ, সামাজিক বিরোধ মাহিষ্যের শিক্ষার পথে প্রধান অন্তরায় হইয়াছে। পূর্ব্বেই ইহা বলা হইয়াছে যে, কোম্পানীর আমলে ক্রমশঃ মাহিষ্যগণ আর্থিক অবস্থায় হীন হইতে থাকেন এবং অন্যান্য জাতীয় ব্যক্তিগণ চাকুরির অর্থে অবস্থা স্বচ্ছল করিয়া সামাজিক গৌরবের নিমিত্ত মাহিষ্যের কুৎসা রচনায় প্রবৃত্ত হয়। এই কুৎসা ও নিন্দাবাদের ফলে পরস্পরের প্রতি ঘৃণা ও দ্বেষ অতিশয় বৃদ্ধি পায়। ফলে ঐ সকল জাতীয় লোক আপনাদের ক্ষমতার অন্তর্গত বিদ্যালয়াদিতে মাহিষ্য বালকের শিক্ষার পথ প্রকারান্তরে রোধ করিয়া দেয়। মাহিষ্য বালক উচ্চশিক্ষিত হইলেই উন্নত হইয়া যাইবে—ইহাই তাহাদের ভয়। অনেকস্থলে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগের সহিত এসম্বন্ধে কলহের ফলে মাহিষ্যগণ দলবদ্ধ হইয়া বালকদিগকে বিদ্যালয়ে প্রেরণ বন্ধ করেন; অথচ সমবেত চেষ্টায় মাহিষ্য কেন্দ্রে স্কুল স্থাপনের কোনও আয়োজন করা হয় নাই। কাজেই বালকগণ অশিক্ষিত রহিয়া গিয়াছে। সুখের কথা এই যে, বহু জেলাতেই মাহিষ্য জাতি ধনে জনে অন্যান্য জাতি হইতে শ্রেষ্ঠ থাকায় এরূপ অনিষ্ট সর্ব্বত্র ঘটিতে পারে নাই।

ষষ্ঠ কথা এই যে, মাহিষ্য-সমাজের অন্তর্গত বিভিন্ন শাখায় পরস্পর একতার

অভাবে পরস্পরের অসহানুভূতি ও ঈর্ষার ফলেও শিক্ষার প্রচুর ব্যাঘাত হইয়াছে এবং হইতেছে।

আমরা সংক্ষেপে পতনের কারণগুলি আলোচনা করিলাম। আরও বহু কারণ আছে, যাহা সকলেরই বিশেষ ভাবিয়া দেখা আবশ্যক। এই সকল কারণে বর্ত্তমানে মাহিষ্যসমাজে নব্য শিক্ষিতের সংখ্যা অতি অল্প। যদিও মাহিষ্যগণ বঙ্গদেশেই সংখ্যায় বিংশ লক্ষ, তথাপি প্রতি বৎসর চারি পাঁচটীর অধিক মাহিষ্য যুবক বি-এ, উপাধি পাইতেছেন না। ওদিকে যাহাদের সংখ্যা মাত্র ৩ লক্ষ তাহাদের মধ্য হইতেও বৎসর শতাধিক যুবক বি-এ পরীক্ষা পাশ করিতেছেন। শিক্ষার সম্যক্ প্রচলন না হইলে সমাজ কখনও ধন ও সম্মানে উন্নত হইতে পারে না। বিদ্যার সম্মানই সর্ব্বপ্রধান এবং বিদ্যাই লোককে ধনোপার্জ্জনের পন্থা বলিয়া দেয়।

আত্মপক্ষ অবলম্বী চাকুরীর কথা। নবাবী আমলে এদেশে একরূপ সামরিক শাসন প্রথা প্রচলিত ছিল। বড় বড় নগরে এক এক জন মুসলমান সেনাপতি বাস করিতেন। তিনিই উহার চতুর্দ্দিকস্থ জেলা বা এলাকার গবর্ণররূপে কার্য্য করিতেন এবং যুদ্ধেরসময় সসৈন্যে যুদ্ধ করিতে যাইতেন। সুতরাং সমর ও শাসন বিভাগ মিশ্রিত ছিল। আজকালও আসাম এবং সীমান্ত প্রদেশের অবস্থা ঐরূপ। সেখানে এক একজন সৈন্যাধ্যক্ষ এক একটী জেলার শাসক নিযুক্ত হইয়া থাকেন। ঐরূপ শাসন নীতির ফলে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী না হইলে উচ্চ রাজপদ পাওয়া যায় না। মুসলমান শাসনকালে এই সমুদয় গবর্ণরের কার্য্য কেবল মুসলমানেরাই করিতেন। রাজপুত, মারাঠা ও জাঠ সর্দ্দারগণও ঐ সকল কার্য্য করিতে পাইতেন। বঙ্গদেশে যশোবন্ত রায় প্রমুখ মাহিষ্য কুলভূষণ বিচক্ষণ ব্যক্তি গবর্ণরের কার্য্য করিয়াছেন। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে দুর্লভরাম, সেতাব রায় প্রমুখ কতিপয় চাকুরিজীবী বাঙ্গালী ঐরূপ গবর্ণরতা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাতেই মুসলমানদিগের সর্ব্বনাশ হয়। বস্তুতঃ সামরিকজাতি না হইলে সেকালে কাহাকেও ঐ সকল পদ প্রদান করা রাজনীতি-বিরুদ্ধ ছিল। বিচার বিভাগ সেদিনে কাজীগণের একচেটিয়া ছিল। ফৌজদার, দারগা, সিপাহী প্রভৃতি কার্য্যে মাহিষ্য, আগুরি, পাঠান প্রভৃতি হইতেই নিযুক্ত হইত। এই কয়টী পদ ছাড়া দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্বসচিব এবং মন্ত্রীর কার্য্যটী সময় সময় হিন্দুরাও পাইতেন। ইহার নিম্ন সমুদয় কার্য্যই মুহুরি সমুচিত বিধায় উহাতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থ জাতীয় লোক সর্ব্বদা প্রবেশ করিত। এখনকার ডিপুটী

ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্য কতকটা ফৌজদারেরা চালাইতেন, কাজেই মাহিষ্যজাতির ঐ সকল পদে নিযুক্ত হইবার সুবিধা ছিল। অতএব দেখা যাইতেছে যে, মুসলমান-শাসন কালে নবাব সরকারে উচ্চ সম্মানীয় পদে মাহিষ্যগণ বঞ্চিত ছিলেন না।

কোম্পানি রাজত্বের প্রথম ভাগে এদেশীয় লোক হইতে সাধারণ মুহুরী নিযুক্ত হইত। মাহিষ্যগণ চিরকালই ঐ কাজে বীতশ্রদ্ধ। যাহারা পুরুষানুক্রমে কেরাণীর কার্য্য করিয়া আসিতেছিল, তাহারাই অগ্রসর হইয়া কোম্পানীর কার্য্যে প্রবেশ করিল। ক্রমে সাহেবদের সহিত কাজকর্ম্ম করিয়া যৎসামান্য ইংরাজী জ্ঞানও তাহাদের ঘটিল। সাহেবদিগের আচার ব্যবহার তাহারা শিক্ষা করিয়া মনোরঞ্জন করিতে পারিল। কাজেই যখন নবাবী পদের তিরোধান হইয়া ইংরেজ রাজত্ব দৃঢ় হয়, তখন ইংরেজী-নবীশ লোকের প্রয়োজন হওয়াতে ঐ সকল লিপিকুশল জাতীয় লোকেরাই মনোনীত হইতে লাগিল। মাহিষ্যগণ সেই হইতেই যবনিকার অন্তরালে সরিয়া পড়িলেন। ক্রমে নূতন নূতন রাজপদ সৃষ্টির সহিত জমিদারদিগের পূর্ব্ব ক্ষমতা কমিয়া গেল। কিন্তু ইংরাজী না জানায় রাজপদে সামরিক জাতিগণ বঞ্চিত রহিলেন। যাহারা শুধু লিপিকরের কার্য্যে জীবন যাপন করিত, তাহাদেরই সন্তানসন্ততি অধুনা উচ্চ বিচারকের ও শাসকের পদে বিরাজ করিয়া দেশ শাসন করিতে লাগিল। এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে হিন্দু-সমাজ ব্যথিত হইল। সামরিক জাতি-নিচয় ইহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অপমান বোধ করিয়া দূরে সরিয়া পড়িল। হায়! সেই দারুণ অভিমানের ফলেই এদেশে মাহিষ্য, আগুরি, মুসলমান প্রভৃতি সামরিক জাতি একদিন যে ভূমির জন্য হৃদয়-শোণিত পাত করিয়াছিল, সেই জন্মভূমিতেই দেখিতে দেখিতে নিরক্ষর কৃষকশ্রেণিতে পরিণত হইয়া গেল! রাজপুত, জাঠ, মারাঠা প্রভৃতি সামরিক জাতির অবস্থাও একই রূপ। মহাত্মা টডের জগদ্বিখ্যাত ইতিবৃত্ত পাঠ করিয়া সদাশয় বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট রাজপুত জাতিকে সর্ব্বদা সমর-বিভাগে স্থান দিতেছেন। ইহাতে তাঁহাদের ততদূর দুর্দ্দশা ঘটে নাই। কিন্তু বঙ্গীয় মাহিষ্য জাতি তাদৃশ মহানুভব ঐতিহাসিকের কৃপাদৃষ্টি না পাইয়া চতুরের চাতুরীতে সে সম্মান হইতেও বঞ্চিত হইয়াছে। সদাশয় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর এ সমুদায় কথা প্রথমে বুঝিতে পারেন নাই। কারণ নূতন দেশের অবস্থা জানিতে কিছু সময়ের আবশ্যক হয়। কিন্তু সূক্ষ্মনীতিজ্ঞ রাজপুরুষগণের তীক্ষ্ণদৃষ্টি শীঘ্রই সে দিকে পতিত হয়।

যাহা হউক, মাহিষ্যজাতি রাজকার্য্যে বহু সংখ্যায় প্রবেশ করিতে না পারায় বর্ত্তমানে তাহাদের ক্ষমতার যথেষ্ট হ্রাস হইয়াছে। রাজশক্তি পরিচালন করিলে সাধারণের উপর আধিপত্য বর্দ্ধিত হয়, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবেন। দারগা বা জজবাবু পেন্‌সন্ পাইয়া বাড়ীতে বসিয়া থাকিলেও লোকে তাহাকে সম্মান করিয়া থাকে। সুতরাং যে জাতিতে ঐরূপ লোকের আধিক্য সে জাতি উন্নত ও সম্মানিত হইবে সন্দেহ নাই। মুচি জাতিকে সকলেই ঘৃণা করিয়া থাকেন; কিন্তু মনে করুন, যদি ১৫ পনর বৎসর পর মুচি জাতীয় প্রায় অর্দ্ধেক লোক উচ্চ শিক্ষা পাইয়া জজ, মুন্সেফ, ডিপুটী, উকিল প্রভৃতি হইয়া যায়, তবে তখন ব্রাহ্মণগণও তাহাদিগকে মান্ত করিতে বাধ্য হইবেন। এই ভাবেই জাতীয় সম্মান বৃদ্ধি পায়।

চাকুরী কার্য্যটী পূর্ব্বে ঘৃণার্হ ছিল। কারণ চাকুরি বলিলেই সেকালে মহুরি পাটোয়ারির কাজ বুঝা যাইত। ঐ সকল কাজ যে মাহিষ্যের বরণীয় নহে, তাহা সকলেই জানেন। হিন্দু-রাজত্বকালে উহাকে 'শ্ববৃত্তি' অর্থাৎ 'কুকুরবৃত্তি' বলিত। কিন্তু গবর্ণমেণ্টের কার্য্যবিভাগের গঠন-প্রণালী সম্প্রতি এরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, যদিও চাকুরী বলিতে সকলই বুঝা যায়, তথাপি চাকুরীর মধ্যে বহু সম্মান-জনক, এবং উচ্চ জাতির করণীয় পদ রহিয়াছে। হিন্দুরাজ্যে হইলে সামরিক জাতিগণ এবং মুসলমান রাজত্ব হইলে মুসলমানগণই ঐ সকল পদ পাইতেন। ইংরাজরাজ উদার-নৈতিক; সুতরাং সকলেই একরূপ সুবিধা ভোগ করিতেছেন। মাহিষ্যগণ ইংরাজী শিক্ষা করিয়া কেরাণীর কার্য্য করিবেন, ইহা কিছুতেই বাঞ্ছনীয় নহে, কিন্তু উচ্চ বিদ্যা শিখিয়া উচ্চ রাজপদ অধিকার করিবেন এবং বিজ্ঞান চর্চ্চা করিয়া শিল্প বাণিজ্য ও কৃষিদ্বারা ধনশালী হইবেন—ইহাই আমাদের আন্তরিক বাসনা। তাহা হইলে—আমরা শূদ্র—এই অনিষ্টকর ভ্রমজ্ঞান আর কাহারও মনে স্থান পাইবে না।

শ্রীবিজয় কুমার রায়।

মাহিষ্য-জাতির উপনাম-বিচার (২)।

শব্দের অর্থের প্রতি প্রণিধান না করিয়া, অনেক সময়ে অনেক বিদ্বান্‌জনও ভ্রম বুঝিয়া থাকেন। মণ্ডল শব্দের অর্থ মহান্। অথচ অনেক শিক্ষিত জনও এই উপাধিকে নিকৃষ্ট মনে করিয়া থাকেন। চৌধুরীভৌমিকোপাধিক অনেক শিক্ষিত মাহিষ্যও মণ্ডলোপাধিক স্বজাতিকে ঘৃণা করিয়া থাকেন। ইহা

তাঁহাদের উপাধিতত্ত্ব অনমুসন্ধানের ফল মাত্র। বিশ্বরাজ্যের বিশিষ্ট বিশিষ্ট বস্তুগুলিই মণ্ডল বিশেষণে বিশেষিত হইয়া থাকে। যথা মহীমণ্ডল, গগন-মণ্ডল, সূর্য্যমণ্ডল, চন্দ্রমণ্ডল, জ্যোতিষ্কমণ্ডল, বায়ু-মণ্ডল। ইহাদের অন্যান্য পর্য্যায় গুলিরও ঐ বিশেষণে উৎকর্ষতা বুঝায়। যথা—ক্ষিতিমণ্ডল, অবনীমণ্ডল, নভো-মণ্ডল, আকাশমণ্ডল ইত্যাদি। মথুরা-মণ্ডল, ব্রজ-মণ্ডল, রাস-মণ্ডল ইত্যাদি। একদেশাধিপতিকে 'মণ্ডলেশ্বর' কহে। রাজস্থানে মণ্ডলোপাধিক এক জন প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয়রাজের বিবরণ বর্ণিত আছে। বর্ত্তমানে শ্রীভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডল গঠিত হইতেছে। পাবনা জেলার অন্তর্গত অষ্টমনীষা গ্রামে মণ্ডল উপাধিক কয়েক ঘর সদ্‌ব্রাহ্মণ বিদ্যমান্ আছেন, ইহা অবগত আছি। যাহা হউক, প্রামাণিক বা মণ্ডল উপাধিককে ঘৃণা করা বুদ্ধিমান্ জনের কর্ত্তব্য নহে। মাহিষ্যজাতির কতকগুলি উপাধি শুনিয়া আপাততঃ হেয় বোধ হইতে পারে, কিন্তু সেই সকল উপাধির অর্থ অনুসন্ধান আবশ্যক। হিন্দী, উড়িয়া ও বাঙ্গালা ভাষায় প্রচলিত কতকগুলি শব্দের অর্থ অনুসন্ধান করিয়া বুঝিয়া লওয়া সুকঠিন হইয়াছে। পাণ্ডে বা পাঁড়ে, দোবে, তেওয়ারি, চৌবে প্রভৃতি হিন্দী উপাধি গুলির প্রকৃত অর্থ কয় জনে অবগত আছেন? যাঁহারা এই সকল উপাধি বহন করিয়া, বাঙ্গালায় অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে কি উহার অর্থ বলিতে পারেন? বোধ হয় না। পণ্ডা অর্থাৎ বেদোজ্জ্বলা বুদ্ধি; এই বুদ্ধি যাঁহার বিদ্যমান্ ছিল, তিনিই পাণ্ডে উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডা অর্থেও তাহাই। দুই বেদাধ্যায়ন পূর্ব্বক আরম্ভ কারী, দোবে বা দ্বিবেদী; তিন বেদ অধ্যায়নকারী তেওয়ারী বা ত্রিবেদী; চতু-র্ব্বেদাধ্যায়ী চৌবে বা চতুর্ব্বেদী। এই সব দ্বিবেদী, ত্রিবেদী, চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ গণের সন্তানেরা অধুনা রেল অফিসে, পুলিশ অফিসে, গবর্ণমেণ্ট অফিসে, শ্ববৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক ম্লেচ্ছপদ লেহন করিতেছেন। হায় রে কলির প্রভাব! যাহা হউক, হিন্দী দোবে, চৌবে প্রভৃতির ন্যায়, উৎকল ভাষায় প্রচলিত উপাধিরও ঐরূপ সদর্থ আছে। যথা মহান্তি শব্দ হইতে মাইতি ইত্যাদি। মাহিষ্যজাতির মাইতি, নায়ক, সাউ বা সাহু, কুতি, মাঝী, বেরা, শিহি, মাধী, খাটা, ঘোড়ুই, রাউথ প্রভৃতি বহু উপাধি বিদ্যমান আছে। ঐ সকল উপাধি শব্দ বিশেষের অপভ্রংশ মাত্র। যথা সাউ বা সাহু উপাধি সাধু শব্দ জাত। হিন্দী ও প্রাকৃত ভাষায় ধ স্থলে হ প্রয়োগ হয়। যথা মধু মহু মৌ; বধূ বহু বউ বৌ; বিধি বিহি ইত্যাদি। বাণিজ্য, ব্যবসায়ী ও কুশীদজীবিগণই ব্যবহারশাস্ত্রে

সাধু নামে অভিহিত হইতেন। কুতি উপাধি কুস্তি শব্দ জাত। হিন্দী ভাষায় অনেক শব্দের সকার রকার বর্জ্জন করিয়া উচ্চারিত ও লিখিত হয়। যথা নিস্তার স্থলে নিতার; বিস্তার স্থলে বিতার; স্নান স্থলে নান্ বা নাওয়া; (দরিদ্র স্থলে দরিদ) ইত্যাদি। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, কুস্তি-প্রিয়তা হেতু বা প্রতিপক্ষের সহিত কুস্তিতে জয়লাভ হেতু কুস্তি বা কুতি উপাধি হইয়াছিল। মাননা শব্দের সঙ্কোচনে মান্না; ইহার অর্থ মাননীয়। শিহি শব্দটি শাহ ও সাহি শব্দের ন্যায় পারসী ভাষা। কোন কর্ম্মানুযত নবাবামলে রাজ সরকার প্রদত্ত উপাধি। পারসী ভাষাভিজ্ঞ জনের নিকটে পুছিলে উহার অর্থোদ্ধার হইতে পারে। নায়ক উপাধি সৈন্য সমূহের অধ্যক্ষতা কার্য্য জন্য হইয়াছিল। যথা গীতা প্রথমাধ্যায়ে—নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে॥" ইতি॥

খাঁড়া উপাধিও যুদ্ধকালে অসি পরিচালনার দক্ষতা জন্য হইয়াছিল। বের অর্থে কুঙ্কুম। কুঙ্কুম পরীক্ষায় সুদক্ষতা জন্য বা কুঙ্কুম ব্যবসায় প্রতিপত্তি লাভ জন্য বেরা উপাধি হইয়াছিল। শঙ্খ ব্যবসায় প্রতিপত্তি লাভ জন্য 'শঙ্খনিধি' উপাধি হইতে দেখা যায়। রাহু শব্দ হইতে রাহুত; রাহুত হইতে রাউথ হইয়াছে। ত বা থ বাক্য বিশ্রাম স্থল। ব্যাকরণ সূত্র ন্যায়ে উহা ইৎ। আহব কালে বিপক্ষগণের পক্ষে রাহু সাদৃশ বলিয়া, রাহু উপাধি হইয়াছিল। মেঠ অর্থে হস্তী পালককে বুঝায়—যুদ্ধকালে অনেক হস্তী পালক যাঁহার অধীনে থাকিত; তাৎপর্য্যার্থ এই যে হস্তীযূথাধিপ বীরগণই মেঠা নামে অভিহিত হইতেন। মেঠা হইতে মেঠে বা মেটে এই অপভ্রংশাত্মক উপাধি হইয়াছে। মেটেল বা মাঠিয়াল শব্দও, বোধ হয়, মেঠা শব্দেরই বিকৃতাবস্থা। কাঠি অর্থে বংশখণ্ড অর্থাৎ ছোট লাঠিকে বুঝায়; লাঠিধারী বীরসেনাগণই কাঠিয়া উপাধিতে পরিচিত হইয়াছিলেন। নৃত্যে সুদক্ষ হইলে, তাহাকে যেমন নাটুয়া বা নাচুয়া কহা যায়, যুদ্ধকালে অশ্ব পরিচালন সুদক্ষতায় ঘোড়ুয়া বা ঘোড়ূই উপাধি হইয়াছে।

কান্যকুব্জ রাজধানীর অধীন অভিধান প্রসিদ্ধ কোল নামে একটি দেশ আছে (কি পূর্ব্বে ছিল)? সেই দেশ হইতে আগত জনেরা কোল উপাধিতে অভিহিত হইয়া গিয়াছেন। যেমন উড়িষ্যাবাসীরা বাঙ্গালায় উড়িয়া বা উড়ে বলিয়া কথিত হয়; তদ্রূপ কোল্ দেশবাসী বলিয়া কোল্লে হইয়াছে। পুনঃ পুনঃ বিবদমানগণের শান্তি রক্ষার্থে রাজপুরুষগণ কর্ত্তৃক বিনিযুক্ত মধ্যস্থ জন গ্রাম্য ভাষায় মাঝী নামে অভিহিত হওয়ায়, ক্রমে উহা উপাধিতে পর্য্যবসিত হইয়া গিয়াছে। খাটা উপাধি

খেটে শব্দের বিকৃতাবস্থা। যিনি ইহা বিশ্বাস করিতে আপত্তি করিবেন, তিনি হেয়া পঞ্চমী স্থলে হোরা পঞ্চমী; কাননগো স্থলে কাননগু; পেন্সন্ স্থলে পেন্সীল, মাসহরা স্থলে মুশহারা; বায়স্কোপ স্থলে বাইশকোপ; গুজরাটি (স্থূর্কেলা) গুজরাতি ইত্যাদি শব্দ-বিপর্য্যয় স্মরণ করিবেন। খেট শব্দ পুরাণে আছে। যথা; "খেট খর্ব্বট ঘোষাংশ্চ দদহু পত্তনানিচ।" ইতি ভাগবত ৭ম স্কঃ ২ অঃ ১১ শ্লোক। খেটঃ কৃষিবলানাং বাসং ইতি স্বামীপাদঃ। যিনি আর্য্য কৃষকগণকে যত্নপূর্ব্বক স্বীয় অর্থব্যয়ে বাস করাইয়াছিলেন, তিনি খেটা উপাধিতে পরিচিত হইয়াছিলেন। খেটা শব্দ হইতে খাটা শব্দ হইয়া পড়িয়াছে। এতাবতায় জানা যাইতেছে যে, ক্ষত্রবৈশ্যজাত আর্য্য মাহিষ্য জাতি কখনই নিকৃষ্ট উপনামের নামী নহেন। তবে শব্দের অপসিদ্ধান্ত করিলে করা যায় বটে, কিন্তু তাহা উদার-চেতা বিজ্ঞজনের গ্রাহ্য হইতে পারে না। শব্দ সকল কল্পতরু সদৃশ বহ্বর্থ প্রকাশ-কারিণী। ইচ্ছা করিলে, চট্টোপাধ্যায় মুখোপাধ্যায়, বা মিশ্র, ত্রিবেদী প্রভৃতিরও কদর্থ করা যাইতে পারে। চৌবে, দৌবে প্রভৃতি সদর্থমূলক হিন্দী উপাধির কেহ কেহ এমন কর্থ কল্পনা করিয়া থাকে যে, তাহা সভ্যসমাজে ব্যক্ত করিবার অযোগ্য। অতএব, কোলে, খাটা, মেটে, মাঝী প্রভৃতি মাহিষ্যের উপাধিগুলির সদর্থ অনুসন্ধান না করিয়া হেয় মনে করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। "সজ্জনাগুণ-মিচ্ছন্তি দোষমিচ্ছন্তি পামরাঃ।"

শেষ কথা এই যে,—মাহিষ্যের কয়েকটি উপনামের অর্থানুসন্ধান করা হইল। এইরূপ আপাত কটু দুর্ব্বোধ্য উপনাম মাত্রেরই সদর্থাস্তিত্ব মনে করিতে হইবে। দুই চারিটি দিগ্ দর্শান হইল অধিক আম্রেড়ন অনাবশ্যক। এই সব বাজে উপাধির কথা ছাড়িয়া দিয়া, মূল উপনাম যাহা বৈশ্যধর্ম্মী মাহিষ্যের অবশ্য ধর্ত্তব্য, তাহাই বলিতে হয়। সে কথা বৈশাখমাসের পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। শিক্ষিত ও সুবিজ্ঞ মাহিষ্য মহোদয়গণের মনোঽভিমত হইলে পরম আহ্লাদের বিষয় হয়। নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মানুষ্ঠান কালে, মাহিষ্য পুরুষগণ নামের শেষে "দেওগুপ" ও মাহিষ্য স্ত্রীগণ নামের শেষে "দেঈ" শব্দ ব্যবহার করিবেন। যথা নিত্যকর্ম্ম স্নানকালে,—বিষ্ণুরোঁম্‌তাতসন্ত বৈশাখেমাসি সিতেপক্ষে পঞ্চম্যাস্তিথৌ মধ্যাহ্নে, আলমাল গোত্রস্ত পরাশর প্রবরস্ত শ্রীহরিপদ দেওগুপ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামে অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে ইতি। স্ত্রীগণ বলিবেন যথা—শ্রীবিষ্ণুর্মোহংস্থেত্যাস্থারভ্য শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেঈ ইত্যভিধানা অস্মিন্ জলে স্নানমহং করিষ্যে ইতি। আবশ্যক মত বিভক্তি

করিয়া বলিতে হইবে। যথা "দেও গুপস্ত" স্ত্রীগণ "দেঈ ইত্যভিধানাং" ইত্যাদি। এ বিষয়ে মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। কাম্য বা শ্রাদ্ধাদি নৈমিত্তিক কর্ম্মে তাঁহারা মাহিষ্য যজমানগণকে ঐরূপ বলাইলেই প্রচলিত হইয়া যাইবে। মাহিষ্য দ্বিজধর্ম্মী। অতএব, বৈশ্যবৎ পক্ষাশৌচ পালন করা কর্ত্তব্য স্থির হইয়া, শনৈঃ শনৈঃ প্রচলিত হইতেছে। এক্ষণে বৈশ্যবৎ উপনাম ধারণ করাও একান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে। বৈশ্যধর্ম্মী পরিচিত হইয়া, শূদ্রার্হ দাসদাসী উপনাম ব্যবহার করা নিতান্ত বিগীতাচার।—শ্রীদুর্গানাথ দেওরায় তত্ত্ববিনোদ।

ভাগ্য-গগনে।

পুরাতন চিরকালই নূতনের নিকট লাঞ্ছিত। জীর্ণ ও শীর্ণের স্থান অরণ্যে, ভূগর্ভে ও আবর্জ্জনার স্তূপে। তরুণের চক্ষে বৃদ্ধের ভাবভঙ্গী উপহাসেরই যোগ্য। কিন্তু এরূপ ব্যবহার তরুণ বর্ব্বরের, অপরিণত-মস্তিষ্ক তরুণেরই, মানসিক দুরবস্থার পরিচায়ক। পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে, বর্ব্বরতা ঘুচিলে, পুরাতনের প্রতি ভক্তি আসে, তাহার উপর শ্রদ্ধা হয়। তখন আমরা অরণ্যে ভগ্নস্তূপ অন্বেষণ করি, ভূগর্ভ খনন করিয়া অতীতের সমৃদ্ধি আবার লোকনয়নের গোচরে আনি, পুরাতন বৈভবের চিহ্ন শত জীর্ণ হইলেও সযত্নে প্রহরীবেষ্টিত অট্টালিকায় রক্ষা করি; বৃদ্ধকে সমাদরে বসাইয়া পুরাতন গাথা শুনিতে থাকি। কেন করি? পুরাতনই যে নূতনের জন্মদাতা। পুরাতনের যে প্রত্যেক আশা, প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা, নূতনের জীবনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত; নূতনের প্রত্যেক কার্য্যে সফলী বা বিফলী কৃত হইতেছে। পুরাতনের অভাব আক্ষেপ, বাধা বিঘ্ন, কীর্ত্তি কলাপের মধ্যেই যে নূতনের দুর্গম পথ সুগম করিবার, সংসারব্যূহ ভেদ করিবার, সন্ধি বর্ত্তমান। এক কথায় এই পুরাতনই যে নূতনের পৈতৃক গৃহ সম্পত্তি, জীবন আরম্ভ করিবার প্রথম সম্বল।

অন্য সম্পত্তির ন্যায়, খণ্ড-সমাজ-বহুল—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ন্যায় অথচ শৃঙ্খলাবিহীন প্রাচীন ইংলণ্ডের সপ্তরাজ্যের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের স্বাধীনতা লোপ করিয়া শুদ্ধ নিজের প্রাধান্য স্থাপনে লোলুপ—আধুনিক হিন্দু-সমাজে এই ঐতিহাসিক সম্পত্তিরও উপর চোর-জুয়াচোরের হস্ত পড়িয়াছে; যাহা চুরি করা যায় না, তাহার উপর হিংসা-বিষধরের কুটিলনেত্র গিয়াছে।

অর্থশালী হইলে, মনুষ্য নামের অযোগ্য, অনেক নীচাশয় লোকের ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান থাকে না; লোলুপনেত্রে যাহাই দেখে, ছলে বলে কৌশলে তাহাই করায়ত্ত করে; যাহা অধিকারে আনিতে পারে না, "উই আর ইন্দুরের মত" তাহাও ছারখার করিয়া দেয়। তোমার আমার ও ব্যক্তিগত ভাবে এইরূপে মানবমাত্রেরই বিবেকবুদ্ধি অনেকদিন বিকসিত হইয়া অধর্ম্মের স্রোত কিয়ৎপরিমিত রোধ করিয়াছে' কিন্তু সমষ্টিগত খণ্ড সমাজ বা বৃহৎ সমাজের অনেকগুলিতে লেখাপড়া ব্যবহারের সহিত সর্ব্বপ্রকার বিদ্যা আলোচনার ও রক্ষণের পথ প্রশস্ত হওয়ায় সামাজিক স্মরণশক্তি ও বুদ্ধিশক্তি প্রখর হইলেও বিবেকবুদ্ধির বিকাশ এখনও হয় নাই। বিশেষতঃ, অস্মদ্দেশের খণ্ডসমাজগুলি অসভ্যযুগের মানবের মত দস্যুতা করিয়া দেহ পোষণ করিতেছে; নবাবী আমলে শঠতা ও ও প্রবঞ্চনার সাহায্যে পার্থিব সম্পত্তি হস্তগত করিত; এখন সেই কৌশলেই মানসিক সম্পত্তি অপহরণ করিতেছে। এই সমাজগুলিরও অর্থ ও সামাজিক বুদ্ধি উদয়ের সহিত ভূমি অধিকার করিয়া "অভিজ্ঞাত" হইবার ইচ্ছা হইতেছে; পরের ঐতিহাসিক গৌরব অপহরণ করিয়া আত্মবংশের অজ্ঞাত কন্দর আলোকিত করিবার বাসনা জন্মিতেছে। সুতরাং চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী পৈতৃকধনের অসমর্থ রক্ষকগণের ও সামাজিক নাবালকগণের মধ্যে সামাল সামাল ডাক পড়িয়াছে। ডাকহাঁকই পড়িবে, সম্পত্তি রক্ষার সামর্থ্য ইহাদের প্রায়ই নাই; থাকিলে এই শ্রেণীর গৌরবান্বেষী বীরপুরুষেরা গাত্রচর্ম্মের মায়া ছাড়িয়া ইহাদের ত্রিসীমায় যাইতেন বলিয়া বোধ হয় না; বেওয়ারিস অভিভাবকগিরিতে একাধারে ধর্ম্ম ও অর্থ "হাতাইবার" এমন সুবিধা দেখিয়া অনাহূতভাবেও এই নাবালকগণের অজ্ঞাতসারে অভিভাবক সাজিবার জন্য এত বিশ্বপ্রেমোন্মত্ত জরদগবের আমদানী হইত না।

নিয়তির রাজ্যে পরিবর্ত্তনের নিয়ম কি এতই কঠোর! প্রতাপশালী গ্রীক ও রোমক বীরগণ দেহপাত করিয়া যে সভ্যতা, যে জ্ঞান, যে বৈভব অর্জ্জন করিয়া গেল, তাহাদের সন্তানসন্ততিরা তাহার উত্তরাধিকারী হইতে পারিল না। হইল কি না টিউটন্ ভাণ্ডাল ও গথ্। প্রকৃতি সমর্থের হস্তেই জগতের যাবতীয় সম্পত্তি অর্পণ করে; তবে যে কিছুদিন ইহা চোর জুয়াচোরের জঘন্য হস্তে কলুষিত হয় তাহা অবশ্যম্ভাবী। জানি না, কোন্ নিয়মের বলে চুরির বিষয়ও ইহজগতে ভোগ হয়! দেশে স্থায়ী লিখিবার উপকরণ না থাকায় তালপত্রাদিতে লিখিত বিবরণ ধ্বংশ হইয়া, হায়, যে সুসভ্য পরাক্রান্ত সুহ্মদেশীয় মাহিষ্যের সভ্যতা, বিদ্বেষীর উপহাসের

বিষয় হইয়াছে; শৌর্য্য বীর্য্য ও বুদ্ধিমত্তায় তৎকালীন অন্যান্য হিন্দুজাতির সমকক্ষ বলিয়াই যাঁহারা সুফলা বঙ্গদেশের শস্যক্ষেত্রস্বরূপ এই প্রাচীন মেদিনীপুর সদর্পে অস্মরণীয়কাল হইতে অধিকার করিয়াছিলেন; যে ভূভাগের রক্তবর্ণ মৃত্তিকা ভূতত্ত্ববিদ্বানের নিকট ইহার সৃষ্টির প্রথম যুগে জন্ম ও সাগরপৃষ্ঠ হইতে বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান জ্ঞাপন করিতেছে; যাহার প্রসিদ্ধ বন্দর ও শস্যশালিনী মৃত্তিকায় এককালে কৃষি ও বাণিজ্যের সমূহ রত্নরাজি বিরাজ করিত; যে জনপদের হস্তে এককালে উত্তর ভারতের সভ্য হিন্দুজাতির সমগ্র বাণিজ্যজাত আসিয়া পৌঁছিত ও তৎপরে পূর্ব্বদিকে সুদূর চীন শ্যাম ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে নীত হইত; যাহার বিদ্যামন্দিরে কত বিদেশীয় পরিব্রাজক তিন হইতে দশ বৎসর কাল অবস্থান করিয়া ইহার প্রাচীন বিদ্যাগৌরব ঘোষণা করিয়াছেন, বঙ্গদেশজাত জৈন সম্প্রদায়ের তাম্রলিপ্তীয় শাখায় অদ্যাবধি যাহার একটী প্রদেশের ধর্ম্মপ্রবলতা চিরগ্রথিত হইয়া রহিয়াছে; নিয়তির কঠোর নিয়মে সেই পুরাতন সমৃদ্ধ জনপদ এখন অজ্ঞাত প্রায়; সেই মাহিষ্যের সন্তান সন্ততিগণ পূর্ব্বপুরুষগণের সামান্য কতকগুলি উপাধি ছাড়া আর সকলগুণেই প্রায় বঞ্চিত; তাঁহাদের বংশধরগণের আর ক্ষত্রিয়ের কঠোর-প্রিয়তা ও পরিশ্রমশীলতা নাই; কেরাণী প্রধান দেশে কেরাণীর উন্নতি দেখিয়া শঠতার, আলস্যের ও বিলাসের আদর্শে দিশাহারা। আর বৈশ্যের উদ্যম ও অধ্যবসায় নাই; সর্ব্বপ্রকার বিদ্যার প্রধান সহায় লেখাপড়ার অভাবে স্বাধীন বৃত্তি মাত্রেই মুমূর্ষু প্রায়। কেবল; দুর্দ্দিনে শৌর্য্যশালী জাতির একমাত্র অবলম্বন, যোদ্ধা নেতা ও স্বাধীনচেতা চরিত্রবান পুরুষ গঠনের প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র, কৃষিকার্য্য ক্ষীণ বর্ত্তিকালোকর ন্যায় অদ্যাপি মাহিষ্যের পূর্ব্বতন সামরিকবৃত্তির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছে।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি সুখানি চ" অনেক পুরাতন কথা; কিন্তু মানুষের ভাগ্যে ও যেমন সমাজের ভাগ্যেও তেমনি খাটে। নতুবা যে গ্রীক একসময়ে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ছিল, তাহাদের দেশে ইতিহাস সৃষ্টি না হইলে, ইতিহাসে তাহাদের বিবরণ না থাকিলে, বর্ত্তমান বংশধরগণের অবস্থা দেখিয়া তাহাদিগকে অপদার্থ বর্ব্বর বলিয়া ভ্রম হইত না কি? ঐ গড়নায়ক, সেনাপতি, বৈতালিক, পুরকায়স্থ, রাহুত, রোহী, সেনী, সমরী, সাহু, শাসমল, জানা ও রাণার বংশধরগণ তুচ্ছ কেরাণী সাজিতে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যভাব বিসর্জ্জন দিয়া পরিশ্রমকে ঘৃণা করিতে শিখিতে, চাকুরের পদবীতে পূর্ব্বপুরুষগণের মহিমা-কিরণে উদ্ভাসিত উপাধিমালা ডুবাইতে এত ব্যস্ত হইত কি? না কেরাণীর বুদ্ধিবৃত্তোয়,

উকীল মোক্তারের ফন্দিতে ও পাটোয়ারীর প্রলোভনে পদে পদে লাঞ্ছিত হইয়া—বিদ্যার অভাবে নিরস্ত্র হইয়া—প্রাতঃস্মরণীয় পূর্ব্বপুরুষ ও তাঁহাদের জ্বলন্ত বহ্নির ন্যায় বিরাজিত পুরোধকুলের পাদুকাবহনেরও অযোগ্য, নিজেদেরই অন্নে পুষ্ট স্ফীতোদর, "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" দেশনেতাগোষ্ঠীর নিগ্রহ বা তদপেক্ষা শতগুণ অধিক মর্ম্মান্তিক "গায়েপড়া" অনুগ্রহের ভাজন হইত? আশা কেবল—"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ",—মানুষের ভাগ্যেও বটে, সমাজের ভাগ্যেও বটে।

শ্রীদুর্য্যোধন পুরকায়স্থ।

মাহিষ্যের জাতীয় উপাধি।

শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গানাথ রায় মহাশয় বিগত বৈশাখ মাসের "মাহিষ্য-সমাজে" মাহিষ্যের উপনাম বিচার করিয়াছেন; এবং তিনি স্বীয় প্রবন্ধে মাহিষ্য মহোদয়গণের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। কিন্তু পাঁচ মাস গত হইল এ সম্বন্ধে "মাহিষ্যসমাজে" কোন আন্দোলন আলোচনা দৃষ্ট হইল না। ইহাতেই বুঝিতে পারা যায়, মাহিষ্যগণের জাতীয় উপনামে তাদৃশ অনুরাগ নাই। অথচ এতৎসম্বন্ধে যে বিরাগ আছে তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে না। বিরাগ থাকিলেও ২।৪টী প্রতিবাদ হওয়া উচিত ছিল। ফলতঃ এইপ্রকার প্রস্তাবে কোন প্রকার আলোচনা না হওয়ায় সামাজিক ঔদাসীন্যই প্রমাণিত হয়।

আমি এতৎসম্বন্ধে কোন বিজ্ঞ মহোদয়েরই মনোযোগ প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। এ পর্য্যন্ত যখন কাহারও দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল না, তখন অগত্যা আমাকেই মতামত প্রকাশ করিতে হইল।

প্রথমতঃ, দুর্গানাথ বাবুর কথিত "গুপ", "দেও" প্রভৃতি অপভ্রষ্ট উপনাম ব্যবহারের কোন আবশ্যকতা দেখি না। যদিও তমলুক-রাজবংশে "দেই" অপভ্রষ্ট উপনাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাও "দেবী" শব্দের ক্রমাপকর্ষে ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। বংশ-পত্রিকা-লেখকদিগের দোষেও ঐরূপ হইতে পারে; এক্ষণে পঙ্কোদ্ধার করিতে হইলে প্রকৃত সংস্কৃত উপনামই ব্যবহার করা উচিত।

দ্বিতীয়তঃ, মাহিষ্যের জাতীয় উপাধি বৈশ্যোচিত হওয়া উচিত নহে। অমিশ্র বৈশ্যজাতির উপাধি "ধন" বা "পুষ্টি" বাচক হইবে। শঙ্খ-সংহিতার

২ অধ্যায়ে নামের উপপদে লিখিত আছে,—"শর্ম্মান্তং ব্রাহ্মণস্যোক্তং বর্ম্মান্তং ক্ষত্রিয়স্য তু। ধনান্তং চৈব বৈশ্যস্য দাসান্তং বান্তজন্মনঃ॥" মনু-সংহিতায় আছে,—শর্ম্মবদ্‌ব্রাহ্মণস্য স্যাদ্রাজ্ঞো রক্ষাসমন্বিতম্। বৈশ্যস্য পুষ্টিসংযুক্তং শূদ্রস্য প্রৈষ্যসংযুতম্॥ এই শ্লোকদ্বয়ে শঙ্খের মতে বৈশ্যের উপাধি "ধন" ও মনুর মতে পুষ্টি-সংযুক্ত "ভূতি" অন্যমতে "গুপ্ত" লিখিত আছে। কিন্তু এই সমস্ত উপাধি অমিশ্র-বৈশ্য-সম্বন্ধীয়। মিশ্র-বৈশ্য অম্বষ্ঠগণ, ব্রাহ্মণের উপাধি লওয়া অকর্ত্তব্য মনে করিয়া, মাতামহের গুপ্ত উপাধি লইয়াছেন। ইহাতে অম্বষ্ঠগণের বৈশ্যভাবের আধিক্য প্রকটিত হইয়াছে। কিন্তু মাহিষ্যগণ কোনকালে উপনামে বৈশ্যভাব রক্ষা করেন নাই। মনুর মতে মাহিষ্যগণ রক্ষাবাচক রণঝম্প, বাহুবলীন্দ্র, গজেন্দ্র, সেনাপতি, দিকৃপতি, শতরা, হাজরা, সিংহ প্রভৃতি রক্ষাবাচক বলান্বিত উপাধি লইয়াছেন। ব্যক্তিগতভাবে এইরূপ রক্ষাবাচক উপনাম গ্রহীত হইয়াছে; সমবেতভাবে উপনাম গ্রহণ করিতে হইলে **বর্ম্মা** উপাধিই প্রশস্ত। এই জাতির পুরাবৃত্ত পর্য্যালোচনা করিলেও ইহাদের "বর্ম্মা" উপাধিই প্রমাণিত হইবে। মহানদীর তীরস্থ "দান্দী গ্রাম" যিনি বিন্ধ্য-বাসিনীর সেবার জন্য অর্পণ করেন, সেই তমলুক-রাজকুমারের উপাধি "বর্ম্মা" ছিল। ইনিই উড়িষ্যা বিজেতা। ঢাকা জেলার সাভাবের হরিশ্চন্দ্র পাল ও ভাওয়াল পরগণার বরই বাড়ীর যশোবন্ত পাল প্রভৃতি যে মাহিষ্যজাতির রক্ত-সম্বন্ধ মগধ বা বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ পাল-সম্রাট্‌গণের সঙ্গে অভিন্নত্ব প্রতি-পাদনের অস্ফুট জ্যোতিঃ বিকীরণ করিতেছে *, সেই জাতির সাধারণ উপাধি **বর্ম্মা** ভিন্ন কিছুই হইতে পারে না। মাহিষ্য ভ্রাতৃগণ, যদি সৎসাহস থাকে, তবে অবিলম্বে পৈতৃক উপাধিভূষণে ভূষিত হউন।

মাহিষ্যের স্বাভাবিক সাধারণ উপাধি "বর্ম্মা"। জগতে কেহই পৈতৃক উপাধি ত্যাগ করেন নাই। পৈতৃক উপাধি গ্রহণ অতি স্বাভাবিক বলিয়াই "লঘুভারত"-কর্ত্তা লিখিয়াছেন,—

---

* ১৩১৯ সালের আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের লিখিত "ঢাকা জেলার কয়েকটী প্রাচীন স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধ, ঐ সনের শ্রাবণ মাসের ঢাকা সাহিত্য-পরিষদের মুখপত্র প্রতিভা পত্রিকার "ধামরাই গ্রামস্থ যশোমাধব" প্রবন্ধ, মাহিষ্য-সমাজ মাসিক পত্রিকার ১৩১৮ চৈত্র সংখ্যায় "সর্ব্বেশ্বর নগরের রাজা হরিশ্চন্দ্র" শীর্ষক প্রবন্ধ এবং ১৩১৮ সনের ৩১শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা শিক্ষাসমাচারে "কোওয়ার খন্দকার সাহেবের সমাধি" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

পুরা ক্ষত্রিয়ভূপানাং রীতিরেষা গরীয়সী।
দধিরে পূর্ব্বপুরুষাণামোপাধিং নৃপাসনে॥
তেনৈব পালবংশাশ্চ বিখ্যাতাঃ পালনামতঃ।
গজপত্যাদি বংশাশ্চ খ্যাতা উৎকল-মণ্ডলে॥
দৃশ্যমেঽদ্যাপি ধরণৌ পৈতৃকোপাধয়োনৃণাং।

লঘুভারত, ১ম খণ্ড, ২৩ পৃষ্ঠা।

মাহিষ্য-সমাজের ১৩১৮ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় "বাঙ্গালায় মাহিষ্যাধিকার" শীর্ষক প্রবন্ধে ছত্রপতি মাহিষ্য-সম্রাট্ শ্যামল বর্ম্মার কথা লেখা হইয়াছে। তিনি পিতৃপক্ষ স্মরণ করিয়া "বর্ম্মা" উপাধি লইয়াছিলেন। আমরা এই সমস্ত কারণে মাহিষ্যের সাধারণ উপাধি বর্ম্মা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিলাম।

নব্যতন্ত্রী কতকগুলি ঐতিহাসিক বঙ্গীয় মাহিষ্যাপরনামা কৈবর্ত্তগণ "দ্রাবিড়" জাতীয় মনুষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, তাহাতেও বর্ম্মা উপাধিই অক্ষুণ্ণ থাকে। মনু-সংহিতায় দ্রাবিড়গণ সংস্কারচ্যুত ক্ষত্রিয় বলিয়া লিখিত হইয়াছে। আমাদের সমস্ত সংস্কার নষ্ট হয় নাই, মাত্র উপনয়ন-সংস্কার নষ্ট হইয়াছে। দ্রাবিড়গণ প্রবল-প্রতাপ ক্ষত্রিয়জাতি। এক সময় সমগ্র দক্ষিণাপথ তাঁহাদের অধিকারে ছিল; দ্রাবিড়বংশীয় অন্ধ্র ক্ষত্রিয়গণ মগধ পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ পাণ্ড্য ও চোলরাজ্য ইঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত। ভারত-বিখ্যাত কাবেরীর বদ্বীপস্থ শ্রীরঙ্গনাথের অপূর্ব্ব মন্দির, মাদুরার দেব-মন্দির, দাক্ষিণাত্যের অসংখ্য সুগঠিত মন্দির ইঁহাদেরই প্রতিষ্ঠিত। হিন্দু-সভ্যতার মধ্য হইতে দ্রাবিড়-সভ্যতা বাদ দিলে হিন্দু-সভ্যতা অসভ্যতায় পরিণত হইবে। যে দ্রাবিড় জাতির স্থাপত্য বিদ্যা, বিশ্ব-বিদাহী কামান-নির্ম্মাণ-প্রণালী, বিশালায়তন প্রস্তরখণ্ড স্থানান্তর-করণ দেখিলে বর্ত্তমান ইউরোপীয় জাতিও স্তম্ভিত হইয়া যায়, এ হেন দ্রাবিড় আখ্যায় আমরা অসন্তুষ্ট নহি। ইহাঁরাও বর্ম্মা উপাধি ধারণ করিতেন। বিভীষণ-বন্ধু চোলরাজের নাম ধর্ম্মবর্ম্মা। (নব্যভারত ২য় সংখ্যা ১৩১৭ সাল, ত্রিচিনপল্লী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এ হিসাবেও আমাদের উপাধি **বর্ম্মা**। সুতরাং যে দিক দিয়াই যাই, **বর্ম্মাই** আমাদের প্রকৃত জাতীয় উপাধি। তবে যে বিষ্ণুসংহিতায় "অনুলোমাসু মাতৃবর্ণাঃ" লিখিত আছে, সে কেবল অনুলোমজাতির শৌচাশৌচ ও সংস্কার-নির্দ্দেশক মাত্র!—উপাধি-নির্ণায়ক নহে।

প্রসঙ্গক্রমে আর একটী কথা বলিতে হইল। সাধারণ কৃষিজীবী মাহিষ্য-গণের মধ্যে যাঁহাদের দাস উপাধি প্রচলিত আছে, তাঁহারা **ক্ষেত্রী** উপাধি

ব্যবহার করিতে পারেন। ঐ উপাধির অর্থ—কর্ষক। ইহা বৃত্তিধর্ম্ম-নির্দ্দেশক অথচ গৌরব-সূচক। প্রমাণ, ক্ষেত্রী—ক্ষেত্রবিশিষ্টঃ কৃষিবলঃ। যথা, কুটুম্বী কর্ষকঃ ক্ষেত্রী হলী কৃষিক কার্ষিকৌ—ইতি হেমচন্দ্রঃ। শব্দকল্পদ্রুম দ্রষ্টব্য।

স্ত্রীলোকের উপাধি "দেবী" শব্দে মতদ্বৈধ নাই। আর্য্যা হইলে কিরূপ হয়?

আমার মতে মাহিষ্য মহোদয়গণের কিরূপ সহানুভূতি আছে, জানিলে সুখী হইব। আশা করি, তাঁহারা এ বিষয় "মাহিষ্য-সমাজে"ই আলোচনা করিবেন।

শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

উদ্বোধন-গীতিকা।

(বলরামবাটী গৌড়াদ্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ-সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনোপলক্ষে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র কাব্যরত্ন কর্ত্তৃক রচিত)

ভৈরবী—একতালা।

স্বাগতং স্বাগতং ভবতি সাম্প্রতং, সাধয়ত ব্রতং সুমহদ্‌যুষ্মাকম্।
ভো ভো দ্বিজবর্য্যাঃ, হে আর্য্যাঃ সুপূজ্যাঃ, ভবতু বো গ্রাহ্যা প্রণতিরস্মাকম্॥

মুঞ্চত মুঞ্চত নিদ্রামিদানীং, শৃণুত শৃণুত প্রবোধন-বাণীং,
ভজত ভবানীং জাতি-স্বরূপিণীং, বরঞ্চ বৃণুধ্বম্ বিঘ্ননাশকম্॥
উদ্যম-উৎসাহ-একতা-বিনাশাৎ, আলস্য-ঔদাস্য-বিলাসিতাদোষাৎ,
কপট-কুটিল-রিপুদল-রোষাৎ, ভস্মসাদ্ গৌরবং বিশ্বব্যাপকম্॥
কে যুয়মাসত সম্প্রতি স্মর্য্যতাম্, জড়তা-ক্ষীণতা সর্ব্বথা ত্যজ্যতাম্,
স্বশক্ত্যা স্বাভীষ্টং সততং পূর্য্যতাম্, গৃহ্যতাম্ স্ব-গলে জয়শ্রীমালিকম্॥
শাণ্ডিল্য-গৌতম-ঘৃতকৌশিকাঃ! রঘুঋষি-কর্ণ-হংস-পুণ্ডরীকাঃ!
জ্ঞান-গুণাধিকা-গৌড়াদ্য-বৈদিকাঃ! কা দশা অধুনা মরণাদধিকম্!!
কা দশা! হে আলম্যান-কাত্যায়নাঃ! কাশ্যপসাবর্ণা বেদ-পরায়ণাঃ,
পশ্যন্তু ভবন্তঃ প্রোন্মীল-নয়নাঃ স্মরন্তু সর্ব্বেষাং গৌরবং স্মারকম্॥
সুপ্রথিত যশা গোষ্ঠীচন্দ্রকৃতিঃ, বিদ্বৎ-সমাজে পূর্ণচন্দ্রাকৃতিঃ।
বংশীবদনো যত্র মহামতিঃ পুণ্যকীর্ত্তির্যেষাং হন্তি পাতকম্॥

যত্র বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চাননঃ, যত্র রামকান্ত বিদ্যাভূষণঃ
কার্ত্তিক ন্যায়রত্নঃ শ্রীবাণী-নন্দনঃ, ঈশ্বর চূড়ামণি র্গতা যে চ নাকম্ ॥
গণেশ সিদ্ধান্তো বদন বাচস্পতিঃ, দ্বিজবর বিদ্যারত্নো মহামতিঃ
মাধব শিরোমণি র্যত্রকুলে কৃতিঃ গৌড়াদ্য-বৈদিক-কুল-হাটকম্ ॥
পঞ্চানন বিদ্যাসাগরো ধীমান্, দীননাথ তর্কভূষণো বিদ্বান্,
ঈশান বিদ্যার্ণবঃ সুধী মহীয়ান্, গৌড়াদ্য-বৈদিক-কুল-হীরকম্ ॥
শ্রীভবতারণ স্মৃতিরত্নো ধীরঃ, গভীর-তত্ত্বজ্ঞঃ কর্ম্মী কর্ম্মবীরঃ,
স্মৃতিশাস্ত্র-বিদ্-বিবুধ-মিহিরঃ, শ্রীনিত্যতারণো ভ্রাতৃজেন সাকম্ ॥
কুলপতি সম মহামহিমানাং, রক্ষত সুনাম পূর্ব্ব পুরুষাণাং,
কৃতিরিয়মেব সুকৃতি-সুতানাং, শ্রূয়তে ন কিং মহাজন-বাক্যম্ ॥
স্বকীয় পৌরুষ পূত মারুতেন, ভস্মাঙ্গারাদীনি বিদূরীকৃতেন,
মন্ত্র-সাধনেন শরীরপাতেন, জ্বালয়ত জাতীয়-যজ্ঞ-পাবকম্ ॥
ত্যক্ত্বা পরীবাদমেকতামুপেত্য, স্বার্থ-সংকীর্ণতামতি তুচ্ছীকৃত্য,
বিদ্যাবুদ্ধি-বলমাচারমাশ্রিত্য ঘাতয়ত তূর্ণং সমাজ-বিপাকম্ ॥
মাত! মহাবিদ্যে! অবিদ্যানাশিনি! জ্ঞানরূপে বাণি কমলারূপিণি!
গৌড়াদ্য-বৈদিকে কৃপাবিধায়িনী, ভব, অব মাং ভূদেব-সেবকম্ ॥
পুণ্যময়মিমম্ সমিতি-নিলয়ং কুরু কৃতিমৎ কণক-বলয়ং
রক্ষ দামোদর! করুণালয়ং প্রণমামি ত্বং বিশ্বপালকম্ ॥
বলরামবাটী গৌড়াদ্য বৈদিক- ব্রাহ্মণ-সমিতি শ্রীল সম্পাদক
উমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সপুত্রকঃ চিরায় জীবতু—ইতি কিমধিকম্ ॥
জয়তি রাজেন্দ্রঃ পঞ্চমজর্জ্জঃ ন্যায়-সুবিচার-বিক্রম-সূর্য্যঃ
যাচে নারায়ণো নরবরবর্য্য! গৌড়াদ্য-বৈদিক-সদয়াবলোকম্ ॥

বিবিধ প্রসঙ্গ।

মহাপ্রস্থান।—কাঁথী মহকুমার পটাশপুর থানার অন্তর্গত খড়াইর মাহিষ্যরাজবংশ অতি প্রাচীন ও সুবিখ্যাত। এই সুবিখ্যাত রাজবংশোদ্ভব রাজা কৈলাশচন্দ্র গজেন্দ্র-মহাপাত্র মহাশয় কঠিন জ্বররোগে গত ৩১শে শ্রাবণ শুক্রবার রাত্রি সাড়ে চারি ঘটিকার সময় অমর লোকে গমন করিয়াছেন। ইনি সহৃদয় জন-হিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী ও স্বদেশানুরাগী জমিদার এবং কাঁথীর অন্যতম অন-

রারী ম্যাজিষ্ট্রেট ও লোকাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। জন-সাধারণের এতদূর অনুরাগভাজন ছিলেন যে, সংকারের দিন রাজোচিত বেশভূষায় সুসজ্জিত এবং আসাসোটা ও অশ্বাদি পরিবেষ্টিত তাঁহার মৃতদেহ রোমাধ্বনি করিয়া সংকারার্থ লইয়া যাইবার সময় শ্মশানভূমি পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর বহুলোক সাশ্রুলোচনে ও শোকভারাবনত-বদনে শবদেহের অনুগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পোষ্যপুত্র শ্রীমান্ জ্যোতিশচন্দ্র গজেন্দ্র-মহাপাত্র পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তাঁহার পুণ্য-কীর্ত্তি অক্ষুণ্ণ রাখুন। ভগবান স্বর্গীয় রাজার অমরাত্মার পারত্রিক কল্যাণবিধান ও শোক-সন্তপ্ত পরিবারের প্রাণে শান্তিবারি বর্ষণ করুন।

সংস্কৃত-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রগণ।—(গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ)—কলিকাতা-পণ্ডিত-সভার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ— (১) সাম বেদ দ্বিতীয় বিভাগে তালুকগোপালপুর চতুষ্পাঠী হইতে শ্রীরত্নেশ্বর উত্থাসনী। (২) কাব্য দ্বিতীয় বিভাগ সংস্কৃত কলেজ হইতে শ্রীকালীপদ চক্রবর্ত্তী। (৩) ব্যাকরণ দ্বিতীয় বিভাগে তালুকগোপালপুর চতুষ্পাঠী হইতে শ্রীসূর্য্যকুমার মিশ্র। (৪) ব্যাকরণ দ্বিতীয় বিভাগে ইছাপুর চংঘুরাল চতুষ্পাঠী হইতে শ্রীশিবরাম রায়। ঘাটাল নিমতলা সমিতি পরীক্ষায়— (৫) ব্যাকরণ দ্বিতীয় বিভাগে ২৪ পং গোতলা বাগীযী চতুষ্পাঠী হইতে শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চক্রবর্ত্তী। (৬) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ রাজপণ্ডিত—সাহাচক চতুষ্পাঠী।

মাহিষ্য ভিন্ন অন্য উচ্চ জাতির স্থাপিত দেবতার পূজক গৌড়াদ্য-বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ। (১) জেলা হাওড়া গ্রাম—পূর্ণাল শ্রীশ্রী ৺শীতলা দেবী, পূজক শ্রীরমানাথ সান্ধকী জ্যোতিঃশেখর। ৺অক্ষয়-কুমার ঘোষ কায়স্থ কর্ত্তৃক স্থাপিত। (২) পাইকপাড়া কাশীপুর কলিকাতা। শ্রীশ্রী৺পঞ্চানন দেব—পূজক তারিণীচরণ সান্ধকী চক্রবর্ত্তী, ৺গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাঢ়ীশ্রেণী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক স্থাপিত। (৩) কাশীপুর চীৎপুরের বাজার শ্রীশ্রী৺ কালিকা দেবী—পূজক শ্রীতারিণীচরণ সান্ধকী চক্রবর্ত্তী। কলিকাতা পাইকপাড়া রাজবাটী—প্রাতঃস্মরণীয় দেশবিখ্যাত স্বর্গীয় লালাবাবুর বংশধর রাজা পূর্ণচন্দ্র সিংহ বাহাদুর কর্ত্তৃক স্থাপিত। (৪) কলিকাতা বেলিয়াঘাটা, শ্রীশ্রী৺ শীতলাদেবী—পূজক শ্রীরসিকমোহন চক্রবর্ত্তী, ৺ গগনচন্দ্র সরকার মহাশয়ের পত্নী কর্ত্তৃক স্থাপিত। (৫) জেলা হুগলী, বালিদেওয়ানগঞ্জ পং, গ্রাম বালিডাঙ্গা, শ্রীশ্রী৺ কালুরায়—পূজক শ্রীহরিপদ মিশ্র, সাং শ্রীমন্তপুর, ৺ কৈলাসচন্দ্র মোদক কর্ত্তৃক স্থাপিত।

গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ অধ্যাপক ও চতুষ্পাঠী।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণচন্দ্র সান্ধকী বিদ্যাভূষণ, পাথরবেড়িয়া, ২৪ পরগণা।

,,	,,	বসন্তকুমার সর্ব্বভৌম	চাকদহ ,,
,,	,,	অম্বিকাচরণ ন্যায়রত্ন	শুঁড়া, কলিকাতা।
,,	,,	ঈশানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	পাইকপাড়া, কাশীপুর, কলিকাতা।
,,	,,	কালীপদ সান্ধকী ব্যাকরণ-তীর্থ,	টালিগঞ্জ, ২৪ পরগণা।
,,	,,	শ্রীনাথচন্দ্র সান্ধকী ভট্টাচার্য্য	কাঁকুড়গাছি কলিকাতা।
,,	,,	রমানাথ সান্ধকী জ্যোতিঃশেখর	পূর্ণাল, হাওড়া।
,,	,,	হেরম্বচরণ তন্ত্ররত্ন	গুটিন্যা গোড় ,,
,,	,,	সুরেন্দ্রনাথ সান্ধকী কাব্যভূষণ	দক্ষিণ সিতি, কাশীপুর, কলিকাতা।
,,	,,	পূর্ণচন্দ্র সান্ধকী বিদ্যানিধি	থালড়—হাওড়া
,,	,,	প্রিয়নাথ বিদ্যারত্ন,	গোনাদ—হুগলি
,,	,,	ভূদেবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	শ্যামপুর ,,
,,	,,	ভীষ্মদেব বাচস্পতি	ভাটড়া ,,
,,	,,	যোগেন্দ্রনাথ তর্কালঙ্কার	চাউলি-রামচন্দ্রপুর, মেদিনীপুর।
,,	,,	ঈশানচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার	লুয়া বাড়বুধি ,,
,,	,,	শৈলজাকান্ত কাব্যরত্ন	বড়িশা ,,
,,	,,	হরিপদ কাব্যরত্ন	চংরা ,,
,,	,,	ভূতনাথ বিদ্যাভূষণ	খাঞ্জাপুর ,,
,,	,,	মহেন্দ্রনাথ সাঙ্খ্যরত্ন	হানুভুঞা ,,
,,	,,	গোপালচন্দ্র বেদরত্ন কাব্যতীর্থ	অশ্বত্থতলা ,,
,,	,,	হরিপদ পৌরহিত্য-বিশারদ	ব্রজলালচক্ ,,
,,	,,	শ্রীনিবাস বিদ্যাবিনোদ	ধান্যশ্রী ,,
,,	,,	মৃতুঞ্জয় ব্যাকরণতীর্থ	ভেকুট্যা ,,
,,	,,	উমেশচন্দ্র স্মৃতিরত্ন	পাথরেঘাটা, নদীয়া।

কবিতা-লেখকগণের প্রতি।—আমরা বহু কবিতা-প্রবন্ধ পাইতেছি—প্রকাশ করার সুবিধা হইতেছে না—তজ্জন্য লেখকগণের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। মাহিষ্য-গৌরব-সূচক ও মাহিষ্য-রাজন্যগণের পূর্ব্বকাহিনীর বর্ণনা-পূর্ণ কবিতা হইলে ভাল হয়।—সম্পাদক।

সাহিত্য-সমাজ বিজ্ঞাপনী।

মাহিষ্য-সমাজ।

২য় ভাগ, ৭ম সংখ্যা—কার্ত্তিক, ১৩১৯।

মহেন্দ্র-মোহ-মুদ্গার।

(হাওড়া জেলার অন্তর্গত সাহাড়া গ্রাম নিবাসী বিদ্যারত্নোপাধিক শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত "কৃষিকৈবর্ত্ত" নামক পুস্তকের প্রতিবাদ।)

গ্রন্থকর্তা কৃষিকৈবর্ত্তে মাহিষ্যত্বারোপ দেখিয়া ঈর্ষা-বিদ্বেষাগ্নিতে জলিয়া পুড়িয়া চতুর্দ্দিকে অন্ধকার দেখিতেছেন। পৃথিবী রসাতলে গেল, ধর্ম্ম গেল, কর্ম্ম গেল; তাহার উপর চাষিকৈবর্ত্ত জাতিকে পক্ষাশৌচ গ্রহণ করিতে দেখিয়া, আর যায় কোথা, সকল নষ্ট হইল।

কৃষিকৈবর্ত্তজাতি পক্ষাশৌচ অবলম্বনে অধর্ম্ম আশ্রয় করিয়াছে দেখিয়া বিদ্যারত্ন মহাশয়ের হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে; কখন অযাচিত উপদেশ প্রদান করিতেছেন, কখন "লুপ্তকালিমা প্রস্ফুটিত" হইবে, "চক্ষু ফাটিয়া রক্তস্রোত বাহির হইলেও কৃষিকৈবর্ত্ত জাতির কাতর ক্রন্দনে কেহ কর্ণপাত করিবে না" বলিয়া ভয় দেখাইতেছেন।

হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র প্রমুখ কায়স্থ-সম্প্রদায় উপবীত গ্রহণ করিয়া ১২শ দিবস অশৌচ প্রতিপালন করিতেছেন, কৈ, সে দিকে ত বিদ্যারত্ন মহাশয়ের লক্ষ্য পড়িল না; তাঁহার লক্ষ্য পড়িল—চাষিকৈবর্ত্তের পক্ষাশৌচের উপর! তাহাদিগকে স্বধর্ম্মে আনিবার জন্য এই পুস্তক-প্রকাশ। কায়স্থ-কুলপতি সারদাবাবুর কার্য্যে প্রতিবাদ করিবার ক্ষমতা প্রকাশ করিতে বোধ হয় বিদ্যারত্ন মহাশয়ের সাহসে কুলাইল না; সে যে বড় শক্ত ঠাঁই—ভীমরুল চাকে কাঠি দিতে গেলেই সে যে হুল ফুটাইয়া দিবে;—তিনি নিজে শূদ্রের দান-গ্রহণকারী, শূদ্রের অন্নে পুষ্ট, শূদ্রযাজী; তিনি নিজেই স্বধর্ম্মে নাই, আবার পরকে স্বধর্ম্মে আনিবার চেষ্টা! যিনি নিজে অন্ধ, তিনি আবার জগৎকে পথ দেখাইয়া দিবেন!

"কৃষি-কৈবর্ত্ত" পুস্তকের সম্বন্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই পুস্তকের ভূমিকায় বিদ্যারত্নের বিদ্যার প্রতিভার দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। যথা—

"অস্মদেশে সমাজের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দর্শনে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কৃষিকৈবর্ত্ত নামক এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম।"

(১) বোধ হয়, বিদ্যারত্ন মহাশয়ের স্বপ্রণীত কোন ব্যাকরণের কোন সন্ধি-সূত্র আছে, যাহার বলে তিনি 'অস্মদেশে' লিখিয়া পুস্তকের গোড়ায় গলদ করিয়াছেন। (২) তিনি লিখিতেছেন,—পুস্তকখানি প্রকাশিত করিলাম, আমরাও বলিতেছি—'তাঁহার পুস্তকখানি পঠিত করিলাম।'—প্রথম দুই ছত্রে দুই ভুল।

পরে ভূমিকার ৫ম ছত্রে লিখিয়াছেন,—"যদি কোন ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষিত ভদ্র-মহোদয় ইহার ভ্রম সংশোধন করিয়া নির্দ্দোষ করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকটে আমি চিরানুগৃহীত থাকিব।"—শিক্ষিত ভদ্রলোকের বিশেষণ "ধর্ম্মপরায়ণ" শব্দ সংযোগ করিয়াছেন। এই ধর্ম্মপরায়ণ শব্দের অর্থ, বোধ হয়, "সনাতন ধর্ম্মপরায়ণ" ব্যক্তিকেই উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন। অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী বা বিশিষ্ট শিক্ষিত কোন ভদ্রলোক তাঁহার ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দিলে তিনি গ্রাহ্য করিবেন না।

পুস্তকখানির প্রারম্ভে ২য় ছত্রে লিখিয়াছেন,—"হিন্দুধর্ম্ম সনাতন আর্য্যধর্ম্ম। জগতে বহুবিধ ধর্ম্ম প্রচারিত, কিন্তু কোনটিই এইরূপ শান্তি প্রদান ও আপন ভিত্তি দৃঢ়ীভূত করিতে পারিল না।" পাঠক মহাশয়, বিদ্যারত্নের উক্ত দৃঢ়ীভূত শব্দ দৃঢ়ীকৃত হইবে কি না, বিচার করিয়া বলুন।

প্রথম পৃষ্ঠার শেষেই লিখিয়াছেন,—"ধর্ম্মশাস্ত্রে অবিশ্বাস, সমাজে এই অশান্তি উৎপাদনের প্রধান কারণ এবং আত্মাভিমান ও অপরিণামদর্শিতা ইহার অন্যতম কারণ"।—যিনি এইস্থলে অন্ততম শব্দ ব্যবহার করিতে পারেন, তিনি কি না মনু, যাজ্ঞবাল্ক্য, গীতার শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া—চাষিকৈবর্ত্তকে জালিক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া—সাধারণকে শাস্ত্রাদেশ শিক্ষা দিতে যাইতেছেন। বামন হইয়া চাঁদ ধরিতে যাইতেছেন। প্রকারান্তরে তিনি জালিক-কৈবর্ত্ত হইতেই চাষি-কৈবর্ত্তের উৎপত্তি সিদ্ধান্ত করিতেছেন। না করিবেন কেন? আশ্চর্য্য কি!

"কাচং মণিং কাঞ্চনমেকসূত্রে গ্রথ্নন্তি মূঢ়া কিমু তত্র চিত্রম্।
অশেষবিদ্ পাণিনিরেকসূত্রে শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ॥"

এই বুদ্ধির ফলেই ত বিদ্যারত্ন মহাশয় তাঁহার পুস্তকের তৃতীয় পৃষ্ঠায় "ব্যভিচার ও সহবাস দোষে একজাতীয় পিতামাতা হইতে বিভিন্ন জাতির উৎপত্তি

হইতে পারে” লিখিয়া “বৈশ্যাশূদ্র্যোস্ত রাজন্যান্ মাহিষ্যাগ্রৌ সুতৌস্মৃতৌ” যাজ্ঞবল্ক্যের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন ও অনুলোম বিবাহকে ব্যভিচার বলিয়াছেন, এবং পঞ্চম পৃষ্ঠায় “রাজা বল্লালসেনের সময় হইতে প্রথমোক্ত কৈবর্ত্তগণ এতদ্দেশে অনেক স্থলে জলচল হইয়া আসিয়াছে” লিখিয়া, বহুকাল পূর্ব্বের প্রতি-বাদকগণের উক্তি চর্ব্বিত চর্ব্বণ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বিদ্যার দৌড় দেখিয়া, তাঁহার ব্যাকরণ-জ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞানের সমালোচনা করিতে যাইলে, আমাদের লেখনী কলঙ্কিত হইবে। তাঁহার সহিত আমরা বাদ-প্রতিবাদ করিতে ইচ্ছা করি না; তবে সাধারণে তাঁহার কথায় প্রতা-রিত না হন, তজ্জন্য কিছু লিখিতে বাধ্য হইলাম। তাঁহার পুস্তকের আমূল প্রতিবাদ শীঘ্রই বাহির হইবে, সাধারণে পাঠ করিয়া সন্তোষলাভ করিবেন কালিয়া কোপ্তা খাইবার পূর্ব্বে আমি কিঞ্চিৎ “নিমঝোল” প্রদান করিব। কারণ, নিম পিত্ত নাশ করে! কিন্তু যাঁহাদের “হায়া পিত্ত” নাই, তাঁহাদের আবার পিত্তনাশ হইবে কি?—“পিত্ত থাকিলে ত পিত্ত নাশ হইবে! যাহাদের পিত্ত আছে, এই নিমঝোলে তাহাদের পিত্ত নাশ হইলে, শ্রম সফল জ্ঞান করিব।

পাঠকগণ! “কৃষি-কৈবর্ত্ত” পুস্তক প্রণেতার ব্যাকরণ-জ্ঞানের পরিচয় প্রথমে পাইয়াছেন। তাঁহার নামের পূর্ব্বেই “বিদ্যারত্নোপাধিক” শব্দ দেখিতে পাইবেন। অনেকে বুঝিবেন, তাঁহার উপাধিরত্নে ধিক্! আমি বলি তাঁহার এই উপাধিধারণে শত ধিক্! কারণ, তিনি স্বকপোলকল্পিত “বিদ্যারত্ন” উপাধি-ধারী। তিনি যদি কোন বিশিষ্ট পণ্ডিত-সভার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধিভূষণে ভূষিত হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার উপাধিধারণ করা সার্থক হইত। যিনি সাধারণকে প্রতারণা করিবার জন্য মিথ্যা ফাঁকা উপাধি ধারণ করিতে পারেন, তিনি প্রবঞ্চক ও শঠ। তিনি পুস্তিকায় গীতার বুক্‌নি দিয়াছেন:—

“শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো.........পরধর্ম্মো ভয়াবহ।”

আমরা বলি—

“ধার্ম্মিকেই ধর্ম্ম রাখে অধার্ম্মিকে ভেদ,
ধর্ম্মধ্বজী ধর্ম্মশীলে অনন্ত প্রভেদ।”

বিদ্যারত্ন-উপাধি-ব্যাধিগ্রস্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মণ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া নিজেই স্বধর্ম্ম পালন করিতেছেন না। তিনি শূদ্রদান-গ্রহণকারী হইয়া, স্বধর্ম্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। তিনি কুলটিকরি-নিবাসী শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ প্রামাণিক নামক জনৈক মাহিষ্য ভদ্র মহোদয়ের

নিকট এক সময় অর্থ কর্জ্জ লইয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ তলপ তাগাদা করিয়া ত্রৈলোক্যবাবু তাঁহার নিকট হইতে টাকা ফেরত না পাওয়ায় উলুবেড়িয়ার দেওয়ানি আদালতে ১৯০৮ সালের ৩৮২ নং মোকদ্দমা উত্থাপন করিয়া ডিক্রী করতঃ ক্রোক ইস্তাহার জারি করিয়া ডিক্রীর ৮০৲ টাকা ও খরচা ৯৷৷০ টাকা আদায় করিয়াছিলেন, তাঁহার প্রকৃত নাম মহেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী। ইনি কিরূপ ধার্ম্মিক সকলে চিনিয়া রাখুন। এইরূপ প্রকৃতির লোক সমাজের উপদেষ্টা হইলে দেশের সুখ শান্তির আশা করা বিড়ম্বনা। মাহিষ্যজাতি পক্ষাশৌচ অবলম্বন করিয়াছে বলিয়া সমাজের অশান্তি উৎপাদন হইয়াছে লিখিয়াছেন। অশান্তির কারণ কাহারা? পক্ষাশৌচাবলম্বী মাহিষ্যগণের নাপিত ধোপা বন্ধ করা হইতেছে। মুসলমানের ক্ষৌরকার্য্য করিয়া যাহারা সমাজে সচল থাকিতেছে, তাহারা পক্ষাশৌচধারী মাহিষ্যগণের ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করিলে পতিত হইবে! কি অদ্ভুত শাস্ত্রীয় বিচার? যাহারা এই প্রকারে নাপিত ধোপা ক্ষেপাইতেছেন তাঁহারা অশান্তির দায়ী, না মাহিষ্যেরা দায়ী? গ্রন্থকর্ত্তা চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিপদগ্রস্ত হইয়া দ্বারে দ্বারে অর্থ ভিক্ষা করিলে, কেহ যখন তাঁহাকে দয়া করেন নাই, তাঁহার "চক্ষু ফাটিয়া রক্তস্রোত বাহির" হইলেও যখন তিনি স্বীয় সমাজের কাহারও নিকট কোন উপকার প্রাপ্ত হন নাই, তখন মাহিষ্যজাতীয় জনৈক ভদ্র মহোদয় তাঁহার বিপদে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু টাকা সহজে সময়ে পরিশোধ না করিয়া তাঁহার উপকারক বন্ধুর কিরূপ প্রত্যুপকার করিয়াছিলেন, উলুবেড়িয়ার আদালতের নথিতে তাহার প্রমাণ আছে। এমন ধর্ম্মধ্বজীর শাস্ত্রীয় উপদেশে সমাজের কৃষিকৈবর্ত্তগণ ধন্য হইয়া যাইবে। কৃষি-কৈবর্ত্ত জাতি অধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া রসাতলে থাকুক, তাহাতে—হে ধর্ম্মধ্বজী বৈড়াল-ব্রতধারী কলির ব্রাহ্মণ! তাহাতে আপনার ক্ষতি কি? আপনি ত চাষি-কৈবর্ত্তকে জালিক কৈবর্ত্তের সামিল করিয়া অন্ত্যজ-শ্রেণীভুক্ত করিতে যাইতেছেন; অতএব তাঁহাদের বাটীতে আপনার ন্যায় সৎ বা অসৎব্রাহ্মণের গমনাগমন সম্ভবে না। তবে আপনার এত ক্রোধ কেন? চাষি-কৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্বের ও বৈশ্যত্বের প্রমাণ অনেক দিন হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের সহিত প্রকাশ্য সংবাদপত্রে বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশিত হইয়া চাষি-কৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। উদাহরণচ্ছলে দুই একটির কথা উল্লেখ করিতেছি।

সম্বন্ধ-নির্ণয়-কর্ত্তা পণ্ডিত শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধির সহিত বহুদিন ধরিয়া "সময়" সংবাদ পত্রে ফরিদপুর-হাবাসপুরের পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস

মহাশয়ের বাক্-বিতণ্ডা চলিয়াছিল, শেষে বিদ্যানিধি মহাশয় ১৩০৪ সালের ১৯শে চৈত্র তারিখের এডুকেশন গেজেটে নিজের ভ্রম সংশোধন করিয়া কৃষি-কৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। হাওড়ার প্রখ্যাত সাহিত্যিক "সমাজকালিমা", 'আদর্শসতী' প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা প্রণম্য শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ মুখোপাধ্যায়ের সহিত "প্রকৃতি" নামক সংবাদপত্রে ঢাকার শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র সরকারের ও ভবানীপুরের শ্রীযুক্ত বাবু প্রকাশচন্দ্র সরকারের বহু বাদ-প্রতিবাদ হইয়াছিল, শেষে প্রাণবল্লভ বাবু সরলভাবে চাষি-কৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্ব ও বৈশ্যত্ব স্বীকার করিয়া মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সাহিত্যজগতে সুপরিচিত সন্ন্যাসী বাবা ধর্ম্মানন্দ মহাভারতী মহাশয় "আনন্দবাজার ও বিষ্ণুপ্রিয়া" পত্রিকায় চাষি-কৈবর্ত্তের গ্লানিসূচক সমালোচনা প্রকাশ করিলে "সেবিকা"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয়ের সহিত বহু তর্ক-বিতর্কে পরাস্ত হইয়া মহাভারতী মহাশয় নিজের ভ্রান্তি প্রকাশ্য সংবাদপত্রে ঘোষণা করিয়া চাষি-কৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এমন কি, তিনি "সিদ্ধান্ত-সমুদ্র" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া চাষি-কৈবর্ত্তের গৌরব প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ বহু পণ্ডিতের সহিত তর্কযুদ্ধ শেষ হইয়া, যাহা সত্য তাহাই জগতে প্রকাশিত হইয়াছে। সেই সময়, বোধ হয়, ভুঁইফোড় বিদ্যারত্ন মহাশয় মাতৃগর্ভে ঊর্দ্ধপদে চাষি-কৈবর্ত্তের পক্ষাশৌচের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য সাধনা করিতে-ছিলেন! তিনি যে পুরাণ কাশুন্দির হাঁড়ী খুলিয়াছেন, সেই হাঁড়ী ঘেঁটুপূজার দিনে হইলে পল্লীস্থ বালকগণের লগুড়াঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইত। ভুঁইফোড় বিদ্যারত্ন মহাশয় মনু ও যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতার ব্যাখ্যা করিতে যাইয়া, নিজের বেদো-জ্জ্বলা পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এখনও কিছুদিন শিক্ষা করিলে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইবেন। খালোড় সভায় দণ্ডায়মান হইয়া একখানি ছাপান দরখাস্ত পাঠ করিতে যাঁহার হৃৎকম্প হইয়াছিল, দরখাস্তে লিখিত একটি শ্লোকও শুদ্ধ উচ্চারণ করিতে না পারিয়া সভাস্থ সকলের টিট্‌কারী লাভ করিয়া অপমানিত হওতঃ যিনি "বিদ্যাশূন্য" ভট্টাচার্য্যে পরিণত হইয়াছেন, তিনি ত অনুগ্রহের পাত্র। তবে তাঁহার কোন সন্দেহ হইলে, তিনি সরলপ্রাণে শ্রীযুক্ত প্রাণবল্লভ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার সন্দেহভঞ্জন করিতে পারেন; পণ্ডিত লালমোহন বিদ্যানিধির সম্বন্ধ-নির্ণয়ের পরিশিষ্টে বিদ্যানিধি মহাশয়ের ভ্রম-সংশোধন দেখিতে পারেন; সেন্সাস্ কোড্ দেখিতে পারেন। মহামান্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আনীত নবদ্বীপের রাজসভাস্থ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ-

প্রদত্ত ভাষ্যপত্র দেখিতে পারেন (সেই সকল মূল ভাষ্যপত্র কলিকাতা ৩৮ নং পুলিশ হাসপাতাল রোড নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের নিকট রক্ষিত আছে)। কলিকাতা সংস্কৃত-কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্সিপাল নীলমণি ন্যায়ালঙ্কার ও স্মৃতিশাস্ত্রের অধ্যাপক মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণ প্রমুখ প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণের প্রদত্ত ভাষ্যপত্র * দর্শন করিতে পারেন। তাহাতেও যদি চাষি-কৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্ব-বিধানের সন্দেহভঞ্জন না হয়, তবে আমরা নাচার। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের শিক্ষা করিতে অনেক বাকী। তিনি বিদ্বেষপূর্ণ হৃদয়ে মাহিষ্যজাতির বিরুদ্ধে যে বিষোদ্গীরণ করিতে যাইয়া অযথা সময় নষ্ট করিয়াছেন, সেই সময় যদি তিনি ব্যাকরণের সন্ধিসূত্র, কর্ম্মবাচ্যে ও কর্ত্তৃবাচ্যে বিশেষণ প্রয়োগবিধি পাঠ করিতেন, তাহাতে তাঁহার জ্ঞানলাভ হইত। পরের চরকায় তৈল প্রদান করা নিষ্কর্ম্মা লোকেরই কার্য্য।

"বিদ্যারত্ন" মহাশয় নাকোলের ব্যবস্থা, পাণিত্রাসের ব্যবস্থা, নিত্যতারণের ব্যবস্থা, থালোড়ের ব্যবস্থা, মহিষাদলের ব্যবস্থা তুলিয়া সাধারণকে বিপথে চালিত করিতেছেন। পণ্ডিত সতীশচন্দ্র মাইতি নাকোলের ব্যবস্থার ব্যাখ্যান সুন্দররূপে করিয়া দিয়া সাধারণে বিতরণ করিয়া দিয়াছেন। সভার আহ্বান-কর্ত্তা শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন মিশ্রকে ব্যবস্থা ব্যাখ্যান প্রদান করিয়াছেন। ভাষ্যখানির প্রতিছত্রে নানাপ্রকার ভুল প্রদর্শন করিয়া—ইহার অসারত্ব প্রতিপাদন করিয়া—অপভাষ্যে পরিণত করিয়া দিয়াছেন। প্রতিবাদ পুস্তকের প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন, বিদ্যারত্ন প্রভৃতি ব্যবস্থাদাতৃগণের সাহসে কুলাইল না। পাণিত্রাসের ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিবার জন্য পার্শ্বস্থ মানকুর গ্রামে বিরাট সভার আয়োজন হইয়াছিল। সেই সভায় পাণিত্রাসের ব্যবস্থাদাতা সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতগণ, বর্দ্ধমান বেলাড়ি নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হংসেশ্বর মুখোপাধ্যায় কাব্যতীর্থ-বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়কে সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত দেখিয়া মিছাকারণে বিবাদছলে পলায়ন করিয়া সে যাত্রা পাণ্ডিত্য রক্ষা করিলেন। কারণ যাবৎ "কিঞ্চিন্নভাষতে"। এই ঘটনা স্থানীয় অধিবাসীবৃন্দ অবগত আছেন। থালোড়ের সভায় দাম্ভিক পঞ্চানন তর্করত্ন, পণ্ডিত হংসেশ্বর কাব্যতীর্থ-বেদান্তশাস্ত্রী মহাশয়ের শাস্ত্রসঙ্গত যুক্তিতর্ক, হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহিয়াছিলেন। তজ্জন্য তিনি তর্করত্নের সহিত একমত না হইয়া, পৃথক্ ভাষ্য প্রদান করিয়াছিলেন। অতএব থালোড়ের সভায় তর্করত্নপ্রদত্ত ভাষ্য সর্ব্ববাদীসম্মত হয় নাই। তথাপি তর্করত্নপ্রদত্ত ভাষ্য-

* কলিকাতা জানবাজারে ৺ত্রৈলোক্যনাথ বিশ্বাস মহাশয়ের বাটীতে রক্ষিত আছে।

খানি মাত্র গ্রন্থকর্ত্তা খালোড়ের সভায় ভাষ্য বলিয়া তাঁহার গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া সত্যবাদিতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। মহিষাদলের রাজবাটীর সভায় তর্করত্ন মহাশয়ের গর্ব্ব চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যায়; তিনি রাজাপ্রজার টিট্‌কারী লাভ করিয়া চলিয়া আসেন। সভার পূর্ব্বে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন-বুভুৎসার যুক্তিবলে সভা ভঙ্গপ্রায় হইয়াছিল। রাজসভায় কোন ভাষ্য প্রদত্ত হয় নাই। "ক্ষীর-কৈবর্ত্ত"-গ্রন্থকার মহিষাদলের রাজসভায় "ভাষ" প্রকাশ করিতেছেন। ধন্য চাতুরী! ধন্য সত্যবাদিতা!!!

পণ্ডিত সতীশচন্দ্র মাইতি তর্করত্ন মহাশয়ের গুরু মধুসূদন স্মৃতিরত্ন মহাশয়ের প্রদত্ত ভাষ্যের মৌলিকতা ও সত্যতা প্রমাণ করিয়া এবং "তর্করত্নকে" মিথ্যাবাদী ঘোষণা করিয়া, "মাহিষ্য-মর্য্যাদা" নামক সরস পদ্যপুস্তিকা প্রণয়নপূর্ব্বক তর্করত্ন মহাশয়কে প্রদান করিয়াছেন ও সাধারণে বিতরণ করিয়াছেন। তর্করত্ন মহাশয় এ পর্য্যন্ত তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হন নাই; বরং কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার গুরুর মন্ত্রশিষ্য উৎকল-ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ মিশ্র মহাশয়ের বাটীতে গমন করিয়া কোন প্রকারে গুরুদত্ত ভাষ্যখানি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন (এই প্রাণকৃষ্ণ মিশ্র মহাশয়ের বাটীতে বসিয়া স্মৃতিরত্ন মহাশয় ভাষ্য লিখিয়াছিলেন); কিন্তু মাহিষ্যজাতি তাঁহাকে বিশেষরূপে চিনিয়াছেন, তাঁহার হস্তে ভাষ্যখানি প্রদান করেন নাই। শিষ্য একলব্য গুরু দ্রোণাচার্য্যকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ কর্ত্তন করিয়া দিয়া গুরুদক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন। তর্করত্ন মহাশয় গুরুলজ্ঘী ছাত্র হইয়া দুই হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনপূর্ব্বক গুরুদত্ত বিধির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন এবং ভট্টপল্লী পঞ্চাননা টোলের ব্যবস্থা জাহির করিলেন। সন ১৩১৫ সালের ২রা ও ৩০শে জ্যৈষ্ঠের হিতবাদীতে "শূদ্রসেবী শূদ্রান্নপুষ্ট শূদ্রের মন্ত্রদাতা শূদ্র-প্রতিগ্রাহী" "বঙ্গবাসীর মাতুলকুলের গুরু ব্রাহ্মণ-কুমার শ্রীমান্ পঞ্চু বাবুর" অসত্যবাদ ও শাস্ত্রের অপব্যাখ্যার টীকা টীপ্পনী প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ঊনবিংশ সংহিতার অনুবাদে বিধবার বিবাহবিধি লিখিয়া জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বিধবা কন্যার বিবাহ ব্যাপার লইয়া "ধর্ম্ম-সিদ্ধান্তে" বিপরীত মত প্রকাশ করিয়া, সত্যবাদিতার চূড়ান্ত নিদর্শন দেখাইয়াছেন। তিনিই আবার চাষি-কৈবর্ত্তের পক্ষাশৌচ লইয়া গত ১৬ই চৈত্রের হিতবাদীতে তাঁহার প্রবন্ধের গৌরচন্দ্রিকায় হিন্দু-সমাজরথের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি-চক্রভঙ্গের উদাহরণ দিয়াছেন, অর্থাৎ চাষিকৈবর্ত্ত জাতি পক্ষাশৌচ অবলম্বন করিয়া নিবৃত্তি-

মার্গের পরিবর্ত্তে প্রবৃত্তিমার্গে চলিয়াছে বলিয়া সমাজরথ আর চলিতেছে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। আহা! তিনি কেমন "নিবৃত্তি"-মার্গের পথিক, সাধারণের তাহা জানিতে বাকী নাই। "কিন্তু বিড়ম্বনার বিষয় এই যে, পঞ্চু বাবু বহু পুত্র কন্যা ও দৌহিত্র বিদ্যমান থাকিতেও বানপ্রস্থাশ্রমের অব্যবহিত পূর্ব্বে ১ম নয়, ২য় নয়, ৩য় পক্ষে ১টি দশম বর্ষীয়া বালিকার পাণিপীড়ন (অদৃষ্টপীড়ন ?)" করিয়া নিজে নিবৃত্তি-মার্গের কেমন সুরসিক পথিক তাহার পরিচয় দিয়াছেন। এই সকল ধর্ম্মধ্বজীদিগের প্রদত্ত ভাষ্য খালোড়ের সভা-আহ্বান-কারিগণের নিকট বহু মূল্যবান ;—বিদ্যারত্নোপাধি-ব্যাধিগ্রস্ত মহেন্দ্রবাবুর নিকট ইহা তদধিক মূল্যবান। তর্করত্ন মহাশয় খালোড়ের সভায় চাষি-কৈবর্ত্তকে মাহিষ্য নয় বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছেন। এখন দেখিলেন যে, ইহাদিগকে মাহিষ্য হইতে বাদ দেওয়া আর সম্ভবপর নহে ; অতএব মাহিষ্যজাতিকে যে কোন প্রকারে অপকৃষ্ট ম্লেচ্ছ জালিক প্রমাণ করিতে পারিলেই সব লেঠা চুকিয়া যায়। শুনিতেছি না কি, বৃহৎ নন্দাকেশ্বর পুরাণে মাহিষ্যের গ্লানিসূচক শ্লোকাবলী প্রকাশ করিয়া মাহিষ্যের বিশুদ্ধত্ব খণ্ডন করিতেছেন। তাঁহার প্রকাশিত শ্লোকাবলী এখনও লোকলোচনে আবির্ভূত হয় নাই।

যদি তিনি সত্য সত্যই মাহিষ্য-জাতির গ্লানিসূচক শ্লোক ছাপান, তাহা হইলে সেই শ্লোকগুলি যে কল্পিত, তাহা নিশ্চয়; কারণ খালোড়ের সভায় সে দিন চাষি-কৈবর্ত্ত মাহিষ্য নহে বলিয়া মাহিষ্যের গৌরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। পাঠক মহাশয় দেখুন, বঙ্গবাসীর "শূদ্রপ্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণকুমার শ্রীমান্ পঞ্চু বাবু" "প্রধান দার্শনিক স্মার্ত্ত নৈয়ায়িক" পণ্ডিতের মুখে শাস্ত্রের কতপ্রকার ব্যাখ্যা হইবে। ২রা জ্যৈষ্ঠের (১৩১৫) "হিতবাদী" স্পষ্ট লিখিয়াছেন, "এই মেকী মহাশয়েরা যতক্ষণ আপনাদের মূল্য বুঝিয়া নীরব থাকেন, ততক্ষণ তাঁহাদের সহিত কোন সম্পর্ক থাকে না ; কিন্তু যখন মেকীর দল বিজ্ঞাপনের বলে স্ফীত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া সমাজে আসল হিসাবে আত্মপ্রকাশ ও বিদ্যা জাহির করিতে অগ্রসর হন, তখন সাধারণের হিতার্থে তাঁহাদিগের স্বরূপ সকলকে জানাইয়া দেওয়া উচিত। নচেৎ পিত্তলকে কাঞ্চন জ্ঞান করিয়া জনসাধারণ ভ্রমে পতিত হইতে পারেন"। ঐ তারিখের হিতবাদীতেই "বঙ্গবাসীর শাস্ত্রজ্ঞান" প্রবন্ধের শেষভাগে প্রকাশিত হইয়াছে,—"এই মহাপণ্ডিত পঞ্চু বাবুই বঙ্গবাসীর শাস্ত্র-প্রকাশের সম্পাদক ; তাই আমরা এক সময়ে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, শাস্ত্রপ্রকাশ ... এই সাকল্যগুরু পণ্ডিতপুঙ্গবই বিধবা-বিবাহের ব্যবস্থা খণ্ড

খণ্ড করিবেন বলিয়া—রঙ্গবাসী স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। খণ্ড খণ্ড না হইবে কেন? জীব-বিশেষের হস্তে মুক্তার মালা পড়িলে তাহার কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা কি কেহ জানে না?” হিতবাদীর উক্তির উপর আমাদের টীকা টীপ্পনী অনাবশ্যক। তবে এই মাত্র বলি যে, এই রূপ পণ্ডিতের হস্তে মাহিষ্য-জাতির বিশুদ্ধতার খণ্ডন হইবে না ত কাহার হস্তে হইবে?

এহেন পঞ্চানন তর্করত্নের নামের দোহাই দিয়া প্রকাশবাবু তাঁহার “মাহিষ্য-প্রকাশের” গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন না গৌরব হ্রাস করিয়াছেন? এহেন তর্করত্নের ভাষ্য গঙ্গার জলে ফেলিয়া তাহার সদ্গতি করা উচিত। প্রকাশবাবুকে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহার “মাহিষ্য-প্রকাশে” যে পৃষ্ঠায় তর্করত্নের নামোল্লেখ আছে, সেই পৃষ্ঠা ছিঁড়িয়া দিয়া এহেন পণ্ডিত-র ত্নর হস্ত হইতে মাহিষ্য-জাতিকে রক্ষা করুন।

‘কৃষি-কৈবর্ত্ত’-প্রণেতা “বিদ্যাশূন্য” ভট্টাচার্য্য “তর্করত্ন”কর্ত্তৃক হিতবাদীতে প্রকাশিত—নিষাদকে ক্ষত্রিয় ও আয়োগবীকে বৈশ্যকন্যা—কষ্টকল্পিত ব্যাখ্যা তুলিয়া, জালিক কৈবর্ত্তের সহিত হালিক কৈবর্ত্তের সমতা প্রমাণ করিতেছেন। তিনি তর্করত্নের ব্যাখ্যার চর্ব্বিত-চর্ব্বণ করিয়াছেন মাত্র, অতএব তর্করত্নের ব্যাখ্যার সমালোচনা করিতে হইল।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের—

ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কলৌ তীবর-সংসর্গাদ্ধীবরঃ পতিতোভুবি॥

শ্লোকের অর্থ পণ্ডিত মহাশয় স্বকপোলকল্পিতভাবে করিয়াছেন। “ক্ষত্রবীর্য্য” শব্দে নিষাদ অর্থ পণ্ডিত মহাশয়ের কেবল অনুচিত জিগীষাসম্ভূত অর্থ মাত্র। আবার বৈশ্যা অর্থে শূদ্রের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভজাতা আয়োগবী জাতীয়া রমণীকে বুঝাইয়াছেন। যদি শূদ্র পিতার কন্যা বৈশ্যাগর্ভে জন্মিলে বৈশ্যা নাম পায়, তবে শূদ্রের ঔরসে ব্রাহ্মণীগর্ভে উৎপন্ন চণ্ডালীকে ব্রাহ্মণী বলিতে বাধা কি? মহর্ষি কৈবর্ত্তকে সম্মানিত করিবার জন্য তাহার ক্ষত্রিয় পিতা এবং বৈশ্য মাতার উল্লেখ করিয়াছেন! তর্করত্ন মহাশয়ের অপর বীরজাতি বোধ হয় “চণ্ডাল” হইবে। তাহাকে সম্মানিত করিবার জন্য সমস্ত শাস্ত্রকর্ত্তা তাহার পিতা শূদ্র, মাতা ব্রাহ্মণী করিয়াছেন কি? কৈবর্ত্তের সপিণ্ডীকরণ করিতে হইবে বলিয়া কি এইরূপ হাস্যাস্পদ ব্যাখ্যা করা পণ্ডিতজনোচিত কর্ম্ম? শ্লোকের সরল সাংসিক অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ কষ্টকাল্পনিক অর্থ কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই অনুমোদন

করিতে পারেন না। এইরূপ অর্থ মান্য হইলে হস্তী অর্থ অশ্ব, সর্প অর্থ ভেক্ হইতে পারে। পণ্ডিত মহাশয়ের ব্যাখ্যা শুনিয়া মনে হইল, সংস্কৃত বিদ্যার বলে অনেক ইংরাজী শব্দেরও নাকি ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণীত হয়। ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গের ছোটলাট উড্‌বরণ্ সাহেবের প্রশস্তি দিবার সময় জনৈক পণ্ডিত তাঁহার নামের ব্যুৎপত্তিসূচক অর্থ করিয়াছিলেন। উড্ (উর্দ্ধ) বরণ্ (যশঃ) যার সে উর্দ্ধবর্ণ বা উড্‌বরণ্। সংস্কৃত ধাতু প্রত্যয় যোগে নাকি মুর্দ্দাফরাস শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নির্ণীত হইয়াছে। এ সকল যদি সম্ভব হয়, তবে ক্ষত্রবীর্য্য শব্দে নিষাদ এবং বৈশ্যা শব্দে বৈশ্যাগর্ভসম্ভূত শূদ্রকন্যা আয়োগবীকে না বুঝাইবে কেন?

পণ্ডিত মহাশয় ব্যাসদেবকে মিথ্যাবাদ হইতে বাঁচাইবার জন্য এই কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু কোন ব্যক্তির পূর্ণ ফটো দিয়া নাম না দিলেও যেমন তাহার প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয়, তদ্রূপ তিনি স্বীয় প্রবন্ধে বেদব্যাসের যে ফটো আঁকিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ঘোরতর মিথ্যাবাদী ও প্রতারক সাজাইয়াছেন। এ পর্য্যন্ত কোন পণ্ডিত নামধারী ব্যক্তি কর্ত্তৃক মহর্ষির এইরূপ লাঞ্ছনা হয় নাই। কারণ তর্করত্ন মহাশয় লিখিয়াছেন—কৈবর্ত্তের ভুজবলে বাঙ্গালা রক্ষিত হইত বলিয়া মহর্ষি কৈবর্ত্তদিগকে সম্মানিত করিবার জন্য—"কৌশলপূর্ণ বচনে কৈবর্ত্তজাতির উৎপত্তি লিখিয়াছেন; আপাতগম্য অর্থের প্রভাবে অধম শূদ্র-সমাজে কৈবর্ত্তজাতির প্রতিষ্ঠা হইবে, ইহাই নীতিবৎ মহর্ষির কৌশল।" এই নীতিবৎ কথা বলাও যা, মহর্ষিকে মিথ্যাবাদী প্রতারক বলাও তাই। যে মহাত্মা স্বীয় জন্মবিবরণ লজ্জাজনক হইলেও সাধারণে প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি কৈবর্ত্তের প্রতারণাপূর্ণ জন্মবৃত্তান্ত লিখিয়া কৈবর্ত্তকে সন্তুষ্ট করিলেন! কি আশ্চর্য্য কথা!! কৈবর্ত্তকে বীরত্বের জন্য সম্মানিত করাই যদি তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তবে চীন, হূন, দ্রবিড়, খসের ন্যায় ক্ষত্রিয় বলিতে তাঁহার কি বাধা ছিল।

তর্করত্ন মহাশয় নিষাদ জাতির বীরত্ব পুরাণের বহুস্থানে দেখিয়াছেন। তাই তাহার সন্তান কৈবর্ত্তের বীরত্ব বর্ণন করিয়াছেন। তিনি মনুর প্রাধান্য স্বীকার করেন। মনু নিষাদ জাতির ব্যবসায় মৎস্যঘাত লিখিয়াছেন, যথা—

"মৎস্যঘাতো নিষাদ নাং"—মনু ১০ম অঃ, ৪৮ শ্লোক।

অতএব দেখা গেল, নিষাদগণ মৎস্যঘাতে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করে। তাহার সন্তান কৈবর্ত্তগণ নরঘাতী, সমরজীবী রাজজাতিতে পরিণত হইল, মীমাংসা মন্দ নহে। পণ্ডিত মহাশয়ের সরল চিত্তে এইরূপ বীরজাতিতে ক্ষত্রিয় সংস্রব আসে না কি?

তর্করত্ন মহাশয় "ক্ষত্রবীর্য্যেণ" শব্দে ব্যাসদেবের কৌশলের অনুসন্ধান পাইয়াছেন। মহর্ষির কৈবর্ত্ত হইতে এত ভয় যে, তিনি সরলভাবে "নিষাদের ঔরসে আয়োগবী গর্ভে কৈবর্ত্তের জন্ম" লিখিতে ভীত হইয়া কূট কৌশলের আশ্রয় লইয়াছেন। ক্ষত্রিয়াৎ বা ক্ষত্রিয়েণ শব্দ প্রয়োগ না করিয়া ছন্দানুরোধে "ক্ষত্রবীর্য্যেণ" শব্দ প্রয়োগ করায় মহর্ষির বড়ই অপরাধ হইয়াছে।

তর্করত্ন মহাশয় কেবল "ক্ষত্রবীর্য্য" শব্দে নিষাদ, এবং বৈশ্যাশব্দে আয়োগবী অর্থ করিয়া মনুর শ্লোকের সহিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তের শ্লোকের একবাক্যতা করিয়াই ছাড়েন নাই। তিনি দেখিলেন, ইহাতেও কৈবর্ত্তদিগকে মনের মত গালাগালি দেওয়া হইল না, এজন্য লিখিলেন "বরং সঙ্কর উৎপত্তির প্রসঙ্গ বলিয়া পরপরিণীতা বৈশ্যার গর্ভে ক্ষত্রিয় উপপতির ঔরসে জাত বর্ণসঙ্কর বলিয়াই মনে হয়।" ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে মিশ্রবর্ণ মাত্রকেই সঙ্কর বর্ণ বলা হইয়াছে। এই সঙ্কর উৎপত্তির মধ্যে থাকায় অম্বষ্ঠ, করণ, উগ্রজাতির যেমন বিশুদ্ধতা নষ্ট হয় নাই, কৈবর্ত্তেরও তদ্রূপ বিশুদ্ধতা রক্ষিত হইয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ অভিধান শব্দকল্পদ্রুমেও সঙ্কীর্ণ শব্দের অর্থস্থলে—"অম্বষ্ঠকরণাদি-চণ্ডাল পর্য্যন্ত মিশ্রজাতিঃ। ইত্যমরঃ।" লিখিত আছে। সুতরাং সঙ্কীর্ণ প্রকরণে কৈবর্ত্তের উৎপত্তি আছে বলিয়া ভাগবত অশুদ্ধ হয় নাই। কৈবর্ত্ত অশুদ্ধ হইলে অম্বষ্ঠকরণাদিও অশুদ্ধ হইবে।

পণ্ডিত মহাশয় ক্ষত্রিয় উপপতি ও পরপরিণীতা বৈশ্যা কোথায় পাইলেন? বৈশ্য শব্দের জাতি অর্থে স্ত্রীলিঙ্গে "বৈশ্যা" হয়। বৈশ্যপত্নী বুঝাইলে "বৈশ্যী" হইত। সুতরাং পরপরিণীতা বৈশ্যী হইলে কদাচ 'বৈশ্যায়াং' পাঠ হইত না।

আর সমাজের আদিম অবস্থার কথা লইয়া কৈবর্ত্তকে নির্য্যাতন করার পূর্ব্বে পণ্ডিত মহাশয়ের ভাবা উচিত ছিল, যে সময়ে আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ প্রভৃতি বিবাহও বিবাহ বলিয়া গণ্য হইত, যে সময়ে পুরুষ রতিপ্রার্থী হইলে স্ত্রীলোকের ঐ পুরুষের অনুগমন করা সনাতন ধর্ম্ম ছিল, যে সময়ে পরাশর মুনি ধীবরনন্দিনীকে পাইয়া ব্যাসদেবের জন্ম দিয়া পরাশর গোত্রীয় ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে সময়ে উতথ্য মুনি স্বীয় ভ্রাতৃপত্নী বৃহস্পতিপত্নীতে ভরদ্বাজ ঋষিকে জন্ম দিয়া ভরদ্বাজগোত্র প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন, যে সময়ে বেশ্যাগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াও বশিষ্ঠ মহামুনি হইয়া বশিষ্ঠগোত্রীয় ব্রাহ্মণের সৃষ্টি করিয়াছেন, যে সময়ে বলি রাজার পত্নীতে দীর্ঘতমা ঋষি অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গাদি সন্তানের উৎপাদন করিয়া ক্ষত্রিয়বংশ বিস্তার করিয়াছেন, সেই সময়ের জাতীয় উৎপত্তি

গ্রন্থকর্ত্তা বিদ্যারত্ন মহাশয় পণ্ডিত নিত্যতারণের ব্যবস্থা তুলিয়া বাহবা লইতেছেন; অথচ নিত্যতারণের ব্যবস্থায় "অনাচরিত-দ্বিজধর্ম্মানামনুলোমজাতানাং মাহিষ্যানামেবঞ্চমেব মাসাশৌচং ব্যবহর্ত্তব্যমিতি" লিখিত আছে। নিত্যতারণ কৃষি কৈবর্ত্তকে ত মাহিষ্য বলিয়া গেলেন, কেবল পক্ষাশৌচের পরিবর্ত্তে মাসাশৌচ ব্যবস্থা লিখিলেন। ব্যবস্থার একাংশ গ্রহণ করা হইবে আর অন্যাংশ পরিত্যাগ করা হইবে, বলিহারি যুক্তি! এক্ষণে নিত্যতারণ স্মৃতিরত্নের চরিত্র ব্যাখ্যার আবশ্যক হইয়াছে। কলিকাতা ইটালি নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধের প্রায় সপ্তাহ পূর্ব্বে যে সভা হইয়াছিল, সেই সভায় পণ্ডিত নিত্যতারণ সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রতিপক্ষগণের সহিত বহু বাদপ্রতি-বাদের পর সভাস্থ সকলের সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে 'কৃষিকৈবর্ত্ত ওরফে মাহিষ্যজাতির পক্ষাশৌচ একান্ত বিধেয়' ঘোষণা করিয়া ভাষ্য প্রদান করিলেন। পরদিন প্রাতঃকালে টালিগঞ্জের প্রতিবাদক শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকৃষ্ণ মণ্ডলের বাটীতে গমন করিয়া, বিপরীত ভাষ্য প্রদান করিলেন। একই পণ্ডিতের দুই প্রকার ভাষ্য-প্রদান * কি চমৎকার ব্যাপার সকলে বুঝুন।

---

* (১) কলিকাতা ইটালী নিবাসী শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয়ের বাটীতে ১৩১৮ সালের ১৫ই কার্ত্তিক তারিখে প্রদত্ত ভাষ্যখানি এইরূপ:—

"সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্সুতা দ্বিজধর্ম্মিণ ইতি মনুবচনেন বিধিনা ক্ষত্রেণোঢ়ায়াং বৈশ্যায়াং জাতস্য দ্বিজধর্ম্মিত্বাভিধানাদনুলোমাস্তু মাতৃবর্ণা ইতি বিধিচোদিতত্বাচ্চ তেষাং বৈশ্যবৎ পঞ্চদশাহা-শৌচাদিকমাচরণীয়মিতি বিদুষাং পরামর্শঃ।"

শকাব্দা ১৮৩৩।৬।১৫

সন ১৩১৮ সাল, ১৫ই কার্ত্তিক।

স্মৃতিরত্নোপাধিক শ্রীনিত্যতারণ শর্ম্মণঃ

কাব্যতীর্থ-বেদান্তশাস্ত্র্যুপনামক শ্রীহংসেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ

বেদান্তবাগীশোপনামক শ্রীসারদাপ্রসাদ শর্ম্মণাম্

তাম্রলিপ্তীয় তালুকগোপালপুর চতুষ্পাঠী।

এই নিত্যতারণ স্মৃতিরত্নের প্রথম ভাষ্য।। ইহাতে পক্ষাশৌচ ব্যবস্থা আছে।

(২) তাঁহার দ্বিতীয় ভাষ্যখানি চন্দননগর-বারাসত মহানন্দ চতুষ্পাঠী হইতে পরদিনেই ১৬ই কার্ত্তিক তারিখে বাহির হইয়াছে, তাহা "কৃষি-কৈবর্ত্ত" পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। উহাতে "দ্বিজধর্ম্মিত্বেনোক্তানামপি অনাচরিত-দ্বিজধর্ম্মাণামনুলোমজাতানাং মাহিষ্যানামবঞ্চমেব মাসা-শৌচং ব্যবহর্ত্তব্যমিতি। সত্যপি শাস্ত্রে কুলাচারস্য বলবত্ত্বদর্শনাৎ কুলাচারানুসারেণ মাহিষ্যানাং মাসাশৌচমেবিতি স্মৃতিপ্রামমিতি।" এইরূপে মাসাশৌচের ব্যবস্থা দেখা যাইতেছে।

পূর্ব্বদিনে অপরাহ্নে এক ভাষা প্রদান করিয়া পরদিনেই অর্থাৎ কয়েকঘণ্টার মধ্যেই ব্রাহ্মণ-বংশ-সম্ভূত ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মরক্ষকশূন্য স্মৃতিরত্নের স্মৃতি-বিভ্রংশ! নিত্যতারণ অনিত্যতারণে পর্য্যবসিত!! এই শ্রীমন্নিত্যতারণ শর্ম্মা মহোদয়ের পাণ্ডিত্য-পরিজ্ঞান নামক পুস্তক যন্ত্রস্থ। শীঘ্রই সাধারণের সম্মুখে বাহির হইয়া তাঁহার চরিত্র পরিস্ফুট করিবে।

"কৃষি-কৈবর্ত্ত" পুস্তকে অনেক উপাধিব্যাধিগ্রস্ত পণ্ডিতের নাম প্রকাশিত আছে। নাকোলের শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসন্ন মিশ্র মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত প্রাণনাথ মিশ্র মহাশয় একখণ্ড পুস্তক উলুবেড়িয়ার সাবডিভিজনাল ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের করকমলে প্রদান করিলে, তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছেন যে, বিদ্যারত্ন, ন্যায়রত্ন, স্মৃতিরত্ন উপাধিধারী ব্যক্তিগণ প্রকৃতপক্ষে যথার্থ উপাধি-ভূষণে ভূষিত নহেন। কেবল কতকগুলা ফাঁকা মিথ্যা কল্পিত উপাধি লইয়া সাধারণকে প্রতারিত করা হইতেছে,—তাহার সাক্ষ্য কৃষিকৈবর্ত্ত পুস্তক প্রণেতা "ভুইকোড় বিদ্যারত্ন" বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য। গ্রন্থকর্ত্তা পুস্তকের মূল্য ।/০ আনা লিখিয়াছেন দেখিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর মন্তব্য প্রকাশ করিলেন যে, এই পুস্তক আবার লোকে পয়সা দিয়া ক্রয় করিবে?

আজিকালি এইরূপ বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য ও ঐশ্বর্য্যাভাবে রায় জাহির হইবে জানি। ৪০০ শত বৎসর পূর্ব্বে মুলো পঞ্চানন তাঁহার গোষ্ঠীকথায় লিখিয়াছেন,—

"বেদের শাখা মাত্রাধ্যাপনে উপাধ্যায়।
ভট্টাচার্য্যাদি খ্যাতি সমগ্র বিদ্যায়॥
চন্দ্রশেখরত্রয়ী সিদ্ধ বিদ্যালঙ্কার।
অধস্তনে বিদ্যালোপ কুলে অহঙ্কার॥
আজি বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য উপাধ্যায়।
রৈ শব্দে ঐশ্বর্য্য কহে অভাবেও রায়॥"—সম্বন্ধ-নির্ণয়।

চাষিকৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্ব লোপ করিবার চেষ্টায় তাহাকে জালিকের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া পুস্তক প্রকাশিত হইল, আর সেই পুস্তকগুলি মাহিষ্য-কুলধ্বজগণ—না—কৈবর্ত্ত-কুলতিলকগণ নিজ সমাজমধ্যে বিতরণ করিয়া প্রতিদ্বন্দ্বিগণের নিকট সুখ্যাতি লাভ করিতে লাগিলেন!

তাই বলি,—"তোরাই তোদের শত্রু রে লাঞ্ছিত জাতি!
কি বলে বুঝাইব ওরে আত্মঘাতী।"

"পণ্ডিতে বুঝিতে পারে পাণ্ডিত্যের মান,
মূর্খজনে পাণ্ডিত্যের না পায় সন্ধান।
কুসুমে বসিয়া অলি মধু লয় হরে ;
গুবরে পোকায় শুধু ঘুরে ঘুরে মরে।
মনের মতন কথা কয় যা বলি তা শুনে;
তারাই সমর্থ বটে প্রীতি আকর্ষণে।"

ভুঁইফোড় বিদ্যারত্ন মহাশয় তর্করত্নের ন্যায় মাহিষ্য জাতিকে জালিয়াৎ বলিয়াছেন। চাষিকৈবর্ত্ত জাতির মাহিষ্যত্বের ও বৈশ্যত্বের এবং তাহাদিগের পক্ষাশৌচ বিধানের ব্যবস্থাপত্রগুলি কলিকাতা পুলিশ হস্‌পিটাল রাস্তাস্থিত ৩৮নং ভবনে শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয়ের নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে; যিনি ইচ্ছা করেন, তিনি দেখিয়া মনের সন্দেহ ভঞ্জন করিতে পারেন। মাহিষ্যজাতি চিরকাল ন্যায়ের পথে সত্যের আলোকে চলিয়া থাকে, তাহা না হইলে গবর্ণমেণ্টের কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইত না।

কৃষিকৈবর্ত্ত পুস্তকে ১৮ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকর্ত্তা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে দোষারোপ করিয়া নিজের ধৃষ্টতার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। পাগল! সাত সমুদ্র তের নদী পার হইয়া যাঁহারা অনুসন্ধিৎসা, অধ্যবসায়, সত্যনিষ্ঠা ও ন্যায়পরতা প্রভৃতি রাজোচিত গুণে আজ অর্দ্ধ পৃথিবীর অধীশ্বর এবং আজ ৩০ কোটী ভারতবাসীর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়াছেন, যাঁহাদের অঙ্গুলি সঞ্চালনে হিমালয় বিন্ধ্যাচল চূর্ণবিচূর্ণ হইতে পারে—তাঁহারা বিনানুসন্ধানে প্রমাণ গ্রহণ না করিয়া এবং পণ্ডিতগণের সম্মতি না লইয়া কৃষিকৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্ব অনুমোদন করিয়াছেন ইহা যে বাতুলের প্রলাপোক্তি? তবে "ভুঁইফোড় বিদ্যারত্নের" ন্যায় পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিগণের মত লইতে না পারেন, তন্নিমিত্ত ক্ষোভ করিলে চলিবে কেন? গ্রন্থকর্ত্তা গবর্ণমেণ্টের হুকুমের নকল দেখিতে চাহিয়াছেন, নকল দেখিতে চাও কেন? বঙ্গের জেলায় জেলায় মহকুমায় মহকুমায় আসল নকল দেখিয়া চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন করিয়া যাও। নকল দেখিলে আবার "জালের" স্বপ্ন দেখিবে। কারণ পাণ্ডু রোগীর চক্ষু হরিদ্রাবর্ণ হওয়ায় সে জগতের যাবৎ বস্তুকে হরিদ্রাবর্ণ দেখে।

"সাধুঃ সাধুময়ং পশ্যেৎ ক্রূরঃ ক্রূরময়ং জগৎ
দর্পণেন যথা জন্তুঃ স্বীয়মাকারং বীক্ষতে।"

যে মাহিষ্যজাতি ধর্ম্মতঃ বৈশ্য, যাহারা কর্ম্মতঃ বৈশ্যাচরণশীল তাহাদিগকে শূদ্রমধ্যে শূদ্রাচারানুবর্ত্তী করিবার জন্য চীৎকারক মহোদয়গণের এত আগ্রহ কেন? শাস্ত্রাদেশ প্রতিপাদন করাইবার জন্য এত মাথা বাথা কেন? নিঃস্বার্থ পরোপকার ব্রত না কি? আসল কথা বলিব কি? সংসারাশ্রমের জীবিকাস্থল অনুগত যজমানগণের সমানশ্রেণিত্ব প্রদর্শনই হৃদয়ের গূঢ়াভিপ্রায়। পরিচর্য্যাত্মক যজমানগণ হইতে মাহিষ্যকে উচ্চ দেখিতে হইবে ইহা অসহ্য!! তাহা না হইলে কৃষিকৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্ব লোপ করিবার প্রবন্ধে নিজ যজমান নাপিতগণের প্রতি এত শুভদৃষ্টি কেন?

প্রশ্নকর্ত্তা নির্ভীক হৃদয়ে "জাতীয় বিচার বা ধর্ম্মের মীমাংসা মাননীয় গবর্ণমেণ্টের করিবার আবশ্যকতা নাই" লিখিয়া অদূরদর্শিতা ও অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা দেখাইতেছেন। কোন্ সাহসে—কোন বুদ্ধির বলে এইরূপে তিনি রাজকার্য্যের প্রতিবাদ করিতেছেন? ইহা কি রাজভক্তির নিদর্শন? গবর্ণমেণ্টের কি প্রয়োজনে জাতিতত্ত্বানুসন্ধান হইতেছে তাহা কি "ভুঁইফোড় বিদ্যারত্নের" ন্যায় বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্যের বুঝিতে আসিবে? মুসলমানদিগের আমলেও একরূপ জাতিমালার কাছারি ছিল। সেই কাছারিতে ধ্রুবানন্দ মিশ্র কুলবিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছিলেন। রাঢ়ীয় ঠাকুরগণের এই কুলবিচারই শেষ বিচার। এই বিচারই ৫ম সমীকরণ। কায়স্থ দত্তখাস এই সামাজিক কুলবিচারের কর্ত্তা ছিলেন। সেই সভায় "ভুঁইফোড় বিদ্যারত্ন" মহাশয়ের সম্প্রদায় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বিভাগ ঠিক হইয়াছিল, যথা—

স্ববংশ ভূপাল কুমারাক ভাং যোগ্যা বিবাদ প্রতিপত্তিকারী
শ্রীদত্তখাসস্য সভায় পূর্ব্বং কিলাপ কুশুংবটকাঃ সমুচুঃ।"

(বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসে উদ্ধৃত মহবংশাবলী)

"গৌণৈঃ সহ গৌণানাং পরিবর্ত্ত বিধানং কদাচিন্মুখ্যে
তনয়া প্রদানং অতোশ্রীদত্তখাসেন রাজ্ঞা
শ্রোত্রিয়ানাং সধর্ম্মত্বেন গৌণা অপি শ্রোত্রিয়াঃ কৃতা।—দেবীবর।

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বিবরণ—১৮৩ পৃষ্ঠা

যিনি স্বীয় সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত জানেন না, তিনি আবার ভিন্ন সম্প্রদায়ের জাতিতত্ত্ব আলোচনা করিতে চলিয়াছেন। এমন অনেক পাড়াগেঁয়ে মোড়ল দেখিয়াছি যে, তাহারা ঘরের সংবাদ অবগত নহে অথচ পরের গণ্ডগোলে মাতোয়ারা।

গ্রন্থকর্ত্তা স্বার্থ সিদ্ধির মংলবে কুলাচারকে প্রধান করিয়া কৃষিকৈবর্ত্তগণকে অযাচিত উপদেশ দিয়া সাবধান করিয়া দিতেছেন, যেন তাহারা মাহিষ্য বলিয়া পরিচয় না দেন, আর কু লোকের পরামর্শে বিপথে গমন না করেন। নতুবা চাষিকৈবর্ত্তের লুপ্ত কালিমা উদ্ধার হইবে ইত্যাদি ইত্যাদি। ধন্য নিঃস্বার্থ উপদেশ-বর্ষণ! এই উপদেশ পাইয়া "কৈবর্ত্ত" জাতি উদ্ধার হইয়া যাইবে, জগৎ রক্ষা হইবে, গ্রন্থকর্ত্তা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে। কৃষিকৈবর্ত্তগণের অযাচিত বন্ধু গ্রন্থকর্ত্তার মতে ভারতের মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণ ও মহামান্য গবর্ণমেণ্ট কু! আর তিনি সু!! হাসিবার কথা বটে!!!

শাস্ত্রবিরোধী দেশাচার বা কুলাচার যে পরিত্যজ্য তাহা কি "বিদ্যারত্ন" মহাশয়ের রত্নাকরে সম্যক্ প্রতিভাত আছে?

"দেশাচারকুলাচারয়োঃ শাস্ত্রবিধির্বলবান্।"

"ন যত্র সাক্ষাৎ বিধয়োর্ণনিষেধা শ্রুতৌ স্মৃতৌ
দেশাচারকুলাচারৈস্তত্র ধর্ম্মোনিরূপ্যতে।"—স্কন্দপুরাণ।

কি লৌকিক, কি পারলৌকিক উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়। শাস্ত্রের বিধি না পাইলে শিষ্টাচার প্রমাণ।

ধর্ম্মং জিজ্ঞাসমানানাং প্রমাণং পরমং শ্রুতিঃ
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রন্তু তৃতীয়ং লোকসংগ্রহঃ।

মহাভারত অনুশাসন পর্ব্ব।

বেদ—সর্ব্বপ্রধান প্রমাণ। ধর্ম্মশাস্ত্র—দ্বিতীয় প্রমাণ। লোকাচার—তৃতীয় প্রমাণ। যে স্থলে বেদ অথবা স্মৃতিতে স্পষ্ট বিধি অথবা স্পষ্ট নিষেধ না থাকে, সেইস্থলে দেশাচার বা কুলাচার অনুসারে ধর্ম্ম নিরূপণ করিতে হয়। এক্ষণে কথা হইতেছে যে, গ্রন্থকর্ত্তা যখন ক্ষত্রবৈশ্যজাত মাহিষ্যাপরনামা কৈবর্ত্ত বলিয়া স্বীকার করিতেছেন না, তখন সমূহ মাহিষ্যজাতি—কি পক্ষাশৌচধারী, কি মাসাশৌচধারী, উভয় দলই—অযাচিত উপদেশদাতার ন্যায় কৃত্রিম বন্ধুগণকে ভাল করিয়া চিনিয়া রাখুন।

গ্রন্থকর্ত্তা চাষিকৈবর্ত্তের লুপ্তকালিমা প্রস্ফুটিত হইবে বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন। তাঁহাকে আর ভয় দেখাইতে হইবে না। লুপ্তকালিমা চাষিকৈবর্ত্তের—না গ্রন্থকর্ত্তার নিজের সম্প্রদায়ের? "ভ্রান্তিবিজয়ে" সকলের ভ্রান্তি দূর হইতেছে। গ্রন্থকর্ত্তার জুজুর ভয়ে কেহ ভাত হইবে না। আজ এই পর্য্যন্ত, বিশেষ প্রতিবাদ পরে প্রকাশ্য।

শ্রীআনন্দ গোপাল চক্রবর্ত্তী।

ইতিবৃত্ত ও উপাধি।

ভাষায় ও ইতিহাসে জাতীয় উপাধি অনেক প্রাচীন তত্ত্বের একমাত্র চিহ্ন। মাননীয় শ্রীযুক্ত সুদর্শন বাবু ও শ্রীযুক্ত দুর্গানাথ দেওরায় তত্ত্ববিনোদ মহাশয় যে মাহিষ্য-সমাজে ইহার সম্বন্ধে নানা তথ্যপূর্ণ আলোচনা করিতেছেন, তজ্জন্য বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু "দেই" শব্দ বংশপত্রিকা-লেখকগণের দোষে ক্রমাপকর্ষ লাভ করিয়া ঐ আকার ধারণ করিয়াছে, সুদর্শন বাবুর এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া বোধ হইতেছে না। বাঙ্গালা ভাষায় অনেক শব্দ সংস্কৃতের বিকৃতি বলিয়া বোধ হয় বলিয়া বাঙ্গালাকে অপভ্রংশ বলা যায় কি? পুত্রের সহিত পিতার সাদৃশ্য থাকিলে যেমন একটীকে আর একটীর বিকৃতি বলা যায় না, ভ্রাতৃ সম্বন্ধেও তাহাই। সদৃশ থাকুক বা নাই থাকুক নৈসর্গিক নিয়মে গঠিত ভাষা মাত্রেই স্বতন্ত্র; ভাবপ্রকাশের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিলে সকলগুলিই সাধুভাষারূপে আদৃত হইবার উপযুক্ত। এই জন্যই পালি বৌদ্ধযুগে সংস্কৃতকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছিল এবং উত্তরকালে প্রাকৃত নানা প্রদেশে নানারূপ ধারণ করিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালা, গুজরাট, মহারাষ্ট্রী প্রভৃতির উৎপাদন করিয়াছে। ভাষাবিদের চক্ষে ইহাদের সকলেই সমান মর্য্যাদা সম্পন্ন স্বতন্ত্র ভাষা। বাস্তবিক "দেই" প্রাচীন বাঙ্গালা; খাঁটী সংস্কৃত নহে বলিয়া অবিশুদ্ধ নহে। এই সকল প্রাকৃত ও পালিযুগের শব্দ বঙ্গীয় মাহিষ্য জাতিতে অবিক্ষুন্ন অবস্থায় থাকিয়া ভাষার দিক হইতেও তাঁহাদের প্রাচীনত্ব ও বিশুদ্ধতা ঘোষণা করিতেছে। দুর্গানাথ বাবুর মত আমিও মাহিষ্যের পূর্ব্বগৌরবের চিহ্ন স্বরূপ এই সকল পুরাতন প্রাকৃত বা পালি শব্দ অন্ততঃ ইতিহাস আলোচনার জন্য অবিকৃত রাখিবার পক্ষপাতী। আমাদের দেশে ইতিহাস ও ভাষা চর্চ্চার সূত্রপাত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না; এরূপ স্থলে ঐতিহাসিক উপকরণ নষ্ট না করাই সকলের কর্ত্তব্য। মাহিষ্যের উপাধিগত ও চরিত্রগত বিশিষ্টতা যে তাহার প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন ইতিহাস নিশ্চয়ই তাহার অনুমোদন করিবে।

দ্বিতীয়তঃ, সুদর্শন বাবু মাহিষ্যের উপাধি বৈশ্যের মতন না হইবার কারণ দেখাইয়াছেন। ব্যবহার ইহার অনেকটা সমর্থন করে। কিন্তু মাহিষ্য সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ কৃষক; উৎপত্তিগত বৃত্তি—যুদ্ধ ও কৃষি—প্রাচীন ঋষিগণ ঠিক কি অর্থে এই জাতিবাচক সংজ্ঞাগুলি ব্যবহার করিতেন, সর্ব্বপ্রকারে বিপরীতগামী পাশ্চাত্য স্রোতের মধ্যে থাকিয়া তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন। বিজ্ঞান এক্ষণে

এক একটী মানব দম্পতী হইতে সমগ্র মানবের উৎপত্তি অসম্ভব স্থির করিয়াছে। তবে যাঁহারা বিভিন্ন প্রকৃতিক মানবচরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া প্রত্যেকেরই চরিত্র সত্ব রজঃ ও তমঃ এই তিন মৌলিক গুণের তারতম্যানুসারে গঠিত এই সনাতন সত্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাঁহাদের জাতিনির্ণায়ক নিয়ম বিজ্ঞান বিরুদ্ধ হইলে এ কথায় বিশ্বাস করা যায় না। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রও মৌলিক বর্ণমাত্র বলিয়া বোধ হয় না কি? সত্ব, রজঃ বা তমঃ যেমন কোন মানবে অমিশ্র অবস্থায় নাই, নৈসর্গিক জাতিতে ঐ চারিটী মৌলিক বর্ণেরও সেইরূপ অমিশ্রভাবে থাকা অসম্ভব। বংশগত জাতিই হউক আর ব্যবসায়গত জাতিই হউক, জনসংখ্যা বর্দ্ধিত হইলে কোন জাতিই একটীমাত্র বিশুদ্ধবর্ণ অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে না। অবশ্য ঋষিগণের নিয়মবন্ধনের যুগে সভ্য হিন্দু-সমাজ যতদূর সম্ভব এই বিজ্ঞান-সম্মত পন্থার অনুবর্ত্তন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহার ফলে পাতিত্য প্রভৃতি শাসন ও গুণকর্ম্মের স্বাভাবিক সমাদর যে বিশেষভাবে চলিয়াছিল, বশিষ্ঠ ব্যাসদেবের বিবরণ হইতে তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। ইউরোপীয় সমাজে এখন অনেকটা এইরূপ class বা শ্রেণী আছে। আমাদের দেশে কোন জাতিকেই একটী class বা শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট করা যায় না বটে, কিন্তু প্রত্যেক জাতির মধ্যেই এই নৈসর্গিক class বা শ্রেণী বিভাগ দেখা যায়; যেমন ব্রাহ্মণের মধ্যে শাস্ত্রাধ্যাপক সৈনিক ব্যবসায়ী ও ভৃত্য চারি বর্ণেরই লোক বর্ত্তমান। হিন্দু সভ্যতা যখন অখণ্ড ছিল তখন ব্রাহ্মণ জাতি বোধ হয় বর্ণেও ব্রাহ্মণ হইতে পারিয়াছিলেন।

সে যাহাই হউক, মৌলিক কৃষিজীবী জাতিসকল বৈশ্যবর্ণান্তর্গত হইলেও যুদ্ধকালে তাহারাই যে প্রধানতঃ দেশরক্ষা করিতে সমর্থ পৃথিবীর সর্ব্বত্র সকল সময়েই তাহা দেখা যায়। বণিকেরাও বৈশ্যবর্ণান্তর্গত। কিন্তু তাহাদের ব্যবসা অল্প স্থলেই শরীরগঠনোপযোগী বলিয়া তাহারা যোদ্ধা হইবার উপযুক্ত নহে। বস্তুতঃ দেখাও যায়, ইউরোপে যোদ্ধৃপ্রধান মধ্যযুগে অস্ত্র ও রাজ্য পরিচালনে অক্ষম, বিকলাঙ্গ ও অকর্ম্মণ্য লোকেরাই বণিক লেখকাদির কর্ম্ম করিত; তত্তৎ সম্প্রদায়ও সেইজন্য হীন ছিল। এই সকল কারণে ক্ষত্রিয় রাজা সেনাপতি ও সৈন্য সাধারণের সন্তানসন্ততির কৃষিকার্য্যের সম্পর্কে ভূম্যধিকারী ও কৃষক হইবার সম্ভাবনা যেমন, বণিকাদি হইবার সম্ভাবনা তেমন নহে। আমাদের দেশে রাজপুত মারহাট্টা জাঠ শিখ প্রভৃতি যোদ্ধৃজাতির আচার ব্যবহার হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু তাহা হইলেও নৈসর্গিক কারণ পরম্পরায় গঠিত

জাতিতে বর্ত্তমান কালে একটা বর্ণের এরূপ অমিশ্র প্রচলন সম্ভব নয়, যাহাতে তাঁহারা একই মাত্র বৃত্তি অবলম্বন করিবে। বিশেষতঃ, কৃষিজীবী বৈশ্য ও অসিজীবী ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় মধ্যে সর্ব্বত্রই চিরকাল ক্ষত্রবৈশ্য উভয় বৃত্তি সমান ভাবে সংমিলিত থাকাই স্বাভাবিক এবং কার্য্যতঃ তাহার সত্যতা ভূরি ভূরি স্থলে দেখা যায়। এমন কি উত্তরপশ্চিমস্থ এক শ্রেণীর বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ কৃষিজীবী বলিয়া বর্ত্তমান সেন্‌সাসে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহারা স্বহস্তে কৃষিকার্য্য করেন ও যেন তদানুসঙ্গিক বলিয়াই সৈন্যদলেও অনেকে প্রবেশ করেন। বিহার অঞ্চলের ব্রাহ্মণবৎ বাভন জাতিও যুদ্ধ ও কৃষিজীবী; বেণারসের মহারাজা এই জাতীয়। ঋষিগণের মাহিষ্য-সংজ্ঞা এই উভয়বৃত্তির যুগপৎ আবির্ভাব-রহস্য আলোচনা করিয়াই প্রদত্ত তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ স্থলে কৃষিজীবী মাহিষ্যগণের ক্ষেত্রী উপাধি ও তদেতরগণের বর্ম্মা উপাধি শুদ্ধ অর্থবিহীন নহে, প্রকৃতির বিরুদ্ধে স্বাধীন ও সদ্‌গুণবর্দ্ধক কৃষিবৃত্তিকে সাধারণের অবজ্ঞাভাজন করায় জাতীয় স্বাস্থ্য ও একতারও বিঘাতক।

শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনী।

"আমার দেশ।"

সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই ভারতে;
সার্থক হয়েছে জীবন তোমায় মা বলে ডেকে!
অনেক দেশ আছে, তবু—নাই তুলনা ভারতের,
সকল দেশের সেরা তুই মা, রাণী তুই মা জগতের!
কোন্ দেশেতে ডাকে সবাই, বাবা, বাবা, মা, মা বলে,
মায়ের, ভায়ের এত আদর কোন্ দেশেতে এমন মিলে!
অকাতরে কোথায় দেয় প্রাণ, জননী সন্তান তরে,
হাসি মুখে যায় গো পত্নী, পতি সহ চিতা পরে!
যতই আমি থাকি দূরে, বাঁধন ততই কসে ধরে;
(আমি) তোর কোলেতে মাথা রেখে, মিশি যেন, তোর ধূলিতে।

শ্রীফণিভূষণ সরকার—আজিমগঞ্জ।

দুইখানি প্রাচীন সনন্দ-পত্র।

মাহিষ্য-যাজী (গৌড়াদ্য-বৈদিক) ব্যাস ব্রাহ্মণগণ যে পূর্ব্বে বিদ্যা ব্রাহ্মণ্যে দেশপূজ্য ছিলেন, এই দুইখানি প্রাচীন সনন্দ পত্র তাহার একতম নিদর্শন। বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করিলে এইরূপ প্রাচীন দলিল, সনন্দ পত্র, তাম্রশাসন ইত্যাদি আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রত্ন-তত্ত্ব আলোচনায় জাতীয় ইতিহাসের অন্যান্য কত বিশিষ্ট উপকরণও এইরূপে আবিষ্কৃত হইতে পারে। পূজনীয় ভূদেব-গণের দৃষ্টি এ বিষয়ে আকৃষ্ট হইবে কি? দ্বারিবেড়ে নিবাসী পণ্ডিত সতীশ চন্দ্র মাইতি মহাশয় স্বচক্ষে দেখিয়া এই দুইখানি প্রাচীন সনন্দের কপি পাঠাইয়াছেন। মূল সনন্দ যাঁহাকে যাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাঁহাদের উত্তরাধিকারিগণের নিকট উহা রক্ষিত আছে।

(১)

তমলুক পরগণার তালুক-গোপালপুরের সিংহ জমিদারগণ 'ব্যাস-বৈদিক' শ্রেণী ব্রাহ্মণ শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্যকে উক্ত পরগণার কয়েকটী গ্রামের সকল জাতির সমূহ ধর্ম্মকর্ম্মের শাস্ত্রসঙ্গত বিধিব্যবস্থা-প্রদান জন্য যে সনন্দ দান করেন, নিম্নে তাহারই প্রতিলিপি মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে মাহিষ্য-যাজী 'ব্যাসোক্ত' ব্রাহ্মণকে "ব্যাসবৈদিক" ব্রাহ্মণ বলিয়া আখ্যাত করা হইয়াছে। দেখুন, প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে "ব্যাস-বৈদিক" আখ্যা প্রচলিত ছিল।—৪০০ পূর্ব্বেও নুলো পঞ্চাননও তাঁহার কারিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ঃ—

"তাদের যাজ্য সুদ্বিজ, কদাচ নহে একজ,
সাতশতী যাজে যে অন্ত্যজ খাঁটী।
অবৈদিক নামে দ্বিজ, সৎকার্য্যে অসার,
অন্ত্যজযাজী, কৌণ্ডিন্য, ব্যাস পরাশর॥"

সম্বন্ধ নির্ণয়ের পরিশিষ্ট ৩৮৭।৮৮ পৃঃ।

এই "ব্যাস-বৈদিক" শ্রেণী ব্রাহ্মণ যে বিদ্যাবলে পুজনীয় ছিলেন, এখন সেই ব্রাহ্মণ সন্তানগণ বিদ্যাহীনতা প্রযুক্তই "ব্যাসোক্ত" বলিয়া অবজ্ঞাত! কি পরিতাপের বিষয়!!

এই প্রাচীন সনন্দ খানি জাতীয় ইতিহাসের জীর্ণ গৃহে অস্পষ্ট আলোক-বর্ত্তিকা!
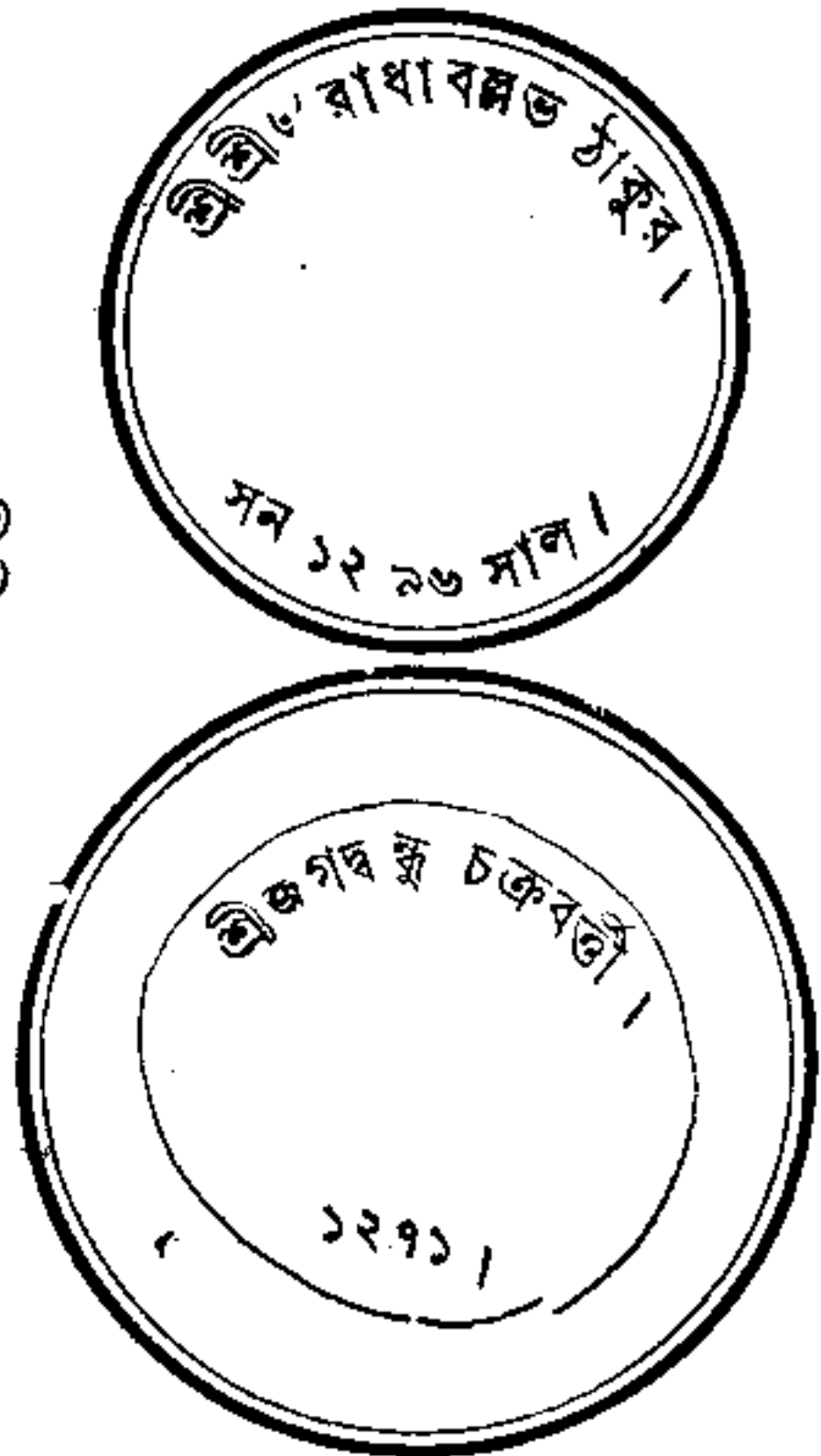
(প্রতিলিপি)

তমলুক পরগণার সামিল তালুক গোপালপুরের অন্তঃপাতী মৌজে গোপালপুর ও বাঙ্গল্যা ও কমলপুর ও বামনপুর ও ঘাশীপুর ও রাউতোড়ীর আসীলাল ওহরকচমে প্রজাবর্গানাং প্রতি আগে মালুম করিবা তোমাদের উক্ত ছয় গ্রামের প্রজা সমূহের উপস্থিত মত ক্রিয়াকর্ম্মাপাদির ধর্ম্মশাস্ত্র মতে বিধিব্যবস্থাদি প্রদানের ভট্টাচার্য্যগিরি কার্য্যে সন ১১৫১ সাল হইতে পর পর রাজদত্তা সনন্দ ক্রমে ব্যাস বৈদিকশ্রেণী ব্রাহ্মণেই এযাবৎকাল পর্য্যন্ত নিযুক্ত থাকিয়া প্রজাবর্গের শাস্ত্র উক্ত মতে বিধি ব্যবস্থা আদান প্রদান করিয়া আসিতেছেন গত সন ১২৮০ সালে বর্ত্তমান ব্যাস বৈদিক শ্রেণী ব্রাহ্মণ শ্রীযুত শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সহিত অত্র তালুকের নিজ গোপালপুর গ্রামের গোয়ালা জাতিরা মনোবাদ করিয়া উহার নিকট বিধিব্যবস্থাদি না লওয়াতে উক্ত শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক অত্র সরকারে যে নালিশ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা নিষ্পত্তি হইলে পরে উক্ত শিবনারায়ণ হুজুরে দরখাস্ত করাতে শ্রীযুত ম্যানেজার সাহেবের পূর্ব্বাপরের নিয়মতে কার্য্য সম্পাদন হওয়ার পক্ষে বিশেষ কোন নিষেধ হুকুম নাই। অতএব তোমাদের ছয় গ্রামের আমিন মুখ্যা প্রজাবর্গানের প্রতি অত্র হুকুমনামা প্রচার করা যাইতেছে যে তোমরা চিরপ্রথামতে সকল বর্ণ প্রজাতে যেমতে উক্ত শিব ভট্টাচার্য্যের নিকটে বিধিব্যবস্থা গ্রহণে পূর্ব্বকার রাজদত্তা সনন্দের লিখিত দানভোজ্য তৈলবট যেমত দেন নেন করিয়া আসিতেছেন, সেইমত করিতে থাকিবা পূর্ব্বকার বহুদিনের রাজদত্তা সনন্দের লিখিত হুকুম অন্যথা হইতে পারিবেক না কেহ অন্যথা কর তাহার সর্ব্বতোভাবে দায়িক হইবা আর ইহাতে আর এক কথা এই প্রকাশ করা যায় এই হুকুমনামা শিবনারায়ণ ভট্টাচার্য্যের দস্তে থাকিবেক তোমরা দৃষ্ট করিয়া গ্রামে গ্রামে একখানি করিয়া নকল রাখিবে। ইতি সন ১২৮১ বার শত একাশী সাল তাং ১১ এগারই চৈত্র।

(২)

তমলুক পরগণার অন্তর্গত গোপালপুর নিবাসী শিবরাম উথাসনী ব্যাস ব্রাহ্মণকে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বর সিংহ বাহাদুর শাসনী ও ভট্টাচার্য্য গিরি সনন্দ দিয়াছিলেন। ইহা ১২৬৪।৬৫ সালের সনন্দ। অন্য একখানিতে প্রজাগণের প্রতি নায়েব হুকুম দিয়াছেন যে শিবরাম ভট্টাচার্য্যের নিকট যাবৎ ধর্ম্ম কর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে। ব্যাস-বৈদিক ব্রাহ্মণ সদ্‌-ব্রাহ্মণ না হইলে দেশের ধর্ম্ম-সংরক্ষক রাজা জমিদারগণ এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণকে যাবতীয় হিন্দু প্রজাগণের জন্য ব্যবস্থা দাতৃ ধর্ম্মশাসকরূপে নিযুক্ত করিবেন কেন?

(প্রতিলিপি)

মৌজে নিজ গোপালপুর নিবাসী শ্রীশিবরাম উথাসিনী প্রতি শাসনী ও ভট্টাচার্য্য অর্থাৎ ধর্ম্ম সাস্তাহ বিধি ব্যবস্থা প্রদানী ও সনন্দ পত্রমিদং কার্য্যনঞ্চাগে আমাদের জমিদারী তমলুক পরগণার মধ্যে তালুক-গোপালপুর ওগায়রহ ছয় মৌজার বিধি ব্যবস্থা ইত্যাদি সাবেক ভট্টাচার্য্যের পুত্র ৺ধর্ম্মদাস চক্রবর্ত্তী ব্যবস্থাদি দিয়া আসিতেছিলেন এক্ষণে উক্ত চক্রবর্ত্তীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীরাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রানুসারে ব্যবস্থাদি দেওনে অপারগ জানিয়া এবং সর্ব্বদা মাহাল মজকুরে উপস্থিত না থাকায় উপরুক্ত ভট্টাচার্য্যের পরিবর্ত্তে বিধি ব্যবস্থাদি প্রদান ও বিষয় শাসনীয় ভট্টাচার্য্য কর্ম্মে তোমাকে বাহাল করা গেল তুমি সর্ব্বদা তালুক মজকুরায় উপস্থিত থাকিয়া প্রজাহায়ের ক্রিয়াকর্ম্ম প্রায়শ্চিত্ত ওগেরহ রীতিমত শাস্ত্রানুযায়ী বিধিব্যবস্থাদি দিবে ও সরকারের ডিহির কাছারীর নিয়মিত যখন যে কর্ম্মে উপস্থিত হইয়া আপন হাওদার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবে আর এই সনন্দে তালুকমজকুরার যোল আনা প্রজার প্রতি অনুমতি করিয়া লেখা জায় যে তোমাদের ক্রিয়াকর্ম্ম যখন যে উপস্থিত হইবেক ধর্ম্মশাস্ত্রানুযায়ী ব্যবস্থা এই ভট্টাচার্য্যের নিকট রীতিমত তৈলবট দাখিল করিয়া ব্যবস্থা লইবা ও ক্রিয়াকর্ম্মাদির শাসনীয় ভট্টাচার্য্যের রীতিমত যে পাওনা তাহা ভট্টাচার্য্যের নিকট দিবা—ইতি সন ১২৬৪ সাল বাঙ্গলা ও সন ১২৬৫ সাল

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

গৌড়াদ্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ-সমিতি।—বিগত ১৩ই ভাদ্র বৃহস্পতিবার জেলা হাওড়ার অন্তর্গত গোগুলপাড়া নামক গ্রামে গৌড়াদ্যবৈদিক-ব্রাহ্মণ-কুলাবতংস পণ্ডিতাগ্রগণ্য স্বর্গীয় বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন মহাশয়ের পূত-বংশীয় ৺নন্দলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বৃষোৎসর্গ শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদীয় সুযোগ্যপুত্র শ্রীমান্ শঙ্করচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর শুভানুষ্ঠানে স্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ চূড়ামণি ভট্টাচার্য্য শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ তত্ত্বনিধি, বুজারসাহা হাইস্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ সিদ্ধান্ত, ডাক্তার শ্রীযুক্ত গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস চক্রবর্ত্তী, কমলাপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ শিরোমণি প্রভৃতি পূজনীয় ভূদববর্গের আন্তরিক যত্নে একটি বৃহতী-সভার অধিবেশন হইয়াছিল। ওয়াদিপুর নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন মহাশয় সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। নেতৃবৃন্দের সাদর আহ্বানে আহূত হইয়া উগারদহনিবাসী নারায়ণচন্দ্র কাব্যরত্ন সভায় যোগদান করিয়াছিলেন। সভাপতি মহোদয় গোগুলপাড়ার—যে গোগুলপাড়া একদিন বিশ্রুত-কীর্ত্তি বিশ্বনাথ তর্কপঞ্চানন, ঈশানচন্দ্র ন্যায়বাগীশ প্রভৃতি মহামহোপাধ্যায় কল্প পণ্ডিতগণের পাণ্ডিত্যে, প্রতিভায় প্রোদ্ভাসিত হইয়াছিল, সেই গোগুলপাড়ার—এ অঞ্চলের লোক যাহাকে "ছোটনদে" বলিয়া গৌরব করিত; সেই গোগুলপাড়ার অতীত গৌরব-কাহিনী বিবৃত করিয়া সভ্যগণকে সেই মহান্ আদর্শের অনুসরণ করিবার জন্য একটি নাতিদীর্ঘ-বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

উপাধি সম্বন্ধে পত্র।—জেলা রাজসাহী পোষ্ট তুলসীরামপুর, পাঁড়ারভাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র সহায় মহাশয় লিখিয়াছেন:—"শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় আশ্বিনমাসের পত্রিকায় যে স্ত্রীলোকের উপাধি দেবী শব্দের ব্যবহারের কথা লিখিয়াছেন, উহাতে আমাদের মত আছে—তবে অবিবাহিতা কন্যার দেবী, বিবাহিতা সধবার দেই এবং বিধবার মাহিষ্যা উপাধি ব্যবহার করিলে মন্দ হয় না। আর্য্যা শব্দ ব্যবহার করা আমাদের মত নহে। দেই শব্দ ব্যবহার করিলে মাহিষ্যরমণী বুঝাইবে—উহাতে কোন আপত্তি হইবে না। দেবী বা আর্য্যা হইলে ব্রাহ্মণী ক্ষত্রিয়া কি বৈশ্যা কোন্‌টী তাহাতে অসুবিধা আছে।"

পক্ষাশৌচান্ত শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রণ-রক্ষা।—জেলা হাওড়া—বাজে শিবপুর—চু সাহেবের বাগানে (জুর্জ্জেশার মান্নাবাবুদের কাছারী বাটীতে) উক্ত জেলার অন্তর্গত কুলে ভাটরার চৌধুরী পরিবারের মান্যবর শ্রীযুক্ত কালী-পদ চৌধুরী মহাশয় বিগত ১৫ই আশ্বিন মঙ্গলবার তারিখে তাঁহার মাতার আদ্য-শ্রাদ্ধ বৈষ্ণবাচারে সমাধা করিয়াছেন। তদুপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত হইয়া শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত ছিলাম; গৌড়াদ্য বৈদিক, রাঢ়ী, বারেন্দ্র প্রভৃতি শ্রেণীর ব্রাহ্মণ-গণও স্বজাতিবর্গ বিশেষ উৎসাহ সহকারে আনন্দিত হইয়া শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন করাইয়াছেন।

খাঁটী পদ্মমধু।—ইহা চক্ষুরোগের মহৌষধ।—পাঠকগণের মধ্যে যদি কেহ দয়া করিয়া উহার প্রাপ্তিস্থানের সন্ধান বলিয়া দিতে পারেন বাধিত হইব।

সম্পাদক—

মাহিষ্য-সমাজ।

২য় ভাগ, ৮ম সংখ্যা—অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

হিন্দুরঞ্জিকায় প্রতিবাদ-প্রসঙ্গ।

(সমালোচনা)

বিগত ১০ই ভাদ্র তারিখের হিন্দুরঞ্জিকায় শ্রীব—মৈত্র মহাশয় "প্রতিবাদ-প্রসঙ্গ" শীর্ষক প্রবন্ধে বাদ-প্রতিবাদ সম্বন্ধে যে সাধারণ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন তাহা অবশ্য শিরোধার্য্য।

মৈত্র মহাশয় 'কৈবর্ত্ত' এই সাধারণ সংজ্ঞার উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্তের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। কাজেই তাঁহার প্রাগুক্তরূপ মীমাংসা অসম্ভব নয়। কিন্তু শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে হইলে, দ্বিবিধ কৈবর্ত্তের অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হইবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ, কুলাষ্টক প্রভৃতি গ্রন্থমতে একপ্রকার কৈবর্ত্তের উৎপত্তি আছে—

'ক্ষত্রবীর্য্যেণ বৈশ্যায়াং কৈবর্ত্তঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।'

মনুতে ২য় প্রকার কৈবর্ত্তের উৎপত্তি আছে—

'নিষাদোমার্গবং সূতে দাশং নৌকর্ম্মজীবিনম্।
কৈবর্ত্তমিতি যং প্রাহুরার্য্যাবর্ত্তনিবাসিনঃ।'

নিষাদ হইতে অযোগবী জাতীয়া স্ত্রীতে নৌকর্ম্মজীবী দাশ বা মার্গব নামক জাতি জন্মে। আর্য্যাবর্ত্তনিবাসিগণ এই জাতিকে কৈবর্ত্ত বলে। এই কৈবর্ত্তের ব্যবসায় নৌকর্ম্ম। নৌকর্ম্ম শব্দে নৌকার ভাড়াখাটা, নৌকাযোগে মৎস্য ধারণাদি বুঝায়। এই কৈবর্ত্তের পিতা নিষাদ, নিষাদের ব্যবসায় মনুতেই লিখিত আছে—"মৎস্য-ঘাতো নিষাদানাং।"

নিষাদ সন্তান কৈবর্ত্তগণ পৈতৃক ব্যবসায় গ্রহণ করিলে মৎস্যঘাতই ইহাদের ব্যবসায় হয়।

আর ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা জাতীয়া স্ত্রীতে যে কৈবর্ত্ত জন্মগ্রহণ করে, তাহার ব্যবসায় ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

'নৃপাজ্জাতোহথ বৈশ্যায়াং গৃহ্যায়াং বিধিনা সুতঃ।
বৈশ্যবৃত্ত্যাতুজীবেত ক্ষাত্রধর্ম্মং ন চাচরেৎ॥'

ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্র (বোম্বে সংস্করণ)
তথা বাচস্পত্যাভিধান জাতিশব্দ ৩০৯৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রে সংস্কার অপেক্ষা করা হয় নাই। ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যা ভার্য্যার সন্তান বৈশ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম আচরণ করিবে না। বৈশ্যবৃত্তি হইতেছে—

কৃষিগোরক্ষাবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্। —শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

অতএব মাহিষ্য বা ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৈবর্ত্তের জাতীয় শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় কৃষি, গোরক্ষা, বাণিজ্য।

এক্ষণে মৈত্র মহাশয়কে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করি, বঙ্গীয় আচরণীয় কৈবর্ত্ত এই দুইয়ের কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইতে পারে?

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ ও ঔশনস ধর্ম্মশাস্ত্রের লক্ষণাক্রান্ত কৈবর্ত্ত কাহারা? ধর্ম্মশাস্ত্র কর্ত্তা মনু বলিয়াছেন—

সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃ পিতৃমাতৃ প্রদর্শিতা।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥

এই সমস্ত জাতির পিতা মাতা প্রদর্শিত হইল। কোন জাতির যদি পিতা মাতা প্রচ্ছন্ন থাকে, তবে তাহার নিজ কর্ম্মদ্বারা পিতা মাতা নির্ণয় করিবে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৈবর্ত্তের পিতা ক্ষত্রিয় মাতা বৈশ্যা। সন্তানে পিতা মাতার গুণ নিশ্চয়ই থাকিবে। আমরা দেখিতেছি বঙ্গীয় কৃষি-কৈবর্ত্ত জাতিতে ক্ষত্রিয়ের সমস্ত লক্ষণ আছে। এই কৈবর্ত্তবংশে রাজ্যশাসন, প্রজাপালন ও সংগ্রাম শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। আদিশূরের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের বহুস্থান এই জাতিরই শাসনাধীন ছিল। সমস্ত মেদিনীপুর জেলা তমলুক, সুজামুঠা, তুর্কা, ময়নাগড়, বালীসীতা প্রভৃতি পঞ্চরাজার শাসনাধীন ছিল। নদীয়ার লাটদ্বীপ, কঙ্কদ্বীপ এই জাতির রাজ্য। ঢাকা জেলার সাভারের হরিশ্চন্দ্র রাজা এই জাতীয়। ময়মন্‌সিংহের নবরঙ্গ রায়, বরাক্ষিয়ার রাজবংশ এই জাতির প্রাচীন গৌরব। বরেন্দ্রদেশেরও বহুস্থান এই জাতির শাসনাধীন ছিল। বৈশ্যবৃত্তি —পশুপালন ও কৃষি —এই জাতির বার আনা লোকে করিতেছেন। এই সমস্ত শাস্ত্রীয় নিদর্শন

দৃষ্টে ব্রহ্মবৈবর্ত্তীয় কৈবর্ত্তের বিষয় এই কৃষি-কৈবর্ত্তে বর্ত্তিতেছে। শাস্ত্র-মীমাংসক পণ্ডিতগণ পিতা মাতা ও ব্যবসায় সাম্যে এক জাতি বলেন। সুতরাং এই কৈবর্ত্ত ও মাহিষ্য একই জাতি। কেবল শাস্ত্রভেদে নামান্তর মাত্র। শাস্ত্রে এক জাতির বিভিন্ন নাম অনেক আছে। একই কৈবর্ত্ত নামে যেমন দুই জাতি আছে, তেমনি একই করণ নামে দুই জাতি বিদ্যমান। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বৈশ্যের শূদ্রাপত্নীর সন্তান "করণ" নামে নির্দ্দিষ্ট। আবার মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ অদর্শন হেতু সংস্কারচ্যুত একপ্রকার ক্ষত্রিয়ও "করণ" নামে অভিহিত। বৈদ্য দুইপ্রকার অম্বষ্ঠবৈদ্য ও মালবৈদ্য। সুতরাং একনামই একজাতিত্বের কারণ নহে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে সুপ্রসিদ্ধ মাহিষ্য জাতির কৈবর্ত্তনামে উল্লেখ থাকায় ঐ গ্রন্থে মাহিষ্যজাতির স্বতন্ত্র উল্লেখ নাই।

মাহিষ্য-কৈবর্ত্ত উচ্চ পিতামাতায় উৎপন্ন বলিয়া তাঁহারা আবহমানকাল হইতেই সদ্ব্রাহ্মণের জলদানের যোগ্য হইয়াছেন। অনাচরণীয় অন্য কৈবর্ত্তের জলদানের মৌলিক যোগ্যতা নাই বলিয়াই অনাচরণীয় রহিয়াছে। আর্য্য কৈবর্ত্তের বিশুদ্ধ উপাদানই তাহাকে জলচল করিয়াছে। ইহাতে বল্লালের ত হাত নাই, ভীমরাজারও গৌরব নাই। বল্লালঘটিত জনশ্রুতি যে সমূলে মিথ্যা তাহা আমি ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "নব্যভারতে" "সূর্য্যদ্বীপ ও সূর্য্যমাঝি" প্রবন্ধে প্রমাণ করিয়াছি। সেই বিস্তৃত প্রবন্ধের স্থান সঙ্কুলান এখানে হইবে না।

বরেন্দ্ররাজ ভীমের রাজত্বকালে ভীমের সদ্‌গুণে যে সমগ্র কৈবর্ত্ত জাতি আচরণীয় হইয়াছেন, ইহা অযৌক্তিক, অপ্রমাণিক, অস্বাভাবিক ও আনুমানিক মাত্র। মৈত্র মহাশয় কেবল রাজসাহী, নদীয়া, মেদিনীপুরে কৈবর্ত্ত আচরণীয় বলিয়াছেন। কিন্তু পাবনা, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, ফরিদপুর, যশোহর, খুলনা, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, সুদূর শ্রীহট্ট প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই কৃষিকৈবর্ত্তগণ আচরণীয়। মৈত্র মহাশয় প্রাগুক্ত রাজসাহী, নদীয়া, মেদিনীপুর ভিন্ন যাবতীয় স্থানের কৈবর্ত্তকে ঔপনিবেশিক বলিয়াছেন। একথাও ঠিক নহে। বিদেশপ্রস্থিত স্বজাতি মূলদেশবাসী স্বজাতির প্রতি আভিজাত্য প্রদান করে। বরেন্দ্রভূমি হইতে যদি তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিতেন, তাহা হইলে বরেন্দ্র ভূমিতেই আভিজাত্যশালী আদিম মাহিষ্য কুলীন থাকিতেন। তাহা না হইয়া সমাজের শ্রেষ্ঠ কুলীনগণ, নদীয়া জেলা, ফরিদপুর

জেলার অন্তর্গত ভূষণা সমাজ, ঢাকা জেলার অন্তর্গত চাঁদপ্রতাপ সমাজভুক্ত থাকেন কেন? এই সমস্ত কারণে অন্যান্য স্থানের মাহিষ্যগণকে বরেন্দ্রপ্রস্থিত ঔপনিবেশিক বলিতে পারি না।

এক্ষণে মৈত্র মহাশয় আর একটী আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন। কৈবর্ত্ত কাহারও কর্ত্তৃক জলচল না হইলে তাঁহাদের পুরোহিত অচল থাকে কেন? পুরোহিতের অচলতা সম্বন্ধে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজ-বিপ্লবের বিষময় ফল কার্য্য করিয়াছে, তাহার প্রমাণ "বঙ্গীয়-মাহিষ্য পুরোহিত" ও ভ্রান্তিবিজয় গ্রন্থে বিশদভাবে দেখিতে পাইবেন। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণের আগমনে বঙ্গের প্রাচীন ব্রাহ্মণ মাত্রই অচল হইয়া পড়িয়াছেন। এই জন্যই বঙ্গের আদিম সাতশত ব্রাহ্মণ বিলুপ্ত। সাতশত ঘর ব্রাহ্মণ নিরুদ্দেশ, অথচ পঞ্চ কণোজ ব্রাহ্মণের সন্তানে দেশ সমাচ্ছন্ন। এই প্রহেলিকার মর্ম্ম উদ্‌ঘাটন করিতে হইলে অনেক অপ্রিয় সত্যের অবতারণা করিতে হইবে।

বঙ্গের প্রাচীন ব্রাহ্মণগণকে আদিশূর রাজাও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন নাই। তাই বিদ্যাভূষণ মহাশয় লঘুভারতে লিখিয়াছেন—

'বৌদ্ধাক্রমণতঃ প্রাচ্যা বিজ্ঞানষ্টাঃ পুরৈবহি।
নপুনঃ শ্রদ্ধধে রাজন্ ব্রাহ্মণান্ প্রাচ্যদেশজান্॥'

লঘুভারত, ২য় খণ্ড, ১১১ পৃ।

এদেশের ব্রাহ্মণ যে পঞ্চমহর্ষির নিকট নিতান্ত ঘৃণিত ও অব্যবিহার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। কারণ এদেশের ব্রাহ্মণ মৎস্যভোজী ও বৌদ্ধাচারদুষ্ট। কণোজ ব্রাহ্মণ নিরামিষভোজী ও আচারপূত। কণোজ ব্রাহ্মণ, কখন প্রথমে এদেশের মৎস্যভোজী ব্রাহ্মণের জলাদি গ্রহণ করেন নাই। আজকাল যে সকল পশ্চিমে পাঁড়ে, চৌবে, দোবে বরকন্দাজ এদেশে আসে, তাহারাও যখন বাঙ্গালী মৎস্যভোজী ব্রাহ্মণের অন্ন গ্রহণ করে না, তখন সেকালের ঋষিকল্প ব্রাহ্মণের ইহাঁদের হাতে অন্নজল গ্রহণ অসম্ভব। কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ প্রথমে শূদ্র-যাজন করেন নাই। শূদ্রের জলপান করেন নাই। ব্রাহ্মণ জলপান করিলে নবশাকাদি জাতি কৃতার্থ হইতেন। কণোজ ব্রাহ্মণের ক্রমাবনতিতে শূদ্রযাজন, শূদ্রদানগ্রহণ, শূদ্রের বাড়ীতে অবাধে পান ভোজন প্রচলিত হইয়াছে। প্রাথমিক ভট্টনারায়ণাদি পঞ্চঋষির বয়কট্ ধারাবাহিক চলিয়া মাহিষ্যযাজী পতিতরূপে গণ্য হইতেছেন। যেখানে এই ব্রাহ্মণের সংঘর্ষ হয় নাই, সেইখানেই কৈবর্ত্তের পুরোহিত ও

কায়স্থাদির পুরোহিত অভিন্ন। পূর্ণিয়া জেলা হইতে দ্বারবঙ্গ প্রভৃতি সর্ব্বস্থানেই কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, নবশাখের ব্রাহ্মণ একমাত্র মৈথিল ব্রাহ্মণ। বঙ্গের কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণের পার্থক্য দেখিয়া সমগ্র কৈবর্ত্তের ব্রাহ্মণ অচল বলা অন্ধের হস্তিদর্শন ন্যায় মাত্র। দিনাজপুর জেলার আটোয়ারী থানায় আমি স্বচক্ষে কৈবর্ত্ত ও নবশাখাদির একই মৈথিল ব্রাহ্মণ দেখিয়াছি। পুরোহিতরূপ মানদণ্ড দ্বারা জাতির পরিমাণ হয় না। এই পুরোহিতের অমর্য্যাদা দেশাচার মাত্র। ফরিদপুর, পাবনা, যশোহর, নদীয়ার পূর্ব্বাংশ প্রভৃতি স্থানে গোয়ালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের ব্রাহ্মণ এক। হাওড়া, হুগলী, বর্দ্ধমানে গোয়ালার ব্রাহ্মণ পতিত। ঐ অঞ্চলে গোয়ালার দধি দুগ্ধাদি চল অথচ গোপযাজী পুরোহিত অচল। এক্ষণে পুরোহিত দৃষ্টে গোয়ালার জাতিতত্ত্ব নির্ণয় করিলে একই গোয়ালাকে দুই জাতিতে বিভক্ত করিতে হইবে। বঙ্গের অগ্রদানী নামক পতিত ব্রাহ্মণ নবশাখ, কায়স্থ ও মাহিষ্যের বাড়ীতে আদ্যশ্রাদ্ধের কার্য্য করেন। তাই বলিয়া কায়স্থাদি জাতির পাতিত্য নির্ণয় হয় না।

মৈত্র মহাশয়ের অন্য আপত্তি, কৈবর্ত্ত মাহিষ্য হইলে মাসাশৌচ থাকার কারণ কি? এদেশে বৌদ্ধবিপ্লবে ও স্মার্ত্তভট্টাচার্য্যের অনুশাসনে মাসাশৌচ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তথাপি মেদিনীপুর জেলার ময়নাপরগণায় অনির্দ্দেশ্য কাল হইতে পক্ষাশৌচ প্রচলিত আছে। এক্ষণে অশৌচসাম্য জন্যই প্রস্তাব উঠিয়াছে। অশৌচ ধরিয়া জাতি নির্ণয় করিলে সমগ্র উৎকল ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থ, কাহার, কুর্ম্মী, গোয়ালা, মাল্লা, ধীমর, ধানুক প্রভৃতি সমস্ত জাতিকে ক্ষত্রিয় নির্ণয় করিতে হইবে। কারণ ঐ ঐ অঞ্চলে ব্রাহ্মণেতর সর্ব্বর্ণই ১২শ দিনে ক্ষৌরকার্য্য করিয়া ১৩শ দিনে শ্রাদ্ধ করে।

অন্য আপত্তি—উপনয়ন সংস্কার। উপনয়ন সংস্কারের অভাব মাহিষ্যত্বের বিঘাতক নহে। মাহিষ্য প্রকৃত বৈশ্য নহে—বৈশ্যধর্ম্মী। এই জাতির উপনয়ন স্বেচ্ছাগ্রহমাত্র। স্বেচ্ছাগ্রহ সংস্কারের স্বতঃই অভাব হয়। এই জন্যই জাতকর্ম্ম, সীমন্তোন্নয়ন, পুংসবন প্রভৃতি সংস্কারের অভাব সর্ব্বজাতির মধ্যেই ঘটিয়াছে। ক্ষত্রিয়বহুল যুক্তপ্রদেশে বহুক্ষত্রিয় উপনয়ন-সংস্কারহীন। অলবরের মহারাজা একদিনেই সহস্র ক্ষত্রিয়ের উপনয়ন সংস্কার দিয়াছেন। যে ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কারই দ্বিজত্বলাভের মুখ্য উপায়, সেই ব্রাহ্মণেরই অনেকস্থানে যথারীতি উপনয়ন সংস্কার হয় না। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের অনেক ব্রাহ্মণসন্তানের নিয়মানুসারে উপনয়ন সংস্কার হয় না। মস্তকমুণ্ডন করিয়া

বিন্ধ্যবাসিনীর পাদস্পর্শ করাইয়া উপবীত গলে দেওয়া হয় মাত্র। ৺কাশীধামস্থ ব্রহ্মামৃতবর্ষিণী সভার সভাপতি ৺রাম মিশ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের "ব্রাত্য সংস্কার মীমাংসা" দ্রষ্টব্য।

এ অবস্থায় উপনয়ন সংস্কারের অভাব শূদ্রত্বের বিশিষ্টপ্রমাণ স্বীকার করা যাইতে পারে না। এই কৈবর্ত্তজাতীয় ময়নাগড়ের রাজার উপনয়ন সংস্কারও মাহিষ্যত্বের অভ্রান্ত সাক্ষী। অপর মেদিনীপুরের অন্তর্গত তুর্কাধিপতি কালীপ্রসন্ন গজেন্দ্র মহাপাত্র মহাশয়ের উপনয়ন সংস্কারযুক্ত জ্ঞাতি অদ্যাপি উড়িষ্যায় খুর্দা—রথীপুর গ্রামে আছেন। ইহাতেও বঙ্গীয় কৃষি কৈবর্ত্তের মাহিষ্যত্ব প্রমাণিত হয়।

অপর, মৈত্র মহাশয় বলিতেছেন, কৈবর্ত্ত মাহিষ্য হইলে বরেন্দ্রভূমির একচ্ছত্রী রাজা দিব্বোক, রুদোক, ভীম প্রভৃতি সার্ব্বভৌমগণ কৈবর্ত্তনামের পরিবর্ত্তে মাহিষ্য নাম প্রবর্ত্তন করিতেন। তদুত্তরে বক্তব্য, তখন মাহিষ্যনামের কোন আবশ্যকতা ঘটে নাই। তখন দেশব্যাপী সেন্সাস ছিল না। তখন যে অঞ্চলে যে জাতির যে নাম প্রচলিত তাহাই গৌরবের ছিল। বর্ত্তমানে যে সেন্সাস আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গীয় মাহিষ্যজাতির একটী সাধারণ নামের আবশ্যকতা হইয়াছে। তজ্জন্যই মাহিষ্যনাম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, নতুবা কৈবর্ত্ত বলিলে কোন অগৌরব নাই। একটী নামের হেতু এই—মেদিনীপুর অঞ্চলে কৈবর্ত্ত ও চাষী নাম অত্যন্ত প্রচলিত। নদীয়া, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ, পাবনা, যশোহর, খুলনায় কৈবর্ত্ত-দাস নাম সুবিদিত। ঢাকা, ফরিদপুরের পূর্ব্বভাগে হালিকদাস নাম প্রচলিত। শ্রীহট্টে শুধু "দাস" নাম প্রচলিত। বিভিন্ন নামে গণিত হইলে পদে পদে ভ্রান্তি উৎপন্ন হয়। গবর্ণমেণ্টের কার্য্যেরও অসুবিধা হয়। তজ্জন্য একটী নাম প্রয়োজন। মেদিনীপুর, নদীয়াদি অঞ্চলে কৈবর্ত্ত নামে আপত্তি নাই। এই সকল স্থানে কৈবর্ত্ত বলিলেই আচরণীয় কৈবর্ত্ত বুঝায়। কিন্তু শ্রীহট্ট, ঢাকা, ময়মনসিংহ ত্রিপুরা অঞ্চলে কৈবর্ত্ত বলিলে জেলে জাতি বুঝায়। ঐ সকল অঞ্চলে মাহিষ্যজাতি দাস বা হালুয়াদাস নামে পরিচিত। কৈবর্ত্ত নাম ঐ অঞ্চলে এ জাতিতে আদৌ প্রযুক্ত হয় না। গবর্ণমেণ্ট জোর করিয়া সেখানে কৈবর্ত্ত নাম প্রবর্ত্তন করিতে পারেন না। তজ্জন্য নবদ্বীপ, চন্দ্রপ্রতাপ, বিক্রমপুর, কলিকাতা রাজকীয় সংস্কৃত কলেজের ব্যবস্থামত ও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানে মহামান্য গবর্ণমেণ্ট একমাত্র "মাহিষ্য" নামে গণন কার্য্যের অনুমতি দান করিয়াছেন। এ বিষয়ে বহুবিচার হইয়া

গিয়াছে। এ অবস্থায় মহারাজ ভীম কেন মাহিষ্যনামের জন্য লালায়িত হইবেন? ভীমের চেষ্টায় কৈবর্ত্ত যদি আচরণীয় হইত, তবে তাঁহার পুরোহিত অনাচরণীয় থাকিবেন কেন? তাঁহার পুরোহিতকে কি তিনি আচরণীয় করিতে পারিলেন না? অথবা পতিত পুরোহিত ত্যাগ করিয়া নূতন পুরোহিত গ্রহণে তাঁহার কি বাধা ছিল? কামার, কুমার, নাপিত, তিলী, মালী, কুরী প্রভৃতি মুষ্টিমেয় জাতি নবাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশধরের যাজ্য হইতে পারিলেন, আর সার্ব্বভৌম রাজগণ বহুসংখ্যক স্বজাতি লইয়া ঐ ব্রাহ্মণকে নিজ পৌরহিত্যে ব্রতী করিতে পারিলেন না? ইহা কি সম্ভব। যিনি জল খাওয়াইতে পারিলেন তিনি পৌরহিত্যে ব্রতী করিতে পারিলেন না, এ আশ্চর্য্য কথা বটে! যদি বলেন রাঢ়ী, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য স্বীকার না করাতেই তিনি কৃতকার্য্য হন নাই। আমরা দেখিতেছি, অনেক রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ পাটনী, ভুঁইমালী, সূত্রধর, মালো, রাজবংশী, শৌলোক, প্রভৃতিকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়া তাহাদের দান গ্রহণ করিতেছেন, তাহাদের বাড়ীতে অধিষ্ঠিত হইয়া অন্নজল গ্রহণ করিতেছেন। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণসমাজ তাহাতে কোন বাধা প্রদান করিতেছেন না। এ অবস্থায় তাঁহারা যে লোভপরাঙ্মুখ, তাহাও স্বীকার করিতে পারি না।

বঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অত্যন্ত প্রভাব। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতানুসারেই ক্ষত্রিয়ের বৈশ্যাভার্য্যার সন্তান মাহিষ্যজাতি, বঙ্গে কৈবর্ত্ত নামে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ঋষিপ্রোক্ত এই নামে দিব্বোক আদি রাজগণের অরুচি হইতে পারে না। বঙ্গে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মত অত্যন্ত প্রবল, তাহা বিজ্ঞগণ বিশেষরূপ অবগত আছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতানুসারেই সমস্ত বঙ্গে ঘরে ঘরে শ্রীশ্রীরাধা-কৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির উপাসনা প্রচলিত। বঙ্গের পতিত-পাবন শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের চেষ্টায় ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মত অনুসারেই শ্রীবৃন্দাবনধামে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির উপাসনা বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড কলিযুগে বিলুপ্ত ও ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। মহাপ্রভু ঐ সমস্ত তীর্থের পুনরুদ্ধার করেন। বঙ্গদেশ ও শ্রীবৃন্দাবন প্রধানতঃ বাঙ্গালীর লীলাস্থান। এই দুই স্থান ব্যতীত কোথাও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্ত্তির উপাসনা প্রচলিত নাই। বোম্বাই, দক্ষিণাপথ প্রভৃতি স্থানে সুধু শ্রীবিগ্রহের পূজা হয়। কোথাও রণছোড় মূর্ত্তি, কোথাও বিঠবাদেব নামে পূজিত হন। অযোধ্যা ও যুক্ত প্রদেশে রামসীতা পূজিত হন। রাধাকৃষ্ণের পূজা ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রাধান্যেই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সেই প্রাধান্যের বলেই বৈশ্যামাতার গর্ভজ ক্ষত্রিয়নন্দন মাহিষ্য সংজ্ঞার পরিবর্ত্তে কৈবর্ত্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। নতুবা অম্বষ্ঠ থাকিল, উগ্র থাকিল, মূর্দ্ধাভিষিক্ত ক্ষত্রিয় থাকিল, কেবল হতভাগ্য মাহিষ্য জাতি ধরা হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল, ইহা কি সম্ভব? মাহিষ্যগণ প্রধানতঃ কৃষিকার্য্য অবলম্বন করিয়া কৈবর্ত্ত নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। কিংবৃত্তি+অণ=কৈবর্ত্ত।

ভট্টোদ্ধৃত সুমন্ত্র বচনে আছে—

'কৃষিং সাধ্বিতি বিপ্রাণাং শক্তি পুত্রাদায়োজগুঃ।
মন্বাদয়ো বিগর্হন্তঃ কিংবৃত্তিরিতি তাং বিদুঃ॥'

অর্থঃ—শক্তিপুত্র (পরাশর) প্রমুখ মুনিগণ কৃষিকে ব্রাহ্মণের পক্ষে প্রশস্ত বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ কৃষিবৃত্তিকে গর্হণা বা নিন্দা করিয়া কিংবৃত্তি বা গর্হিত বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কাজেই কিংবৃত্তি-শব্দে কৃষিবৃত্তি বুঝায়। অতএব কৃষিবৃত্তিধারীর অপরনাম কৈবর্ত্ত। যে দিন ভারতে বৌদ্ধবিপ্লবে কৃষি নিন্দিতা বৃত্তি বলিয়া গণ্য হইয়াছে, সেই দিনই মাহিষ্য কৈবর্ত্ত নাম পাইয়াছেন। এই নাম-সাদৃশ্যেই আজ মাহিষ্য জাতি অপমানিত ও পদদলিত হইতেছে।

যাহা হউক, ব্রাহ্মণ চিরকালই হিন্দু সমাজের মস্তক। তাঁহাদের নিকট আমরা কোন অবিচার বা পক্ষপাতের ভয় করি না। তবে ব্যক্তিগত মতান্তর ঘটিতে পারে। এজন্য অস্মদ্‌পক্ষের বক্তব্য বলিয়া আমরা অবসর গ্রহণে বাধ্য হইলাম।

শ্রীসুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস।

পাতিলাখালির মহামায়া।

সারাঘাট হইতে উত্তরপূর্ব্বে ২॥ ক্রোশ ব্যবধানে পাতিলাখালি গ্রাম। এই গ্রাম পাবনা জেলায় ও বাজুবাস-নাজিরপুর পরগণার অন্তর্গত। সেরে-স্তায় তরফ পাতিলাখালি বলিয়া লিখিত হইয়া থাকে। ফল, মূল, বাঁশ, কাঠ, ধান, মাছ প্রভৃতি সংসারী লোকের নিয়ত আবশ্যকীয় সামগ্রী সম্বন্ধে পূর্ব্বে এই গ্রাম এত বড় সুবিধার ছিল যে, লোকে এই গ্রামকে 'সোণার পাতিলাখালি' বলিত। এই গ্রামেরই অধীনে মৌবাড়িয়া প্রভৃতি ১১টা মৌজা, দুটী দীঘি ও বহুতর পুরাতন জঙ্গলাকীর্ণ বর্ত্তমানে ব্যবহারের অনুপযোগী পুষ্করিণী বিদ্যমান

আছে। দীঘি দুটী খুব জাগ্রত। সে সম্বন্ধে অলৌকিক দুই চারিটি কিংবদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। "পাতিলাখালি-কাহিনী" পুস্তকে সে সব কথা লিখিয়াছি। প্রবন্ধ বিস্তার ভয়ে এখানে লিখিত হইল না। পাতিলাখালি বাস্তবিকই 'সোণার পাতিলাখালি' ছিল। এক্ষণে অবনতির চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। সে দুঃখের কথা মৎ-রচিত "বিষাদ-তরঙ্গ" পুস্তকে সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রামে নাটোরাধিশ্বরী প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানীর সময়ে শারদীয়া মহামায়ার পূজা স্থাপিত হয়। অদ্যাবধি প্রতি বর্ষের শরতে সেই পূজা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এখানকার মহামায়ার প্রতিমার একটু বিশেষত্ব আছে। দুইখানি ঠাটে ২৪টি পুত্তলিকা নির্ম্মিত হয়। ছোট ঠাট খানিই সাধারণে প্রচলিত সপ্ত পুত্তলিকার ঠাটের প্রায় সমান। দুইখানি ঠাটে পুত্তলিকা নির্ম্মিত ও চিত্রিত হইয়া, ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাকালে মণ্ডপের আসনে স্থাপিত হয়। নির্ম্মাণাদি পৃথক্ গৃহে হইয়া থাকে। বড় ঠাটের উপর ছোট ঠাট তুলিয়া দেওয়া হয়। বড় ঠাটখানি দালান ঘরের আকার। ছোটখানির চালা বাঙ্গালা ঘরের আকার। বড়খানিতে প্রচলিত সপ্ত পুত্তলিকা অর্থাৎ দুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, গণেশ, কার্ত্তিক, অসুর, সিংহ ছাড়া কৃষ্ণবলরাম, ও জয়াবিজয়া এই চারিটি মূর্ত্তি অধিক আছে। ছোটখানির মধ্য কুঠরীতে বৃষভোপবিষ্ট শিব, তাঁহার বামে কুঠরীতে গরুড়-বাহনে বিষ্ণু, বিষ্ণুর বামে ঠাটের বাহিরে কোণে হনুমান-বাহনে জটাধারী শ্রীরামচন্দ্র ধনুতে জ্যা আরোপণ পূর্ব্বক মায়ামৃগের প্রতি শরসন্ধানে নিযুক্ত, শিবের দক্ষিণে কুঠরীতে হংসবাহনে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা, তাহার দক্ষিণে ঠাটের বাহিরে কোণে লক্ষ্মণ দেব হস্তী-বাহনে ঐ মৃগের প্রতি শরসন্ধানে নিযুক্ত। ছোট একটি মৃগ ঠাটের চালার উপর সঙ্কটাপন্ন। শিবের দক্ষিণে বহির্ভাগে নন্দী, বামে বহির্ভাগে স্বৈরিণী কোচরমণী। ঠাটের চালার উপরিভাগে মকরবাহনে দ্বিভুজা গঙ্গাদেবী। মণ্ডপাসনে বড় ঠাটের উপর ছোট ঠাটখানি তুলিয়া দিলে, গঙ্গাদেবীর ধম্মিল্ল চন্দ্রাতপ স্পর্শ করে। মণ্ডপ-গৃহ পাঁচ-চালা বৃহৎ ঘর। ডাকের সাজের ব্যবহার নাই; মাটির প্রস্তুত গহনাতে সোণাপাত ও রূপাপাত দিয়া মণ্ডিত। ইহার নিকটে বিবিধ কারুকার্য্য-ময় চাক্‌চিক্যযুক্ত ডাকের সাজে সজ্জিত প্রতিমা আমাদের চক্ষে কোথায়ও ভাল লাগে নাই। মহামায়ার মহামহিমা দেশবিদেশে বিখ্যাত। কতস্থানের কত হিন্দু মুসলমানের নরনারী চিনি, সন্দেশ, দুগ্ধ, নববৃক্ষজাত ফল, ছাগ, সোণারূপার গহনা লইয়া মায়ের দুয়ারে উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহার ইয়ত্তা

নাই। এখানে নবমী পূজার দিন মাত্র ছাগ বলি হয়। সে দিন প্রতি বৎসরেই একটী মেলা বসিয়া সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকে। পদ্মানদীতে বিসর্জ্জন হয়। পদ্মানদী এখান হইতে একণে ১৷৹ ক্রোশ ব্যবধান। অদ্যাপি সেই পাটস্থানে পাতিলা-খালির মহামায়ার অগ্রে অন্য প্রতিমা কেহ বিসর্জ্জন দেন না। মহামায়ার প্রতিমা-নির্ম্মাতা, পূজক ও পরিচর্য্যাকারী নাপিতদিগের মধ্যে আপনার ত্রুটী-দোষে কেহ অন্ধ, কেহ অসাধ্য ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া যাওয়ায়, এখন কেহ এই মহামায়ার ঐ সকল কার্য্য করিতে সহজে সম্মত হয় না। তথাপি কোন বৎসরে কার্য্য বন্ধ হইতে দেখা বা শুনা যায় নাই। মণ্ডপের আসনে মাসিক পূজা ও ভোগ হইয়া থাকে, যেমন ভাদ্রমাসে তালবড়া, পৌষমাসে পিষ্টক, এই প্রকার।

বাল্যকালে প্রতিমার যে প্রকার গঠন ও সৌন্দর্য্য দেখিয়াছি, এখন তাহা মনে করিলে অত্যন্ত অনুশোচ উপস্থিত হয়। আর তেমন গঠন বা চিত্র-সৌন্দর্য্যের কিছুই নাই। কিন্তু জাগ্রতমহিমা সম্বন্ধে এখনও মধ্যে মধ্যে ১।১টি ঘটনা অনুভব হইয়া থাকে। অনেকে মহামায়ার এই স্থানকে সিদ্ধপীঠ মনে করিয়া থাকেন। হিন্দু ও মুসলমান জগন্মাতাকে সমানভাবে ভয়ভক্তি করিয়া থাকেন। পূর্ব্বে দেবীর স্থানে মানসার চিনিসন্দেশ এত যুটিত যে, পূজক মহাশয় বৎসরাবধি নায়েব, মোহুরের, পাইক, নাপিত, ভূইমালী, মালাকার, ঢাকী ও গ্রামস্থ সকলকে যথেষ্টরূপে প্রসাদ বিতরণ করিয়া, সংবৎসরের ব্যয়োপযোগী আপনার রাখিয়া ও বন্ধুবর্গকে দিয়াও ২০।২৫ টাকা করিয়া বিক্রয় করিতেন। দুগ্ধ এত যুটিত যে সমস্ত আবর্ত্তন করিতে অশক্ত হইয়া পুষ্করিণীতে ঢালিয়া দেওয়া হইত। এখন তাহার শতাংশের একাংশও যুটে না। পূর্ব্বে যত মণ আতপের আহার ও ভোগের নিয়ম ছিল, এখন তাহার অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

এই মহামহিমান্বিতা-মহামায়ার ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। এই তরফ পাতিয়াখালির এক ক্রোশ ব্যবধানে পূর্ব্বে নারিচা নামক একটি অনেক দিনের পুরাতন ক্ষুদ্র গ্রাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই গ্রামে অনেক দিন হইতে ভৌমিকোপাধিক কয়েক ঘর সম্ভ্রান্ত ভদ্র মাহিষ্যের বাস আছে। এই মাহিষ্যবংশে স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়, আচার, বিদ্যা, বিনয়, প্রতিষ্ঠাদি গুণে দেশমধ্যে সম্মান্ত হইয়াছিলেন। ইনি উত্তম অবস্থাপন্ন ছিলেন। ভৌমিকদের বাটীতে দাসদাসীগণেরও এত সুখ ও সুবিধা ছিল যে, গোরক্ষক, কৃষকাদি চাকর সম্প্রদায়েরা বাড়ীর গোমস্তাকে উৎকোচ দিয়া ঐ বাড়ীর চাকুরী লইতে প্রয়াস পাইত। মহাত্মা অখিলচন্দ্র ভৌমিক মহাশয়,

গোস্বামীদের শিষ্য হেতুক কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছিলেন বটে,—কিন্তু দুর্গাদেবীর প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। শিব, শক্তি ও বিষ্ণুকে যিনি অভেদ জ্ঞানে অবগত হন, তিনিই নরোত্তম ব্যক্তি। স্বর্গীয় অখিলচন্দ্র ভৌমিক প্রত্যহ প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে আলতার রং দিয়া এক সহস্র দুর্গানাম লিখিতেন। বাড়ীতে দুর্গোৎসবে সান্ধ্য আরতির কালে, ঢক্কানিনাদে পরম আনন্দে তাঁহার হৃদয়তন্ত্রী তালে তালে নৃত্য করিতে থাকিত। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, নির্নিমেষ-নয়নে জগজ্জননীর প্রতিমার দিকে চাহিয়া আনন্দ-গদ্‌গদচিত্তে মা মা বলিয়া ডাকিতেন ও দুটি চক্ষের ধারায় বক্ষদেশকে প্লাবিত করিতেন। তাঁহার এইরূপ পবিত্র অন্তঃকরণ ও ভক্তিনিষ্ঠা জানিয়া, মহামায়া পূজার সময় তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন। ভৌমিক মহাশয় স্বপ্নাবেশে সাক্ষাত্‌ ব্রহ্মময়ীর স্বরূপ-বিভূতি দর্শন করিলেন। চিন্ময়ীর দর্শনরূপ স্বপ্নকে প্রাকৃত গুণময় স্বপ্ন মনে করিতে হইবে না। মহামায়া ভৌমিককে স্বপ্নযোগে অবগত করাইলেন যে, "আমি তোমার ভক্তিগুণে বাধ্য হইয়া, তোমার প্রতিমাতে আবির্ভূতা হইলাম এবং তোমার গৃহে নিত্য অধিষ্ঠিতা থাকিব। প্রতিমা বিসর্জ্জন হইলে তুমি নিত্য নিত্য আসনে পূজা দিও।" এই বলিয়া মহামায়া অন্তর্হিতা হইলেন। ভৌমিক মহাশয় হঠাৎ সুপ্তোত্থিত হইয়া, জগন্মাতার প্রত্যাদেশ স্মরণ করতঃ, আনন্দ-বৈবশ্যতাবশতঃ কিঞ্চিৎকাল নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। পরে, প্রবুদ্ধ হইয়া, আপনার পরমসৌভাগ্য মনে গণিলেন। ভৌমিক মহাশয় মহামায়ার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি ইষ্টকময় মণ্ডপ ও তাহার নিকটেই একটি পুষ্করিণী খনন করাইলেন। পরবৎসর নূতন মন্দিরে মহোৎসবে মহামায়ার পূজা আরম্ভ করিলেন। লীলাময়ী মধ্যে ২।১টি করিয়া অশ্রুতপূর্ব্ব লীলা করিয়া দেশেবিদেশে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে এই দুর্গাদেবী জাগ্রতা দেবী বলিয়া নানাস্থানে রাষ্ট হইয়া পড়িল। লারিচা ভৌমিকদের বাটীতে স্বয়ং দুর্গাদেবীর অধিষ্ঠান হইয়াছে এই এক মহারব পড়িয়া গেল। অনেকে মানস করিয়া সদ্য ফল পাইল। অপুত্রক পুত্র পাইল; অর্থী ন্যায়-বিচারে জয়লাভ করিল, দণ্ডার্হ রাজদণ্ড হইতে মুক্তি পাইল, ইত্যাদি অনেকে অনেক মানস করিয়া ফল পাইতে লাগিল। দেবীর মাহাত্ম্য আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল। ভৌমিক মহাশয়ের আনন্দের সীমা নাই। আনন্দময়ীর সেবায় পরমানন্দে অনেক দিন কাটিয়া গেল। শেষ দশায় ভৌমিক মহাশয়ের বাটীতে পারিবারিক অশান্তি ঘটিয়া উঠিল। ভৌমিক

মহাশয়ের বহুগোষ্ঠি। পুরনারীগণ দিবারাত্র কলহ দ্বারা গৃহাধিষ্ঠাত্রী দেবী মহামায়াকে বিরক্তা করিয়া তুলিলেন। নারীগণ গৃহীর গৃহলক্ষ্মীস্বরূপা; তাঁহারা যদি সতত কলহপ্রিয়া হন, তাহা দ্বারা গৃহে মহা অমঙ্গল সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে। ভৌমিক মহাশয়ের সংসারে তাহাই ঘটিল। তিনি বৃদ্ধদশায় কাহাকে কিছু বলিয়া প্রবোধ দিতে না পারিয়া সতত মনোদুঃখেই কাল-যাপন করিতে লাগিলেন। এ দিকে মহামায়া ভক্তের আলয় হইতে অন্তর্হিতা হইবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পূর্ণ হইবার বিলম্ব কতক্ষণ? এই সময় পাতিলাখালি গ্রামের স্বর্গীয় মহাদেব দাস গ্রামস্থ হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে কয়েক জন প্রধানের সহিত পরামর্শ করিলেন যে, এই গ্রামে কোন উৎসবাদি নাই; আমরা এ বৎসরের খাজনা না দিয়া, সেই টাকা দ্বারায় দুর্গোৎসব করিব। তখনকার গ্রাম্য মুসলমানগণ ব্রাহ্মণ ও হিন্দুর দেবতাকে ভয় ও ভক্তি করিত। সকলে সম্মত হইলে, সেই বৎসরই সমস্ত মৌজার টাকা সঞ্চয় করিয়া, পূজার অনুষ্ঠান করা হইল। নারিচার ভৌমিকদের বাটীর প্রতিমার ন্যায়, কোথায় অমন সুন্দর প্রতিমা দেখা বা শুনা যায় না, অতএব অবিকল ঐ ধরণের প্রতিমা গড়িয়া পূজা দিতে হইবে, এই পরামর্শ স্থির হইল। এ সম্বন্ধে পাতিলাখালির কাছারির পাইক মৃত কুলী মণ্ডল নামক জনৈক মুসলমানের উদ্যোগ উৎসাহ অধিক ছিল। সে উদ্যোগের একটু বিশেষ কারণ ছিল; বাহুল্য বোধে তাহা উল্লিখিত হইল না। যাহা হউক, ভৌমিকদের বাটীর প্রতিমার আদর্শে পাতিলাখালির নূতন পূজার প্রতিমা গঠন করান হইল। ওদিকে, ভৌমিক মহাশয়ও প্রতিবর্ষের ন্যায় যথাকালে প্রতিমা নির্ম্মাণ করাইলেন। ক্রমে পূজার দিন উপস্থিত; অদ্য ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ। আজি মহামায়ার মহাশঙ্কট। একদিকে প্রাচীন ভক্ত ভৌমিকের অব্যাহত ভক্তি, অন্যদিকে নব অনুরাগী পাতিলা খালির মহাদেব দাস ও তৎপ্রমুখ তত্রত্য সকলের প্রগাঢ় উৎসাহ। নকুল-ভার্য্যা কাহার প্রতি অনুকূলা, আর কাহার প্রতি প্রতিকূলা হইবেন? দক্ষ-তনয়া ছলনায় মহাদক্ষ। ভক্তকে ছলনা আরম্ভ করিলেন। ভৌমিক মহাশয় দিবাভাগে আপনার শয়ন গৃহে খট্টার উপর শয়ন করিয়া আছেন, ঈষন্মাত্র তন্দ্রাবেশ হইয়াছে। তৎকালে মহামায়া ভৌমিকের একটি বিবাহিতা কন্যার বেশে সেই গৃহে উপস্থিত হইয়া, মৃদুস্বরে ভৌমিককে কহিলেন,—'বাবা আপনার বাটীতে কলহের জ্বালায় অস্থিরা হইয়া গেলাম, আর এক মুহূর্ত্ত এখানে থাকিতে ইচ্ছা

হইতেছে না। আমাকে বিদায় দেন, পাতিলাখালির নূতন পূজা দেখিয়া চলিয়া যাইব।" ভৌমিক মহাশয়, আপনার কন্যাবোধে, তাহার দিকে না চাহিয়াই দুঃখিতভাবে উত্তর করিলেন,—"মাগো! দিবানিশি কলহ জন্য আমিও সর্ব্বদা অশান্তিতে আছি। কি করি, উপায় নাই। তুমি থাকিতে যদি নিতান্ত অসুবিধা মনে কর, এখনই যাইতে পার, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।" মহামায়া ভৌমিকের তন্দ্রাবস্থার এই অর্দ্ধস্ফুট বাক্যালম্বন করিয়াই, তাঁহাদের গৃহ ত্যাগপূর্ব্বক, পাতিলাখালি যাইয়া তত্রতা নব প্রতিমাতে আবির্ভূতা হইলেন। মহেশ্বরী মহাদেব দাসের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। জগজ্জননীর আবির্ভাব হওয়ায়, নৈসর্গিক প্রতিমা অলৌকিক শোভাসম্পন্ন হইয়া পড়িল। নারিচার মহামায়া পাতিলাখালিতে আসিয়াছেন বলিয়া, চতুর্দ্দিকে রব পড়িয়া গেল। একথা লোকমুখে রাষ্ট করায় কে? সর্ব্বশক্তিময়ী মহামায়া। যাহা হউক, এইরূপে পাতিলাখালি গ্রামে মহামায়ার পূজা স্থাপিত হইল। দেশে বিদেশে নারিচার পরিবর্ত্তে পাতিলা খালির নাম পড়িয়া গেল। ওদিকে ভৌমিক মহাশয়ের যে দশা হইল, তাহা বর্ণন করিতে অতিশয় দুঃখ উপস্থিত হয়। তিনি নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখিলেন যে, মহামায়াই কন্যা বেশে বিদায় লইয়া পাতিলাখালি গিয়াছেন। নিদ্রোত্থিত হইয়া আপন কন্যাকে ডাকিলেন। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, তাঁহার কন্যা বিদায় চায় নাই। তখন দ্রুতগতি প্রতিমার নিকটে যাইয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীদুর্গানাথ দেওরায় তত্ত্ববিনোদ।

ভেষজবিহীন চিকিৎসা-বিজ্ঞান।

(Science of drugless healing)

চিকিৎসা-শাস্ত্র আলোচনা করিলে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যাধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঔষধ সেবনের ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। এ পর্য্যন্ত যতগুলি চিকিৎসা প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে রোগবিশেষে ঔষধসেবন বা প্রয়োগের বিধি ব্যবস্থিত হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দু আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা-শাস্ত্রেও

প্রাগুক্ত বিধিই দৃষ্ট হইয়া থাকে। সময় সময় মহামারী উপস্থিত হইলে বহু জনপদ শ্মশানে পরিণত হয়। তদ্দ্বারা জাতীয় শক্তি ও উন্নতি বিশেষ বাধা প্রাপ্ত হয়। মানব পুনঃ পুনঃ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে, জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ঐ প্রকার ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিগণ অকালে মানবলীলা সম্বরণ করে। কি উপায় অবলম্বন করিলে মানব দুরন্ত ব্যাধির হস্ত হইতে রক্ষা পায়, তাহার উপায় আবিষ্কারের জন্য আধুনিক সুসভ্য পাশ্চাত্য দেশে তুমুল আন্দোলন ও আলোচনা চলিতেছে। অনেকে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে, মানবদেহে এক প্রকার কীটাণু জন্মিয়া দেহ জীর্ণ শীর্ণ করিয়া ফেলে, সেজন্য শরীর জরাগ্রস্ত হয়; ঐ প্রকার কীটাণু ধ্বংস করিতে পারিলে মানুষ সহজে মরিবে না। ফ্রান্স দেশের পণ্ডিতগণ এ সম্বন্ধে বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন; কিন্তু এখনও ইহার উপায় আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

ভারতের আয়ুর্ব্বেদ-শাস্ত্র রচিত ও প্রচলিত হইবার পর হইতে এতদ্দেশে তাহার উন্নতিবিধানার্থ কোনও উপায় ইতিপূর্ব্বে পরিলক্ষিত হয় নাই। ভারতের মধ্যে বিশেষতঃ বাঙ্গালা দেশে বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির অভাব নাই; কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই কোনও বিষয় আবিষ্কারের জন্য তেমন চেষ্টা করেন নাই। আবার এক শ্রেণীর ব্যক্তি আছেন, তাঁহারা পরশ্রীকাতর, নিজের স্বার্থ বজায় রাখিয়া অবশিষ্ট সময়টুকু তাঁহারা জ্ঞানালোচনার পরিবর্ত্তে পরনিন্দায় ব্যয় করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন; সুতরাং বাঙ্গালীর সময়টুকু অনর্থক ব্যয় হইয়া যায়। এ অবস্থায় অধিকাংশ বাঙ্গালীর জ্ঞানালোচনা সময়ের অভাবেই হয় না, বেশ বলিতে পারা যায়। প্রায় সমুহ সভ্যদেশে শিক্ষা-বিস্তারের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানোন্নোতির পথও বিশেষরূপে পরিষ্কৃত হইতেছে; কিন্তু এই ভারত সেই তিমিরে ডুবিয়া আছে। জাপান প্রভৃতির অভ্যুদয়ে এদেশের কোন কোন ব্যক্তি মস্তিষ্কের অংশবিশেষ এ বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু দুই একদিন পরে তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় ঔদাসীন্য অবলম্বন করেন।

স্বাস্থ্যরক্ষার এমন কতকগুলি নিয়ম আছে, তাহা প্রতিপালন করিলে, অনেক রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে রোগ হইলে এমন অনেক গুলি শারীরিক অঙ্গচালনা ও অন্যান্য কয়েক প্রকার উপায় অবলম্বন দ্বারা যন্ত্রবিশেষকে উত্তেজিত করিয়া ব্যাধির হস্ত হইতে আরোগ্য

লাভ করিতে পারা যায়। চিকিৎসা-শাস্ত্রে একটি রোগের অনেকগুলি ঔষধ সেবন বা প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে; সকল গুলি কার্য্যকারী নহে। যথা, শিরঃপীড়া বহু কারণে হইতে পারে, ও ইহার ঔষধ প্রয়োগও বিভিন্ন প্রকার। মস্তিষ্কে রক্ত-সঞ্চয়, সর্দ্দি, অপাক, যকৃতের পীড়া, জ্বর প্রভৃতি নানাকারণে শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। ইহার প্রত্যেকটির জন্য বিভিন্ন প্রকার ঔষধ প্রয়োগের ব্যবস্থা আছে। যকৃতের ক্রিয়ার বৈলক্ষণ্যবশতঃ শিরঃপীড়া হইলে যকৃতের চিকিৎসা করা আবশ্যক, নতুবা তথায় আয়ুর্ব্বেদোক্ত হিমসাগর তৈলে মাথা ভিজাইয়া দিলেও রোগ স্থায়ীরূপে আরোগ্য লাভ করিবে না। এইরূপ দেহের স্থান বিশেষে বেদনা হইলে, তাহার মূলকারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক, নতুবা কেবল বেদনা নিবারক ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য লাভের সম্ভাবনা অল্প। এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত চিকিৎসকগণ উত্তমরূপ জানেন, সে কারণ বাহুল্য ভয়ে তৎসমূহ পরিত্যক্ত হইল। উল্লিখিত ঘটনা দ্বারা জানা যায় যে, দেহে রোগ উৎপন্ন হইলে কোন যন্ত্র বিশেষ আক্রান্ত হয়। অনেক সময় চিকিৎসকগণ রোগের প্রতীকার করিতে অসমর্থ হইয়া স্বভাবের (nature) উপর নির্ভর করিয়া থাকেন, সময় সময় তাহাতে বেশ ফলও পাওয়া যায়। অনেক আসন্নপ্রসবা স্ত্রীলোকের প্রসবের সুবিধার জন্য চিকিৎসকগণ রোগিনীকে সাময়িক অঙ্গচালনার পরামর্শ দেন, ইহাতে জরায়ুর ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় বলিয়া সত্বরে প্রসব কার্য্য সম্পন্ন হয়। অস্ত্রচিকিৎসা-কালীন রোগীর বা সদ্যঃজাত শিশুর শ্বাস প্রশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে, কৃত্রিম উপায়ে শ্বাসযন্ত্র উত্তেজিত করিয়া রোগীকে আরোগ্য করা হয়, এখানে ঔষধ সেবন কদাপি কার্য্যকরী নহে। উৎকট জ্বর উপশম না হইলে ঠাণ্ডা জল প্রয়োগ ও ব্যবহারের বিধি আছে। অনেকে বিশ্বাস করেন, শরীরে রোগ-আরোগ্যকরী শক্তি আছে, ঔষধ সেবন দ্বারা সেই শক্তি জাগরিত করা হয়। আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা-শাস্ত্রের অধ্যাপক ডাঃ ম্যাককলান (Dr. W. G. McCallum) আমাকে লিখিয়াছিলেন যে, ঔষধ সেবন দ্বারা মাত্র চারিটি রোগ আরোগ্যলাভ করিতে পারে, যথা,—(১) ডিপথিরিয়া (ঝিল্লিক প্রদাহ) ও (২) ধনুষ্টঙ্কার এণ্টিটোক্সিন্ * প্রয়োগে (৩) স্পাইনাল মেনিঞ্জাইটিস্ (মস্তিষ্কের পৃষ্ঠবংশীয় আবরণ ঝিল্লির প্রদাহ) রোগ-রকফেলার ইনষ্টিটিউটের আবিষ্কৃত উপায়ে,

* ব্যাকটিরিয়া বিষনাশক পদার্থ পশুর রক্তে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(৪) ম্যালেরিয়া, কুইনাইন প্রয়োগে আরোগ্য হইতে পারে। মানবদেহে পুনঃ পুনঃ ঔষধ প্রয়োগ করিয়া এ পর্য্যন্ত উত্তমরূপে জানিতে পারা গিয়াছে যে, আরোগ্যকরী শক্তির অভাব হইলে ঔষধপ্রয়োগে কোন কার্য্য হয় না। জীবনীশক্তি নিতান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িলে অনেক স্থলে তাড়িৎ শক্তির সাহায্য গ্রহণ করা হইয়া থাকে। ইলেক্ট্রোহোমিওপ্যাথির আবিষ্কারক কাউণ্ট ম্যাটি তাড়িৎশক্তি প্রয়োগে অনেক উপকার পাইয়াছেন। ডাঃ সুসলারের আবিষ্কৃত টিসুরিমেডি নামক দ্বাদশটি ঔষধ প্রধানতঃ টিসুর উপর কার্য্য করিয়া থাকে।

বিস্তর অনুসন্ধান দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অধিকাংশ পীড়া রক্তের গতি বৈলক্ষণ্যবশতঃ উৎপন্ন হয়। এবং রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলে স্বাস্থ্য পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়। শারীরিক অঙ্গচালনা দ্বারা রক্তবহানালী, শিরা ও কৈশিকনাড়ীসমূহে রক্তসঞ্চালন ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। কতিপয় মাংসপেশী ও সন্ধিস্থল সঞ্চালনে নিকটস্থ রক্তবহানালীতে চাপ পড়িয়া রক্তসঞ্চালনের গতি বৃদ্ধি পায়। এইরূপে দেহের কতিপয় অংশ সঞ্চালনে কোন কোন অংশে যেমন রক্তের গতি বৃদ্ধি পায়, তেমনি কোন কোন অংশে রক্তের গতি কম হয়। এই প্রক্রিয়া অবগত হইতে পারিলে, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া উত্তেজিত না করিয়াও যে কোন ব্যক্তি দেহের অংশবিশেষে রক্তসঞ্চালনের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিতে পারে। বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্যের যে কয়েকটি উপায় আছে. তাহা এই ঃ—পূর্ব্বোক্তরূপ শারীরিক অঙ্গচালনা (ব্যায়াম নহে), বিশ্রাম, গরম বা ঠাণ্ডা জল ব্যবহার, খাদ্য, স্নান, তাড়িৎশক্তি প্রয়োগ, মানসিক চিন্তার গতি পরিবর্ত্তন, আলোক প্রভৃতি।

মানবদেহে একপ্রকার তাড়িৎশক্তি আছে যাহা রশ্মির ন্যায় দেহের চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। এই রশ্মি দেখিতে পাওয়া যায় না বা ইহার দ্বারা অন্ধকারে আলোক পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে ইহার অস্তিত্ব উপলব্ধি হইয়াছে। বর্ত্তমান এই আবিষ্কারের পূর্ব্বে ভারতের আর্য্যঋষিরা ইহার সত্ত্ব উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন। হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তির মস্তকের চতুস্পার্শ্বে ঐ রশ্মি প্রতিফলিত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ রশ্মিজাল দেখিয়া অনেক আধুনিক ইংরেজী শিক্ষিত যুবক প্রাচীন চিত্রকরগণকে অসভ্য বলিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। সাহেবের মুখ হইতে কোন কথা না বাহির হইলে তাহা বেদবাক্য নহে, ইহাই ঐ শ্রেণীর যুবকদলের ধারণা।

শিক্ষার প্রথম হইতেই তাহারা হিন্দুদের প্রাচীন গ্রন্থসমূহের উপর বীতশ্রদ্ধ বলিয়া বিদ্যাশিক্ষার পর তাহার আলোচনা ঘৃণিত কার্য্য মনে করে; সুতরাং প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র প্রভৃতির উন্নতি কোথা হইতে হইবে? মানব-দেহে তাড়িৎ শক্তি আছে ও উহাই রশ্মিজালের ন্যায় বিকীর্ণ হইয়া থাকে, আমরিকার কোন কোন খ্যাতনামা অধ্যাপক ইহা স্বীকার করিয়াছেন। মানবদেহ ব্যাধিগ্রস্ত হইলে রশ্মির কোনরূপ প্রকারভেদ হয় কি না, তাহা আমি ঠিক বলিতে পারি না। একজনের সহিত আর একজনের মনের মিল হয় না, অথবা এক ব্যক্তিকে অন্য ব্যক্তি দেখিলে জড়সড় হয়, সেখানে ঐ রশ্মি-জালের বিভিন্নতাই প্রধান কারণ। অনেক দম্পতির মনের মিল হয় না, তথায় রশ্মির বিরুদ্ধ ক্রিয়া মুখ্য কারণ বলিয়া গণ্য। অনেকে বোধ হয় জানেন যে, একজন রুগ্ন ক্ষীণকায় ব্যক্তি একটি বলবান লোকের সহিত দীর্ঘকাল একত্রে এক শয্যায় শয়ন করিলে, ক্ষীণকায় ব্যক্তি ক্রমশঃ সবল ও সুস্থ হইতে থাকে। এস্থলে উভয়ের তাড়িৎ পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া সমভাবাপন্ন হইবার চেষ্টা করে ও সবলের শক্তি অধিক হওয়ায় দুর্ব্বলের শক্তি প্রতিহত হইয়া অজ্ঞের অলক্ষ্যে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এস্থলে দুর্ব্বল ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য কোন ঔষধের আবশ্যক হইল না। যেখানে তাড়িৎ রশ্মির বিরুদ্ধ ক্রিয়া দ্বারা উভয়ের মনের মিল হয় না, তথায় প্রক্রিয়া বিশেষ অবলম্বন করিলে, ক্রমশঃ ধাতু শোধন হইতে পারে।

বজ্রাঘাতে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। শ্বাস-যন্ত্রের স্নায়ু-মণ্ডলীর ক্রিয়া কিছুক্ষণের জন্য নষ্ট হইয়া যায়, এজন্য মানুষ মরে বলিয়া অনেকে বলেন। কৃত্রিম উপায়ে এই প্রকার মৃতবৎ ব্যক্তির শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া উত্তেজিত করিতে পারিলে, সে বাঁচিতে পারে। এখানে ঔষধ প্রয়োগে রোগী বাঁচে না ও তদ্দ্বারা কোনও ফল হয় না। ফিজিক্সে বজ্রাঘাতে মৃত্যুর বিষয় অবগত হইয়া আমি বিস্তর চেষ্টা ও অনুসন্ধানে এ পর্য্যন্ত ৫টি মৃত দেহ দেখিয়াছি। তন্মধ্যে দুইটি ব্যক্তি ব্যতীত অন্য তিনটির সম্বন্ধে শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া নষ্ট হওয়ায় মৃত্যু হইয়াছে, এমত অনুমিত হয় নাই। কারণ শেষোক্ত তিনটির অঙ্গের কোন স্থান ঝলসাইয়া নীলাভ হইয়া গিয়াছিল ও ঐ স্থানে বড় বড় ফোস্কা উঠিয়াছিল। তাড়িতাগ্নির তেজে উহাদের দেহ পুড়িয়া গিয়াছিল, এখানে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাসের কার্য্য করিলে তাহারা বাঁচিত না। অন্য দুইটি ব্যক্তির দেহে উক্ত

প্রকার কোন চিহ্ন ছিল না, যথাসময়ে চেষ্টা করিলে হয় ত তাহারা বাঁচিতে পারিত, তাড়িতের সম্বন্ধে এ প্রবন্ধে আলোচনা করা অসম্ভব, সেজন্ত অধিক লিখিতে ইচ্ছা করি না। (ক্রমশঃ)।

শ্রীআশুতোষ জানা।

"আমরা গৌড়ের বৈদিক আদি"।

(রামপ্রসাদী সুর)

আমরা গৌড়ের বৈদিক আদি।
আদিশূর একদিন যাঁহাদের ক'রেছিল সাধাসাধি॥
উন্নতি আর অবনতি যত কিছু বিধির বিধি।
(দেখ) কাটি গাঙে জাহাজ চলে, আদ্যা গঙ্গা কাণা নদী॥
মুটা কত পান্তাভাতে, ভেবে দেখ কান্ত মুদী।
সে যে রাজপ্রসাদে রাজপ্রাসাদে পাত্‌ল সাধে রাজার গদি।
মর্ম্মভেদী কথা শুনে, কাঁদিরে ভাই নিরবধি।
কাঁদ্‌লে কিছু হবে না ভাই, খুঁজতে হবে মহৌষধি।
আদিশূর আর বল্লাল সেনের ক'রে কত তোষামুদী।
কায়েম মোকাম আসল সত্ত্বে বাধা দিচ্ছে মিথ্যাবাদী॥
সত্য সত্য পরম সত্য, সত্য কি ভাই হয় তমাদি।
দেখা যাবে হকিয়তে, কেমন দলিল কে ইসাদি॥
বুনন ধানে অল্প ফলে রোপণ ধানে কাঁদি কাঁদি।
আঁটির চারা বুনো হ'ল, কলমের আম হয় সুস্বাদী॥
ঘরের লক্ষ্মী আপদ বালাই পাটেশ্বরী হয় রে বাঁদি।
যার ধন তার ধন হ'ল না, নেপো খেলে মুড়কি দধি॥
সদাচার ব্রাহ্মণের আচার, এ কথাটি মান যদি।
বাতিল হবে ভাই তা হ'লে, ষোল আনা গর আবাদী॥
রাজাধিরাজ পঞ্চমজর্জ্জে চিরজীবী করুন বিধি।
(তাঁর) ন্যায়বিচারে ছারে খারে যাবে দুষ্ট ফরিয়াদী॥

শ্রীনারায়ণচন্দ্র কাব্যরত্ন।

ব্রাহ্মণ-বংশাবলী।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর হইতে)

—:০:—

[জেলা হুগলি, মহকুমা শ্রীরামপুর, থানা চণ্ডীতলার অন্তঃপাতী উগারদহ গ্রামস্থ গৌড়াদ্য-বৈদিক হংসঋষি গোত্রীয়].
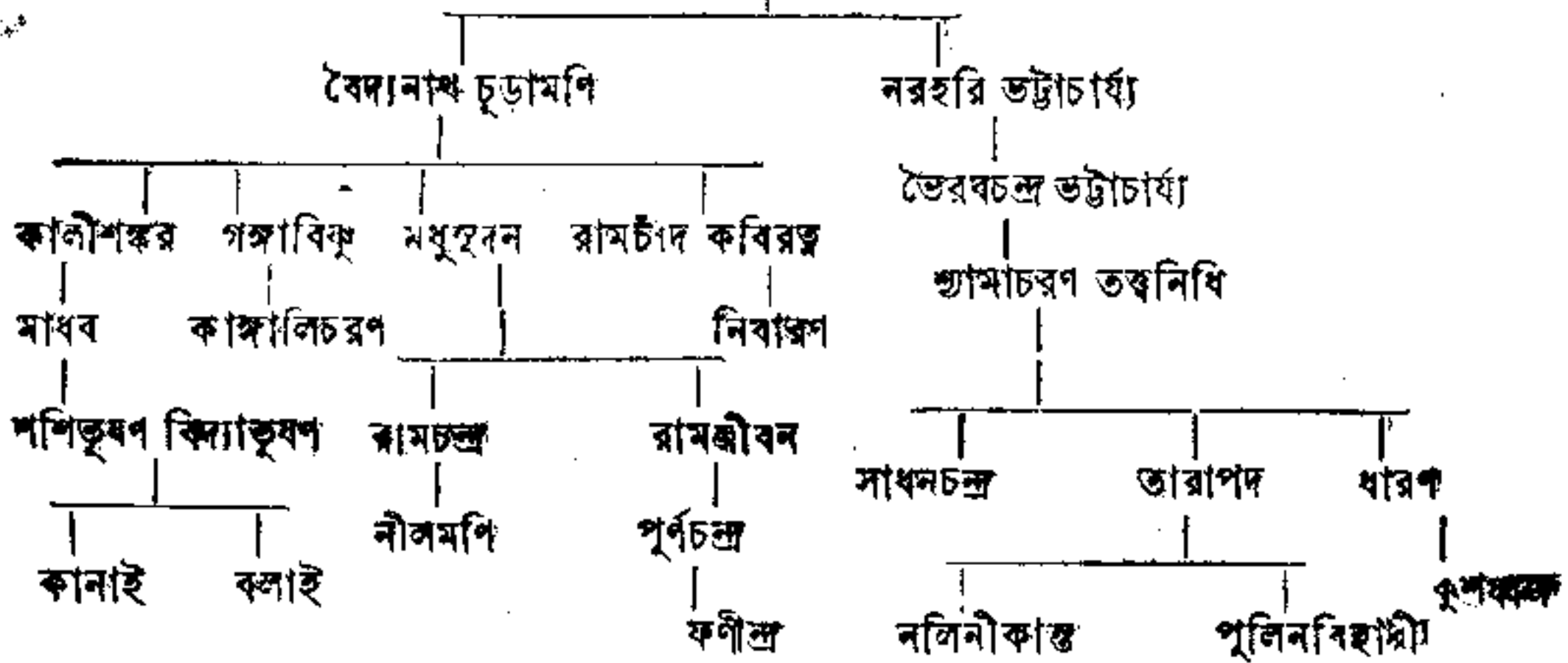
বাঞ্ছারাম বিদ্যারত্ন মহাশয়ের বংশ সনাতন—হংসঋষি গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত। বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল রেলওয়ের অন্তর্গত দ্বারবাসিনী পূর্ব্ববাসস্থান। কুলদেবতা ৺হংসেশ্বরী দেবী। আচার, বিদ্যা প্রভৃতি সদ্‌গুণানুসারে গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণের যে ৪টি শ্রেণী আছে, ইহাঁরা তন্মধ্যে উথাসনী শ্রেণীস্থ এবং যজ্ঞস্থলে সদস্য (ভ্রম-সংশোধনকারী) বরণ প্রাপ্ত হয়েন। উত্তরদেশীয় দ্রাবিড় শাখার সমাজের হাউলে পরগণা ও দ্বারবাসিনী প্রভৃতি অঞ্চলে এই গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ গোষ্ঠীপতি আছেন। বাঞ্ছারাম বিদ্যারত্ন মহাশয় উক্ত উগারদহ গ্রামে প্রসিদ্ধ জাগ্রত দেবতা শ্রীশ্রী৺সিদ্ধেশ্বরী কালীমাতার সেবায়তরূপে নিযুক্ত হইয়া বর্দ্ধমানাধিপতি প্রদত্ত ১৮/০ বিঘা দেবোত্তর ভূসম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া বসবাস করেন। বর্ত্তমান বংশধরগণ আজ পর্য্যন্ত গ্রামের জমিদার ফরাসী চন্দননগরাধীন গোন্দল-পাড়ার স্বনামধন্য বদান্যবর স্বর্গীয় গোপালচাঁদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তরাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের নামে, নাম গোত্রাদি উল্লেখপূর্ব্বক যথারীতি সংকল্প করতঃ, উক্ত দেবীর পূজা করিয়া দক্ষিণাদি গ্রহণে পুরোধার কার্য্য করিয়া আসিতেছেন।

সমালোচনা।

বঙ্গীয় মাহিষ্য-পুরোহিত।—জেলা ফরিদপুর, হাবাসপুর নিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুদর্শনচন্দ্র বিশ্বাস প্রণীত উপাদেয় পুস্তক; কাগজ ও ছাপা সুন্দর। মাহিষ্য-পুরোহিতের সামাজিক উন্নতি সাধন করিতে হইলে এই পুরোহিতের প্রতি জন সাধারণের যে প্রবাদমূলক ভ্রান্তবিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়া আছে, তাহা অপনোদন করিতে হইবে, তদর্থে বহুসংখ্যক যুক্তিমূলক পুস্তক ভিন্নশ্রেণীর ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, সদ্গোপ, তিলি, গন্ধবণিক প্রভৃতি জাতির মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে। দরিদ্র গ্রন্থকারের পক্ষে ইহা অসম্ভব। প্রত্যেক গ্রামের অবস্থাপন্ন প্রত্যেক মাহিষ্য যদি অন্ততঃ ১৲ টাকা মূল্যের মাহিষ্য-পুরোহিত গ্রন্থ ভিন্ন সমাজে বিতরণ করেন, তবে সমাজের কুসংস্কার বহু পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে। মূল্য প্রত্যেক খণ্ড ।০ চারি আনা মাত্র। বিতরণ জন্য লইলে ১৲ এক টাকায় ৫ খানা দেওয়া গ্রন্থকারের মত। এই পুস্তকে মাহিষ্য-পুরোহিতের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপে হইল বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অধিকন্তু বিগত ১৬ই চৈত্রের হিতবাদীতে পণ্ডিত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয় কৈবর্ত্ত শীর্ষক প্রবন্ধে মাহিষ্য-জাতিকে যেরূপে অশাস্ত্রীয় ভাবে আক্রমণ করিয়াছেন, তাহারও অত্যুৎকৃষ্ট প্রতিবাদ দেখিতে পাইবেন। তাহা ব্যতীত হাওড়া জেলার সাহাড়া নিবাসী মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় কৃষিকৈবর্ত্ত নামক যে পুস্তিকা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতিবাদও এই মাহিষ্য-পুরোহিতে পাইবেন।

সার্ভে ও সেটেলমেণ্টে প্রজার কর্ত্তব্য।—পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশ-চন্দ্র মাইতি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত জরীপ সম্বন্ধীয় অতি প্রয়োজনীয় পুস্তক। যে অঞ্চলে গবর্ণমেণ্ট হইতে জরীপ আরম্ভ হইয়াছে বা শীঘ্র হইবে তথাকার প্রজা-গণের পক্ষে এই পুস্তক অতি আবশ্যক। জমিদার ও প্রজার সত্ব কিরূপ তাহা এই পুস্তকে বিশদভাবে কথোপকথনচ্ছলে বিবৃত হইয়াছে। বহুদিবস যাবৎ রাজষ্টেটে দক্ষতার সহিত কার্য্য করিয়া সতীশবাবু জমিদারী সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহার কিয়ৎ পরিমাণ এই পুস্তকে দেখিতে পাইবেন। পুস্তকখানির গুরুত্ব হিসাবে ইহার মূল্য ১৲ এক টাকা হওয়া উচিত। কিন্তু গ্রন্থকার কেবলমাত্র ।০ চারি আনা মূল্য ধার্য্য করিয়াছেন। ইহাও তাঁহার সহৃদয়তা ও নিস্বার্থতার প্রমাণ ছাপা ও কাগজ অতি পরিপাটী। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছন

বিবিধ প্রসঙ্গ।

বিগত আষাঢ় মাসের মাহিষ্য-সমাজে শ্রীযুক্ত সুদর্শন বিশ্বাস মহাশয়ের নিকট রক্ষিত যে ৫৪৸০ টাকা জমা প্রদর্শিত হইয়াছে, উহার ৫১/০ টাকা খরচ ও উদ্বৃত্ত ৩৷/০ টাকা। খরচের হিসাব নীচে প্রদর্শিত হইতেছে :—

খরচ।—

মুন্সীগঞ্জ হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত দুইজনের রেলভাড়া ... ২৷৵১০

দুইজনের ফিরিবার টিকেট একখানা, কলিকাতা হইতে মাছপাড়া, অন্যখানি কলিকাতা হইতে হালসা ... ৩ ৻৫

দুইজনের কলিকাতায় খাবার ও ট্রামভাড়া বিভিন্ন স্থানে যাতায়াত ইত্যাদি ... ২৷৷/৫

প্রতিবাদের জন্য পঞ্চানন তর্করত্নের অনুবাদিত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ খরিদ ১৷০

আনন্দবাজারে প্রতিবাদ প্রকাশ দেখিবার জন্য একখানা গ্রহণ ... ২/০

মাছপাড়া হইতে আলমডাঙ্গা সুদর্শন বিশ্বাসের রেলভাড়া ... ৷/১০

প্রতিবাদ প্রকাশের জন্য কোন ব্যক্তিকে দেওয়া যায় ... ৫৲

১৬৸/১০

জের— ১৬৸/১০

পাইকপাড়া-মাহিষ্যসমিতির বিতরণ জন্য মাহিষ্য-পুরোহিত খরিদ ২৮ খানা ৭৲

জেহালা মাহিষ্য-সমিতির বিতরণ জন্য ১৬ খানা মাহিষ্য-পুরোহিত খরিদ.. ৪৲

কুর্শা মাহিষ্যসমিতির বিতরণ জন্য মাহিষ্য-পুরোহিত খরিদ ২৮ খানা...৭৲

বাড়াদী মাহিষ্যসমিতির জন্য ১৪ খানা মাহিষ্য-পুরোহিত খরিদ ... ৩৷০

কালিদাসপুর মাহিষ্য-সমিতির জন্য ৪ খানা মাহিষ্য-পুরোহিত খরিদ... ১৲

সাহেবপুর মাহিষ্য-সমিতির জন্য ১০ খানা মাহিষ্য-পুরোহিত খরিদ ২৷৷০

সাহেবপুরে পুস্তক পাঠাইবার ডাকমাশুল ... ৵১০

বঙ্গীয় মাহিষ্য-পুরোহিত সহ প্রবন্ধ মুদ্রণ জন্য সাহায্য ... ৯৲

মোট খরচ— ... ৫১/০

মেদিনীপুরের কয়েকটী পল্লী-সভা।—বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির অন্যতম সভ্য এবং সাহিত্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রামপদ বিশ্বাস মহাশয় গত শারদীয়া পূজার অবকাশে মেদিনীপুর জেলার প্রান্তভাগে সুবর্ণরেখার উপকূলবর্ত্তী বহু সংখ্যক গ্রামে পরিভ্রমণ করিয়া সমিতি স্থাপনপূর্ব্বক তত্রত্য স্বজাতিভ্রাতৃগণকে জাতীয় প্রেমে অণুপ্রাণিত করিয়াছেন। তদুপলক্ষে যে সকল "পল্লী সমিতি" সংগঠিত হইয়াছে তাহার মধ্যে প্রধান প্রধান কয়েকটীর নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল। (১) আগড়বাড় সাহিত্য পল্লী সমিতি—পোঃ সাউরি। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু হর প্রসাদ রায়। (২) মাজনা পল্লীসমিতি, পো খলিসাডাঙ্গা, সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ চন্দ্র নায়ক। (৩) বালিঘাই-সাহিত্য সমিতি—পো, বালিঘাই, জেলা মেদিনীপুর। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ভরত চন্দ্র ভুঞ্যা জমিদার। (৪) **কালিন্দি সাহিত্য-সমিতি**—প্রায় ৫০।৬০ খানি গ্রাম লইয়া এই সমিতি সংগঠিত হইয়াছে। স্থানীয় জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপ চন্দ্র শাসমল এবং তদীয় মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু মৃত্যুঞ্জয় শাসমল এই সমিতির সম্পাদক ও সহকারী সম্পাদকরূপে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং দক্ষিণশীতলা নিবাসী বাগ্মী-প্রবর শ্রীযুক্ত বাবু কামদেব খাটুয়া ও পুরুষোত্তমপুর নিবাসী মহেন্দ্র নাথ গিরি প্রভৃতি মহোদয় গণ গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া সমিতির মহান্ উদ্দেশ্য প্রচার করিতেছেন। এই সমিতির উদ্‌যোগে একটী মধ্য ইংরাজী স্কুল এবং নিকটবর্ত্তী প্রায় প্রতি গ্রামেই এক একটী প্রাইমারী স্কুল স্থাপিত হইয়াছে। (৫) **খলিসাডাঙ্গা সাহিত্য-সমিতি**, পোঃ খলিসাডাঙ্গা, জেলা মেদিনীপুর। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ সামন্ত। এই সমিতির উদ্‌যোগে একটী মধ্য ইংরাজী স্কুল, একটী পোষ্টাফিস এবং একটী ডাক্তারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইন্দ্র বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান বসন্তকুমার একজন বিশেষ স্বজাতি-প্রেমিক শিক্ষিত যুবক। (৬) ঘাটোয়া সাহিত্য সমিতি পোঃ খলিসাডাঙ্গা।—জেলা মেদিনীপুর। (৭) ঘোল বনবাড় সাহিত্য-পল্লী-সমিতি, পোঃ দেপাল। সম্পাদক শ্রীযুক্তরঘুনাথ জানা।

মুর্শিদাবাদ জেলায় কয়েকটী সভা।—আমডহরা জাতীয় উৎসবে যোগদান করিবার জন্য আহুত হইয়া উলুবেড়িয়া কোর্টের উকীল ও অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত অমৃতলাল হাজরা মহাশয়, ভ্রান্তিবিজয় প্রণেতা শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র

চক্রবর্ত্তী, ডায়মণ্ডহারবার হইতে শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি, বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতি হইতে রিপোর্টার শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চক্রবর্ত্তী, সুগায়ক শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী এবং মাহিষ্য-সমাজ সম্পাদক শ্রীমৎসেবানন্দ ভারতী মহাশয় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভারতী মহাশয় আমডহরা জাতীয় উৎসবের পূর্ব্বদিনে মুরশিদাবাদ লালবাগে স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত রাধাকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন; মন্মথ বাবু ও বিপিন বাবু সঙ্গে ছিলেন। মুরশিদাবাদ সহরের গণ্যমান্য মাহিষ্য মহোদয়গণ ও রাধাকৃষ্ণ বাবুর পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে নিমন্ত্রিত হইয়া উপস্থিত প্রায় তিন শতাধিক গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণগণ মিলিয়া তথায় সভার আয়োজন করেন। এইরূপে ২রা অগ্রহায়ণ রবিবার দিন **লালবাগ সভা।** সভাপতি শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়। তৎপর দিবস **আমডহরা মাহিষ্য-সমিতির** অধিবেশন। সভাপতি শ্রীযুক্ত নীলমণি চক্রবর্ত্তী মহাশয়। আমডহরা সভায় মাহিষ্য-জাতির ক্ষত্রিয়াচারে দ্বাদশাহাশৌচ গ্রহণের প্রস্তাব উঠে। বহু বাদ-প্রতিবাদের পর মাহিষ্য জাতি বৈশ্যবর্ণান্তর্গত ও পক্ষা-শৌচ গ্রহণ সঙ্গত, ইহাই অধিকাংশ সভ্যের অভিমত বুঝা গেল। শ্রীযুক্ত রাধারমণেশ চক্রবর্ত্তী মহাশয় মাহিষ্য জাতি বৈশ্য বর্ণান্তর্গত হইলেও সগুণ মাহিষ্যের যে দশদিন বা বার দিনে অশৌচান্ত হওয়া শাস্ত্রসঙ্গত, তাহা প্রমাণ করেন ও মেদিনীপুর জেলায় ব্যবহারতঃ যে তদনুরূপ প্রচলিত আছে, তাহার উল্লেখ করেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় তাহার সমর্থন করিয়াও বলেন যে, সাধারণ মাহিষ্যের সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে পক্ষাশৌচ গ্রহণই প্রশস্ত। শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহু চেষ্টা করিয়া দ্বাদশাহাশৌচ ও পক্ষাশৌচ উভয় মতাবলম্বী-দিগের মধ্যে সম্মিলন স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। তথা হইতে সদলে **রমানাথপুর মাহিষ্য-সমিতির** নৈশ অধিবেশনে যোগদান—৪ঠা অগ্রহায়ণ। তৎপরদিন ৫ই অগ্রহায়ণ **গোপীনাথপুর সারগাছি সম্মিলনী**—সভাপতি সারগাছী রামকৃষ্ণ-মিশন-অনাথ-আশ্রমের শ্রীমৎ **স্বামী অখণ্ডানন্দ।** স্বামিজী অসুস্থ শরীরেও সভাপতির আসনে উপ-বেশন করিয়া সকলের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিলেন। তত্ত্বনিধি মহাশয় ও হরিশবাবু বক্তৃতা করেন। এই সভায় বহুতর প্রয়োজনীয় বিষয়ের আলোচনা হয়। পূজনীয় স্বামী অখণ্ডানন্দ পরমানন্দে উপস্থাপিত প্রস্তাবগুলির উদ্দেশ্য উপস্থিত সাধারণকে বুঝাইয়া দিয়া তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি জ্ঞাপন করিলে তত্ত্বনিধি মহাশয়

(১২) আমলা সাদরপুর সভা।—বিগত ১১ই কার্ত্তিক রবিবার শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র-নাথ বিশ্বাস ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বিশ্বাস মহাশয় দ্বয়ের উদ্যোগে উক্ত মাহিষ্য-সভার অধিবেশন হয়। সভাপতি—শ্রীযুক্ত রামগতি বিশ্বাস মহাশয়। শিক্ষাবিস্তার ও সমাজসংস্কার সভার উদ্দেশ্য। এখানে একটী মাহিষ্য-ছাত্র-সম্মিলনীর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে বারান্তরে বিশেষ বিবরণ প্রকাশ্য।

হাওড়া জেলার পল্লীসভা।—(১৩) ময়নাপুর মাহিষ্য-সভা। হাওড়া উলুবেড়িয়ার অন্তর্গত পাইকান বলরামপুর নিবাসী শ্রীমান্ গোষ্ঠবিহারী পাঞ্জা ও শ্রীমান্ চতুরানন পাঞ্জা ভ্রাতৃদ্বয়ের উদ্যোগে বিগত ৬ই কার্ত্তিক তারিখে ময়নাপুর গ্রামে একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহোদয়। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি, শ্রীযুক্ত ভূতনাথ প্রামাণিক প্রভৃতি ভদ্রমহোদয়গণ মাহিষ্যজাতির বৈশ্যাচার, পক্ষাশৌচ ও শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি বর্ত্তমান ইতিকর্ত্তব্যতা প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা করিয়াছিলেন। স্থানীয় বহুসংখ্যক গৌড়াদ্যবৈদিক ব্রাহ্মণ ও মাহিষ্য উপস্থিত ছিলেন। (১৪) রসপুর কলিকাতা-মাহিষ্যসভা। ৯ই কার্ত্তিক ১৩১৯। সভাপতি খোষালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। বক্তা শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি; আলোচ্য বিষয় পক্ষাশৌচ। (১৫) বড়ময়রা মাহিষ্যসভা। হাওড়া জেলার আমতা থানার অন্তর্গত বড়ময়রা গ্রামে বিগত ১০ই কার্ত্তিক তারিখে একটী মাহিষ্য সভার অধিবেশন হইয়াছিল। খোষালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত যাদবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সভাপতি ও শ্রীযুক্ত সাধুচরণ ভট্টাচার্য্য সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। আলোচ্য—পক্ষাশৌচ ও শিক্ষাবিস্তার। (১৬) কমলাপুর মাহিষ্য সমিতি। জেলা হুগলি সিঙ্গুর থানার অন্তর্গত কমলাপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত বিহারীলাল মণ্ডলের বাটিতে বিগত ২৫শে কার্ত্তিক একটী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাপতি শ্রীযুক্ত কালিপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য, সহকারী সভাপতি শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ ধাড়া মণ্ডল। আলোচ্য—বৈশ্যাচার ও শিক্ষাবিস্তার।

হুগলী জেলা মাহিষ্য-সম্মিলনী।—গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ও মাহিষ্য জাতির মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও কৃষির উন্নতিকল্পে বিশেষ বিধান প্রবর্ত্তন জন্য হুগলী জেলার ৫০০ শত মাহিষ্য ও ২০০ শত ব্রাহ্মণ নির্ব্বাচিত সভ্য উপস্থিত হইয়া শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত বলরাম বাটী গ্রামে সম্পাদক শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ

চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের আহ্বানে একটী সম্মিলনী হইয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় ৬টী প্রয়োজনীয় প্রস্তাব উপস্থাপিত ও অনুমোদিত হইয়াছে। অনেক গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক যোগদান করিয়াছিলেন। অন্যান্য জেলায় এইরূপ সম্মিলনী হওয়া দরকার। কেবল সম্মিলনী হইলেই হইবে না প্রস্তাবানুযায়ী কার্য্য করা চাই।

গ্রামোফোন-মেসিন্ প্রস্তুত করিবার উদ্যম।—জেলা হুগলীর অন্তর্গত পোষ্টাফিস পারগোপালনগর, মধ্যহিজিলা গ্রাম নিবাসী শ্রীমান্ পাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী গ্রামোফোন্ মেসিন প্রস্তুতের চেষ্টা করিতেছেন, বহুদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন। আবশ্যকীয় যন্ত্রাদি ক্রয়ের ব্যয়সংকুলান করিতে অসমর্থবিধায় তিনি আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই। তিনি দরিদ্র গৌড়াদ্য-বৈদিক ব্রাহ্মণ। উপযুক্তরূপে সাহায্য করিলে তাঁহার প্রতিভার বিকাশ হয়।

বাৎসরিক অধিবেশন।

মাহিষ্য-ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন—আগামী ২৮শে ডিসেম্বর, শনিবার, ১৩ই পৌষ।

বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির বাৎসরিক সাধারণ অধিবেশন—আগামী ২৯শে ডিসেম্বর, রবিবার, ১৪ই পৌষ।

স্থান—৩৮নং পুলিশ-হাসপাতাল রোড, ইটালী, কলিকাতা।

এবারে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সমূহের আলোচনা করা হইবে। অতি প্রয়োজনীয় তিনটী গুরুতর বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। মাহিষ্যমাত্রেরই যোগদান একান্ত প্রার্থনীয়। মাহিষ্যমাত্রকেই অনুরোধ করা যাইতেছে যে, তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহাদের মহকুমার অন্তর্গত মাহিষ্যের মধ্যে কে কত টাকা করিয়া গবর্ণমেণ্টে খাজনা প্রদান করেন, তাহার একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়া শীঘ্র পাঠাইয়া দেন।

বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন,—৩০শে ডিসেম্বর, সোমবার, ১৫ই পৌষ। বিষয়—কার্য্যপ্রণালী নির্দ্ধারণ।

ভ্রম-সংশোধন।—এই সংখ্যা মাহিষ্য-সমাজের ১৯১ পৃষ্ঠায় ১৬।১৭ ছত্রে—"শাস্ত্রসঙ্গত, তাহা প্রমাণ করেন"—এই স্থলে—"শাস্ত্রসঙ্গত প্রমাণ করিতে বৃথা চেষ্টা করেন"—এইরূপ পাঠ হইবে।—রিপোর্টার।

দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর।

জেলা মেদিনীপুরের অন্তর্গত ষ্টেট্ মাজনামুঠার জমিদার কায়স্থ-কুলভূষণ দানবীর প্রাতস্মরণীয় ৺ রাজা যাদবরাম রায়চৌধুরী মহানুভব উক্ত ষ্টেটের দোর দুবনান পরগণার (গৌড়াদ্য-বৈদিক) ব্যাস ব্রাহ্মণকে যে দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর ভূমি দান করিয়া গিয়াছেন তাহারই নিরূপণ-পত্র। (দ্বারিবেড়ে নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত সতীশচন্দ্র মাইতি মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত ও প্রেরিত)।

গৃহীতার নাম ধাম	মিষ্টার বেলী সাহেবের সেটেলমেণ্ট অফিসারের অধীন রাবর্ট ফেণী সাহেবের নিকট ১৮৪৪ সালের গ্রাহকের নাম ধাম	নিষ্কর বাহালী জমির পরিমাণ	সকর নিষ্পী বাজাপ্তী জমির বিবরণ	একুন জমির পরিমাণ	বর্ত্তমান ভোগদখলকারের নাম
১। গঙ্গাধর শর্ম্মা সাং বাবুপুরা	জয়নারায়ণ পণ্ডা সাং বাবুপুর	৭/৩॥০	২৩॥০৸৵০	৩০॥৪।৵০	রজনীকান্ত পণ্ডা
২। সিদ্ধেশ্বর অধিকারী গোবিন্দরাম পণ্ডা সাং অনন্তপুর	শ্যামাচরণ অধিকার সাং অনন্তপুর	—	১৪•৸৪৸	১৪৫৸৪৸০	শ্রীমতীপ্রসন্নময়ী দেবী
৩। ঐ	ঐ	১৯৩৸৪।/০	—	১৯৩৸৪।/০	ঐ
৪। আন্দিরাম শর্ম্মা সাং শোভারামপুর	দেবীচরণ শর্ম্মা সাং শোভারামপুর	—	৩।৪৸/০	৩।৪৸/০	শ্রীবটুকদেব মিশ্র
৫। ত্রিলোচন সাঙ্খ্যকী সাং শোলাট্	বিদ্যাধর সাঙ্খ্যকী সাং শোলাট্	—	৮/০/০	৮/০/০	শ্রীস্বরূপচন্দ্র সাঙ্খ্যকী
৬। দুলাল সাঙ্খ্যকী নিতাই সাঙ্খ্যকী সাং শোলাট্	মঙ্গল সাঙ্খ্যকী সাং শোলাট্	—	২৮॥১।/০	২৮॥১।/০	ঐ
৭। রাম মিশ্রী মুরলী মিশ্রী সাং শোভারামপুর	বিক্রম মিশ্রী সাং শোভারামপুর	—	৭।৩৸৶০	৭।৩৸৶০	শ্রীমতী কাদম্বরী দেবী
৮। হারু শর্ম্মা বলরাম শর্ম্মা উদ্ধব শর্ম্মা সাং শোভারামপুর	গোলক শর্ম্মা কালীপ্রসাদ শর্ম্মা সাং শোভারামপুর	—	২৯৸৩/০	২৯৸৩/০	শ্রীভূতনাথ মিশ্র
৯। জগন্নাথ ভট্ট ও ঈশ্বরী ভট্ট	মধুসূদন ভট্ট সাং শোভারামপুর	—	২১/২॥/০	২১/২॥/০	ঐ
১০। ঐ	হৃদারাম ভট্ট সাং শোভারামপুর	৫৮॥৪৶০	—	৫৮॥৪৶০	ঐ
একুন	...	২৫২৸২	২৬৮/১৸৵০	২৭৸৩৸৵০	

☞ বিস্তারিত বিজ্ঞাপন বর্ত্তমান সনের শ্রাবণ মাসের "মাহিষ্য-সমাজ" পত্রিকার ৯৪ পৃষ্ঠায় দেখুন।

মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি

সমগ্র বঙ্গদেশে মাহিষ্য-সমাজে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছে। যদি আপনি মাহিষ্য জাতির যাবতীয় তত্ত্ব জানিতে চাহেন তবে উহা একবার পাঠ করুন।

এই পুস্তক যিনি পাঠ করিয়াছেন তিনি মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রকার কূটতর্কে নিরস্ত হইয়াছেন। প্রবল শত্রুগণ ইহার জটিল তর্কের উত্তর দিতে অসমর্থ হইয়াছেন।

মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি

মাহিষ্যজাতির সর্ব্ববিধ তত্ত্ব, মাহিষ্য ইতিহাস ও মাহিষ্য গৌরবকাহিনী প্রচারের একমাত্র পুস্তক। এরূপ উৎকৃষ্ট গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।

পাঠকমাত্রেই উক্ত গ্রন্থের সুন্দর শাস্ত্রীয় মীমাংসা ও বহুল বিষয়ের সুশৃঙ্খল সমাবেশ প্রভৃতি দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছেন।

শতাধিক অযাচিত প্রশংসা-পত্র পুস্তকের বিশুদ্ধতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

বঙ্গদেশের মাহিষ্যজাতির মুখপত্র "মাহিষ্য-সমাজ" বলেন :—

মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি। মাহিষাজাতির পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বিবরণ, উৎপত্তি, সামাজিক মর্য্যাদা ও অন্যান্য বহুবিধ নূতন জ্ঞাতব্য বিষয়ে পুস্তকখানির কলেবর পূর্ণ। শাস্ত্রবিধি কুলাচার অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ, গ্রন্থকার তাহা বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার হাঁড়িয়া পোঃ, বিরুলিয়া গ্রামবাসী আমাদের পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু, বিজ্ঞান-তত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত আশুতোষ জানা মহাশয় এই পুস্তকের প্রণেতা। মূল্য ৸০ আনা মাত্র। এই ধরণের জাতীয় পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ১৩১৯, জ্যৈষ্ঠসংখ্যা।

'মাহিষ্য-বান্ধব' বলেন,—

মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি। শ্রীযুক্ত আশুতোষ জানা প্রণীত। মেদিনীপুর বিরুলিয়া হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ৸০ আনা। বর্ত্তমান সময়ে এইরূপ গ্রন্থের যত অধিক প্রচার হয়, ততই ভাল। মাহিষ্য-বান্ধব, ভাদ্র, ১৩১৯ সাল।

মেদিনীপুর জেলার লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র 'মেদিনী-বান্ধব' কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি।—শ্রীযুক্ত আশুতোষ জানা প্রণীত। এই পুস্তকখানি মাহিষ্যজাতি সম্বন্ধে অবশ্যজ্ঞাতব্য বিবিধতত্ত্বে পরিপূর্ণ। ইহার 'মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি" নাম সার্থক হইয়াছে। ইহা পাঠে মেদিনীপুর জেলার অনেক পুরাতত্ত্বও অবগত হওয়া যায়। ইহাতে মেদিনীপুর জেলার কয়েকটি প্রাচীন রাজবংশের বিবরণ ও প্রমাণাদিসহ মেদিনীপুরের লুপ্ত শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী লিপিবদ্ধ হওয়ায় পুস্তকখানির গৌরব বর্দ্ধিত হইয়াছে। পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির নিমিত্ত তমলুক রাজবংশের ইতিহাস উদ্ধৃত হইল। মেদিনীবান্ধব, ১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩১৯।

এতাবৎ শতাধিক অযাচিত প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কেবলমাত্র কতিপয় পত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত হইল :—

৺কাশীধাম নিবাসী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ন্যায়-বেদান্ত পঞ্চানন মহাশয়ের চিঠি।—

আপনার প্রেরিত উপহার স্বরূপ একখানি "মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি" যথা সময়ে প্রাপ্ত হইয়াছি। গ্রন্থখানির বাহ্যিক চাকচিক্য দেখিয়া মনে হইল বুঝি ইহা কেবল আড়ম্বরের ঘটা; কিন্তু আমি পুস্তকখানি পাঠ করিতে আরম্ভ করিয়া শেষ না করিয়া ছাড়িতে পারি নাই। ভাষা, লেখার ভাব, বিষয় নির্ব্বাচন ও মীমাংসাদি অতি পরিপাটি হইয়াছে। জাতিতত্ত্বের আলোচনায় আপনি যথেষ্ট শ্রম স্বীকার করিয়াছেন। পুস্তকখানি বর্ত্তমান সময়ের সম্পূর্ণ উপযোগী একথা বলা বাহুল্য বলিয়া মনে করি। মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে এ প্রকার একখানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর পুস্তকের

ম্পূর্ণ অভাব ছিল, এতদিনে তাহা মোচন হইল। ইহা পাঠ করিলে মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে কান প্রকার ভ্রমাত্মিকা ধারণা থাকিতে পারে না। প্রত্যেক মাহিষ্যের উহা একবার পাঠ করা উচিত। গ্রন্থের তুলনায় মূল্যও বেশ সুলভ হইয়াছে। ইতি ২২শে তারিখ, ১৩১৯।

জনৈক অধ্যাপকের চিঠি।—

মহাশয়, আপনার কৃত "মাহিষ্য তত্ত্ব বারিধি" পাঠ করিয়া নিরতিশয় প্রীতিলাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি মাহিষ্য জাতির পক্ষে অতীব উপাদেয় ও আবশ্যকীয় হইয়াছে। প্রত্যেক মাহিষ্যের এই গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করা অতীব প্রয়োজনীয়। গ্রন্থখানির সংকলনে আপনি যেরূপ কঠিন পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন তজ্জন্য আপনাকে অগণ্য ধন্যবাদ দিতেছি। নিয়ত প্রার্থনা করি, যেন ভবাদৃশ মহাত্মগণ দীর্ঘ জীবন লাভ করতঃ সমাজের হিতসাধনে যত্নবান হন। ইতি ? শে আষাঢ়, ১৩১৯

স্বাঃ শ্রীকালাচাঁদ স্মৃতিরত্ন,
অধ্যাপক ভুপতিনগর চতুষ্পাঠী,
গ্রাম ভুপতিনগর, পোঃ মুগবেড়্যা, মেদিনীপুর।

মাহিষ্য-কুল-গৌরব-রবি ময়নাধিপতি রাজা শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ বাহুবলীন্দ্র বাহাদুর স্বহস্তে কি লিখিয়াছেন দেখুন,—

মহাশয়, আপনার প্রেরিত 'মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি" নামক স্বজাতি সম্বন্ধে বিস্তৃত প্রমাণাদি সম্বলিত একখানি পুস্তক প্রাপ্তে যারপর নাই আনন্দিত ও বাধিত হইলাম। পুস্তকখানির সংকলন যে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে সে বিষয়ের কোনও সন্দেহের কারণ নাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আপনি পুস্তকখানির প্রণয়নে যেরূপ উদ্যম ও অধ্যবসায় নিয়োগ করিয়াছেন, বিশেষতঃ নিজ শক্তি ও সামর্থ্যের অপব্যয়ে স্বজাতি-প্রীতির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে আমাদের ভবিষ্যৎ জাতীয় ইতিহাসে আপনাদের নাম যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিবে তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। অধিকন্তু আমাদের বর্ত্তমান সমাজের অনেকগুলি হস্তীমূর্খেরও যে ইহা পাঠে জ্ঞানচক্ষু উন্মিলিত হইবে সে পক্ষে কোনও সন্দেহ নাই।

উপসংহারে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা তাঁহার কৃপায় আপনার এতদূর অধ্যবসায় ও শ্রম সফল হউক এবং আপনাদের এইরূপ ঐকান্তিক চেষ্টা ও পরিশ্রমের গুণে স্বজাতির মুখোজ্জল হইতে থাকুক। ইতি ১৬।৮।১২

স্বাঃ—শ্রীরাজা জ্ঞানানন্দ বাহুবলীন্দ্র,
ময়নাগড় রাজবাটী, মেদিনীপুর।

জনৈক মাহিষ্যনেতার চিঠি,—

মহাশয়, আপনার প্রেরিত "মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি" একখানি পাইয়া নিরতিশয় আনন্দিত হইয়াছি। কি বলিয়া যে আপনাকে ধন্যবাদ দিব তাহা ভাষায় খুঁজিয়া পাইতেছি না। গ্রন্থ

খানি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও মাহিষ্যদের অতীব আদরের সামগ্রী হইয়াছে। উক্ত পুস্তকখানি যাহাতে বহুল প্রচার হয় তদ্বিষয়ে মাহিষ্য মহোদয়গণের সচেষ্ট হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। ইতি ১৩১: ২২শে শ্রাবণ।

স্বাঃ—শ্রীদুর্গাপ্রসাদ পড়িয়া, একতারপুর মদন মোহন বাড়,
পোঃ বাসুদেবপুর, জেলা মেদিনীপুর

মহাশয়, আপনার "মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি" পাইয়া যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছি। উক্ত পুস্তক সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর ও নিভুর্ল এবং ইহাতে কিছুমাত্র ভ্রম নাই। ইহার কণামাত্র দোষ বাহির করা সামান্য পণ্ডিতের কার্য্য নহে। এরূপ পণ্ডিত অতি বিরল যে, ইহার খণ্ডন বাহির করিতে সাহসী হইবেক। ইতি ১৬।৬।১২।

স্বাঃ—শ্রীহরেকৃষ্ণ মণ্ডল, সাং জিয়ঙ্ক, পোঃ সহরার হাট, ২৪ পরগণা

মিজিতপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বলরাম দাস লিখিয়াছেন,—

মহাশয়, চাঁচল সবরেজেষ্টারী আফিসের হেড ক্লার্ক বাবু নীলমণি দাস আপনার নিকট হইতে যে "মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি" ক্রয় করিয়াছিলেন আমি তাহার আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। এ খানি মাহিষ্য জাতির পক্ষে অত্যন্ত আবশ্যকীয়। আমি বিশেষ রূপে দেখিলাম যে, মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে আপনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করিয়াছেন এবং মাহিষ্য জাতির মহত্ব প্রকাশের জন্য আদ্যোপান্ত ওজস্বিনী ভাষায় লেখনী পরিচালনা করিয়াছেন। আমরা বহুদিন যাবৎ আপনা কৃত পুস্তকের ন্যায় সর্ব্ব অকার বিষয় সম্বলিত পুস্তক প্রাপ্ত হই নাই। ইহা দ্বারা মাহিষ্য জাতির উৎকর্ষতা সর্ব্বত্র বিদিত হইবে। এতদঞ্চলের লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি বাবু রামতনু দাস মহাশয় "মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি" পাঠ করিয়া দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছেন যে, মাহিষ্য জাতির উৎকৃষ্টত্ব প্রতিপন্ন মূলক কোনও পুস্তক নাই বলিয়া অন্যান্য জাতির যাঁহারা বলিয়া থাকেন এই গ্রন্থ দ্বারা তাঁহাদের সে সন্দেহ সম্পূর্ণ ভঞ্জন হইবে। আমি বিস্ময়ের সহিত আগ্রহপূর্ব্বক পুস্তকখানি পাঠ করিয়াছি এবং ইহা সমাজের অনিষ্টকারিগণের হৃদয়ে নিঃসন্দেহ রূপে চৈতন্য সঞ্চার করিবে আমি নিরতিশয় আনন্দের সহিত আশা করি যে, "মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি" মাহিষ্যদিগকে বর্ত্তমান উন্নতির পথে চালিত করিবার পক্ষে অতীব মূল্যবান পুস্তক। প্রত্যেক মাহিষ্যকে এই পুস্তক এক এক খানি রাখিবার জন্য অনুরোধ করি। ইহার মূল্যও গুণানুসারে খুব সুলভ। ইতি ২১।১০।২২।

স্বাঃ—শ্রীবলরাম দাস, সাং মিজতপুর, পোঃ মৈডাঙ্গা, জেলা মালদহ

মহাশয়ের নিকট হইতে ইতিপূর্ব্বে ২খানি মাহিষ্য-তত্ত্ব-বারিধি ভিঃ পিতে আনাইয়াছিলাম উক্ত গ্রন্থ পাঠে আমাদের সামান্য বিদ্যা বুদ্ধিতে বুঝিলাম যে, আমাদের জাতিসম্বন্ধে একখানি পরম উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচিত হইয়াছে তাহার আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। ইহা চিরদিন রক্ষার ব্যবস্থা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। অগ্নিদাহে আমাদেরও নানাপ্রকার পুস্তক নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এজন্য

বলিতেছি এই সাহিত্য-তত্ত্ব-বারিধি নামক গ্রন্থখানি **আমার পাতে** লিখাইয়া আমাদের স্বজাতির মধ্যে জেলায় জেলায় নূ্যনকল্পে একখানি করিয়া রাখিতে পারিলে মহৎ হিতের কারণ হইতে পারে। গ্রন্থখানি যাহাতে বহুল প্রচার হয় তাহার চেষ্টা করা প্রত্যেক সাহিত্যের কর্ত্তব্য। আরও ৩ খানি পুস্তক পত্রপাঠ পাঠাইবেন। ইতি ১৩১৯।১৫ কার্ত্তিক।

স্বাঃ শ্রীশিবচন্দ্র সহায়, গ্রাম তুলসীরামপুর, পোঃ পাঞ্জর ভাঙ্গা, রাজসাহী।

মাহিষ্য-সমাজ।

২য় ভাগ, ৯ম সংখ্যা—পৌষ, ১৩১৯।

বঙ্গে নীল ও জাতি-বিদ্বেষ।

(মতামতের জন্য লেখকই দায়ী)

জাতিবিদ্বেষ বাঙ্গালীর একটী প্রধান কলঙ্ক। প্রত্যেক জাতিই আপনাকে বড় করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। অধিকাংশ গ্রন্থকারের পুস্তকেই দেখা যায় যে, তাঁহারা স্বজাতিকে বড় করিয়া অন্য জাতিকে সমাজের চক্ষে হীন করিতে উৎসুক। ঐ সকল গ্রন্থকার যতই প্রতিভা-সম্পন্ন হউন না কেন, মনুষ্য সমাজে তাঁহাদের মতামত সর্ব্ব সময়ে আদর্শরূপে গৃহীত হয় না। নিজ জাতিকে গৌরবান্বিত করিবার চেষ্টা দোষাবহ নহে; কিন্তু ন্যায় ও সত্যের মর্য্যাদা লঙ্ঘন করিয়া অপর জাতিকে সমাজের চক্ষে হীন করার চেষ্টা কোনরূপেই সঙ্গত নহে। হিন্দু সমাজে সকল জাতিরই প্রয়োজন আছে। ব্রাহ্মণ হইতে নমঃশূদ্র পর্য্যন্ত প্রত্যেক জাতিই বিশাল হিন্দু সমাজের এক একটী অঙ্গ স্বরূপ। এরূপ অবস্থায় কোন জাতিকে সমাজের নিকট হীন করিতে চেষ্টা করা নিজ চরিত্রের দুর্ব্বলতা ও ঈর্ষাপরায়ণতা প্রকাশ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কতকগুলি লেখক আছেন যাঁহারা নিজের সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বীয় মতামত প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই সমস্ত লেখক যদি জাতিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় গুরুতর বিষয়গুলি বিশেষরূপে আলোচনা করিয়া পরে তাঁহাদের স্ব স্ব মত প্রকাশ করেন, তাহা হইলে সমাজের ও দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। ইহা না করিলে দুইটী কুফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যদি কোন প্রতিভাসম্পন্ন লেখক কোন জাতিকে অযথা নিন্দাবাদ করেন, তাহা হইলে ক্রমশঃ তাঁহার উপর ঐ জাতীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের অশ্রদ্ধার ভাব জন্মে

এবং উহা ঐ জাতীয় সাধারণ লোকের মধ্যেও ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। উক্ত প্রতিভাসম্পন্ন লেখক অন্যান্য বিষয়ে নির্দ্দোষ হইলেও ঐ জাতীয়গণ তাঁহাকে ঘৃণার চক্ষেই দেখিয়া থাকেন। ইহাই মানুষের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম। ইহার ফলে সমগ্র হিন্দু সমাজে পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাব জাগিয়া উঠে। দ্বিতীয়তঃ, কোন জাতি সম্বন্ধে কুৎসাপূর্ণ প্রবন্ধগুলি জাতীয় জীবন (nationality) সংগঠনের প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়।

আর এক শ্রেণীর লেখক আছেন যাঁহারা কেবল ঈর্ষাপ্রণোদিত হইয়া অন্য জাতিকে নিম্ন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে আমরা বেকন সাহেবের ঈর্ষাসম্বন্ধীয় উক্তিগুলি পাঠ ও ধীরভাবে আলোচনা করিতে অনুরোধ করি। এই সকল লেখক আমাদের কৃপার পাত্র। সুতরাং তাঁহাদিগকে আমাদের আর অধিক কিছু বলিবার নাই।

পূজনীয় ৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার 'বিবিধ প্রবন্ধে' হালিক কৈবর্ত্ত সম্বন্ধে কয়েকটী ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন। আমরা এরূপ মনে করিতে পারি না যে, বঙ্কিম বাবুর মত প্রতিভাসম্পন্ন ও দেশহিতৈষী ব্যক্তি কোনও বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। বঙ্কিম বাবুর প্রতি বর্ত্তমান প্রবন্ধ লেখকের যথেষ্ট ভক্তি আছে। বঙ্কিম বাবুর প্রবন্ধ পাঠে জানা যায় যে, তিনি ইহার অধিকাংশই সেন্সাস্ রিপোর্ট্ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন। সেন্সাস্ রিপোর্টে সময়ে সময়ে যে ভ্রম প্রমাদ থাকে তাহা সকলেই জানেন। কারণ আমাদের সেন্সাস্ রিপোর্ট লিখিবার ভার যাঁহাদের উপর অর্পিত হয়, তাঁহারা যে সকলেই জাতিবিদ্বেষশূন্য একথা বলা যায় না। কাজেই সেন্সাসে জাতি-তত্ত্বের যে সকল রিপোর্ট সংগৃহীত হয়, তাহাও সকল স্থলে নির্ভুল হয় না। গৌড়রাজমালার ভূমিকায় শ্রীযুক্ত অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় মহাশয় যথার্থই লিখিয়াছেন—"এখনও আমাদিগের ব্যক্তিগত, জাতিগত বা সম্প্রদায়গত অনুরাগ-বিরাগ আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই অনেক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের অনুকূল বা প্রতিকূল করিয়া রাখিয়াছে।"

স্বর্গীয় দীনবন্ধু বাবু 'নীলদর্পণে' এই জাতির প্রতি কটাক্ষপাত করিয়াছেন। তাঁহার দেখাদেখি কোন কোন থিয়েটারের ম্যানেজার (১) ও তৃতীয়শ্রেণীর

---

(১) ষ্টার থিয়েটারে যিনি 'চন্দ্রশেখর' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়াছেন, তিনি বঙ্কিম বাবুর উপরও এক কলম চালাইয়া ও জাতি-বিদ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া [illegible]

গ্রন্থকারও তাঁহাদের পুস্তকে এই জাতি সম্বন্ধে অনেক গ্লানিপূর্ণ কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের উদ্দেশ্য এই জাতিবিদ্বেষপ্রিয় দেশে তাঁহাদের পুস্তকগুলির কাট্‌তি বেশী করা। একজাতি অপর জাতির দোষ উদ্‌ঘাটন করিতে পারিলেই আহ্লাদে আটখানা হইয়া থাকেন। হায়, দেশের শিক্ষা! হে স্বদেশবাসী ভ্রাতৃগণ! এই জাতিবিদ্বেষের পরিণাম ফল কি একবারও ভাবিয়াছেন?

নীলকুঠীতে অনেক অত্যাচার সংঘটিত হইত। কিন্তু হালিক কৈবর্ত্তগণই যে সেই অত্যাচারের একমাত্র নায়ক ছিলেন, এরূপ কোনও প্রমাণ কোথায়ও পাওয়া যায় না। দীনবন্ধু বাবু নিজেই বলিয়াছেন যে কায়স্থ সম্প্রদায়ও নীলকুঠীর কার্য্য করিতেন। অথচ স্বজাতির প্রশংসা করিয়া সমস্ত হালিক কৈবর্ত্তকেই নিষ্ঠুরতার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তিরূপে চিত্রিত করিয়াছেন। ইহা কি কম আক্ষেপের বিষয়! যে সকল পুস্তক জাতীয় সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইতে পারে, তাহা জাতিবিদ্বেষে পরিপূর্ণ!! দুই একজন বাঙ্গালীর চরিত্র দেখিয়া মেকলে (Macaulay) সাহেব সমস্ত বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী বলিয়াছেন। ইহা যেরূপ তাঁহার একদেশদর্শিতার পরিচায়ক, দুই একজন নিষ্ঠুরপ্রকৃতি লোকের আচরণে বঙ্গদেশের বিশাল মাহিষ্যসমাজকে অযথা আক্রমণ করাও তদ্রূপ অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতার কার্য্য ভিন্ন আর কিছুই নহে।

এই প্রবন্ধে আমরা দেখাইব, হালিক কৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যবংশীয় দুইজন উদারস্বভাব ব্যক্তির উদ্যোগেই বঙ্গদেশ হইতে নীলের চাষ উঠিয়া গিয়াছিল। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে অমৃতবাজার পত্রিকায় স্বদেশবৎসল, ধর্ম্মপ্রাণ, সুলেখক ৺শিশিরকুমার ঘোষ মহাশয়ের 'A Story of Patriotism in Bengal' নামক যে প্রবন্ধটী বাহির হইয়াছিল এবং এক্ষণে যাহা 'Indian Sketches' নামক পুস্তকে স্থান পাইয়াছে, তাহা হইতে দেখান যাইবে যে মাহিষ্যগণই এদেশ হইতে নীলের চাষ উঠাইয়া দিবার প্রধান উদ্যোগী। ভারতহিতৈষী মহাত্মা কেন্ (Caine) সাহেব এই পুস্তকের মুখবন্ধ (Preface)

একটী নূতন চরিত্রের সন্নিবেশ করিয়াছেন। রামহরি বিশ্বাস একস্থানে বলিতেছে 'কৈবর্ত্তের আবার কুলীনত্ব' ইত্যাদি। এইজন্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়কে লেখা হইয়াছিল; কিন্তু তিনি উহার উত্তর দেওয়া বোধ হয়, ভদ্রোচিত বিবেচনা করেন নাই।

লিখিয়াছেন। শিশির বাবুর ইংরাজী রচনার পারিপাট্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্যক্ষেত্রে ও ধর্ম্মজগতে শিশির বাবু সকলেরই সুপরিচিত। সুতরাং এস্থলে ঐ পুস্তক সম্বন্ধে অধিক না বলিয়া সংক্ষেপে আমরা এই প্রবন্ধের উপসংহার করিতে চেষ্টা করিব। স্বতন্ত্র প্রবন্ধে ঐ পুস্তকের সবিশেষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।

নদীয়া জেলার নীলের অত্যাচার নিবারণের জন্য যে দুই মহাত্মা অশেষ নির্য্যাতন ভোগ করিয়াছিলেন তাঁহাদের নাম ৺দিগম্বর বিশ্বাস ও ৺বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস। প্রথম ব্যক্তি নদীয়া জেলার অন্তর্গত পোড়াগাছা নিবাসী এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি চৌগাছা নিবাসী। উভয়েই জাতিতে মাহিষ্য ছিলেন এবং নীলকুঠীর কার্য্য করিতেন। শিশির বাবু ইহাঁদের সম্বন্ধে বলিয়াছেন—"They were both men of some property,........they were not acquainted with the English language, but they were men of indomitable perseverence and courage. They were, besides men of heart and had a large share of that intelligence which generally characterises a Bengali gentleman."

নীলকর সাহেবেরা এদেশের প্রজাদিগের উপর প্রথমতঃ বেশী অত্যাচার করেন নাই। অনেক সহৃদয় নীলকর সাহেব সময়ে সময়ে অপর নীলকরের অত্যাচার নিবারণার্থ প্রজাদিগের পক্ষও অবলম্বন করিতেন। কিন্তু নীলের চাষে তাঁহারা যতই লাভবান হইতে লাগিলেন, অত্যাচারের মাত্রা ততই বাড়িয়া উঠিল। যে সকল প্রজা নীল বুনিতে অস্বীকার করিত, নীলকরগণ তাহাদের বাড়ী ঘর এমন কি সমস্ত গ্রাম পর্য্যন্ত ভস্মীভূত করিয়া তাহাদের অনেককে নীলকুঠীর গুদামে আবদ্ধ করিয়া রাখিত এবং নানাপ্রকার অবর্ণনীয় ক্লেশ দিত। এমন কি, সেই স্থানেই অনেক অসহায় নিরীহ কৃষকজীবনের শেষ অঙ্কও অভিনীত হইয়াছিল। এইরূপে প্রজাগণ নানাবিধ অসহনীয় অত্যাচারে উৎপীড়িত হইত (২)। প্রথম প্রথম যে সকল নীলকর সাহেব এদেশে আসিতেন, তাঁহারা এদেশবাসিগণের আর্থিক ও মানসিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি

(২) * * * that raiyats obnoxious to the factory were frequently kidnapped and that other acts of great violence were committed with impunity in open day * * * (Vide Buckland's Bengal under Lieutenant-Governors, page 185)

রাখিয়া কার্য্য করিতেন। কিন্তু পরে কতকগুলি নব্য উদ্ধতপ্রকৃতি নীলকর সাহেব এদেশে আসাতে অত্যাচারের মাত্রা ক্রমশঃ বাড়িয়া উঠিল (৩)। উপরি উক্ত বিশ্বাস মহাশয়দ্বয় ঐ সমস্ত অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া এবং নীল-কুঠীর কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলে তাঁহাদিগকেও ঐ অমানুষিক অত্যাচার ও উৎপীড়নের সহায়তা করিতে হইবে ভাবিয়া কুঠীর-কার্য্য পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রজাগণের প্রতি অযথা অত্যাচার নিবারণার্থ উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন।

প্রথমে তাঁহারা স্বগ্রামে নীলবুনানি বন্ধ করিলেন। ফলে ইঁহাদের গোলা-বাড়ীসমূহ লুণ্ঠিত হইল। ইঁহাদের নিকট যাহারা ধান্যাদি ঋণস্বরূপ গ্রহণ করিত, সাহেবেরা তাহাদিগকে ঐ সকল ঋণ পরিশোধ করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। প্রজারাও সুযোগ বুঝিয়া বিশ্বাসমহাশয়দ্বয়কে ধান্যাদি দেওয়া বন্ধ করিল। বিশ্বাস মহাশয়েরা গ্রামে গ্রামে লোক পাঠাইলেন এবং বলিয়া দিলেন কেহ যেন নীলকর সাহেবদিগের অত্যাচারে ভীত হইয়া নীলবুনানি না করে। কিন্তু প্রথমে কেহই তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিল না। কেবলমাত্র নদীয়া জেলার অন্তর্গত হাঁসখালির নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুর নামক গ্রামের প্রজাগণ তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইল।

নীলকরগণ একদিন প্রচার করিলেন যে, তাঁহারা চৌগাছা আক্রমণ করি-বেন। বিশ্বাস মহাশয়দ্বয় এই সময় হইতে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং বরিশাল হইতে লাঠিয়াল আনয়ন করিলেন। এ দেশীয় অনেক জমীদারও লোকজন দ্বারা তাঁহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। কিন্তু নীলকর সাহেব-দিগের সড়কীওয়ালারা সেদিন চৌগাছা আক্রমণ না করিয়া গোবিন্দপুর আক্র-মণ করে। গ্রামবাসীরাও সাধ্যমত তাহাদিগকে বাধা দিয়াছিল। তাহাতে উভয়দলের সড়কীওয়ালাদের মধ্যে বিষম সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এবং প্রথম সংঘর্ষে

---

(৩) এই সকল নব্য নীলকর সাহেবের অত্যাচার সম্বন্ধে ভারতের তদানীন্তন করুণহৃদয় রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিং এর পর্য্যন্ত আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল।

"In the autumn of 1860 things looked critical. * * * 'I assure you,' wrote Lord Canning, 'that for about a week it caused me more anxiety than I have had since the days of Delhi and from that day I felt that a shot fired in anger or fear by one foolish planter might put every factory in Lower Bengal in flames."

(Vide J. P. Grant's minute of 17th September, 1860).

গ্রামবাসীরাই পরাস্ত হয়, নীলকরগণ তখন অগ্নিদ্বারা গ্রামখানি ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। এদিকে বিশ্বাসমহাশয়দের অবস্থাও শোচনীয় হইয়া উঠিল। ইহাঁরা স্ব স্ব স্ত্রী পুত্রাদি লইয়া বিব্রত হইয়া পড়িলেন ; এবং এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে ইহাদিগকে স্থানান্তরিত করিতে লাগিলেন। প্রবল প্রতাপান্বিত নীলকর সাহেবদের ভয়ে অনেকে তাঁহাদিগকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হইল (৪)।

অবশেষে নদীয়া জেলার অন্তর্গত দারিয়াপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ বিশ্বাস মহাশয়দিগের বাটীতে, মাধবপুরের জমীদার শ্রীযুক্ত বক্সী মহাশয়দিগের বাটীতে ও কলিঙ্গা প্রভৃতি স্থানে তাঁহারা এবং ঐ গ্রামস্থ অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তি রাত্রিযোগে স্ত্রী পুত্রাদি রাখিয়া আইসেন। নদীয়া জেলার সুবিখ্যাত জমীদার শ্রীযুক্ত নফরচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয়ের পিতামহ স্বর্গীয় পরাণচন্দ্র পাল চৌধুরী মহাশয় ইঁহাদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। স্ত্রীপুত্রাদি স্থানান্তরে রাখিয়া ইঁহারা পূর্ব্বাপেক্ষা একটু নিশ্চিন্ত হইলেন এবং নূতন উদ্যমে দরিদ্র কৃষককুলের প্রতি নীলকরগণের অযথা অত্যাচার নিবারণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইঁহারা নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত করিলেন এবং বলপূর্ব্বক নীলবুনানি বন্ধ করিবার জন্য চতুর্দ্দিকে লোক পাঠাইতে লাগিলেন। নীলকরদিগের বিরুদ্ধে যে সমস্ত মোকদ্দমা উপস্থিত হইল, তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। যে প্রজাদিগের উপকারের নিমিত্ত ইঁহারা প্রাণপণ চেষ্টা ও অর্থব্যয় করিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতেছিলেন, তাহারাই ইঁহাদিগের পক্ষ পরিত্যাগ করিল। প্রজারা তাঁহাদিগকে বলিল, "সাহেবদিগের নিকট দাদন লওয়ার জন্য যে ঋণ হইয়াছে, তাহা যদি পরিশোধ করিয়া দিতে পারেন, তাহা হইলে আমরা আপনাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে পারি। বিশ্বাস মহাশয়েরা তাহাতেই স্বীকৃত হইয়া ঐ সকল প্রজার ঋণ নিজেরাই পরিশোধ করিয়া দিলেন।

এই সময়ে R. L. Tottenham নামক জনৈক সহৃদয় ইংরাজ নদীয়া জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়া আগমন করেন। পরে ইনি কলিকাতা হাইকোর্টের জজ হইয়াছিলেন। ইহাঁর ন্যায়পরায়ণতায় অনেক স্থলে নীলকরগণ প্রজাদিগের সহিত মোকদ্দমায় দোষী সাব্যস্ত হইলেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও নানাস্থানে প্রজাদিগের সহিত নীলকরগণের সংঘর্ষ চলিতে লাগিল (৫)।

---

(৪) Vide 'Indian Sketches' by late Babu Sishir Kumar Ghose.

(৫) "Nadia District was the principal scene of the Indigo riots of 1860 which occasioned so much excitement throughout Bengal proper." Vide Imperial Gazetteer, XVIII. p. 273.

তখন প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া বিশ্বাস মহাশয়দের সাহায্য ও উপদেশে নীলকরগণের অত্যাচার নিবারণ করিতে অনেকাংশে সমর্থ হইল। নীলকর ও বিশ্বাস মহাশয়দিগের সংঘর্ষ নিবারণ করিতে সৈন্যের প্রয়োজন হইয়াছিল। নদীয়ার আদর্শে সমস্ত বঙ্গের প্রজাগণ নীলবুনানি বন্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইল। এই সময়ে সহৃদয় বঙ্গেশ্বর পিটারগ্রাণ্ট এদেশে আগমন করেন। বিশ্বাস মহাশয়দের যোগে সমস্ত নদীয়ার প্রজাগণ নীলকরদিগের অত্যাচার সবিশেষ বর্ণনা করিয়া বঙ্গেশ্বরের নিকট এক দরখাস্ত প্রেরণ করেন। তিনি এই বিষয়ের সবিশেষ তদন্ত করিবার জন্য একটী কমিশন নিযুক্ত করেন। কমিশনারগণ জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি প্রধান প্রধান রাজপুরুষ, মিশনরী সাহেব, জমীদার, নীলকর ও রাইয়ত প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর লোকের সাক্ষ্যগ্রহণ এবং নীল সম্বন্ধীয় বিবিধ কাগজপত্র দর্শন করণান্তর বর্ত্তমান নীল কার্য্যপ্রণালীর বহুবিধ দোষকীর্ত্তন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিলেন। ইহাতে নীলকর সাহেবেরা পূর্ব্বমত বলপ্রয়োগে অসমর্থ হইয়া বহুতর চুক্তিভঙ্গের মোকদ্দমা উপস্থিত করিতে লাগিলেন। এই সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টকে অনেক ডেপুটী কালেক্টার নিযুক্ত করিতে হইল। যদিও এইরূপ মোকদ্দমায় অনেক রাইয়তের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, তথাপি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সমস্ত রাইয়ত

ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় বাঙ্গালার মধ্যে নদীয়া জেলাই নীলের অত্যাচার নিবারণে অগ্রণী হইয়াছিল। শিশির বাবুর "Indian Sketches" পড়িলেই জানা যায় যে পূর্ব্বোক্ত বিশ্বাসমহাশয়বর্গই ইহার প্রধান নেতা ছিলেন। ইঁহাদের organisation সম্বন্ধে শিশির বাবু লিখিয়াছেন—

"It is yet a mystery to them as to how a combination of the apathetic Bengali rayots, a combination in which about five millions of men took part was brought about so secretly and so suddenly without the authorities knowing anything about it."—"Indian Sketches," by late S. K. Ghose.

"The endeavours made by the planters to compel them (the rayots) to do so led to serious rioting which was not suppressed until the troops were called out."—Imperial Gazetteer, XVIII.

"Reports that the raiyots would prevent the October sowings led government to strengthen military police in the indigo districts, to send 2 gunboats to the rivers of Nadia and Jessore and native infantry to these two stations."—Buckland's Bengal under L.G.'S.

"অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক" নীলবুনানি আর কোনও মতেই করিব না—এই দৃঢ় সঙ্কল্প করিল। অল্পকাল মধ্যেই নীলকরগণের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তমিত হইল। অনেকের কুঠী ও ভূসম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গেল। (৬)

বিশ্বাস মহাশয়েরা হিসাব করিয়া দেখিলেন যে, এই সমস্ত অত্যাচার নিবারণার্থ তাঁহাদের ১৭০০০৲ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে। কিন্তু ঐ অর্থ তাঁহাদের স্থায় মধ্যবিত্ত লোকের পক্ষে অধিক হইলেও যে মহৎ কার্য্য তাঁহারা সম্পন্ন করিলেন, তাহার তুলনায় উহা যৎসামান্ত বলিতে হইবে।

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতে কিছুই চিরস্থায়ী থাকে না। বহুপূর্ব্বে যাহা ছিল, এখন তাহা নাই; আবার, এখন আমরা যাহা দেখিতেছি, কালক্রমে তাহার আমূল পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইবে। উক্ত দুই মহাত্মাও ইহজীবনের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া কালপ্রভাবে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহারা প্রাণপণ পরিশ্রম, অজস্র অর্থব্যয় ও নানাবিধ নির্য্যাতন ভোগ করিয়া স্বদেশ-বাসীর যে মহদুপকার করিয়া গিয়াছেন, তাহা জনসাধারণের বিশেষতঃ নদীয়া-বাসিদের স্মৃতিপট হইতে এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। অন্য দেশে হইলে তাঁহারা এক এক জন হ্যাম্প্‌ডেন্‌' (Hampden) বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন। কিন্তু আমাদের এই হতভাগ্য দেশে ও সমাজে সে আশা কোথায় ?

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বিশ্বাস,
দারিয়াপুর, নদীয়া।

অবনতির ইতিহাস (৪)।

৩। ব্যবসায় ও বাণিজ্যের কথা।

জল ও স্থলপথ ভেদে বাণিজ্য দুই প্রকার। ইহাদের প্রত্যেকটীকেই আবার দুই দুইটী শাখায় বিভক্ত করা যায়। যথা, কারবার ও দোকানদারী। অর্থবান্ ব্যক্তি বহু টাকা মূলধন লইয়া প্রচুর পরিমাণে বস্তুজাত একস্থান হইতে স্থানান্তরে আনিয়া যে বিক্রয়াদি করেন অথবা এক স্থানেই প্রভূত দ্রব্য সংগ্রহ

---

(৬) ক্ষিতীশ-বংশাবলী-চরিতম্।

"A fatal blow had been dealt to indigo cultivation in the district, from which it never altogether recovered."—Imperial Gazetteer, XVIII.

বা উৎপন্ন করাইয়া ব্যবসায় করেন, তাহাকেই আমরা কারবার বলিতে ইচ্ছুক। আর অল্প মূলধন লইয়া ঘরে বসিয়া অল্পাধিক পরিমাণে ক্রয় বিক্রয় করাকে দোকানদারী বলিব। যাহারা বৃহৎ কারবার করেন তাহারাই এদেশে সওদাগর নামে পরিচিত। ঐ শ্রেণীর ব্যবসায়ীরাই ধনী ও সম্পত্তিশালী হইয়া থাকেন। দোকানদারী ব্যবসায়ে অর্থবান্ হওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহা প্রথম শ্রেণীর ন্যায় নহে।

কৃষি ও বাণিজ্য মাহিষ্যের শাস্ত্র-সঙ্গত বৃত্তি সন্দেহ নাই। মাহিষ্যগণ যুদ্ধবিদ্যায় রত থাকিলেও তাহাদের মধ্যে এই দুইটী কার্য্যেও বহু ব্যক্তি নিযুক্ত ছিলেন। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী' একথা সেকালের মাহিষ্যগণ বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। প্রাচীনকালে সিংহল, যাবা, সুমাত্রাদির সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের কথা আমরা এখানে আলোচনা করিব না। সেই অতীতযুগে মাহিষ্য বণিকগণ সাগর তুচ্ছ করিয়া অর্ণবপোতারোহণে দেশ বিদেশ হইতে বাণিজ্যলব্ধ ধনরাশি আনয়ন করিতেন, একথা বিচক্ষণ নিরপেক্ষ ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমরা সম্প্রতি যে যুগের কথা বলিয়া আসিতেছি তাহারই আলোচনা করিব। সেদিনে এদেশে গন্ধবণিক, তন্তুবায়, কুম্ভকার, তৈলী প্রভৃতি কতিপয় জাতীয় লোকেই সাধারণ ব্যবসায় বাণিজ্য করিত। ঐ সকল জাতির প্রত্যেকেরই একটী শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় থাকাতে হিন্দুরাজা বা জমিদারগণ তাহাদিগকে জাতীয় ব্যবসায় অবলম্বন করিতে বাধ্য করিতেন। নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসায়ে যিনি যতদূর পারেন উন্নতি করিতে পারিতেন। তবে ইতিহাসে দেখা যায়, ঐ সকল জাতীয় দুই চারি জন ধনশালী ব্যক্তি শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় ছাড়িয়া অপর ব্যবসায়ও করিতে পাইতেন। এই দিনে পথঘাট নিরাপদ না থাকায় এবং শান্তিরক্ষার সুবন্দোবস্তের অভাবে সওদাগর শ্রেণীর বিশেষ অসুবিধা ছিল। দ্রব্যাদি একস্থান হইতে অন্যস্থানে চালান দেওয়া বড়ই বিপজ্জনক ও ব্যয়সাধ্য হইত। ইহার ফলে প্রায় গ্রামে এবং প্রত্যেক নগরেই সকল রকমের ব্যবসায়িগণ বসতি করিতেন। তাহারা ঐ স্থানে দ্রব্যাদি উৎপন্ন করিয়া নিজ গ্রাম বা নগরে কিম্বা নিকটবর্ত্তী কোনও স্থানে বিক্রয় করিতেন। কদাচিৎ ভিন্ন দেশ হইতে দ্রব্যাদির চালান আসিত। বড় বড় নগরে সওদাগরগণ অধিকমূল্যের আশায় নানাস্থান হইতে বহুব্যয় করিয়াও দ্রব্যাদি আমদানি রপ্তানি করিতেন।

এইদিনে মাহিষ্যবণিকগণের বিশেষ সুবিধা ছিল। পাঠকগণ অবশ্য

শীতবস্ত্র-বিক্রয়ী কাবুলী সওদাগরদিগকে দেখিয়া থাকিবেন। উহারা দলবদ্ধ হইয়া দেশ হইতে বহির্গত হয় এবং এদেশে আসিয়া পৃষ্ঠে দ্রব্যসম্ভার ও হস্তে দীর্ঘ যষ্টি লইয়া গ্রামে গ্রামে বাণিজ্য করিয়া থাকে। তাহাদের বিশাল দেহ ও দীর্ঘযষ্টি দর্শন করিয়া ক্রেতৃগণ সভয়ে দ্রব্যাদির যথোচিত মূল্য প্রদান করে। চোর দস্যুগণও ভয়ে উহাদের সম্মুখীন হইতে পারে না। গ্রামবাসিগণ অনেক সময়ে ইহাদের দ্বারা উত্যক্ত হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু সে কথা ছাড়িয়া পাঠক একবার ইহাদের বাণিজ্য প্রণালীটী চিন্তা করিয়া দেখুন। এ প্রথা নূতন নহে। মুসলমানী আমল হইতে এরূপ বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখনকার বাণিজ্য এরূপই ছিল। পথঘাট সুরক্ষিত বা সুনির্ম্মিত না থাকাতে এবং রেল জাহাজের ন্যায় গমনাগমনের কোনও নিরাপদ উপায় না থাকাতে বাণিজ্য কার্য্যও কতকটা যুদ্ধবিদ্যার ন্যায় ছিল। নিরীহ তন্তুবায়, বণিক্, তৈলী প্রভৃতি জাতির পক্ষে চালান লইয়া যাতায়াত অসম্ভব ছিল। রাজার বিশেষ সাহায্য না পাইলে তাহারা উহাতে অগ্রসর হইত না। দোকানদারীই তাহাদের অবলম্বন ছিল। নিজ নিজ দেশে দোকানপাট রক্ষা করিতেই তাহাদের প্রাণান্ত হইত। প্রায়ই লুঠপাটের দরুণ তাহাদের সর্ব্বনাশ হইয়া যাইত। সেই দুর্দ্দিনে মাহিষ্যবণিকগণ কাবুলীদের ন্যায় অস্ত্রশস্ত্র লইয়া বাণিজ্য করিতেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীবিজয় কুমার রায়।

মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোং লিমিটেড।

বার্ষিক অধিবেশন ১৯১২।

শ্রীযুক্ত বাবু গগনচন্দ্র বিশ্বাস
,, ,, নরেন্দ্রনাথ দাস
,, ,, কেদার নাথ দাস
,, ,, সুদর্শন বিশ্বাস
,, ,, সীতানাথ সরকার
,, ,, কালিপদ দাস
,, ,, নগেন্দ্র নারায়ণ রায়
,, ,, কেদার নাথ রায় চৌধুরী
,, ,, হরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
,, ,, চন্দ্রকান্ত বিশ্বাস,
প্রক্সী গগনচন্দ্র বিশ্বাস,

শ্রীযুক্ত বাবু হাজারিলাল সরকার
প্রক্সী রামপদ বিশ্বাস
,, ,, শৈলেন্দ্র নাথ দাস
,, ,, ধীরেন্দ্র নাথ দাস
,, ,, সত্যেন্দ্র নাথ দাস
,, ,, সতীশচন্দ্র সরকার
,, { শ্রীনীলকণ্ঠ দাস সাং বিরামপুর
,, { শ্রীগুরুচরণ দাস বিরামপুর
,, { শ্রীবনমালী দাস সাং বিরামপুর
প্রক্সী গগনচন্দ্র বিশ্বাস
(ইহাঁরা উপস্থিত ছিলেন।)

নির্দ্ধারণ।

১। সেক্রেটারীর রিপোর্ট পাঠ করা গেল।

২। ১৯১২ সালে উদ্বৃত্ত পত্র মঞ্জুর করা হইল।

৩। কার্য্যকারীগণের বিবরণ অবগত হওয়া গেল।

৪। ডিরেক্টার এবং অডিটার যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা রহিলেন। তবে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ তত্ত্বনিধি মহাশয় তাঁহার অংশ বিক্রয় করাতে তিনি ডিরেক্টার পদ হইতে অপসারিত হইলেন।

৫। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ডিরেক্টার আছেন কিন্তু সভায় যোগদান করেন না, তাঁহাদিগকে পত্র লিখিয়া তাঁহারা ডিরেক্টার থাকিবেন, কি না তৎসম্বন্ধে তাঁহাদের অভিপ্রায় জানা হউক।

৬। মুর্শিদাবাদ নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গোকুলকৃষ্ণ সরকার মহাশয় প্রস্তাব করেন যে, মুর্শিদাবাদ হইতে রেশমী কাপড় খরিদ করিয়া মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর ষ্টকে মজুত রাখিয়া বিক্রয় করিবেন এবং কাপড় কোম্পানির আফিসে পৌঁছিলে সাতদিনের মধ্যে শতকরা ৭৫্ টাকা হিসাবে মূল্য দিতে হইবে। সমস্ত কাপড় বিক্রয়ান্তে লাভের সিকি অংশ ও প্রদত্ত টাকা কোম্পানি পাইবেন। কোম্পানির পক্ষে কর্ম্মচারীও মোট লভ্যাংশের সিকি পাইবেন।

৭। কোম্পানির যে সকল অংশীদার অদ্যাবধি তাঁহাদের দেয় টাকা পরিশোধ করেন নাই, তাঁহাদিগকে আগামী ডিসেম্বর পর্য্যন্ত সময় দেওয়া হউক স্থিরীকৃত হইল।

৮। বাৎসরিক ৮০০্ আট শত টাকা বজেট্ মঞ্জুর করা হইল।

৯। এজেণ্টগণকে শতকরা দশ টাকা হিসাবে কমিশন দেওয়া হইবে স্থিরীকৃত হইল।

১৩ই পৌষ, ১৩১৯।

শ্রীসীতানাথ সরকার,
সভাপতি।

১৯১২ সালের কার্য্য-বিবরণী।

(সেক্রেটারীর রিপোর্ট)

১৯১১ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত যে হিসাব অংশীদারগণ সমীপে প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহাতে দেখান হইয়াছে যে, ঐ তারিখ পর্য্যন্ত কোম্পানির ১৭৪৮০ টাকার অংশ বিক্রি হইয়াছিল। তৎপর ১৯১২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত

যে হিসাব অদ্য দেওয়া যাইতেছে তাহাতে দেখান যাইতেছে যে কোম্পানির আরও কতিপয় অংশ বিলি হইয়া বর্ত্তমান তারিখ পর্য্যন্ত সর্ব্ব মোট ১৮০০০ আঠার হাজার টাকার অংশ বিলি হইয়াছে। এই টাকার মধ্যে ১১৯৮৫ নগদ আদায় হইয়াছে, অবশিষ্ট ৬০১৫ ছয় হাজার পনের টাকা অংশীদারগণের নিকট অনাদায় রহিয়াছে। গত বৎসর ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত ১০২৭৫ টাকা ব্যাঙ্কিং কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া মাসিক প্রায় ১১০৲ টাকা পরিমাণ সুদ পাওয়া যাইতেছিল। বর্ত্তমান বৎসরে ১১৩০০৲ টাকা ব্যাঙ্কিং কার্য্যে খাটান যাইতেছে এবং তাহাতে মাসিক প্রায় ১৩৩৲ টাকা পরিমাণ সুদ পাওয়া যাইতেছে। গত বৎসর কোম্পানির স্থায়ী ফাণ্ডারে (Reserve Fund) কেবল মাত্র ৭১৲ টাকা জমা রাখিয়া অংশীদারগণকে ৩২৯৸৹ লভ্যাংশ দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান বৎসরে উক্ত ভাণ্ডারে ৫১৯৵৫ টাকা মজুত রাখিয়া ৩৭৫৷৹ টাকা অংশীদারগণ মধ্যে লভ্যাংশরূপে বিতরণ করা হইবে। যে সকল অংশীদার তাঁহাদের অংশের সমস্ত টাকা পরিশোধ করিয়াছেন কেবল তাঁহারাই এই লভ্যাংশের অধিকারী হইবেন। বর্ত্তমান বৎসরে কোম্পানির স্থায়ী ভাণ্ডারে (Reserve Fund এ) ৭৬৫৷৵৫ মজুত রহিয়াছে।

উল্লিখিত হিসাব দৃষ্টে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, কোম্পানি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ মহৎ কার্য্যের প্রতি মাহিষ্য ভ্রাতৃগণের তাদৃশ সহানুভূতি নাই! প্রত্যেক মাহিষ্য ভ্রাতারই বুঝিয়া রাখা উচিত যে, মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানি সমগ্র মাহিষ্য জাতির উন্নতির সোপান এবং একটী বিশেষ আদরের জিনিষ। যে জাতির মধ্যে যৌথ কারবারের সংখ্যা যত অধিক পরিমাণে প্রচলিত হইয়াছে, জগতে সেই জাতিই তত অধিক পরিমাণে উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছে। আর যে জাতির মধ্যে একতা নাই, সেই জাতির মধ্যে যৌথ কারবারও প্রচলিত হয় নাই, কাজেই তাহা অবনতির অধস্তলে নিপতিত হইয়াছে। এই মাহিষ্য জাতিই একতার গুণে এক সময়ে সমগ্র বঙ্গদেশ কেন, সুদূর বালী-যাবা প্রভৃতি দ্বীপসমূহ পর্য্যন্ত করতলগত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, যাহাদের বিজয়ডঙ্কা এক সময়ে ভারত মহাসাগর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল. যাহাদের প্রবল প্রতাপে এক সময়ে দিগ্ দিগন্ত পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়াছিল, আমরা—সেই মাহিষ্যজাতি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছি কিন্তু সেই একতা নাই, সে বিশ্বাস নাই আর সে মনের বলও নাই! আছে কেবল দ্বেষ, হিংসা ও পরশ্রীকাতরতা।

মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানি কেবলমাত্র আপনার আমার লাভের জন্য নয়, সমগ্র মাহিষ্যজাতির উন্নতিসাধন জন্য। সেই উন্নতি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই একটী স্থায়ী ফণ্ডের প্রয়োজন, চাঁদা ভিক্ষা অথবা এককালীন দান দ্বারা এই বিরাট কার্য্য কখনই সুসম্পন্ন হইতে পারে নারে না, সেইজন্যই মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানিও স্থাপন করা হইয়াছে ইহার আরও একটী মহৎ উদ্দেশ্য—যে সকল মাহিষ্য পরিবার অপরাপর জাতির নিকট ঋণ-গ্রহণ করিয়া কেবলমাত্র সুদের দায়ে ভিটা মাটী বাঁধা দিয়া উৎসন্ন হইয়া যাইতেছেন তাঁহাদিগকে রক্ষা করা। সেন্‌সাস্ রিপোর্টে দেখা যায় যে, সমগ্র মাহিষ্য জাতির মধ্যে এগার হাজার জমিদার রহিয়াছেন, ইহা ছাড়া ব্যবসাদার, উকিল, মোক্তার প্রভৃতি কত শত উপযুক্ত লোক রহিয়াছেন তাহার ইয়ত্তা নাই, কিন্তু সকলেই স্ব স্ব প্রধান, কেহ কাহারও প্রতি তিলমাত্র বিশ্বাস স্থাপন করা সঙ্কোচ বোধ করেন, যাহা হউক আমি প্রত্যেক জেলার মাহিষ্য ভ্রাতাকে অনুরোধ করি তাঁহারা যেন সকলেই স্ব স্ব সাধ্যানুযায়ী কোম্পানির অংশ গ্রহণ করিয়া এই জাতীয় হিতকর কার্য্যে যোগদান করেন। মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির আপাততঃ কেবল তেজারতি বিভাগ খোলা হইয়াছে মাত্র, উপযুক্ত পরিমাণে অংশ বিলি হইলে, ট্রেডিং অর্থাৎ বাণিজ্য এবং Agriculture অর্থাৎ কৃষিবিভাগ খুলিবার বাসনা রহিয়াছে। সকলের সহানুভূতি পাইলে সত্বরেই তাহা কার্য্যে পরিণত করা যাইবে আশা করা যায়।

বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির বাৎসরিক অধিবেশন।

(১৩১৯)

বিগত ২৯শে ডিসেম্বর, রবিবার, ১৪ই পৌষ অপরাহ্ণে কলিকাতা ৩৮ নং পুলিশ হাসপাতাল রোডে উক্ত সমিতির বার্ষিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। কৃষ্ণনগরের খ্যাতনামা উকীল শ্রীযুক্ত বাবু মহীতোষ বিশ্বাস, বি-এল, মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশের প্রত্যেক জেলার ৪০০ শত প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। প্রথমেই দিল্লী বিভ্রাটে মহামতি বড় লাট লর্ড হার্ডিঞ্জ মহোদয়ের জীবননাশের আক্রমণে বোমা নিক্ষেপ জন্য এই সভা আন্তরিক দুঃখ ও মনোবেদনা প্রকাশ করেন। বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির সম্পাদক মহাশয়ের অনুপস্থিতি নিবন্ধন সহকারী-সম্পাদক হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার বি-এল মহাশয় কর্ত্তৃক ২৪শে ডিসেম্বর তারিখেই বড়লাটের

প্রাইভেট্ সেক্রেটারীর নিকট তারযোগে সভার পক্ষ হইতে যে সমবেদনা জানান হয় তাহা উপস্থিত সভ্যগণকে অবগত করান হইল। সম্পাদক মহাশয় তৎপরে গত বৎসরের কার্য্য-বিবরণী আয় ব্যয়ের হিসাব ইত্যাদি পাঠ করেন। মাহিষ্য-ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর উন্নতি বিধানার্থ আলোচনা, মাহিষ্য-সমাজ পত্রিকা পরিচালন, মাহিষ্য-জাতীয় প্রাচীন রাজগণের কীর্ত্তিচিহ্ন রক্ষা, বঙ্গীয় কৃষক-সমিতি সংস্থাপন, কৃষিবাণিজ্যের উন্নতিসাধন, মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণগণের সামাজিক উন্নতি, শিক্ষাবিস্তার, পাবলিক সার্ভিস কমিশন সম্বন্ধে আমাদের কর্ত্তব্য, মাহিষ্য-ছাত্রগণের কর্ত্তব্য, ছাত্রাবাস স্থাপন এবং আগামী বর্ষের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ প্রভৃতি গুরুতর বিষয়ের আন্দোলন আলোচনা হইয়াছিল। জেলা হুগলী, শ্রীরামপুর মহকুমার অন্তর্গত মধ্যাহ্নিজলা নিবাসী শ্রীমান্ পাঁচকড়ি চক্রবর্ত্তী স্বহস্তে যে গ্রামোফোন মেসিন প্রস্তুত করিয়াছেন তাহা প্রদর্শন ও তদ্দ্বারা সঙ্গীত হইয়া সভাপতি মহাশয়ের প্রতি ধন্যবাদান্তে সভাভঙ্গ হয়। সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত প্রস্তাবগুলি অনুমোদিত হইল :—

(১) দিল্লীতে বড় লাট ও তাঁহার মহিষীর জীবন-নাশের যে ঘৃণিত চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার জন্য এই সভা গভীর দুঃখপ্রকাশ করিতেছেন এবং ভগবানের নিকট বড়লাট বাহাদুরের শীঘ্র আরোগ্য হইবার প্রার্থনা জানাইতেছেন।

(২) বাঙ্গালার মাহিষ্যজাতি সরকারী কর্ম্মচারীরূপে গবর্ণমেণ্টের কার্য্যে অতি কম পরিমাণে নিযুক্ত আছেন, কিন্তু এই জাতির সামাজিক মর্য্যাদা ও গৌরবানুসারে যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণে বিশেষ সুবিধা পায়, তজ্জন্য এই সভা গবর্ণমেণ্টের নিকট বিনীত প্রার্থনা করিতেছেন। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর বাহাদুর যাহাতে এ বিষয়ে কৃপা-দৃষ্টিপাত করেন তজ্জন্য এই সভা অনুরোধ করিতেছেন।

(৩) সামাজিক গৌরব ও জনসংখ্যার তুলনায় মাহিষ্যজাতি উচ্চশিক্ষায় পশ্চাৎপদ, সুতরাং গবর্ণমেণ্ট যাহাতে প্রত্যেক মাহিষ্যকেন্দ্রে উচ্চ-ইংরাজী স্কুল সংস্থাপনে সহায়তা করিয়া এই জাতির উচ্চশিক্ষার সহায়তা করেন, তজ্জন্য এই সভা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর বাহাদুরের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন। অনুরূপ সুবিধা করার জন্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছেন।

(৪) বঙ্গীয় মাহিষ্য-জাতির শতকরা ৮৫ জন কৃষক ; কৃষি বিষয়ক উন্নতি সাধনার্থ প্রত্যেক মাহিষ্য কেন্দ্রে কৃষকসমিতিসমূহ সংস্থাপিত হইয়া যাহাতে বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগীয় রাজপুরুষগণের সহায়তায় দেশে কৃষির উন্নতি

করিতে পারেন, তজ্জন্য এই সভা বঙ্গীয় সাহিত্য নেতৃগণকে "বঙ্গীয়-কৃষিপরিষৎ" বা Agricultural Association of Bengal বা ঐরূপ কোন নাম দিয়া একটী সভাগঠনের জন্য আহ্বান করিতেছেন।

(৫) বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিবৃত্ত সম্পর্কীয় বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি কর্তৃক দিনাজপুরে আবিষ্কৃত গৌড়-সম্রাট্ অত্যাচারী মহীপাল-ধ্বংসকারী দিব্যোক ও রুদোক এবং রুদোকের পুত্র ভীম রাজা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিজয়স্তম্ভ ধ্বংসের কবল হইতে রক্ষিত হইয়া যাহাতে ঐতিহাসিক উপকরণ অক্ষুণ্ণ থাকে তজ্জন্য এই সভা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর বাহাদুরের সহানুভূতি প্রার্থনা করিতেছেন।

(৬) যদিও বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষায় অন্যান্য জাতির তুলনায় এই জাতি একই রূপ তথাপি উচ্চশিক্ষা ও নিম্নশিক্ষা বিস্তার কার্য্যে ছাত্রাবাস স্থাপন, স্কুল স্থাপন প্রভৃতি অনেকরূপ উপায় উদ্ভাবন করার প্রয়োজন উপলব্ধ হইতেছে বলিয়া শাখাসভা, পল্লীসভা, ছাত্রসম্মিলনী ও নেতৃবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

(৭) এই সকল প্রস্তাবের কপি গবর্ণর বাহাদুরের নিকট প্রেরিত হউক।

১৯১২ সালের কার্য্য-বিবরণী।

(সম্পাদকের রিপোর্ট)

বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির ১৯১১ সালের ১লা এপ্রেল হইতে ১৯১২ সালের ৩১শে মার্চ্চ পর্য্যন্ত হিসাব।

জমা —			জমা জের —		৫৲
মেম্বর ফি			গোবর্দ্ধন প্রামাণিক	...	১৲
ভোলানাথ বিশ্বাস			ভূতনাথ প্রামাণিক	...	১৲
সাং সেনপাড়া জেলা মুর্শিদাবাদ		১৲	দুর্গাপদ বেরা	...	১৲
শ্যামাচরণ মজুমদার			নরেন্দ্রনাথ মণ্ডল	...	১৲
সাং ডেঙ্গাপাড়া মুর্শিদাবাদ	...	৩৲	দ্বারিবেড়্যা সাহিত্য-সমিতি	...	১৲
শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী সরকার			যোগেন্দ্রনাথ সিংহ		
সাং শান্তিপুর	...	১৲	সাং মহিষাদল, মেদিনীপুর	...	১৲
একুন	...	৫৲	একুন	...	১১৲

জমা জের— ১১৲
রাখালকৃষ্ণ বিশ্বাস
সাং হালমা নদিয়া ... ১৲
ত্রৈলোক্যনাথ দাস সাং সন্তোষপুর ১৲
গৌরকৃষ্ণ সরকার
সাং পাইকপাড়া জেলা নদীয়া ... ১৲
তারকব্রহ্ম বিশ্বাস রায় সাহেব
সাং পাইকপাড়া নদিয়া . ১৲
অনন্তকুমার দাস সাং সোনাই ... ১৲
দীননাথ দাস সাং পাবনা ... ১৲
শ্যামাচরণ মজুমদার ... ১৲
সীতানাথ সরকার ... ১৲
সুরেন্দ্রনাথ দাস সাং রমনাপাড়া ১৲
মেঘনাথ সরকার ... ১৲
নবকৃষ্ণ সরকার ... ১৲
অক্ষরকুমার মাইতি সাং নিশ্চিন্তপুর ১৲
শ্যামাচরণ মজুমদার ... ১৲
রাখালচন্দ্র মণ্ডল
সাং বারুইপাড়া মুর্শিদাবাদ ... ১৲
কালিপদ দাস সাং ভবানীপুর ... ১৲
রাধানাথ সামন্ত সাং শোভারামপুর ১৲
উপেন্দ্রনাথ হাজরা
সাং বড়মোহরা, হাওড়া ... ১৲
বিধুভূষণ মজুমদার সাং দিনাজপুর ১৲
অশ্বিনীকুমার সরকার সাং ধুতুরদহ ১৲
দয়ালচন্দ্র দাস সাং দিনাজপুর ... ১৲
নরকিশোর দাস
সাং হরিপুর, দিনাজপুর ... ১৲

একুন ... ৩২৲

জমা জের— ৩১৲
রসময় বিশ্বাস ... ১৲
হরিপদ হালদার পারুলিয়া ... ১৲
ভূতনাথ হালদার সাং গাববেড়ে ২৲
রাধাসুন্দর রায় সাং আমতা ... ১৲
মন্মথনাথ বিশ্বাস সাং ভোলাডাঙ্গা ১৲

এককালীন দান।

গোপেন্দ্রকুমার ... ৵০
হরেকৃষ্ট বিশ্বাস .. ।০
বরদাকান্ত সরকার ... ৵০
সিঙ্গুর মাহিষ্য-সমিতি ... ১
শ্রীমতী বসন্তকুমারী চৌধুরাণী
দত্তক গ্রহণ উপলক্ষে ... ১০৲
মেদিনীপুর পল্লীসমিতি নদীয়া... ৩৸৵০
মাহিষ্য-ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর
লভ্যাংশের সিকিভাগ প্রাপ্ত ৮২৷৶১০

বিবাহবৃত্তি আদায়।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীহরি জোয়ার্দ্দার
সাং কুরুসা নদিয়া বিবাহ
উপলক্ষে দান ... ৫৲
অক্ষয়কুমার সরকার ... ৫৲
সুধন্বা রায় সাং বেট্‌রা হাওড়া
পুত্রের বিবাহ উপলক্ষে ... ১৲
মহাদেব হাজরা—কন্যার বিবাহ
উপলক্ষে ... ১৲
শশীভূষণ দাস—কন্যার বিবাহে... ১৲
ক্ষেত্রনাথ দাস—কন্যার বিবাহে ... ১৲
হাওলাত জমা ... ৩৩৵১০

জমা মোট— ... ১৮৩৲

খরচের হিসাব পরে দেওয়া যাইতেছে।

খরচ—

গঙ্গাধরপুর যাতায়াত জন্য শ্রীযুত রামপদ বিশ্বাস পাথেয় খরচ ... ৫৸১০
সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী পাথেয় জন্য ২॥০
তেকালা প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত জন্য পাথেয় ... ৬।১০
বল্লালচরিত খরিদ ... ॥৵
কাগজ কলম ইত্যাদি ... ॥/০
সঞ্জীবনী চাঁদা ... ২/০
বসুমতী ... ২৶০
ভক্তিস্বরয়ের নিকট টেলিগ্রাফ ইত্যাদি খরচ ... ৫৸৵১০

একুন ... ২৫৸৵১০

খরচ জের— ... ২৫৸৵১০
সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বেতন ... ১৪৲
গরুড় পুরাণ ইত্যাদি খরিদ ... ৫৲
প্রাইভেট্ সেক্রেটরীর নিকট টেলিগ্রাম ... ৬।৵০
মিটিংএর জন্য খরচ ... ৪৪॥/১৫
বসুমতী আফিস ও ভবানীপুর যাতায়াত গাড়ীভাড়া ... ২॥৵০
সাহিত্য-ব্যাঙ্কিং ও ট্রেডিং কোং ঋণ শোধ ... ৮৪।৶১৫

মোট খরচ ... ১৮৩৲

১লা এপ্রেল হইতে বর্ত্তমান তারিখ পর্য্যন্ত আয় ব্যয়ের হিসাব।

জমা—

শ্রীযুক্ত বাবু রাধাকৃষ্ণ আদক সাং চেতলা, মেম্বর ফি ... ৫৲
অনুকূলচন্দ্র দাস মেম্বর ফি ... ১৲
শীতলচন্দ্র মণ্ডল সাং মহেশপাড়া এককালীন দান ... ১০৲
উপেন্দ্রনাথ দাস সাং মজিলপুর মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে ... ১৲
শচীপতি দাস সাং চুচড়া কন্যার বিবাহ উপলক্ষে ... ১৲
ভোলানাথ দাস সাং বেনিয়াপুকুর পুত্রের বিবাহে ... ১৲
যজ্ঞেশ্বর বিশ্বাস ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট মেম্বর ফি ... ২৲

একুন ... ২১৲

খরচ—

শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দগোপাল চক্রবর্ত্তীর রাজপুর প্রভৃতি স্থানে যাতায়াত জন্য পাথেয় খরচ ইত্যাদি ৬।১৫
পোষ্টেজ ষ্ট্যাম্প খরিদ ৫৲

১১।১৫

মজুত ... ৯॥৶৫ মাত্র।

উপরে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির যে হিসাব প্রদত্ত হইল তাহাতে দেখা যাইতেছে যে সমিতির তহবিলে এখন ৯৷৶৫ মাত্র মজুত রহিয়াছে কিন্তু সাহিত্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির তহবিল হইতে ১৯০৩ সালে যে টাকা ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছিল, গত কয়েক বৎসর মধ্যে কিছু কিছু করিয়া পরিশোধ করিয়া এখনও ৩৬২৷৵০ ঋণ রহিয়াছে ; সুতরাং সমিতির সভ্যগণের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন স্ব স্ব দেয় চাঁদার টাকা যথাসময়ে পরিশোধ করিয়া দেন এবং আরও যাহাতে সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তদ্বিষয়ে যথাসাধ্য চেষ্টা করেন।

২। বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির উদ্দেশ্য প্রচারের নিমিত্ত সাহিত্য-সমাজ নামক মাসিক পত্র পরিচালনের যে ভার সমিতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে, সমিতি যেন ক্রমশই ঋণজালে জড়িত হইতেছে। সভ্যগণের কর্ত্তব্য যাহাতে এই পত্রিকা গ্রাহক সংখ্যা বৃদ্ধি হয় তৎপক্ষে চেষ্টা করা। নিম্নে সাহিত্য-সমাজের গত দুই বৎসরের হিসাব প্রদত্ত হইল।

১৩১৭ সাল।

জমা—		খরচ—	২০১৷৶৫
গ্রাহকদিগের নিকট হইতে আদায়	১৫২৷৷৶০		
হাওলাত	৪৮৷৷৶৫		
একুন	... ২০১৷৶৫		

১৩১৮ সাল।

জমা—		খরচ—	
গ্রাহক	...১০১৫৶০	ঐ বৎসরের জন্য ছাপা খরচ	...৬৭১৸০
বিজ্ঞাপন	... ২৭৷০	ষ্ট্যাম্প	... ৩৯৭৸৵১৫
কমিশন	...২০৵১০	হরেক রকম খরচ	... ২২৷৷/১৭৷০
১৯ সালে প্রাপ্ত	...২৬৸৶০	মুটে ভাড়া	... ১৸৶০
		মাশুল ইত্যাদি	... ১১১৲
	... ১০৮৯৸১০		১২০৫৶১০
হাওলাত	... ১১৫৷৶২৷০		

১৩১৯ সালের অগ্রহায়ণ পর্য্যন্ত।

জমা—		খরচ—	
গ্রাহকদিগের নিকট	... ৭৫২৸৵০	ছাপা খরচ	... ৩২৮।০
বিজ্ঞাপন	... ২২৲	ষ্ট্যাম্প	... ২৩৯৷।১০
		মাহিনা ইত্যাদি	... ৯২৸৵০
	৭৭৪।৵০		৬৫৯৸৵১০

৩। সেন্সস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মাননীয় ওমালি সাহেব বাহাদুর মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে তদন্ত করিবার নিমিত্ত ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্টর মহোদয়ের উপর ভার অর্পণ করিলে ম্যাজিষ্টর সাহেব শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের রিপোর্টে ভ্রমপথে চালিত হইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতি স্থানে স্থানে চেষ্টা করিয়া মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণের প্রাচীন ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করেন এবং তৎসমুদয় ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর সমীপে দাখীল করিলে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের ভ্রম দূরীভূত হয় এবং মাহিষ্যযাজী ব্রাহ্মণ যে সদ্‌ব্রাহ্মণ তৎসম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন।

৪। বর্ত্তমান বৎসরে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির চেষ্টায় বহুসংখ্যক পল্লীসমিতি সংগঠিত হইয়াছে তন্মধ্যে কয়েকটী প্রধান প্রধান সমিতির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।—(ক) মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কাঁথি মহকুমার অধীন, কালিন্দি, পুরুষোত্তমপুর ষোলবনবাড়, দক্ষিণ-শীতলা, খলিসাভাঙ্গা, মাজনা, ঘাটোয়া, জিনানন্দপুর, আগড়বাড়, বালিঘাই, সিউড়ি, বিদ্যাধরপুর, চিরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে। (খ) হুগলী জেলার—তারকেশ্বর, বলরামবাটী, সেওড়াকুলী, (গ) হাওড়া জেলার—ময়নাপুর, রসপুর, বড়মগরা, কমলাপুর, প্রভৃতি স্থানে। (ঘ) ২৪ পরগণা—বরথালী আমিড়া (ডায়মণ্ডহারবার)। (ঙ) মুর্শিদাবাদ—রামনাথপুর, গোপীনাথপুর, রায়পুর সাগরপাড়া, শক্তিপুর প্রভৃতি স্থানে। (চ) নদীয়া—আমলা সদরপুর, পাইকপাড়া, কুরুসা, হালসা, বাড়াদী, মুন্সিগঞ্জ, সাহেবপুর প্রভৃতি স্থানে।

৫। বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির উদ্যোগে ও চেষ্টায় কলিকাতাবাসী মাহিষ্য-ছাত্রদিগের লইয়া যে মাহিষ্য-ছাত্রসম্মিলনী সংগঠিত হইয়াছে সেই সম্মিলনীতে এখন প্রায় ৪ চারিশত মাহিষ্য বালক যোগদান করিয়াছেন, ইহা একটী অতীব আনন্দের এবং ভাবী উন্নতির বিষয় বলিতে হইবে। (৬) মাহিষ্য-সমাজের

দরিদ্র বালকগণের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিবার নিমিত্ত বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতি একটী ছাত্রাবাস খুলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু নেতৃবৃন্দের সেরূপ সহানুভূতি না পাওয়ায় আপাততঃ উহা স্থগিত রহিয়াছে। (৭) বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির চেষ্টায় ও যত্নে প্রায় প্রত্যেক জেলাতেই কিছু কিছু করিয়া স্কুল, পাঠশালা, বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। (৮) বিগত বৎসরে ভ্রান্তি-বিজয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পুরোহিত, ব্যবস্থা-পঞ্চবিংশতি, সাহিত্য-মর্য্যাদা, সাহিত্য-তত্ত্ববারিধি, গৌড়াদ্য-বৈদিক-ব্রাহ্মণ-পরিচয়, সাহিত্য-প্রকাশ, আর্য্যপ্রভা, মহেন্দ্র-মোহ-মুদ্গর, নিবেদন-মালা প্রভৃতি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে এবং বিজয়াবসান ও তমলুকের ইতিহাস শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। অন্যান্য বহুবিধ প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চা করিবার জন্য একটী বিশেষ ব্যক্তি নিয়োগের আবশ্যকতা উপলব্ধি করা যাইতেছে। সম্পাদকপদে একজন উপযুক্ত লোক পাইলে ভারতী মহাশয় প্রত্নতত্ত্বের চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিতে পারেন।

এককালীন দান প্রাপ্তি-স্বীকার।

(১৪ই পৌষ রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির অধিবেশন দিন)

মাণিকচন্দ্র দাস—বলরামবাটী ... ১৲
আশুতোষ জানা ... ১৲
গোপীনাথ মাইতি, কাঁথী ... ১৲
গোকুলকৃষ্ণ দাস .. ১৲
প্যারিমোহন শিকদার, বি-এল ... ১৲
শরৎচন্দ্র জানা, এম্ এস্-সি ... ১৲
শ্যামাচরণ সরকার ... ১৲
প্রকাশচন্দ্র সরকার, বি-এল ... ১৲
সতীশচন্দ্র সরকার, গাইবান্ধা ... ১৲
কৃত্তিবাস মণ্ডল বি-এল, ঘাটাল ... ১৲
ঈশানচন্দ্র মণ্ডল,
ব্রাহ্মণ-বসান, ঘাটাল ... ১৲
সীতানাথ সরকার,
ফুলবাড়ী পাবনা ... ১৲

অমৃতলাল হাজরা বি-এল উলুবেড়িয়া ১
বনমালী পাল—চন্দননগর, ... ১৲
রাধাবিনোদ বিশ্বাস, উকীল, পাবনা ১৲
প্রসন্নকুমার দাস শ্রীরামপুর ... ১৲
আনডহরা সাহিত্য-সমিতি
সাং গোকুলকৃষ্ণ দাস ... ১৲
বসন্তকুমার ধাড়া ... ১৲
গৌরহরি বিশ্বাস ... ||০
রাজবল্লভ বিশ্বাস, বেজপাড়া
রামনাথপুর আনন্দময় সমিতি ... ১৲
হরিনাথ চক্রবর্ত্তী
রামনাথপুর আনন্দময় সমিতি ... ১৲
দক্ষিণ শ্যামপুর সমিতি
সাগরচন্দ্র মণ্ডল ... ১৲

রামনাথপুর-সমিতি
নীলকান্ত কবিরাজ বৈদ্যনাথ মণ্ডল ১৲
রজনীকান্ত রায় মেট্রোপলিটন কলেজ ১৲
প্রফুল্লকুমার সরকার বি-এ
দারিয়াপুর নদীয়া ... ১৲
চণ্ডীচরণ ধাড়া, কমলাপুর ... ১৲
যোগেন্দ্রনাথ দাস সিতি ... ১৲
রামনারায়ণপুর মাহিষ্য-সমিতি
কুমুদাকান্ত সামন্ত ... ১৲
গগনচন্দ্র বিশ্বাস, বি, সি, ই, ... ১৲
মহীতোষ বিশ্বাস, বি-এল ... ১৲
ঝুড়ু পাল, পহলামপুর ... ১৲
রাধাকৃষ্ণ আদক, চেতলা ... ১৲
কার্ত্তিক দেওয়াসী
বড়ময়রা মাহিষ্য-সমিতি ... ১৲
মাণিকচন্দ্র কোলে ... ১৲
কবিনাথ কোলে ... ১৲
আমডহরা বৈষ্ণব সম্প্রদায়
গোকুলকৃষ্ণ দাস ... ১৲
অঘোরচন্দ্র দাস ... ১৲
মতিলাল চক্রবর্ত্তী হাওড়া ... ১৲
দ্বারিবেড়ে মাহিষ্য-সমিতি
যোগেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক ... ১৲
হরিপুর মাহিষ্য-সমিতি
মতিলাল দাস ... ১৲
বোড়াই মাহিষ্য-সমিতি
লক্ষ্মীনারায়ণ সাঁতরা ... ১৲
রাইপুর মাহিষ্য-সমিতি
নগেন্দ্রনারায়ণ রায় ... ১৲
[illegible] ... ১৲

দেবেন্দ্রনাথ দাস, চাতরা ... ১৲
হরিদাস থামারই শ্রীরামপুর ... ১৲
কার্ত্তিকচন্দ্র ভাণ্ডারী মামুদপুর ... ১৲
বিষ্ণুপদ দাস তালতলা ... ২৲
শ্রীপতি চরণ হাজরা ... ১৲
ত্রিলোচন মান্না ... ১৲
অক্ষয়কুমার সরকার,
হেডমাষ্টার দোরো কৃষ্ণনগর .. ১৲
কেদারনাথ বেরা, ম্যানেজার,
শিবপুর, গুজারপুর, হাওড়া ... ১৲
চন্দ্রকিশোর বেরা ও কেদারনাথ বেরা
২৩ পগেয়াপটী, কলিকাতা ... ২৲
কার্ত্তিকচন্দ্র বেরা, জমিদার
শিতলপুর শ্যামপুর হাওড়া ... ২৲
অবিনাশচন্দ্র গুড়িয়া
গুজারপুর হাওড়া ... ॥০
গদাধর মাইতি বক্‌সীচক লক্ষ্যা
মেদিনীপুর ... ॥০
কালিকৃষ্ণ হালদার,
বেণাপুর, ২৪ পরগণা ... ১৲

সভ্যের চাঁদা।

মহীতোষ বিশ্বাস বি, এল,
কৃষ্ণনগর নদিয়া ... ২৲
রাধাবিনোদ চৌধুরী, খোলাহাটী
গাইবান্ধা, রংপুর ... ২৲
দয়ালচন্দ্র দাস, দিনাজপুর ... ১৲
বিধুভূষণ মজুমদার দিনাজপুর ... ১৲
রাখালকৃষ্ণ বিশ্বাস কুরুসা নদিয়া ... ১৲
দেবেন্দ্রনাথ জোয়ার্দার ... [illegible]

কৃষি-বার্ত্তা।

(লেখক—শ্রীআশুতোষ দেশমুখ।)

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির বিগত দশমবার্ষিক অধিবেশনে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীমৎসেবানন্দ ভারতী মহাশয় সাহিত্যের পক্ষে কৃষি কত সুবিধা আনিতেছে ও ভবিষ্যতে কৃষি-বিদ্যার উন্নতির সহিত কত সুবিধার পথ উন্মুক্ত হইবে, প্রাঞ্জল ভাষায় তাহা সমাগত সভ্যগণকে বুঝাইয়া দিয়াছেন। শরীর ও মনের দুর্ব্বলতাপোষক কেরাণী-গিরি হইতে কৃষি যে সর্ব্বাংশে বরণীয় তাহা উপস্থিত সকলেই জানিতে পারিয়াছেন। দেশের সমস্তই বিপর্য্যস্ত, সুতরাং কেরাণীগিরি সম্মানসূচক বলিয়া ভ্রম জন্মিবার আশ্চর্য্য কি? প্রকৃতিস্থ পাশ্চাত্য দেশসমূহে কিন্তু কেরাণীগিরির বিন্দুমাত্র আদর নাই। আমাদের দেশ প্রকৃতিস্থ হইবে কবে?

ভারতী মহাশয় গবর্ণমেণ্ট প্রচারিত "যৌথ-ঋণদান-সমিতির" উদ্দেশ্যও সকলকে বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। বঙ্গদেশীয় "কো-অপেরাটীভ্‌ ক্রেডিট্‌ সোসাইটী"গুলির রেজিষ্ট্রার ডবলিউ এইচ্‌ বুচান মহোদয় সরস ভাষায় একত্র বলিয়াছেন "মহাজনই কৃষকের একমাত্র অবলম্বন, কেমন না যেমন দড়ি প্রাণদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর একমাত্র অবলম্বন"। কৃষক প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যাহা উপার্জ্জন করিল, তাহা যদি মহাজনেরাই গ্রাস করিলেন তাহা হইলে সে কৃষির উন্নতি করিবে কাহার জন্য? সদাশয় গবর্ণমেণ্টের চেষ্টা ফলবতী হইয়া কৃষকের প্রধান অভাব দূর হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

বঙ্গের "ডাইরেক্‌টার অব্‌ এগ্রিকালচার" আফিস হইতে আমরা হৈমন্তিক ধান্যের কতপরিমাণ ফসল জন্মিয়াছে তৎসম্বন্ধীয় সরকারী আনুমানিক ফর্দ্দের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে দেখা গেল যে, বিগত বৎসরের মত সুপর্য্যাপ্ত না হইলেও এখনও প্রায় পনের আনা ফসল আশা করা যাইতে পারে। বিঘাপ্রতি ৪/০ মণ ধান ধরিলে এখনও সমগ্র বঙ্গে ১২৮১০৬৮০০ হন্দর ধান্য পাওয়া যাইতে পারে। গত বৎসর ১৩৪৮৮৪৪০০ হন্দর পাওয়া গিয়াছিল।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ দাস মহাশয় তাঁহার সুন্দরবনের এষ্টেটে কৃষির যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন। তত্রত্য প্রজাগণ পূর্ব্বে ধান্য ব্যতীত আর কিছু উৎপাদন করিতে অগ্রসর হইত না। নরেন্দ্রবাবু বহু অর্থ ব্যয় করিয়া প্রথমে তাঁহার খাস জমীতে ধান্য ব্যতীত অপর লাভজনক ফসল যখন উৎপাদন করিলেন তখন প্রজাগণ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার

প্রশংসা করিয়া তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিল। এখন তাঁহার এষ্টেটে বঙ্গের প্রধান কৃষিজাত পাটের বহু আবাদ হইতেছে। দেশের ও দশের যথার্থ উপকার করিতে হইলে কৃষির উন্নতিসাধন অগ্রে করিতে হইবে। আমাদের সাহিত্য-ভূম্যধিকারিগণ নরেন্দ্রবাবুর দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিয়া কৃষকগণকে উৎসাহিত করিবেন কি ?

যশোহরে পাট ও তিলের কতকগুলি শত্রু আছে যাহাদের জন্য উক্ত ফসলের আবাদে বিলক্ষণ লোকসান হইতেছে। আমরা এই কীটগুলি সরকারী কীটতত্ত্ববিদ্‌কে পাঠাইয়া প্রতীকারের উপায় করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির বিগত বাৎসরিক অধিবেশনে অনুমোদিত চতুর্থ নির্দ্ধারণ মতে আমরা বাঙ্গলার সাহিত্য-সমিতিগুলিকে সত্বর কৃষিসমিতি গঠন করিতে অনুরোধ করিতেছি। আপাততঃ স্থানীয় সাহিত্য-সমিতির সম্পাদকগণই কৃষিসমিতির সম্পাদক প্রভৃতির কার্য্য করিতে পারিবেন। কেবল সমিতির মধ্যে স্থানীয় কৃষিবিদ্‌ ও কৃষিতে অনুরক্ত কৃতবিদ্য সাহিত্য মহোদয়গণ ও প্রধান প্রধান কৃষকগণকেও আহ্বান করিতে হইবে। "সাহিত্য-সমাজের" সহায়তায় বা পত্রদ্বারা "বঙ্গীয় কৃষি-পরিষদ্‌" যে যে বিষয় উপস্থিত করিবেন তাহার যথাযথ আলোচনা করিয়া, স্থানীয় নিরক্ষর কৃষকগণকে বুঝাইয়া দেওয়াই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য হইবে। কৃষির ন্যায় মহোপকারী বিদ্যার প্রচারকল্পে এইরূপ স্বেচ্ছাসেবকের কার্য্য করায় যে ধর্ম্ম ও অর্থ দুইই আছে তাহা কাহাকেও বোধ হয় বুঝাইতে হইবে না। স্বেচ্ছাসেবকগণের নিকট বিশেষ অনুরোধ এই যে, যেন তাঁহারা শীঘ্র বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতি আফিসে নাম ধাম পাঠাইয়া "বঙ্গীয় কৃষি-পরিষদের" মেম্বর হইয়া আমাদের কার্য্যে সহায় হন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

দিল্লী-দুর্ঘটনা।—বিগত ২৩শে ডিসেম্বর তারিখে ব্রিটিশ ভারতের নূতন রাজধানী দিল্লীনগরীর উদ্বোধন উপলক্ষে শোভাযাত্রা করিয়া যাইবার সময় হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় বড়লাট বাহাদুর ও তাঁহার মহিষীর জীবননাশের ঘৃণিত চেষ্টায় বোমা নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। বড়লাটের পশ্চাৎস্থিত ছত্রধারী জমাদার একেবারে নিহত হইয়াছে, বড়লাট বাহাদুর সাংঘাতিকভাবে আহত হইয়াছিলেন, লেডী হার্ডিঞ্জ সম্পূর্ণ নিরাপদ ছিলেন। চিকিৎসায় বড়লাট বাহাদুর আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। এই দুর্ঘটনার সংবাদ কলিকাতায় পৌছিবামাত্র আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়াছি। যে দুর্বৃত্ত বা দুর্বৃত্তেরা এইরূপে আসুরিক চেষ্টায় আমাদের সর্ব্বজনপ্রিয় বড়লাট বাহাদুরের এইরূপ প্রাণনাশের চেষ্টা

বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির টেলিগ্রাম। ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে প্রাতঃকালে বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির সম্পাদক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র নাথ দাস মহাশয় কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে ছিলেন বলিয়া হাইকোর্টের উকীল—বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির সহকারী সম্পাদক—শ্রীযুক্ত প্রকাশ সরকার বি-এল, মহাশয় সমিতির পক্ষ হইতে দুঃখ ও সমবেদনা জানাইয়া নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম বড় লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারীর নিকট প্রেরণ করেন,—

To Private Secretary H. E. Viceroy, Delhi.
Bangiya Mahishya Samiti, 38 Police Hospital Road, Calcutta, learns with mingled feelings of horror and abhorrence, and joy at the dastardly outrage on their Excellencies and providential escape. Praying for his Excellency's rapid recovery.—Prakash Chandra Sarkar, Asst. Secretary.

৩০শে ডিসেম্বর তারিখে প্রাইভেট-সেক্রেটারী বাহাদুর দিল্লী হইতে টেলিগ্রামের উত্তরে প্রকাশ বাবুর নিকট নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রেরণ করিয়াছেন :—

"To Prakash Chandra Sarkar,
Asst. Secretary Bangiya Mahishya Samiti.
38, Police Hospital Road, Calcutta.
Many thanks for message of sympathy sent by Samiti which will be laid before Viceroy on his recovery. I am sure he will greatly appreciate it—P. S. V."

অশৌচ সমস্যা ও জাতীয় কার্য্য।—স্থানে স্থানে অশৌচ লইয়া বড় গোলযোগ চলিবার উপক্রম হইতেছে। লেখাপড়া-শিক্ষা, আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান, জাতীয় অন্যান্য বহুবিধ কার্য্যদক্ষতা ইত্যাদি দূরে থাকুক—অতি তুচ্ছ অশৌচ সমস্যা লইয়া মহা গোলযোগ করিতেছেন। আমরা এরূপ আন্দোলনের পক্ষপাতী নহি। সামাজিক শান্তি না রহিলে কখনই উন্নতি লাভ করা যায় না। যেখানে অশৌচ পরিবর্ত্তনে কোনরূপ সামাজিক বিপ্লব না ঘটে, সেখানে পরিবর্ত্তনে কোন বাধা থাকে না। সামাজিক বিপ্লব বা অশান্তি প্রভৃতি কাহারও বাঞ্ছনীয় নহে।

কৃষক-সমিতি।—প্রত্যেক জেলায়, প্রত্যেক মহকুমায় একটী করিয়া কৃষকসমিতি যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রেত। আমরা সেই অভিপ্রায় অনুসারে প্রত্যেক মাহিষ্যকেন্দ্রে কৃষিসমিতি সংস্থাপন করিবার পরামর্শ করিতেছি। মাহিষ্যপল্লীসমিতির যেরূপ প্রয়োজনীয়তা আছে সেইরূপ পল্লীকৃষক-সমিতির-প্রতিষ্ঠা এখন বিশেষ আবশ্যক। বারান্তরে আমরা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব। পত্র লিখিলে কৃষক-সমিতির প্রতিষ্ঠা প্রণালী জানান হয়। কৃষিতে অনুরক্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণের সহানুভূতি বাঞ্ছনীয়।
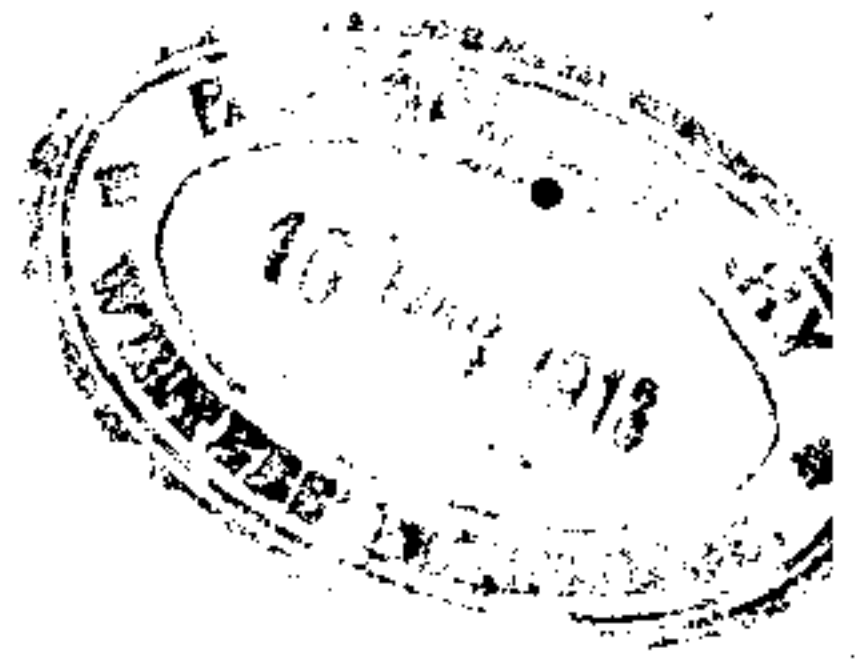
দ্বিতীয় বর্ষ—মাঘ, ১৩১৯।

মাহিষ্য-সমাজ।

ভারতে কৃষি-কলেজ।

মানবজাতির রক্ষারূপ মহাব্রত সাধনের দিকে লক্ষ্য করিয়া ভারত-গবর্ণমেণ্ট এবং প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহ এদেশের কৃষিবিষয়ক উন্নতি সাধনার্থে যে সমস্ত অনুষ্ঠান করিতেছেন তন্মধ্যে কয়েকটী কৃষি-কলেজ স্থাপন ও পরিচালন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দারুণ দুর্ভিক্ষের সময় এ দেশের কৃষিজাত দ্রব্যের অধিক পরিমাণে উৎপাদন বিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি প্রথম আকৃষ্ট হইয়া সঙ্গে সঙ্গে কৃষি-বিষয়ক শিক্ষাদানের জন্য আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে ফেমিন কমিশনের উপদেশ অনুসারে ভারতবর্ষে গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগ খোলা হইলে উচ্চ প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত কতকগুলি সরকারী কর্ম্মচারীর প্রয়োজন অনুভূত হইল। ইতিপূর্ব্বে ১৮৭৮ খৃঃ অব্দ হইতে পুণা বিজ্ঞান-কলেজে কৃষি-বিষয়ক প্রাথমিক বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য শ্রেণী খোলা হইয়াছিল। তখন রেভিনিউ ইন্‌স্পেক্টর বা কাননগু পদের (ভাগ কারকুন) জন্য সরকারী কর্ম্মচারী প্রস্তুত করণের জন্যই ঐ বন্দোবস্ত হইয়াছিল। তৎপরে ১৮৯০ খৃঃ বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় পুনা-বিজ্ঞান-কলেজ বা বরদা-কলেজ হইতে কৃষিবিষয়ক "ডিপ্লোমা" দিবার আয়োজন করেন। কিন্তু এই ডিপ্লোমা গবর্ণমেণ্ট সার্ভিসে বিশেষ আদরের হয় নাই। সেই জন্যই কৃষিবিজ্ঞান শ্রেণীতে ছাত্রেরা আর আগ্রহ সহকারে প্রবেশ করিতে চাহে নাই—ফলে ক্রমশঃ ১৮৯৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত দুই একটী ছাত্র ঐ শ্রেণীতে পড়িতে দেখা গিয়াছিল।

পুনা কৃষি-কলেজ।

১৮৯৫ খৃঃ হইতে ১৯০১ খৃঃ পর্য্যন্ত পুনা-বিজ্ঞান-কলেজে আর একটীও ছাত্র কৃষি-বিজ্ঞানের ডিপ্লোমা পায় নাই। ১৮৯৭ খৃঃ অব্দ হইতে এই অবস্থায় উন্নতির জন্য বোম্বে গবর্ণমেণ্ট ও বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ উপায় অনুসন্ধান করিতেছিলেন, অবশেষে ১৮৯৯ খৃঃ অব্দে বোম্বে বিশ্ব-বিদ্যালয়

"লাইসেন্‌সিয়েট-ইন্‌-এগ্রিকালচার" ডিগ্রী দিবার বন্দোবস্ত করিলেন এবং যাহাতে উচ্চ-বিজ্ঞান-সম্মত কৃষি বিষয়ক শিক্ষা দান করা হয় তৎপ্রতি মনোনিবেশ করেন। বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রিভিয়াস পরীক্ষায় (কলিকাতার এফ্‌-এ) উত্তীর্ণ ছাত্রেরাই উক্ত শ্রেণীতে অধ্যয়নের অধিকার পাইবে এবং ডিগ্রী পাইয়া অন্যবিধ ডিগ্রী প্রাপ্ত ছাত্রের ন্যায় সমান আদর পাইবে এইরূপ নিয়ম হইলে ক্রমশঃ এই শ্রেণীতে পড়িবার আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। সেই জন্যই ১৯০১ খৃঃ অব্দে একজনও ডিগ্রী পায় নাই, কিন্তু ১৯০২ খৃঃ অব্দে ১ জন, ১৯০৩ অব্দে ২, ১৯০৪ অব্দে ৩, ১৯০৫ অব্দে ৬, ১৯০৬ অব্দে ৭, ১৯০৭ অব্দে ১১, ১৯০৮ অব্দে ২১, ১৯০৯ অব্দে ২৬, ১৯১০ অব্দে ৩৬, ১৯১১ অব্দে ২০ জন ডিগ্রী পাইয়াছে। এইরূপ উন্নতি দেখিয়া কর্তৃপক্ষ ১৯০৫ খৃঃ অব্দে পৃথক কলেজ স্থাপনের পরামর্শ করিয়া ১৯০৮ অব্দের জানুয়ারী মাস হইতে পুনা বিজ্ঞান-কলেজ হইতে কৃষি-বিজ্ঞান শ্রেণী পৃথক করিয়া পুনা কৃষিকলেজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ১৮০৯ খৃঃ অব্দ হইতে বোম্বে বিশ্ব-বিদ্যালয় আরও নূতন নূতন অদল বদল করিয়া "বেচিলর-অব্‌-এগ্রিকল্‌চার" ডিগ্রী দিবার নিয়ম করিয়াছেন। ব্যাবহারিক শিক্ষার জন্য বহু পরিমাণ চাষের জমি উক্ত কলেজের সহিত সংলগ্ন করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং গবেষণা কার্য্যের জন্যও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। বোম্বে প্রেসিডেন্সীর মধ্যে ইহা এখন আদর্শ কৃষি-কলেজ।

১৯১১ খৃঃ অব্দের ১৮ই জুলাই তারিখে বোম্বে প্রেসিডেন্সীর গবর্ণর স্যার জর্জ ক্লার্ক বাহাদুর পুনা কৃষি-কলেজের নব মন্দিরের উদ্বোধন কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। পুনা কৃষি-কলেজে উচ্চ কৃষি-বিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য এক্ষণে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে ছাত্রগণ আসিতেছে। প্রত্যেক বৎসর ৪০ জনের অন্যূন ছাত্র নূতন ভর্ত্তি হইতেছে এবং প্রায় প্রত্যেক বৎসরই শতাধিক ছাত্র সর্ব্বসমেত এই কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। (১) এই কলেজে তিন বৎসর পড়িতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাবহারিক শিক্ষা প্রদত্ত হইয়া থাকে। জমিদার বা ধনী কৃষক-সন্তানগণও এক বৎসরের জন্য এই কলেজে আসিয়া যাহাতে ব্যাবহারিক শিক্ষালাভ করতঃ নিজেদের কৃষিক্ষেত্রে তাঁহাদের শিক্ষালব্ধ জ্ঞানের পরিচালনা করিতে পারেন তাহারও বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। (২) ইহা কেবল পড়া বা ব্যাবহারিক শিক্ষার কেন্দ্র নহে, এখানে কৃষি বিজ্ঞানের গবেষণা করাও হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত (৩) ইহা সর্ব্বপ্রকার কৃষি-বিষয়ক

সংবাদ ও কৃষি-বিজ্ঞানের উন্নতিমূলক নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কারের কেন্দ্রস্থান। প্রতি বৎসরেই কলেজ ও কলেজ সংলগ্ন কৃষিক্ষেত্র দেখিবার জন্য কৃষিজীবিগণ এখানে সমবেত হইয়া বীজ, অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্য সমূহ ও নূতন নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়া থাকে। এইরূপে শিক্ষা, গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহ এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া পুন কৃষিকলেজ প্রতি বর্ষেই ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। শ্রীযুক্ত হ্যারোল্ড এইচ ম্যান্ ডি, এস্‌সি সাহেব বাহাদুর এখন এই কলেজের প্রিন্সিপাল।

পুনা কৃষিকলেজে প্রত্যেক জুন মাসে বৎসর আরম্ভ হয়। ইণ্টার-মিডিয়েট্ আর্ট্ বা সায়ান্স পাশ করিলে তবে এই কলেজে প্রবেশাধিকার হয়। মাসিক ১৫৲ টাকা পরিমাণ ৮টী গবর্ণমেণ্ট বৃত্তি আছে, উহা তিন বৎসর পর্য্যন্ত স্থায়ী, বম্বে প্রেসিডেন্সীর ছাত্র না হইলে পাইবে না। ২৫৲ টাকা করিয়া দুইবারে বার্ষিক ৫০৲ টাকা কলেজ ফি দিতে হয়। বোর্ডিং ও লজিংএর সুন্দর বন্দোবস্ত আছে। ভারতের যে কোন প্রান্ত হইতে ছাত্রগণ গিয়া সেখানে অনায়াসে থাকিতে পারেন। তিন বৎসরের পর বম্বে বিশ্ববিদ্যালয় বি, এ-জি ডিগ্রী দিয়া থাকেন। এগ্রিকলচার ডিপার্টমেন্টে ইহাঁদের দাবী সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যিনি কৃষিজীবী ব্যক্তির সন্তান বা যাঁহার পরিবার কৃষিতে অনুরক্ত তাঁহারই আবেদন সর্ব্বাগ্রে গ্রাহ্য হইয়া থাকে।

পুনা কৃষি-গবেষণা মন্দির ও কৃষিকলেজ।

১৯০৩ খৃঃ অব্দে মিষ্টার হেন্‌রী ফিপস্ সাহেব তদানীন্তন ভারতের বড়লাট লর্ড কর্জ্জন বাহাদুরের হস্তে ২০,০০০ পাউণ্ড (পরে উহা ৩০,০০০ পাউণ্ড পর্য্যন্ত) ভারতের কোন সাধারণ হিত সাধনের জন্য—বিশেষতঃ কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্য—দান করিয়াছিলেন। ঐ টাকার কতকাংশ দক্ষিণ ভারতের কুনূর পেষ্টেউর ইনষ্টিটিউট্ স্থাপনের জন্য ব্যয়িত হয়। অবশিষ্টাংশ ভারতের অধিবাসিদিগের অবলম্বিত কোন প্রধান ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার কেন্দ্র ভূমি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্যয় করার পরামর্শ করা হয়। তদনুসারে ভারত গবর্ণমেণ্ট প্রায় ১৩০০ একার পরিমিত ভূমিসহ পুষায় একটী উচ্চধরণের আদর্শ কৃষিবিজ্ঞান গবেষণা মন্দির ও শিক্ষাবিষয়ক কলেজ স্থাপন করিয়াছেন।

১৯০৩ খৃঃ অব্দে যখন ইহা প্রথম স্থাপিত হয় তখন ইহা ভারতের তদনীন্তন কতিপয় কৃষি-কলেজ ও কৃষিস্কুল সমূহে সাধারণ কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য

পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। এদেশের কৃষিপদ্ধতির সম্যক্ স্থায়ী উন্নতি সাধনই এক্ষণে প্রথম ও অতি প্রয়োজনীয় চিন্তার বিষয়। সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বজনবিদিত করিয়া যাহাতে বৈজ্ঞানিক ও ব্যাবহারিক কৃষিশিক্ষার সর্ব্বত্র প্রচলন করা যায় এবং যাহাতে শিক্ষাদান ও গবেষণার জন্য এদেশকে স্বাবলম্বনের পথে অগ্রসর করা যাইতে পারে তাহাই এক্ষণে বাঞ্ছনীয়। তজ্জন্যই প্রত্যেক প্রদেশে একটী করিয়া উচ্চ ধরণের কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইবে—তথায় ছাত্রেরা তিন বৎসর ধরিয়া সাধারণ কৃষি-বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষা লাভ করিবে। পুষা কৃষি-কলেজে ঐ সমস্ত প্রাদেশিক কলেজ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণের জন্য পোষ্ট-গ্র্যাজুয়েট কোর্ষ নির্দ্ধারিত হইয়া কৃষি-বিজ্ঞানের কোন একটি বিশেষ বিষয়ে যাহাতে সম্যগ্রূপে ব্যাবহারিক ভাবে শিক্ষিত হইতে পারেন, তাহার ব্যবস্থা করা হইতেছে।

এখানে সংযুক্ত কৃষিক্ষেত্রে সকল প্রকার শস্য উৎপাদিত হইতেছে। নীল ও তামাক প্রভৃতি উৎপাদিত হইতেছে। পশুশালা আছে, ছাত্রগণের ব্যাবহারিক শিক্ষা ও পরিদর্শনের সুবিধা আছে। সুবৃহৎ লেবরেটরী রহিয়াছে। ছাত্রগণের জন্য হোটেল ও বাসস্থান ইত্যাদির সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। বেঙ্গল নর্থ ওয়েষ্টার্ন রেলওয়ের ওয়েনি ষ্টেশন হইতে ৬ মাইল দূরে পুষা-কলেজ। (১) এগ্রিকল্‌চারাল কেমিষ্ট্রী (২) একোনমিক বটানী (৩) একোনমিক এণ্টোমলেজী (৪) মাইকোলজী (৫) এগ্রিকল্‌চারাল ব্যাক্‌টেরিওলজী (৬) এগ্রিকলচার। এই কয়টী বিষয়ের কোন না কোন একটী একবারে দুই বৎসরের উপর ধরিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। প্রত্যেক বৎসরে ৪৪ জনের অধিক ছাত্র লওয়া হয় না। ১লা এপ্রেলের পূর্ব্বে প্রিন্সিপ্যালের নিকট দরখাস্ত করিতে হয়। ভারত গবর্ণমেণ্টের এগ্রিকল্‌চারাল অ্যাড্‌ভাইসার মহোদয়ই এই কলেজের ডিরেক্টর বা প্রিন্সিপ্যাল। প্রত্যেক প্রদেশ হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া ডিরেক্টর মহোদয় নির্দ্দিষ্ট কতিপয় ছাত্রগণেরই প্রবেশাধিকার দিয়া থাকেন। যে কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট হইলেই তিন প্রকারে ছাত্রসমূহ মনোনীত হইবে:—(১) প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট বা অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেশন কর্ত্তৃক মনোনীত, (২) ভারতীয় করদ বা মিত্ররাজ্য হইতে প্রেরিত ও ডিরেক্টর মহোদয় কর্ত্তৃক মনোনীত, (৩) প্রাইভেট—ডিরেক্টর মহোদয়ের আদেশ প্রাপ্ত। প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের প্রেরিত ছাত্রগণের বৃত্তি দিতে পারেন। ঐ বৃত্তির পরিমাণ মাসিক ৫০্ টাকার অধিক হইবে না। পুস্তক ব্যতীত বোর্ডিং লজিং

ও কলেজ-ফি ইত্যাদিতে একটী ছাত্রের মাসিক অন্যূন ২৫৲ টাকা পরিমাণ ব্যয় হইতে পারে—এইরূপ হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে। এই কলেজ হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রগণ ভারতের কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করিয়া যাহাতে দেশের কল্যাণ সাধন করিতে পারে তাহাই বাঞ্ছনীয়। ভারত এককালে নিজের পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইতে পারিবে এবং কৃষিজাত দ্রব্যে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের অভাব দূরীকরণ করিতে পারিবে—এইরূপ আশা ভারত-গবর্ণমেণ্ট পোষণ করেন, দেশের লোকেও চিন্তা করেন।

সাবার কৃষিকলেজ।

"বিহার ও উড়িষ্যা" প্রদেশ সে দিন পৃথক্ হইয়া নূতন গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে বলিয়া আমরা সাবার কলেজ বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে পৃথক দেখিতেছি। সাবার কলেজ বেঙ্গল এগ্রিকালচারাল কলেজ নামেই বিখ্যাত ছিল। যদিও "বিহার-উড়িষ্যা" গবর্ণমেণ্টের হাতে উহা গিয়াছে বটে, কিন্তু বঙ্গদেশ ও আসাম হইতে ছাত্রেরা তথায় গিয়া অধ্যয়ন ও ব্যাবহারিক শিক্ষালাভ করিতে পারে। এই কলেজ-সংশ্লিষ্ট প্রায় ২০০ একার পরিমিত স্থান আদর্শ কৃষিক্ষেত্ররূপে ব্যবহৃত হয়, নানাপ্রকার শস্যাদি ও কৃষিজাত তরুলতার উৎপাদনের পরীক্ষা করা হয়। কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার উৎকৃষ্ট লেবরাটরী ও সুন্দর বাগান আছে। এখান হইতে শিক্ষালাভের পর উচ্চকৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার জন্য মনোনীত ও নির্ব্বাচিত ছাত্রেরা পুষায় প্রেরিত হয়। তিন বৎসর শিক্ষালাভের পর "লাইসেন্‌সিয়েট-ইন্‌-এগ্রিকল্‌-চার" ডিপ্লোমা পাইয়া গবর্ণমেণ্ট সার্‌ভিসে এগ্রিকলচার ডিপার্টমেণ্টে নিযুক্ত হইতে পারেন। বৎসরে কলেজ ফি সর্ব্বসমেত ৫০৲ টাকা চারি সমান কিস্তিতে আদায় দিতে হয়। ২১ বৎসরের অনধিক বয়স্ক ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করা ছাত্রেরা প্রবেশাধিকার পাইয়া থাকে। মৌলিক কৃষিজীবী বা কৃষিতে অনুরক্ত ব্যক্তির সন্তানগণের আবেদন আগে মঞ্জুর হইয়া থাকে। এমন কি কোন কোন বিশেষ স্থলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ না হইলেও প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে। তিন চারিটী ফ্রীশিপ আছে, এখানেও বোর্ডিং লজিং প্রভৃতি সমস্ত কলেজের তত্ত্বাবধানে রহিয়াছে। মাসিক মোটের উপর ২০।২২ টাকা ব্যয় করিলে একটী ছাত্র তিন বৎসরে (L. Ag) ডিপ্লোমা পাইতে পারে। অন্যান্য বিষয় To the Principal, Provincial Agricultural College, Sabour, Dist. Bhagalpur এই ঠিকানায় পত্র লিখিলেই অবগত হওয়া যায়।

মাহিষ্য জাতি বৈশ্যবর্ণান্তর্গত, কৃষিই ইহাঁদের জাতীয় বৃত্তি ও ব্যবসা;

উচ্চকৃষিবিজ্ঞান শিক্ষা করিয়া যাহাতে স্ব স্ব ভূমিতে উন্নত পদ্ধতি-ক্রমে নূতন নূতন শস্যাদি উৎপন্ন করতঃ দেশে কৃষির নূতন স্রোত প্রবাহিত করিতে পারেন, ধান গম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় কৃষিজাত যাহাতে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে উৎপাদন করিয়া দেশে ধনাগমের পন্থা উন্মুক্ত করিতে পারেন, তজ্জন্য কৃতবিদ্য যুবকগণ অগ্রসর হইবেন আশা করি। ভারতে এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট পরিচালিত পুনা, পুষা ও সাবার ব্যতীত আরও কৃষিকলেজ রহিয়াছে। পরে আরও প্রতিষ্ঠিত হইবে। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর মধ্যে কৃষিকলেজ বর্ত্তমানে নাই, আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করি যে, যাহাতে প্রত্যেক জেলায় অন্ততঃ ১ একটী করিয়া কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষার জন্য কৃষি স্কুল ও প্রেসিডেন্সীর মধ্যে অন্ততঃ ১ একটী প্রভিন্সিয়াল কলেজ শীঘ্র সংস্থাপিত হইয়া এই কৃষিপ্রধান দেশে উন্নত কৃষিবিজ্ঞানের বিস্তার হয়। মাহিষ্য, আগুরী ও সদোগাপ জাতিই এদেশে প্রাচীন কাল হইতে মৌলিক কৃষিজীবী সম্প্রদায়; অতি প্রাচীনকালে এদেশে মুশলমান ছিল না। এক্ষণে অপর যাঁহারা, মুসলমানই হউন বা অন্যান্য হিন্দুজাতিই হউন, কৃষির উপর নির্ভর করিয়াছেন, তাঁহারা অপরের বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন। মৌলিক কৃষিজীবী জাতিত্রয়ের মধ্যে অপর দুই জাতির সংখ্যা বড় কম, মাহিষ্য জাতি সংখ্যায় বিশ লক্ষ। ইহাদের মধ্যে ১১ হাজার জমিদার ও শতকরা ৮৫ জন কৃষক। সুতরাং কৃষির উন্নতিতে মাহিষ্য জাতির আর্থিক উন্নতি। উন্নত কৃষিবিজ্ঞান শিক্ষায় মাহিষ্য ছাত্রগণের অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য। তাহাতে ধনাগমের পন্থা উন্মুক্ত হইবে।

শিবপুর কলেজে পড়িয়া সিভিল ইঞ্জিনীয়ার হইয়া গবর্ণমেণ্টের বড় চাকরী ভিন্ন আর কিছুই হয় নাই। বি-এল্ পাশ করিয়া উকীল, ব্যারিষ্টার এটর্ণী হইলে কেবল দেশে মামলা মোকদ্দমার সৃষ্টি ও মনোমালিন্য বৃদ্ধি হইতে পারে। যাঁহারা তাহা তে উপযুক্ত নহেন, তাঁহারা দুর্ব্বল কেরাণীগিরির উপর নির্ভর করিতেছেন, কিন্তু সাবার কৃষি-কলেজে ও পুষা কৃষি-গবেষণা-মন্দিরে মস্তিষ্ক পরিচালনা করতঃ যাহাতে মানবজাতির জীবনরক্ষা রূপ মহাকার্য্যের জন্য জীবন সমর্পণ করিতে পারেন, তাহা কি শ্রেয়ঃ নহে? ডাক্তার হইলে অসুস্থ জীবনের উপর লক্ষ্য পড়ে। কিন্তু এই পৃথিবীর যে কোন অংশেরই হউক না কেন, দুর্ভিক্ষরূপ রাক্ষসের গ্রাস হইতে আবালবৃদ্ধবনিতার সুস্থ ও সবল জীবনের রক্ষারূপ মহাব্রত কি জীবনের চরম লক্ষ্য হইতে পারে না? আসুন মাহিষ্য যুবকবৃন্দ,-সোৎসাহে ভারতে কৃষি-কলেজ প্রতিষ্ঠার মহদুদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধর্ম্মঅর্থকামমোক্ষ চতুর্ব্বর্গলাভের পন্থায় পাদক্ষেপ করিবেন আসুন।

ভেষজ-বিহীন চিকিৎসা-বিজ্ঞান (২)।

ঔষধ সেবন না করিয়াও যে উপায়ে রোগ আরোগ্য হইতে পারে—তাহার একটী প্রক্রিয়া নিম্নে লিখিত হইল।

অনেকেই মেদ রোগে বিশেষ কষ্ট পাইয়া থাকেন। স্থূল-শরীর-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ একটি মাংসপিণ্ড বিশেষ, গ্রীষ্মকালে তাঁহাদের যন্ত্রণার অবধি নাই। তাড়াতাড়ি তাঁহারা কোনও স্থানে যাতায়াত করিতে পারেন না। বিপুল-দেহের জন্য তাঁহারা সংসারের কষ্টসাধ্য কোন কার্য্য করিতে পারেন না। নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করিলে উক্ত রোগের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারা যায়।

প্রতিবার আহারের একঘণ্টা পূর্ব্বে ও শয়নের আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে ৬ আউন্স মাত্রায় গরম জল একবার বা তিনবার পান করিতে হইবে। পাকস্থলীর অবস্থা বিবেচনায় প্রথমতঃ ৬ আউন্স বা তদপেক্ষা অল্প মাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে মাত্রা বৃদ্ধি করা ভাল। অতিরিক্ত বা অতি অল্প পরিমাণ তরল দ্রব্য পান এই দুইটিই তুল্যাংশে অনিষ্টকর, ইহা বিবেচনা করিয়া প্রথমতঃ নিতান্ত অল্প বা অধিক মাত্রায় জলপান করিবে না। বমন না হইতে পারে এজন্য ভোজনের একঘণ্টা পূর্ব্বে গরম জল পান বিধি, কারণ ইহার পর ভোজন করিলে পাকস্থলীতে জল থাকিতে পারে না বলিয়া পাকস্থলী পরিষ্কৃত হইয়া কার্য্যক্ষম হয়। কোনপ্রকার পানীয় দ্রব্য পানের ইচ্ছা হইলে ভোজনের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে বা দুই ঘণ্টা পান করিবে। আহারের অব্যবহিত পরে জল বা দুগ্ধাদি পান একেবারে নিষিদ্ধ। জল যত উষ্ণ থাকিতে পান করিতে পারা যায় তত উষ্ণ থাকিতে পান করিবে এবং এরূপ পান বিশেষ উপকারী; ঈষদুষ্ণ জল বমনকারক ও তেমন উপকারী নহে। অল্প পরিমাণে কপিপাতা গোল আলু, কদলী প্রভৃতি শাক সবজী সিদ্ধ করা ছাঁকা জল, বা অম্লমধুর স্বাদ বিশিষ্ট ফলের যূষ অথবা আররুট ও বার্লি সহ সিদ্ধ করা কাফি এইরূপ বিভিন্ন প্রকার তরল পানীয় প্রতিদিন পরিবর্ত্তন করিয়া গরম গরম পান করিবে। উক্ত পানীয় সুস্বাদু করণার্থ উহাতে লেবুর রস মাখন অথবা সামান্য পরিমাণ লবণ সংযোগ করিয়া লইবে। বলা বাহুল্য যে, পানীয় যাহাতে জলের ন্যায় পাতলা হয় তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে।

শরীরে শতকরা ৭৫ ভাগ জল আছে এবং উপযুক্তরূপ কার্য্য করিবার জন্য

প্রচুর পরিমাণ তরল দ্রব্য আবশ্যক। গরম জল ব্যবহারে আভ্যন্তরীণ স্নানের কার্য্য উত্তমরূপ সম্পন্ন হয়, কারণ ইহা দ্বারা শরীরের প্রত্যেক অংশ দিয়া দেহস্থ দূষিত পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় বহির্গত হয়। আরও ইহা দ্বারা অন্ত্রের সহিত সংযুক্ত পাকস্থলীর নিম্নমুখের মাংসপেশী শিথিল হয়, পাকস্থলীর নিম্ন ভাগের ক্রিয়া উত্তেজিত করে এবং কর্দ্দমবৎ পদার্থ আম ও পিত্ত তাহাদের নির্দ্দিষ্ট পথ দিয়া জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া অধোগামী হয়, এজন্য রক্ত ও মূত্রাশয় দিয়া পিত্ত নিঃসরণ না হইয়া তাহা ঐ প্রকারে পরিষ্কৃত হয়। ঐ নিঃসারণের গুণে খাদ্য হইতে পরিণত চট্‌চটে, রজ্জুবৎ ও তন্তুময় পদার্থ পাতলা হইয়া যায় ও অন্যান্য পদার্থ দ্রবীভূত হয়। উত্তাপের ঐরূপ মৃদুশক্তি আভ্যন্তরীণ প্রয়োগে পেটের খিল ধরা ও পেট বেদনা বা শ্বায়ুশূল আরোগ্য লাভ করে। গরম জল পানের পর শরীরের ত্বকের মধ্যস্থ ছিদ্র দিয়া ঘর্ম্ম নির্গত হওয়াতে চর্ম্ম সুন্দর দেখায় এবং দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শুষ্ক শ্লৈষ্মিক ঝিল্লী সমূহ আর্দ্র হয় ও বরফ সংযুক্ত ঠাণ্ডা পানীয় গ্রহণের ইচ্ছা ফলবতী হওয়ায় মদ্যপায়ীগণের মদ্য পানের ইচ্ছা ক্রমশঃ হ্রাস প্রাপ্ত হয়। মদ্য উত্তেজক পানীয় এজন্য তদ্বারা স্নিগ্ধ পানীয় গ্রহণের লালসা চরিতার্থ হয় না।

ভুক্ত দ্রব্য পাকস্থলীর মধ্যে গিয়া কার্বনিক এসিড গ্যাস ও এলকোহল উৎপন্ন করে। ঐ গ্যাস গলনালী উত্তেজিত করায় কাসি উৎপন্ন হয় এবং তদ্বারা সময় সময় স্বরভঙ্গ হয়। মিষ্ট ও শ্বেতসার বিশিষ্ট খাদ্য পাকস্থলীর সঙ্গে প্রচুর এলকোহল উৎপন্ন করে, তদ্দ্বারা অভ্যন্তরস্থ কতিপয় অংশ বিশেষ রূপে উত্তেজিত হয়। এই প্রকরে গ্যাস ও এলকোহল সম্বন্ধীয় উচ্ছলন ক্রিয়া দমনার্থে গরম জল পান ব্যতীত অন্য কোন উপায় নাই।

স্থূল দেহ শোধনের জন্য সাধারণতঃ ৬ মাস কাল আবশ্যক হয়, এজন্য পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুযায়ী গরম পানীয় ব্যবহার করিবে। ১২।১৪ দিনের পর ৬।৭ দিন পর্য্যন্ত পানীয় দ্রব্য সেবন বন্ধ রাখা উচিত। প্রতিদিন কোনও দ্রব্য সেবন করিলে তাহা ক্রমশঃ শরীরে সহ্য হইয়া যায়, বিশেষ ক্রিয়া দর্শায় না,—এজন্য মাঝে মাঝে কিছুদিন গরম জল পান বন্ধ রাখিবে। দুষ্পাচ্য দ্রব্য পরিপাক না হইলে গজলাইয়া উঠে, গরম জল পানে সেই দূষিত পদার্থ স্থানান্তরিত ও শোধিত হওয়ায় বিকৃত, ক্লেশকর ও অবসাদজনক ভাব তিরোহিত হয়, তজ্জন্য শারীরিক প্রফুল্লতা ও কার্য্যদক্ষতা উপস্থিত হয়।

গরম জল পান কালে আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সমূহের কার্য্য বৃদ্ধি করিতে পারিলে, ইহার পরিষ্কারকরণ ক্রিয়া শীঘ্র শীঘ্র সম্পন্ন হয়। শারীরিক অঙ্গচালনা দ্বারা এই ক্রিয়া উত্তেজিত ও বর্দ্ধিত করিতে পারা যায়। বক্ষঃস্থল ও উদরের মধ্যস্থিত পেশী ও উদর প্রাচীরের মাংসপেশী আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিবার জন্য অঙ্গ চালনা করিতে হয় ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ উপরের ও নীচের দিকে এবং সম্মুখ ও পশ্চাতের দিকে সঞ্চালন করিতে হয়। উক্ত প্রক্রিয়া সাধন জন্য প্রতিদিন নিম্নলিখিত নিয়মে সকালে ও বৈকালে অন্যূন অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল ব্যায়াম আবশ্যক।

ব্যায়াম অভ্যাস কালীন ৬ মাস কাল আহারের বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। অতিরিক্ত ঘৃত, মাখন ও চর্ব্বি সংযুক্ত দ্রব্য, মাংস ও অন্যান্য গুরুপাক ও দুষ্পাচ্য দ্রব্য প্রভৃতি ভোজন ও মদ্যপান নিষিদ্ধ। একবন্ধা দুগ্ধ অল্প পরিমাণ ব্যবহার করিলে ক্ষতি নাই।

(১) একটি মোটা দড়ীতে এক ফুট আন্দাজ ব্যবধানে ১০।১২টি গ্রন্থি দিবে ও দড়ীটি গৃহের কড়ি কাঠে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখিবে। ব্যায়াম কালীন ঐ রজ্জুর এক একটি গ্রন্থি হস্তে ধরিয়া (পায়ের সাহায্য না লইয়া) ছাদের দিকে উঠিবে ও নামিবে। কেবল হাতের জোরে শরীরের ভার উঠাইবার চেষ্টা করিবে।

(২) এক পায়ে ভর দিয়া দাঁড়াইবে ও সেইরূপে উপবেশন করিবে। ঐ প্রকার উভয় পায়ে পর পর অভ্যাস করিবে। বসিয়া হঠাৎ উঠিবে না বা দাঁড়াইয়া হঠাৎ বসিবে না, ইহাতে অনিষ্টের আশঙ্কা আছে।

(৩) পদদ্বয় পাশাপাশি রাখিয়া দাঁড়াইবে ও ক্রমে ক্রমে বক্রভাব অবলম্বন করিয়া উভয় হস্ত দ্বারা মৃত্তিকা স্পর্শ করিবে ও পদদ্বয়ের অঙ্গুলির অগ্রভাগ হইতে উভয় হস্তের অঙ্গুলির ব্যবধান যেন একহস্ত হয়। এইরূপ অবস্থায় ডাম্বেল বা তদনুরূপ কোন ভারী দ্রব্য মৃত্তিকা হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত উঠাইবে ও নামাইবে।

(৪) দাঁড়াইয়া বসিবে ও উভয় হস্ত সম্মুখ দিকে প্রসারণ করিয়া অন্য কোন ভারীদ্রব্য উভয়হস্তে একবারে গ্রহণ করিবে ও সেই অবস্থায় (সম্মুখ দিকে হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক) দাঁড়াইবে। বসিবার সময় হস্তদ্বয় সম্মুখ দিকের পরিবর্ত্তে পশ্চাতের দিকে প্রসারণ করিবে। উপর্য্যুপরি ১০।১৫ মিনিট এই প্রক্রিয়া অবলম্বন করিবে।

(৫) হরিজণ্টাল বার বা তৎসদৃশ অন্য কোন জিনিস উভয় হস্তে ধরিয়া সমস্ত শরীর এককালীন ঊর্দ্ধদিকে তুলিবার চেষ্টা করিবে।

(৬) স্নানকালে সন্তরণ দিবে এবং সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে এক ঘণ্টা অতি দ্রুতবেগে ভ্রমণ করিবে।

(৭) সুবিধা হইলে বাইসিকেলে আরোহণ করিয়া অন্যূন ১ ঘণ্টাকাল প্রতিদিন অপরাহ্নে ভ্রমণ করিবে।

(৮) ৩।৪ দিন বাদে একদিন সন্ধ্যার পর মেরুদণ্ডের উপরে হস্তদ্বারা ১০।১৫ মিনিট কাল ঘর্ষণ করিয়া রক্ত সঞ্চালনের ক্রিয়া বৃদ্ধি করিবে।

উল্লিখিত ব্যায়াম অভ্যাস করিবার সঙ্গে সঙ্গে দেহের উপরিভাগের নীলবৎ স্নায়ুসমূহের দৃঢ়তা ও শক্তি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে ও যে সমূহ মাংসপেশী আভ্যন্তরীণ যন্ত্র সমূহে সংযুক্ত আছে, তাহারা প্রকৃত স্থান অধিকার করিবে। ইহার ফলে শরীরের এক যন্ত্র হইতে অন্য যন্ত্রে রক্তের সূক্ষ্মগতির অক্ষমতা দূর হইবে ও শরীরের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত স্থূল অঙ্গসমূহ ক্রমশঃ হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়া শরীর সবল ও সুদৃঢ় হইবে।

ব্যায়ামকালীন মানসিক প্রফুল্লতা রক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। মানসিক বৃত্তিসমূহ নিকৃষ্ট চিন্তার বশবর্ত্তী হইলে রক্তের গতি দূষিত করিতে থাকে এবং জীবনীশক্তি নষ্ট হইবে এমন আশঙ্কা জন্মাইলে, অন্ত্র ও ধমনীর সহিত সংযুক্ত শিরা সকলের কার্য্য দুর্ব্বল হয়; এপ্রকার অবস্থায় ব্যায়ামের অধিকাংশ আশানুরূপ কার্য্যকরী হয় না।

শ্রীআশুতোষ জানা।

অবনতির ইতিহাস (৫)।

ঘোটক, গর্দ্দভ ও অশ্বতরের পৃষ্ঠে কিম্বা নৌকায় মূল্যবান্ পণ্যদ্রব্য স্থাপন করিয়া মাহিষ্য বণিককুল সশস্ত্রে বহির্গত হইতেন। নানা দেশজনপদে ক্রয় বিক্রয় করিতে হইত। বহু স্থানে প্রবল দস্যুদলের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতে হইত। অনেক সময়ে কোন কোন দেশের নরপতিগণ এরূপ বণিক-দলকে বিজিত করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করিতে ইচ্ছুক হইতেন। ফলে সেস্থলেও যুদ্ধ হইত। বণিকগণ কোথায়ও যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতেন, কোথায়ও বা অর্থ দিয়া মুক্ত হইতেন। এইরূপে তাহারা বহু নগর ও গ্রামে বাণিজ্য করিয়া ধনরাশি সংগ্রহ করতঃ দেশে ফিরিতেন। অনেক দল দস্যু হস্তে বা গ্রামবাসী-

দিগের হস্তে নির্মূল হইয়া যাইত। কোনটী বা বিপথে পড়িয়া পানাহারের অভাবে কালগ্রাসে পতিত হইত। ভীরুদিগের পক্ষে এরূপ বাণিজ্য সম্ভবপর নহে। ইংরেজ বণিকগণও এইভাবে সশস্ত্র অবস্থায়ই এদেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। এখন ইংলণ্ড হইতে দ্রব্যাদি আনিয়া বাণিজ্য করিতে আর অস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে ও ইংরাজ রাজত্বের প্রাথমিক অবস্থায় পশ্চিমাঞ্চল হইতে বহু কাবুলী, পারসী, মাড়োয়ারী বণিক এদেশে আসিতে মাহিষ্যগণ প্রতিযোগিতায় হীন হইয়া পড়েন। বিশেষতঃ তখন পূর্ব্বাপেক্ষা পথঘাট কতক সুনির্ম্মিত ও রক্ষিত হইয়া যাওয়াতে এদেশীয় নবশাখ শ্রেণীর বহু ব্যক্তিও সওদাগরী আরম্ভ করেন। সশস্ত্র বণিকদিগকে দস্যু মনে করিয়া অনেক সময়ে রাজদরবারে লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। কাজে কাজেই মাহিষ্য বণিককুল বাণিজ্যে হতোৎসাহ হইয়া যান। সেই অবধি সওদাগরিতে অবনতি ঘটিয়াছে।

দোকানদারি ব্যবসায়ে মাহিষ্যগণ কোনকালেই বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। বিশেষতঃ অনেক পণ্যের ক্রয় বিক্রয় কার্য্য জাতি বিশেষের একচেটিয়া থাকাতে এবং শাস্ত্রে নিষেধ থাকা গতিকে মাহিষ্যগণ সে সমুদয় ঘৃণা করিতেন। তথাপি অনেকে পূর্ব্বাপর দোকানদারী করিয়া আসিতেছেন সন্দেহ নাই।

এখন কি সওদাগরী, কি দোকানদারী সমুদয় ব্যবসায়েরই প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। যাতায়াতে সুবিধা, শান্তিস্থাপন এবং সংবাদ প্রেরণের অভাবনীয় সুযোগ উপস্থিত হওয়াতে বাণিজ্যের রীতিনীতি নূতন রকমের হইয়াছে। বিশেষতঃ শিক্ষা ও আচার ব্যবহারের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদিরও ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে। সুতরাং এখনকার উপযোগী প্রণালীতে ব্যবসায় না করিলে লাভের আশা বিরল। যে সকল জাতি পূর্ব্বে বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিত সাহসী হইত না, তাহারাও আজকাল লেখা পড়া শিখিয়া ব্যবসা বাণিজ্যের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছে, এবং নূতন ধরণে কারবার ও দোকানদারী আরম্ভ করিয়া লাভবান হইতেছে। মাহিষ্যগণ যদি অতি সত্বর বাণিজ্য শিক্ষা করিয়া নূতন প্রণালী অবলম্বন না করেন তবে কতিপয় বৎসর পরে অবস্থা অতীব শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। তখন প্রতিযোগিতায় পরাজিত হইয়া সর্ব্বত্র বিফল মনোরথ ও দারিদ্র্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে সন্দেহ নাই। বাণিজ্যে কি হেতু অবনতি হইয়াছে তাহা সংক্ষেপে বিবৃত হইল। অনেকের

ধারণা মাহিষ্যজাতি বাণিজ্যে কোন দিন মনোযোগ দেন নাই। কারণ তাঁহারা বর্ত্তমানে সেরূপ চিহ্ন দেখিতে পান না। আর এই ভ্রান্ত ধারণার বশে অনেকে একার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ভয় পাইয়া থাকেন। আমাদের বিশ্বাস শিক্ষার কিঞ্চিৎ বিস্তৃতি ঘটিলেই সকলে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। আমরা এদিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। (নব প্রণালী মতেই মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং কোম্পানীর গঠন করা যাইতেছে সুতরাং সকলেরই শেয়ার গ্রহণ করা একান্ত আবশ্যক।)

৪। কৃষিকথা।

কৃষি মাহিষ্যের শাস্ত্রসঙ্গত বৃত্তি। আর এ জাতিতে কৃষকের সংখ্যা এখনও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। প্রায় শতেক বৎসর পূর্ব্বে হাণ্টার সাহেব তদীয় পুস্তকে এ জাতিকে "কৃষিজীবী জাতি" নিচয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে কথা এই, যদি আমরা কৃষিকার্য্যেই রত থাকিলাম তবে কৃষিতে কি অবনতি ঘটিল? ইহার উত্তর এই যে, লেখাপড়া বা জমীদারীতে আমাদের যে আকারের অবনতি ঘটিয়াছে, এদিকে সে আকারের নহে। ঐ সকল বিষয়ে অন্যান্য জাতিগণ আমাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া যাওয়াতে আমরা নিম্নে পড়িয়া গিয়াছি। কিন্তু কৃষিতে যদিও কেহ এ জাতিকে আজ পর্য্যন্ত পশ্চাৎপদ করিতে পারে নাই, তথাপি যদি এখন সতর্ক না হওয়া যায়, তবে অতি সত্বর গুরুতর অনর্থ ঘটিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা স্বতন্ত্র প্রবন্ধে একথার বিস্তৃত আলোচনা করিব। সম্প্রতি ইহা বলা যায় যে, বর্ত্তমানে ভূমির উর্ব্বরাশক্তি হ্রাস পাওয়াতে পূর্ব্বে যে প্রণালীতে কৃষিকার্য্য চলিত এখন আর সে প্রণালী অবলম্বন করিলে চলিবে না। নবনীতি শিক্ষা করিয়া ভূমিতে প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপাদন করা আবশ্যক। এ বিষয়ে শিক্ষা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নানা উপায় অবলম্বন করিতেছেন। স্কুল, কলেজ, কৃষিশালা প্রভৃতি স্থাপিত হইতেছে। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রকৃত কৃষিব্যবসায়ী মাহিষ্যগণ ঐ দিকে কিছুমাত্র যত্ন বা আগ্রহ প্রদর্শন করিতেছেন না। ইহার ফল এই হইবে যে, এক শ্রেণীর লোক আগ্রহ করিয়া ঐ সকল বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে এবং করিবে। তাহারা পরে কৃষি বিভাগটি আয়ত্ত করিয়া ফেলিবে। আর উত্তম শিক্ষা সম্পন্ন হইলেই নানা উপায়ে ভূমি হস্তগত করিয়া দ্রুতবেগে কৃষি-কার্য্যে উন্নতি করিতে থাকিবে। তখন নিরক্ষর মাহিষ্য কৃষক-কুল কি করিবেন একবার ভাবিয়া দেখুন। সে সময় অন্যগতি না দেখিয়া সকলেই নূতন

লোকদের মজুর বা কর্ম্মকর হইয়া স্বাধীনতা হারাইবেন। সে ভয়ানক পরিণামের কথা মনে হইলেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়। তখন অর্থ সঞ্চয় করিয়া কৃষিশিক্ষা করা, তার পর ব্যবসায় করা, বড়ই কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। আমরা একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। চাহিয়া দেখুন, কর্ম্মকার বা সূত্রধর জাতির কি অবস্থা। পূর্ব্বে মুসলমান শাসনকালে সরকারের যাবতীয় কার্য্য উহারা করিত। অস্ত্র, শস্ত্র, নৌকা, গাড়ী, কপাট, জানালা প্রস্তুত করণ, সরকারী অফিস, দুর্গ, রাজপ্রসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ, নক্সাকরণ, এবং গৃহের যাবতীয় আসবাব পত্র প্রস্তুত করণ, সেতু নির্ম্মাণ ইত্যাদি কার্য্য কর্ম্মকার ও সূত্রধর দ্বারা করান হইত। ফলে ঐ সকল জাতির মধ্যে বহু ধনী ও কর্ম্মকুশল লোক বিদ্যমান ছিলেন। তারপর ইংরাজের রাজত্বকালে এদেশে ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ও কলেজ হওয়া অবধি তাহাদের সে সৌভাগ্য লোপ পাইয়াছে। এখন এই সকল স্কুল কলেজে পড়িয়া যাহাদের কোনও পুরুষে এ সব কর্ম্ম করে নাই, সেই সমুদয় লোক ইঞ্জিনিয়ার, নক্সাকারী, ওভারসিয়ার প্রভৃতি কার্য্য করিতেছেন। সরকারী যাবতীয় কাজ-কর্ম্ম তাহারাই করিতেছেন, এবং কণ্ট্রাক্‌টারী প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা সহস্র সহস্র টাকা উপার্জ্জন করিয়া ধনী হইতেছেন। আর সেই সূত্রধর, কর্ম্মকার, লৌহকার প্রভৃতি শিল্পীজাতিরা কোথায়? ঐ দেখুন তাহারা এই সমুদয় বিরাট কার্য্যের মধ্যে মাসিক ৮।১০৲ টাকা বেতনে সামান্য কারীগরের কার্য্য করিয়া কোনরূপে পরিবার ভরণ পোষণ করিতেছে। কদাচিৎ দুই একটি লোক সামান্য একটু উন্নতি লাভ করিলেও সমগ্র জাতি ঐভাবে মজুরের কার্য্য করিয়া ক্রমেই অবনত হইতেছে। যদি উহারা প্রথম হইতে স্কুলে প্রবেশ করিত এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট বিশেষ সুবিধার প্রার্থনা করিত, তবে উহাদের যাবতীয় লোকেই এখন ইঞ্জিনিয়ারী শিখিয়া ধনবান হইতে পারিত। দিন ফিরিয়া যাইত।

পাঠক, এখন একবার নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করুন, মাহিষ্যজাতির ভবিষ্যৎ কিরূপ হইবে। শুধু চিন্তা করিলেই চলিবে না, তদনুসারে প্রতীকারের জন্যও বদ্ধপরিকর হইতে হইবে।

উপসংহার।

অবশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, আমরা প্রতি বিষয়েই অবনতির যে সময় নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহাতে দেখা যাইবে যে, ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভেই আমাদিগের দ্রুত অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। ইহাতে কেহ যেন মনে করেন না যে, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আমাদিগের অপকার করিতেছেন; তাহা নহে।

প্রকৃত কথা এই যে, গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বপ্রথমে এদেশীয় লোকদিগের রীতিনীতি আচার ব্যবহার ও সামাজিক সম্বন্ধ না জানাতে প্রথমতঃ কোনও দিকে পক্ষপাত না করিয়া শাসন আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে অনেক জাতি সুবিধা পাইয়া আপন আপন স্বার্থসাধনে যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হয়। গবর্ণমেণ্ট সর্ব্বদা উহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকাতে প্রকৃত অবস্থা বুঝিয়াও বুঝিতে পারিতেছিলেন না। অবশেষে সূক্ষ্মদর্শী রাজপুরুষগণ দেশের অবস্থা জ্ঞাত হইয়াছেন, এবং আমাদিগের উন্নতি নিমিত্ত সর্ব্বতোভাবে যত্ন করিতেছেন। এখন আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। এবং গবর্ণমেণ্টেকে আমাদের অভাব অবগত করান আবশ্যক। এতৎসঙ্গে নিজেদেরও যত্নবান হইতে হইবে। স্বাবলম্বন শিক্ষা না হইলে উন্নতি হওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, দেশে রাজশক্তি পরিবর্ত্তিত হওয়াতে আমাদের অবনতি ঘটিয়াছে। একথা ঠিক নহে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ প্রভৃতি জাতির কিছুমাত্র অবনতি ঘটে নাই, বরং উন্নতিই হইয়াছে। ইহাতেই বুঝা যায় যে, রাজশক্তি পরিবর্ত্তন কালে জাতীয় নেতৃবৃন্দের দূরদর্শিতা না থাকিলেই জাতীয় পতন হইয়া থাকে—শুধু পরিবর্ত্তনে নহে। যদি মুসলমান রাজত্বের অবসানকালে এমন কোনও স্বজাতিবৎসল মনীষি মাহিষ্য সমাজে জন্ম গ্রহণ করিতেন, যিনি জাতিকে ভবিষ্যৎপন্থা বলিয়া দিতে পারিতেন, তবে আমাদের অবনতি ঘটিত না। যাহাদের মধ্যে সে সময় ঐরূপ লোক ছিল তাহাদের পতন হয় নাই। আমরা আপন বুদ্ধি দোষেই নিম্নগামী হইতেছি। শিক্ষার মর্ম্ম বুঝিতেছি না এবং উন্নতির জন্য সমবেত চেষ্টা করিতেছি না। তবে এখনও আমাদের নিরাশ হইবার কারণ নাই। সকলে অবনতির কারণ চিন্তা করুন, তাহা হইলেই উন্নতির পথ পাওয়া যাইবে।

শ্রীবিজয় কুমার রায়।

মাহিষ্য-মণ্ডল।

(২)

মাহিষ্য-মণ্ডল এইরূপ নাম ব্যবহারের দিকে লক্ষ্য করিলেই আমাদের প্রাচীন মনু মহারাজের কথা মনে পড়ে:—

"মধ্যমস্য প্রচারঞ্চ বিজিগীষোশ্চ চেষ্টিতং এতাঃ প্রকৃতয়ো মূলং মণ্ডলস্য সমাসতঃ।"
"উদাসীন প্রচারঞ্চ শত্রোশ্চৈব প্রযত্নতঃ অষ্টৌচান্যাঃ সমাখ্যাতা দ্বাদশৈব তু তাঃস্মৃতাঃ।।"

মনু-সংহিতা, ৭ম অধ্যায়।

অর্থাৎ প্রাচীনকালে বিজিগীষু রাজা, তাঁহার শত্রু এবং তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে ও নিকটে অবস্থিত রাজাদিগকে লইয়া একটী **মণ্ডল** কল্পনা করা হইত, উক্ত "মণ্ডলে" দ্বাদশ জন নৃপতি থাকিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের স্থানে এক এক রাজার অধীন দ্বাদশজন সামন্ত নিয়োগের ব্যবস্থা হয়। রাজপুতানা প্রভৃতি স্থানে ইহাই দৃষ্ট হয়। বাঙ্গলার এই মণ্ডল পদ্ধতি "বার ভুঁইয়া" প্রথায় দাঁড়াইয়া ছিল। পাল রাজগণের সময়েই ভূঁইয়া প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে, এবং সেই সময়েই মাহিষ্যজাতীয় নেতৃবর্গ অতুল প্রতাপে পালসম্রাট্ মহীপালের হস্ত হইতে গৌড়ের শসানদণ্ড কাড়িয়া লইয়া মহারাজ দিব্যোক, রুদোক বা ভীমের হস্তে প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন (Memoirs of A. S. B. Vol. III, No. 1)। এই মাহিষ্য জাতীয় বিজয়ী বীরগণের পূর্ব্বপুরুষ-গণ নর্ম্মদাতীরস্থ মাহিষ্মতী দেশ হইতেই সমগ্র দক্ষিণাপথ এবং উড়িষ্যা ও তাম্রলিপ্ত রাজ্য হইয়া, গৌড় ও কামরূপ প্রভৃতি বাঙ্গলার প্রাচীন জনপদে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। বৌদ্ধগ্রন্থ বা পালিগ্রন্থ সমূহে সম্ভবতঃ সেই বিজয়ী মাহিষ্য বীরগণের প্রতিষ্ঠিত মণ্ডল বা সামন্ত-চক্র 'মাহিষ্য-মণ্ডল' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকিবে, এবং তাহার কেন্দ্রভূমি মাহিষ্মতী বা বর্ত্তমান মান্ধাতাকে মাহিষ্য-মণ্ডলের রাজধানী বলিয়া নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে।

মিঃ পারজিটার মাহিষ্য-মণ্ডলের রাজধানী মাহিষ্মতী ও বর্ত্তমান মান্ধাতা একই বলিয়া লিখিয়াছেন এবং ফ্লিট সাহেব সোসাইটির জর্ণালের প্রবন্ধে তাহা সমর্থন করিয়াছেন। দীপবংশ (৮ম অধ্যায়) ও মহাবংশ (১২ অধ্যায়) নামক পালিগ্রন্থে মাহিষ-মণ্ডলের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগুরু মগ্‌গলী-পুত্ত-তিসা এই প্রদেশে বৌদ্ধ প্রচারকদল প্রেরণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গলার বা দাক্ষিণাত্যের এবং ভারত সাগরীয় দ্বীপমালার প্রাচীন ইতিবৃত্ত হইতেও মাহিষ্য-মণ্ডলের প্রতাপ-কাহিনী পরিশ্রুত হইতেছে—নর্ম্মদা তীর হইতে প্রবাহিত বিরাট মাহিষ্য-প্রবাহ তাৎকালিক প্রাচ্য জগৎ চমৎকৃত করিয়াছিল।

পরস্পর সহানুভূতি—স্বজাতি-প্রেম।

কোন সাধারণ জাতীয় কাজ করিতে হইলেই প্রথমেই পরস্পর সহানুভূতি করা প্রয়োজন—স্বজাতি-প্রেম এইরূপ সহানুভূতির প্রসূতি। আমরা ভারত-বাসী সেই স্বজাতি-প্রেম ভালরূপে শিক্ষা করি নাই বলিয়া অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ রহিয়াছি। বিদ্যাশিক্ষা বল, ব্যবসাবাণিজ্য বল, চাষবাস বল, যে

দিকেই যাই না কেন, পরস্পর সাহায্য ব্যতিরেকে, দশজনে না মিশিয়া, কোন কাজ করিতে পারি না। গবর্ণমেণ্ট এ দেশের কৃষির উন্নতি সাধন কল্পে অনুষ্ঠান করিতে গিয়া—কৃষকের দুরবস্থা দেখিয়া—এই পরস্পর সাহায্য বা সহানুভূতির অভাব প্রথমেই উপলব্ধি করিয়াছেন। তজ্জন্য গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় এ দেশে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট্ সোসাইটির সংগঠন আরম্ভ হইয়াছে। আমরা মাহিষ্য জাতি মৌলিক কৃষিজীবী ও অতি গরীব; সুতরাং আমাদের পক্ষে যৌথ-ঋণ-দান সমিতি বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু পরস্পরের প্রতি জাতীয় প্রেম জাগাইতে না পারিয়া উক্ত বিষয়ের বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছি। সে দিন কলিকাতায় যৌথ-ঋণ-দান-সমিতি-বিষয়ক বৈঠক হইয়া গেল, কাগজে উপস্থিত প্রতিনিধিবর্গের নাম ধাম বাহির হইয়া গেল, কিন্তু তাহাতে এই হতভাগ্য মাহিষ্য জাতীর এক জনেরও নাম দেখা গেল না, ইহা কি কম পরিতাপের বিষয়! আমরা মুখে স্বজাতি-প্রেমের খুব বড়াই করি, কিন্তু কাজের বেলায় কেহ নাই। শুধু এই বৈঠক কেন, দেশের প্রত্যেক সাধারণ কাজেই মাহিষ্য-জাতীয় কাহারও যোগ-দান করিতে দেখি নাই। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে ৩ জন কি ৪ জন গত বৎসরে সভ্য শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কার্য্যকরী মেম্বর নহেন। এসিয়াটিক সোসাইটী কিম্বা ঐরূপ কোন স্থলেও মাহিষ্য জাতীয় কেহ নাই। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কাউন্সেলে মাত্র বর্দ্ধমান বিভাগের মিউনিসিপালিটী সমূহ কর্তৃক হাইকোর্টের উকীল মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায় এম্-এ, বি-এল, মহাশয় নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের চেষ্টায় কৃষির উন্নতি সাধন ও উন্নত কৃষি-বিজ্ঞান প্রচার কল্পে জেলায় জেলায় "জেলা-কৃষি-সমিতি" এবং কলিকাতায় একটি "প্রদেশক কৃষি-সমিতি" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাতে মাহিষ্য-জাতীয় সভ্য বেশী হওয়া আবশ্যক। কারণ মাহিষ্যের জাতীয় ব্যবসায় কৃষি এবং ইহারা কৃষিতে অনুরক্ত। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ বা নবশায়ক জাতি কৃষিতে সেরূপ অনুরক্ত নহেন, তাঁহারা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া ব্যাবহারিক কোন কাজ দেখাইতে পারেন নাই বলিয়া কৃষিবিভাগীয় বার্ষিক কার্য্য বিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে। আশা করি, কৃতবিদ্য মাহিষ্য মাত্রেই তাঁহার পল্লীতে একটী করিয়া কৃষক-সমিতি, কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটী স্থাপন করিতে চেষ্টা করিবেন তাহাতে সহানুভূতি ও স্বজাতি-প্রেম জাগরিত হইবে। তিনি তাঁহার নিজের জেলায় যে Dist Agricultural Association আছে তাহার মেম্বর হইবেন। যাঁহারা আরও একটু অগ্রসর হইতে চাহেন

তাঁহারা প্রাদেশিক কৃষি সমিতির সভ্য পদ প্রার্থনা করিয়া—To the Secretary, Provincial Agricultural Association, Writer's Buildings, Calcutta এই ঠিকানায় পত্র দিবেন।

আমাদের মাহিষ্যজাতীয় উকীল, মোক্তার, ডাক্তার দোকানদার প্রভৃতি যেন স্বজাতির নিকট হইতে সহানুভূতি লাভ করিতে পারেন। ধরুন, আপনার একটী মোকদ্দমা হাইকোর্টে করিতে হইবে, আপনি হাইকোর্টে আসিয়া মহেন্দ্র বাবু, প্রকাশ বাবু প্রভৃতির নিকট পরামর্শ করিলেন। চিকিৎসা করাইবার আবশ্যক হইলে ইউ এন্ সামন্ত, এস্ সি দাস প্রভৃতি কৃতবিদ্য মাহিষ্য-ডাক্তারগণের নিকট আসিয়া পরামর্শ করিলেন। এইরূপে মাহিষ্য-জাতীয় প্রত্যেক বিজ্ঞ ব্যক্তির গৌরব যাহাতে বৃদ্ধি হয় তাহার চেষ্টা করিলেন, ক্রমে ক্রমে তাঁহারাও সহানুভূতি পাইয়া স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্রে যোগ্যতার সহিত অগ্রসর হইতে লাগিলেন ইত্যাদি।

গ্রন্থকারগণ স্বভাবতঃ গরীবের ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। ধনী ব্যক্তিগণের সাহায্যে তাঁহারা যাহাতে সাহিত্য-জগতে পরিচিত হইতে পারেন তাহার চেষ্টা করা উচিত। 'দাম্পত্যচিত্র' ও 'বৌ-কথা-কও' প্রণেতা সুকবি শ্রীযুক্ত ক্ষিতিনাথ দাস মহাশয় বিশেষ সাহায্য পাইলে বাণীমন্দিরে একটী উজ্জ্বল-তম রত্ন হইতে পারিতেন, কিন্তু দারিদ্র্যের নিষ্পীড়নে তিনি জর্জ্জরিত—তাঁহার উপস্থিত প্রকাশিত দুইখানি গ্রন্থ নিঃশেষে মাহিষ্য-সমাজে বিক্রীত হইলে আরও অন্যান্য পুস্তকগুলি প্রকাশিত হইত, তাহা হইতেছে না—দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা একটী মাত্র গ্রন্থকারের নাম উল্লেখ করিলাম মাত্র। কিন্তু এইরূপ আরও কয়েক-জন গ্রন্থকার রহিয়াছেন তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত সুদর্শন বিশ্বাস, শশিভূষণ দাস, রেবতী-রঞ্জন রায় প্রভৃতি অন্যতম। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সাঁতরা মহাশয় তাঁহার রচিত রাণী রাসমণির জীবনচরিত গ্রন্থখানি অর্থাভাবে মুদ্রিত করিতে পারেন নাই বলিয়া আমরা সংবাদ পাইয়াছি। স্কুলপাঠ্য গ্রন্থরচনায় মাহিষ্য-গ্রন্থকারের সেইজন্যই বড় একটা আগ্রহ দেখিতে পাই না। সুনামগঞ্জের বসন্ত বাবু কলেজের পাঠ্যপুস্তক লিখিয়া থাকেন, তাঁহার প্রতি সহানুভূতি করিতে অতি অল্পসংখ্যক মাত্র লোকের চিত্ত আকৃষ্ট হইতেছে। অন্তরে স্বজাতিপ্রেম চাই, মুখে বড়াই করিলে আসল কাজে ফাঁকি পড়ে, অদ্য এই পর্য্যন্ত।

শ্রীরাজেন্দ্রনাথ রণঝম্প।

সামাজিক গতিবিধি।

মাহিষ্য সমাজের বর্ত্তমান গতিবিধি আলোচনা করিয়া আমাদের মনে হইতেছে যে, নিদ্রিত মাহিষ্য সমাজের নিদ্রার কাল বুঝি এইবার পূর্ণ হইয়া আসিয়াছে। প্রত্যেক জেলায় প্রত্যেক মহকুমার প্রায় প্রতি পল্লীতেই সভাসমিতি গঠনের বিশেষভাবে চেষ্টা হইতেছে এবং মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানিই যে মাহিষ্য-জাতির একমাত্র ভাবী উন্নতির মূল তাহা বুঝিতে পারিয়া সকলেই তাহার উন্নতির কামনায় বদ্ধপরিকর হইতেছেন, এতদিন পরে আমাদের বাসনা পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়। সেই জন্যই মহাপুরুষগণ বলিয়াছেন—"শনৈঃ পন্থাঃ শনৈঃ কন্থাঃ শনৈঃ পর্ব্বতলঙ্ঘনম্।

১। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অধীন কালিন্দি হইতে শ্রীযুক্ত বাবু প্রতাপচন্দ্র শাশমল মহাশয় লিখিয়াছেন—"মহাশয়, পৌষ মাসের "মাহিষ্যসমাজ" কাগজ পাঠ করিয়া মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির বিষয় অবগত হইলাম, এবং কোম্পানি যে উদ্দেশ্যে গঠিত হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য অতীব মহৎ, কৃষিবাণিজ্য ও গোরক্ষা মাহিষ্যজাতির বৃত্তি বলিয়া শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে; সুতরাং মাহিষ্য-সমাজের মধ্যে বাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যে ব্যাঙ্কিং কোম্পানি স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে প্রত্যেক মাহিষ্য ভ্রাতারই যোগদান করা কর্ত্তব্য। আমি সামান্য লোক হইলেও এই কোম্পানির অন্ততঃ ৫টী অংশ গ্রহণ করিব আবশ্যকীয় ফারম ইত্যাদি ৫০ খানা মাত্র বাধিত করিবেন। এখানে প্রায় ৬০ খানি গ্রাম লইয়া একটী পল্লীসমিতি গঠিত হইয়াছে। সমাজ-সংস্কার এবং শিক্ষা-বিস্তার প্রভৃতি বিষয়ে এই সমিতি বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেছেন।"

২। মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অধীন পটাশপুর "গোপেন্দ্র-নিকেতন" হইতে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মহান্তি মহাশয় লিখিয়াছেন—"সাধু কার্য্যে আমাকে আহ্বান করিয়াছেন, ইহা অপেক্ষা সুখের বিষয় আর কি আছে? আমি একটী শেয়ার লইব এবং যদি বাঁচিয়া থাকি প্রতি বৎসর এক একটী করিয়া লইতে থাকিব, আবশ্যকীয় ফারম ইত্যাদি পাঠাইয়া দিবেন। আমার সাধ্যমত অংশীদার সংগ্রহ করিয়া দিব, এ বৎসর অন্ততঃ দশজনও সংগ্রহ করিয়া দিতে পারিব আশা করা যায়। একমাত্র আলস্যই আমাদিগকে অবনতির দিকে ক্রমশঃ টানিয়া ফেলিয়াছে। আমাকে বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিবেন।"

৩। ঐ জেলার বাঘাদাড়ি গ্রামের শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ জানা মহাশয় লিখিয়াছেন—"মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমার অধীন নাড়ুয়ামুঠা পরগণার বাঘাদাড়ি গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র জানা মহাশয়ের উদ্যোগে ও উক্ত জানা বংশীয় কতিপয় ভদ্র মহোদয়ের উৎসাহে একটী সাহিত্য-সম্মিলনীর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতেছে। কতিপয় মেম্বরের দ্বারা কিছু সংগৃহীত হইয়াছে, এবং সেই অর্থে জাতীয় পুস্তকগুলি সংগৃহীত হইতেছে। সম্মিলনীর সভ্যগণ সাহিত্য ব্যাঙ্ক এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানির অংশ সংগ্রহের জন্য বিশেষভাবে যত্ন ও চেষ্ট করিতেছেন। আমাকে বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতির সভ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবেন।" ক্রমশঃ।

কৃষি-বার্ত্তা।

(লেখক—শ্রীআশুতোষ দেশমুখ।)

বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনস্থ পুনা কৃষি-কলেজ হইতে আমরা কলেজের ত্রৈমাসিক মুখপত্র "পুনা এগ্রিকালচারাল কলেজ ম্যাগাজিনের" চতুর্থ ভলম, তৃতীয় সংখ্যা সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়াছি। কৃষি বিষয়ক অত্যাবশ্যকীয় প্রবন্ধ সমূহে পত্রিকাখানির কলেবর পূর্ণ। মেসার্স টী, লোবো ও ই, জে, ফার্ণাণ্ডো বিশেষ যোগ্যতার সহিত ইহা সম্পাদন করিতেছেন।

কৃষিপ্রধান বঙ্গের দুর্দ্দৈব, এখানে মুসলমান অধিকারের পর হইতে চাকুরী ও চাকুরেরই জয় জয়কার। কিন্তু সেদিন পর্য্যন্ত স্বাধীন মহারাষ্ট্র দেশে কৃষির কিরূপ আদর, তাহা প্রচলিত প্রবাদ বাক্য হইতেই অনুমান করা যাইতে পারে। আমাদের দেশে বাণিজ্যকে কৃষির উপরে বসায়, কিন্তু বরুকচ্ছ (Broach) প্রদেশের লোকেরা বলে—"উত্তম খেতী মধ্যম বেপার (বাণিজ্য)।" পত্রিকাখানির লেখকগণের মধ্যে দুই জন ব্যতীত আর সকলেই এতদ্দেশীয় এবং অধিকাংশই কলেজ হইতে উচ্চ উপাধিপ্রাপ্ত ভূতপূর্ব্ব ছাত্র। কৃষি-ক্ষেত্রে শূকরের উৎপাত নিবারণ প্রবন্ধ এ অঞ্চলের কৃষকের পক্ষে বহু মূল্যবান। আহাম্মদনগরের প্রধান কৃষক মহম্মদ রাসাল মহাশয়ের প্রবন্ধ বড়ই আশা-প্রদ। বঙ্গের প্রধান প্রধান কৃষকগণ এইরূপে কৃষিজীবন ও কৃষিশিক্ষা বিস্তারে অগ্রণী হইবেন কবে?

আলিবাগ আদর্শ কৃষিক্ষেত্রের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট কে, ডি, জোসী বি, এ-জি, মহাশয় উত্তর কঙ্কণ প্রদেশস্থ পল্লীকৃষিসমিতিগুলির গতিবিধি বিশেষ আলোচনা করিয়াছেন। জোসী মহাশয় বলেন, কৃষির উন্নতি করিতে হইলে প্রথম দুইটী কাজ করিতে হইবে। (১) বিভিন্ন স্থানে কিরূপ ফসল উপযোগী ও কৃষকের লাভকর, বারম্বার পরীক্ষা দ্বারা তাহার স্থিরীকরণ ও (২) উৎকৃষ্ট কৃষি-প্রণালীর প্রবর্ত্তন। অনেক সময় দেখা যায়, পার্শ্ববর্ত্তী জেলার কোন ফসল যে পদ্ধতিতে চাষ হইতেছে তাহা আমাদের পদ্ধতি অপেক্ষা অনেক উৎকৃষ্ট, অথচ প্রচারের অভাবে আমরা তাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত হইতে পারি না। জোসী মহাশয়ের মতে প্রথমোক্ত কার্য্য সরকারী কৃষিবিভাগের দ্বারাই সুচারুরূপে হওয়া সম্ভব। কিন্তু পল্লী কৃষিসমিতি ও স্বেচ্ছাসেবকগণ চেষ্টা করিলেই আপনাপন জেলার অপরাপর স্থানে প্রবর্ত্তিত বা ভিন্ন জেলা ও প্রদেশের প্রচলিত উৎকৃষ্টতর কৃষিপদ্ধতি প্রতিবেশী কৃষকগণের মধ্যে প্রচারিত করিয়া কৃষক ও দেশের প্রকৃত উপকার করিতে পারেন। দেশ দেশান্তরে প্রচলিত অস্মদ্দেশে প্রবর্ত্তনের উপযোগী উৎকৃষ্ট কৃষিপ্রণালী বঙ্গীয় কৃষকমণ্ডলীর মধ্যে প্রচার করা "বঙ্গীয় কৃষি-পরিষদের" একতম উদ্দেশ্য। কলেজের পত্রিকাখানি কৃষিতে অনুরত ব্যক্তির মাত্রেরই পাঠ করা উচিত। মূল্য অতি সুলভ, বৎসরে দুই টাকা ও প্রতিখণ্ড নয় আনা মাত্র। বলা বাহুল্য বঙ্গে এইরূপ সুলভ ইংরাজী কৃষিপত্রিকা নাই।

পত্রিকার কথা দূরে থাকুক, বঙ্গদেশে এখন কৃষি-কলেজ পর্য্যন্ত নাই। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কৃষিকলেজের গ্রাজুয়েটদিগকে অন্যান্য গ্রজুয়েটদিগের সমান অধিকার দিয়া কৃষির মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। কর্ত্তৃপক্ষের যত্নে ও কৃষি-জগতে সুপরিচিত ডাক্তার হেডারল্ড ম্যান্, ডি এস্‌সি, সাহেবের অধ্যক্ষতায় পুনা কলেজ এক্ষণে মুমূর্ষু অবস্থা হইতে রক্ষা পাইয়া ভারতের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। আর আমাদের নিম্নশ্রেণীর সাবোর কৃষিকলেজ এখন বিহার গবর্ণমেণ্টের অধীন; সাধারণ ছাত্রের দুরধিগম্য সর্ব্বোচ্চ পুষা কৃষিকলেজও তদন্তর্গত। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট কিরূপ অধ্যবসায়ের সহিত কৃষিতে সাধারণের, বিশেষতঃ কৃষকমণ্ডলীর, অনুরাগ জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা পুণাকলেজ ক্যালেণ্ডার দেখিলেই বুঝা যায়। কৃষিজীবিগণের জন্য বিশেষ সুবিধা দেওয়া হইয়াছে। বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ১৫ টাকার আটটী স্কলারশিপ্ ও সিন্ধুপ্রদেশের গবর্ণমেণ্ট বি এ-জি ডিগ্রী পড়িবার জন্য সিন্ধুপ্রদেশের ছাত্রগণকে

২৫ হইতে ৩৫ টাকার চারিটী স্কলারশিপ্ দেন, এতদ্ব্যতীত আনাভ্লা কৃষিজীবী ব্রাহ্মণ শ্রেণীর ছাত্রগণের জন্য তুইটী "গোলাপদাস ভাইদাস উকীল সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড স্কলারশিপ্" আছে। আমরা বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের কৃষির পৃষ্ঠপোষকতা আমাদের মাননীয় প্রজারঞ্জক গবর্ণর বাহাদুর ও দেশীয় ধনকুবেরগণের গোচরে আনিতেছি।

বঙ্গীয় সাহিত্য-সমিতি ঢাকা-বিশ্ববিদ্যালয় সক্রান্ত কমিটির রিপোর্ট পাইয়াছেন। পুরাকালে অধিকাংশ বিদ্যাই গুরুগৃহে অভ্যাস ব্যতীত ছিল না। এখন বিদ্যামাত্র শিক্ষার প্রধান যন্ত্র লেখাপড়া ও মুদ্রাযন্ত্রের বহুলপ্রচার হওয়ায় অনেকের পক্ষে অনেক বিদ্যা ঘরে বসিয়া শিক্ষা সম্ভবই হইয়াছে বটে, কিন্তু গুরুর সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে না থাকিলে শিক্ষার্থিগণের শরীর ও মন উপযুক্তরূপে ও সমভাবে সুগঠিত হইতে পারে না; কাজেই পদে পদে নৈতিক স্খলন ঘটে। সেই কারণে আর্য্য ঋষিগণ শিক্ষার্থীর জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিধান করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং কমিটির উপস্থাপিত বিদ্যামন্দিরের আদর্শ আমাদের জাতীয় জীবনেরই অনুযায়ী। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রায় ৫৩ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে সকল প্রধান বিদ্যাশিক্ষার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে, অথচ কমিটি কৃষিকলেজ স্থাপনের পরামর্শ দেন নাই। বঙ্গদেশে কৃষিকলেজ নাই বলিয়াই কি কমিটী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন? ঢাকাতে স্ত্রীশিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপিত হইলে স্ত্রীশিক্ষার যথেষ্ট উন্নতি হইবে আর কৃষিকলেজ স্থাপনে কমিটী কি কোন উপকারই দেখিলেন না?

কৃষিজাত লইয়াই ত বঙ্গের সমৃদ্ধি। প্রতি বৎসরে বঙ্গদেশ হইতে শুদ্ধ ৩০ কোটী টাকা পাটেরই রপ্তানি হইয়া থাকে। ধনাগমের এমন সুপ্রশস্ত পথ যাহাতে উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়; যাহাতে কৃষিবিদ্যায় পারদর্শী বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব হয়; যাহাতে জাতীয় স্বাস্থ্যদায়ক উন্নত কৃষিজীবনে সাধারণের অনুরাগ জন্মে, কৃষির উপর যাহাতে সকলের শ্রদ্ধা আসে, তাহা বাঞ্ছনীয় নহে কি? আমরা বিনীতভাবে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর বাহাদুরের নিকট এ বিষয়ের পুনরালোচনা করিয়া বঙ্গে একটা কৃষিকলেজ স্থাপন করিবার প্রার্থনা করিতেছি। সকল বিদ্যারই উপায় হইল আর কৃষির ভাগ্যে হতাদর। এরূপ হইলে যে বঙ্গে কৃষির উন্নতি সুদূরপরাহত হইবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি?

---

২৪ পরগণা-ডিষ্ট্রীক্ট-সরকারী-কৃষিসমিতির ভূতপূর্ব্ব সদস্য ভাতুড়া মধ্য ইংরাজী স্কুলের হেডমাষ্টার মাননীয় শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ পুরকায়স্থ মহাশয়কে কৃষিপরিষদের সদস্য হইতে ও সরকারী কৃষিসমিতির নিয়মাবলী পাঠাইতে অনুরোধ করায় তিনি উত্তরে লিখিতেছেন :— 'আপনাদের প্রতিষ্ঠিত কৃষি-পরিষদের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হইতে আমার কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। * * গবর্ণমেণ্টের কৃষিক্ষেত্রসমূহে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষিত চাষের স্বীয় ক্ষেত্রে পরীক্ষা দ্বারা সেইদিকে সাধারণ কৃষকগণের চিত্ত আকর্ষণ করা ও তাহা অবলম্বন করিতে তাহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করাই ডিষ্ট্রীক্ট কৃষিসমিতির সদস্যের প্রধান কার্য্য। সদস্যগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ ও তাহাদিগকে পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য একজন বিভাগীয় কৃষি ইন্স্পেক্টার নিযুক্ত আছেন। তিনি সময়ে সময়ে মফঃস্বলে আসিয়া সাধারণ কৃষকগণের বাটীতে গিয়া তাহাদিগকে পরামর্শ ও উৎসাহ দিয়া থাকেন। সদস্যগণকে বীজ বিতরণ করা হয়। সদস্যগণের অভিপ্রায় অনুসারে কৃষকগণকেও বিনামূল্যে বীজ দেওয়া হয়। ঐ বীজ লইয়া যে চাষ করা হয় তাহার ফল যথাসময়ে সমিতির সভাপতির নিকট রিপোর্ট করাই নিয়ম। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত সভার সভাপতি। বৎসরে ২।৩ বার সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। উক্ত সভায় সদস্যগণের ও কৃষকগণের কৃত ও কর্ত্তব্য কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা হইয়া থাকে।" কৃষিতে অনুরক্ত কৃতবিদ্য সাহিত্য মহোদয়গণের নিকট আমাদের প্রার্থনা এই যে শীঘ্র পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচন শেষ করিয়া উপরোক্তরূপ আলোচনার দ্বারা পরিষদের নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিতে প্রস্তুত হন। নিকটে সরকারী কৃষিসমিতি থাকিলে আমরা কৃষিপরিষদের সদস্যগণকে তাহার মেম্বার হইতেও অনুরোধ করিতেছি। পুরকায়স্থ মহাশয় নিম্নলিখিত নামগুলি সদস্যশ্রেণীভুক্ত করিতে পাঠাইয়া দিয়াছেন :—শ্রীযুক্ত সারদা প্রসাদ বৈদ্য, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নাথ কাঞ্জি; শ্রীযুক্ত মণিমোহন মিদ্দে, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ হালদার, শ্রীযুক্ত রামপদ সামন্ত। সহরার হাট পোষ্ট—২৪ পরগণা।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

ব্রাহ্মণ-সমাজ। কলিকাতা ব্রাহ্মণ-সভার মুখপত্র। ৩ সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। ব্রাহ্মণ-সমাজ বেশ চঞ্চল হইয়াছেন বটে—"মাথা নাই তার মাথা ব্যথা।" যে সমাজের চালক বিকৃত-মস্তিষ্ক, তাহার চঞ্চলতা বাতুলতা

মাত্র। বাতুলের কথায় কর্ণপাত না করাই ভাল। তর্করত্নের তর্কের দৌড় দেখা আছে, আর দেখিবার আবশ্যক করে না। মাহিষ্য জাতির উন্নতি দেখিয়া হিংসায় অস্থির ও চঞ্চল। ২+২=৪ যেমন; ৪ না হইয়া ৫ হয় না; তেমনই কৃষিকৈবর্ত্ত মাহিষ্য। তাহার অন্যথা হইতে পারে না। তর্কভূষণ মহাশয়ের কথা দূরে থাকুক, তর্করত্নের গুরু যাহা সিদ্ধান্ত করিয়া গিয়াছেন তাহা তিনি যখন স্বীকার করেন না, তখন অন্য কাহারও কথা যে তাঁহার স্বীকার্য্য নহে, তাহার আর সন্দেহ কি?

মাহিষ্য-সমাজের মূল্য। বৎসর শেষ হইতে চলিল, এখনও বহু-গ্রাহকের নিকট মাহিষ্য-সমাজের মূল্য বাকী রহিয়াছে। মাহিষ্য-সমাজের মূল্য অগ্রিম দিবার নিয়ম। যে সকল গ্রাহক মূল্য দেন নাই তাঁহারা যেন দয়া করিয়া শীঘ্র পাঠাইয়া দেন, অথবা ভিঃ পিঃ করিলে যেন ফেরত না দেন এই আমাদের অনুরোধ। মাহিষ্য-সমাজ ফেরত আসার দরুণ বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির বিস্তর ক্ষতি হইতেছে। দেনার উপর দেনা হইতেছে। ইহা সাধারণের পত্রিকা; সকলের সমান আদরের জিনিষ। অতএব গ্রাহকবৃদ্ধি ও মূল্য আদায় সম্বন্ধে সকলের সমান যত্ন করা উচিত। প্রত্যেক গ্রাহক অন্ততঃ একটী করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিলে গ্রাহক সংখ্যা অনায়াসে দ্বিগুণ বৃদ্ধি হয়।

হাওড়া—সামতা-ব্রাহ্মণ সভা। পাণিত্রাস হাই স্কুলের হেডপণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের উদ্যোগে বিগত ৬ই মাঘ রবিবার সামতা গ্রামে একটী সাধারণ ব্রাহ্মণসভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মেল্লক নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণাপদ রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতির এবং কল্যাণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সভার আলোচ্য অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পক্ষাশৌচধারী মাহিষ্যগণের সহিত বিগত বৎসর হইতে যে সামাজিক সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা করার জন্য উপস্থিত ব্রাহ্মণগণ আগ্রহ সহকারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। নানারূপ বাক্‌বিতণ্ডা ও আলোচনার পর কৃষি-কৈবর্ত্ত জাতিই যে মাহিষ্য এবং তাঁহাদের পক্ষাশৌচগ্রহণ যে শাস্ত্রসঙ্গত—তাহা সকলেই বুঝিয়াছেন এবং অতঃপর পাণিত্রাস, কল্যাণপুর, সামতা মেল্লক অঞ্চলে যে পক্ষাশৌচধারী মাহিষ্যগণের সহিত ভবিষ্যতে সাধারণ-ব্রাহ্মণ-সমাজের বা অন্যান্য হিন্দু সমাজের কোন গোলযোগ ঘটিবে না তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন।

ভগবানের ইচ্ছায় কাব্যতীর্থ প্রমুখ পণ্ডিতগণ ও ব্রাহ্মণগণ যে মাহিষ্যজাতির এইরূপ সামাজিক উন্নতিতে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন ও সহানুভূতির চক্ষে দেখিয়াছেন তাহাই পরম সুখের কথা।

সরকারী কৃষিসভা সমূহের তালিকা।—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে নিম্নলিখিত কৃষিসভাসমূহ পরিচালিত হইতেছে। মাহিষ্য জাতীয় কৃতবিদ্য ব্যক্তিগণ সভ্যপদ গ্রহণ করিবেন আমাদের অনুরোধ।

বিভাগীয় কৃষিসভা।—(১) বর্দ্ধমান বিভাগীয় কৃষিসভা। (২) প্রেসিডেন্সী বিভাগীয় কৃষিসভা। ইহাতে দুই বিভাগের কমিশনার বাহাদুরদ্বয় সভাপতি। বঙ্গের অপর তিনবিভাগে এখনও বিভাগীয় সভার আয়োজন হয় নাই।

জেলা কৃষিসভা।—প্রত্যেক জেলার কলেক্টর বাহাদুর সভাপতি। (১) বর্দ্ধমান (২) বীরভূম (৩) বাঁকুড়া (৪) হুগলী (৫) মেদিনীপুর (৬) ২৪ পরগণা (৭) খুলনা (৮) যশোহর (৯) নদীয়া (১০) মুরশিদাবাদ (১১) বগুড়া (১২) রঙ্গপুর। ২৪টী জেলার মধ্যে এই বারটীতে মাত্র জেলা সভা স্থাপিত হইয়াছে।

শাখা কৃষিসভা।—(১) কুষ্টিয়া (২) রাণাঘাট (৩) চুয়াডাঙ্গা (৪) মেহেরপুর (৫) রামপুরহাট। এই পাঁচটী মহকুমায় মাত্র পাঁচটী শাখা কৃষিসভা স্থাপিত হইয়াছে। সবডিভিসনাল অফিসারগণ উহার সভাপতি। অন্যান্য মহকুমায় যাহাতে শীঘ্র সভা স্থাপিত হয়, তজ্জন্য সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাইতেছে।

শোক-সংবাদ।

আমরা অতীব শোকভিন্ন-হৃদয়ে আজ একটী মহাত্মার বিয়োগবার্ত্তা বিজ্ঞাপিত করিয়া প্রিয় পাঠকগণকে দুঃখিত করিতেছি। স্বদেশহিতৈষী স্বজাতি-প্রেমিক মাহিষ্য-কুল-ভূষণ বারুইপুরের উকীল মান্যবর উমাচরণ দাস মহাশয় আত্মীয়স্বজন বন্ধুবর্গকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া কয়েকদিন হইল হৃদ্‌রোগে ইহধাম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অমরধামে মহাপ্রস্থান করিয়াছেন। বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির কার্য্যকারী সমিতির একজন উদ্যমশীল সভ্য ছিলেন। ইহাঁর অকালবিয়োগে মাহিষ্য-সমাজের বিশেষ ক্ষতি হইল। ভগবান তাঁহার আত্মার সদ্‌গতি ও শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের সান্ত্বনাবিধান করুন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।

মাহিষ্য-সমাজ।

দ্বিতীয় বর্ষ—ফাল্গুন, ১৩১৯।

শ্রীকৃষ্ণ।

খেলালে কি খেলা? ক্রীড়াচ্ছলে হে গোপাল!
বিস্তারি' বদন দেখাইলে ত্রিভুবন;
যশোদা বাৎসল্য ভাবে পেল মুক্তি-পথ
শিশু জ্ঞানে উপেক্ষি' হ'ল পুতনা-মরণ।
বাজালে কি বাঁশি শ্যাম! শুষ্ক-তরুরাজি
মঞ্জুরিল, যমুনা সে বহিল উজান;
গোকুল আসিল বশে মন্ত্রমুগ্ধ মত,
পেল বৃদ্ধ শিশু নারী পূত প্রেম-জ্ঞান।
বাজালে কি শঙ্খ হরি! ধরা রঙ্গভূমে
পাপ-পুণ্য-অভিনয় হইল সুন্দর;
অধর্ম্মের মহাশক্তি বিধ্বস্ত, ধর্ম্মের
উঠিল কি কীর্ত্তিস্তম্ভ ভেদি বিশ্বস্তর!
তুমি লীলাময় কৃষ্ণ! সর্ব্ব গুণাকর;
সৃষ্টি-ধ্বংস-মাঝে তব লীলা মহত্তর।

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস।
(“গাথা” ও “উচ্ছ্বাস” প্রণেতা।)

গঙ্গারিডি বীর কাহারা ?

গৌড়রাজমালা পাঠে অবগত হওয়া যায়—"ডিওডোরস মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, গঙ্গানদী "গঙ্গারিডই দেশের পূর্ব্বসীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গারিডই-গণের অসংখ্য বৃহদাকার রণহস্তী আছে। এই নিমিত্ত তাঁহাদের দেশ কখনও কোন বিদেশী রাজা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই। বাঙ্গলার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে অবস্থিত, তাহা এখন "রাঢ়" নামে অভিহিত। * * * প্লিনি লিখিয়া গিয়াছেন,—"গঙ্গানদীর শেষভাগ 'গঙ্গারিডি-কলিঙ্গ' রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। * * * * গঙ্গারিডির প্রধান নগর "গঙ্গে" ভারতের প্রধান বন্দর ছিল। * * "পিরিপ্লাস ইরিথ্রিয়েন্থি" নামক [খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দে রচিত] একখানি গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে,—"গঙ্গে" বন্দর হইতে প্রবাল, উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্র, এবং অন্যান্য দ্রব্যের রপ্তানী হইত। * * * খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দে প্রাদুর্ভূত প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক টলেমি লিখিয়া গিয়াছেন,—"গঙ্গার মোহানা সমূহের সমীপবর্ত্তী প্রদেশে "গঙ্গারিডিগণ বাস করেন। এই রাজ্যের রাজা "গঙ্গে" নগরে বাস করেন। * * *

এই সমস্ত বর্ণনা দ্বারা ভাগীরথীর উভয়তীরবর্ত্তী স্থান ও রাঢ় দেশই প্রাচীন গঙ্গারিডি রাজ্য বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। গঙ্গার মোহানার সমীপবর্ত্তী স্থানেই গঙ্গারিডিগণ বাস করেন। এক্ষণে এই জাতির বংশধর কাহারা দেখা যাউক। গঙ্গার মোহানার সমীপবর্ত্তী দেশে অর্থাৎ হাওড়া, ২৪ পরগণা, তমলুক অঞ্চলে প্রধানতঃ মাহিষ্যজাতি বাস করেন। এক মেদিনীপুরেই ইহাঁদের পাঁচটী স্বাধীন রাজ্য ছিল। তমলুক রাজ্যই তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই অঞ্চলে এই জাতির মধ্যেই অদ্যাপি সামন্ত, হাজরা, সেনাপতি, দলপতি, দিকপতি, বাহুবালীন্দ্র, গজেন্দ্র, রণঝম্প, রাণা, গড়নায়ক, দৌবারিক, দেশমুখ, পাত্র, মহাপাত্র, সিংহ, ব্যাঘ্র (বাঘ) প্রভৃতি বীরত্ব-সূচক উপাধি বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। সেই সুপ্রাচীন কালের বীরগণের সন্তানগণ এক্ষণে কেবল বার্থ উপাধি বহন করিয়া প্রাচীন স্মৃতি জাগরূক রাখিতেছেন। ইহাতে অনুমান হয়, খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ইহাঁরাই রোমসম্রাটের নিকট বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া রোম-সম্রাট্‌কেও বিস্মিত করিয়াছিলেন।

মহাকবি ভার্জিল [জর্জিক্‌স্‌ কাব্যের তৃতীয় সর্গের সূচনায়] লিখিয়া গিয়াছেন,—তিনি স্বকীয় জন্মস্থান মেণ্টুয়া নগরে ফিরিয়া গিয়া, মর্ম্মর প্রস্তরের একটী মন্দির নির্ম্মাণ করিবেন; এবং মন্দিরের দ্বারফলকে সুবর্ণ এবং হস্তিদন্ত দ্বারা "গঙ্গারিডিগণের" যুদ্ধের দৃশ্য এবং সম্রাটের রাজ-চিহ্ন অঙ্কিত করিবেন।" যাঁহাদের যুদ্ধের দৃশ্য দেখিয়া মহাকবি ভার্জ্জিল বিমোহিত হইয়াছিলেন—সেই গঙ্গারাঢ়ী বা গঙ্গারাষ্ট্র-বাসিগণ বঙ্গীয় মাহিষ্য জাতি ভিন্ন আর কেহই নহেন। হাওড়া, ২৪ পরগণা, মেদিনীপুর জেলায় এইজাতির একচেটিয়া বাস। ইহারাই সেই প্রাচীন গঙ্গারাঢ়ীয় বীর-সন্তান।

শ্রীসুদর্শন চন্দ্র বিশ্বাস।

বাল্য-বিবাহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশের পর)

বাল্য-বিবাহ রূপ ঘোরতর শত্রুকে যাহাতে সমাজ হইতে সত্বর দূরীভূত করিতে পারেন, তদ্বিষয়ে সবিশেষ যত্নবান হইবেন। সমাজে কোন কুপ্রথা একবার প্রবেশ লাভ করিলে ইহার দোষ সহজে সমাজ-চক্ষে পতিত হয় না। সমাজ-সংস্কারক চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের বিশেষ চেষ্টাতেও জন-সাধারণের মনে ইহার অপকারিতা উপলব্ধি হয় না। যে সমাজে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা অধিক সেই সমাজই কতকাংশে সত্বর সংস্কৃত হইবার সম্ভাবনা। চিন্তাশীল শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা যত বৃদ্ধি হয় ততই সমাজ-সংস্কারের পথ সহজ হয়। দুঃখের বিষয়, মাহিষ্য-সমাজে শিক্ষার নিতান্তই অভাব। অশিক্ষিত সমাজে সাধু সঙ্কল্পের আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। সমাজের দিকে চাহিলে নৈরাশ্য আসিয়া পড়ে। কিন্তু হতাশ হইয়া পড়িলে এ সমাজ চির অন্ধকারে থাকিয়া যাইবে, সুতরাং সমাজ-সংস্কারক মহোদয়গণ শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে সচেষ্ট হউন। নিদ্রিতকে জাগরিত করা মহতের কার্য্য। অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করাই স্বজাতি-হিতৈষিগণের কর্ত্তব্য। চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নাই। এক্ষণে নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না।—ভগবানই আমাদের একমাত্র সহায়। তাঁহার প্রসাদে নিশ্চয় কৃতকার্য্য হইব। সত্য জয় যুক্ত হইবে।

অন্তকার প্রবন্ধে শারীর-তত্ত্ব হইতে বাল্য-বিবাহের অপকারিতা প্রতিপন্ন

করিবার চেষ্টা করিব। পাশ্চাত্য শারীরিক তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন—মনুষ্যের মৃত্যুর 'হার' (average rate of death) সকল অবস্থায় সমান নহে। প্রথমতঃ স্ত্রীলোকের মৃত্যু সংখ্যা পুরুষের মৃত্যু সংখ্যা অপেক্ষা অনেক অল্প। আমরা এক্ষণে পুরুষের মৃত্যু কালের আলোচনা করিব। পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, শিশুর ৫ম বর্ষ পর্য্যন্ত মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, পঞ্চম হইতে দশম বর্ষ পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অল্প। দশম হইতে বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত তদপেক্ষা অল্প। একবিংশ বর্ষ হইতে পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। অর্থাৎ পণ্ডিতগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বিংশ বর্ষ বয়স অতিক্রম করিলে পঞ্চচত্বারিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত বিশেষ কোন দুর্দৈব ভিন্ন মৃত্যু যুবকগণকে আক্রমণ করে না। পঞ্চচত্বারিংশং বর্ষের পর বার্দ্ধক্য আসিতে থাকে। মৃত্যু সংখ্যাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। হিন্দু শাস্ত্রকারগণ সম্যগ্‌রূপে ইহা অবগত ছিলেন। মহাভারতের অনুশাসন পর্ব্বের চতুশ্চত্বারিংশত্তম অধ্যায়ে ভীষ্মদেব ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির দেবের "কিরূপ পাত্র ও কন্যার পরিণয় ধর্ম্মমূলক" প্রশ্নের উত্তরে উপদেশ দিয়াছেন—<u>ত্রিংশদ্বর্ষ বয়স্ক পাত্র দশম বর্ষীয়া কন্যা ও একবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পাত্র সপ্তম বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ</u> করিবে" ইহাই শাস্ত্রের আদেশ। ইহাতে কেহ বলিতে পারেন যে, বালিকার বিবাহকাল অল্প বয়সে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে আমরা ইহার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিব। বর্ত্তমান প্রবন্ধে বালকের বিবাহের উপযুক্ত কাল নির্দ্ধারণ করাই আমাদিগের আলোচ্য। এতক্ষণে বোধ হয়, কাহারও বুঝিতে বিলম্ব হইবে না যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের শারীরতত্ত্বের মীমাংসা আমাদিগের সনাতন হিন্দু শাস্ত্রকারগণের অবিদিত ছিল না। প্রত্যুত ধর্ম্ম বিজ্ঞান দেশ কাল প্রভৃতি বিশেষ বিবেচনা করিয়া মহর্ষিগণ শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছিলেন। আমরা সময়ে সময়ে অজ্ঞতা প্রযুক্ত সকল আদেশের যৌক্তিকতা স্থির করিতে না পারিয়া শাস্ত্রাদেশকে অমান্য করিয়া থাকি ও তাহার প্রতিফলও ভোগ করিয়া থাকি। শাস্ত্রাদেশের যুক্তি বিশেষরূপে লিখিত না থাকায় আমরা যুক্তি অনুসন্ধানে অকৃতকার্য্য হইয়া আপন অজ্ঞতাকে পাণ্ডিত্য জ্ঞানে শাস্ত্রকারগণকে দোষ দেই। আবার যখন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ঐ যুক্তি প্রদর্শন করেন—আমরা অমনি শাস্ত্রকে দেববাক্য বলিতে প্রস্তুত হই। শাস্ত্রাদেশকে লঙ্ঘন করিয়া জাতিবিদ্বেষের বশীভূত হইয়া সমগ্র মাহিষ্য জাতিকে সমাজ চক্ষে হেয় ও অবিশুদ্ধ প্রভৃতি নিন্দা সূচক বাক্যে অপমানিত করিবার জন্য তথাকথিত সমাজ-নেতৃগণ

(self-made গাঁয়ে মানেনা আপনি মোড়ল) কেমন বদ্ধ পরিকর হইয়াছেন তাহা কাহারও অবিদিত নাই।

বর্ত্তমান যুগে বিধবা-বিবাহ হিন্দুসমাজ মধ্যে প্রচলিত নাই। অতএব যাহাতে সমাজে বিধবার সংখ্যা বৃদ্ধি না হয়, তাহাতে সমাজ-সংস্কারকগণের লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। সমাজে অল্পবয়স্কা বিধবার অবস্থা কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। নিজ পরিবার, আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব প্রতিবাসী স্বজাতির পরিবার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই বিধবার অবস্থা দেখিয়া ক্রন্দন না করিয়া থাকিতে পারেন না। এরূপ অবস্থায় বাল-বিধবার সংখ্যা হ্রাস করিতে হইলে দেখিতে হইবে, কিরূপ বয়সে পুরুষের বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। সুতরাং মানব-জীবন যে সময় মৃত্যুর আক্রমণ হইতে কতকাংশে সুরক্ষিত, সেই সময়ই বিবাহ কাল নির্দ্দিষ্ট হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য। একমাত্র বাল-বিধবার দুঃখ দূর করিবার জন্য বাল্যবিবাহকে দিনেকের জন্য সমাজে প্রশ্রয় দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। শারীর তত্ত্বর দিক হইতে কেবল বালবিধবার সংখ্যাধিক্য নিবারণের জন্য বাল্যবিবাহ দোষাবহ সপ্রমাণ করা হইল না। স্ত্রী পুরুষের শরীরের পূর্ণতা লাভের পূর্ব্বে স্ত্রীসংসর্গ কি ভয়ানক শত্রু, তাহাও শারীর তত্ত্বের বিষয়। ইহার সম্বন্ধে পশ্চাৎ আলোচনা করিবার আশা থাকিল।

শ্রীরামকৃষ্ণ মণ্ডল বি এল্।

"চাহি না"।

আমি চাহি না লভিতে যশ অর্থ
　　　　চাহি না গো ধন মান ;
(প্রভু) পারি যেন সহিবারে সুখ দুখ
　　　　ভাবিয়া তোমার দান।
হৃদয়ের মাঝে থাক যদি তুমি,
　　　　কারেও করিনে ভয়,
দুখ হবে মোর মাথার মাণিক,
　　　　গাহিব তোমারি জয়।

শ্রীফণিভূষণ সরকার।
(আজিমগঞ্জ।)

পাতিলাখালির মহামায়া।

(পূর্ব্ব-প্রকাশের পর)

শুশ্রূষায় সংজ্ঞালাভ করতঃ ভৌমিক মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে কহিলেন :—

"ওরে! আর কার পূজা দিব? মহামায়া আমাকে ত্যাগ করিয়া পাতিলাখালি গিয়াছেন! ঐ দেখ, প্রতিমার আর তেমন শোভা নাই!"

অতঃপর, ভৌমিককে ধরাধরি করিয়া অন্তঃপুরে লওয়া হইল। সে বৎসর শূন্য প্রতিমার পূজা সমাধা করা হইল। ভৌমিক মহাশয় মহামায়ার মহাশোকে কঠিন ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া, নশ্বর কলেবর ত্যাগ করতঃ, দিব্যদেহে দিব্যধামে প্রস্থান করিলেন। জগজ্জননী তাঁহার প্রিয় সন্তানকে অযোগ্য মর্ত্তাধাম হইতে লইয়া যাইয়া, স্বীয় অন্তিকে স্থান প্রদান করিলেন। নারিচা গ্রামে মহামায়ার সেই ইষ্টকময় মণ্ডপের ভগ্নাবশেষ এবং ভগ্নদশাপন্ন সোপানযুক্ত পুষ্করিণী বিদ্যমান রহিয়া অদ্যাপি সেই অতীত কাহিনীর সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মহাত্মা অখিলচন্দ্র ভৌমিকের বংশীয় স্বর্গীয় রামসুন্দর ভৌমিকের কয়টি পুত্রকন্যা বর্ত্তমান আছেন। বারান্তরে সেই ভৌমিক বংশের কোর্ষিনামা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল।

পাতিলাখালিতে মহামায়ার পূজা হইয়া গেলে, শুভ বিজয়ার পর, প্রসাদী কিছু চিনি, সন্দেশ ও নির্ম্মাল্য বিল্বপত্র, নূতন হাঁড়িতে পূরিয়া জনৈক হিন্দুর দ্বারা নাটোর রাজধানীতে প্রেরণ করা হয়। তাহার পর প্রধান কয়েকজন প্রজাসহ স্বর্গীয় মহাদেব দাস তথায় উপস্থিত হন। "খাজনার চালান না দিয়া সেই টাকা দ্বারা এবার গ্রামে দুর্গোৎসব করা হইয়াছে" এই কথা মহারাণী ভবানীকে অবগত করান হইল। মহারাণী ভবানী যথাসময়ে খাজনার চালান ইরসাল না হওয়ার জন্য মহালের প্রধান প্রধান প্রজাদের প্রতি কিঞ্চিৎ অসন্তুষ্টা হইয়াছিলেন এবং হঠাৎ খাজনা আদায় না দেওয়ার কারণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন না। বঙ্গভূমির আদর্শা নারী ধর্ম্মপ্রাণা রাণী ভবানী এক্ষণে আর অসন্তুষ্টা হইয়া থাকিতে পারিলেন না।

মহামায়ার পূজার কথা শুনিয়া রাণী অত্যন্ত আনন্দিতা হইলেন। দুর্গাদেবীর ভোগ পূজা নির্ব্বাহার্থে ৭৫/ পঁচাত্তর বিঘা দেবোত্র জমী প্রদান করিলেন।

অদ্যাবধি সেই দেবীত্র জমীর আয় দেবীর ভোগ পূজায় ব্যয়িত হইয়া থাকে। ঐ যোত এখন 'ঠাকুরাণীর যো'ত' নামে অভিহিত। ঠাকুরাণী বা দেবীর অনেক প্রজা হইয়াছে। বর্ত্তমানে আয় ৮০০৲ টাকা মাত্র। নাটোরের রাজ্যভূমির ভগ্নদশার সময়, এই •রফটি পদ্মদার প্রতাপশালী জমীদার মহাশয়েরা নিলামে ক্রয় করিয়া লয়েন। তাহার অনেকদিন গতে এই সম্পত্তি লইয়া নানা গোলযোগের পর, পদ্মদার জমিদারেরা বেঙ্কল (বৈঙ্কট ?) সাহেবকে ইজারা দেন। বেঙ্কল সাহেব পাতিলাখালি গ্রামের দক্ষিণ সীমায় নাটোরদীঘির নিকটে একটি নীলকুঠি স্থাপন করেন। তরফের দুর্দ্ধর্ষ প্রজাগণের অত্যাচারে বেঙ্কল সাহেব নীলের কার্য্য চালাইতে অক্ষম হইয়া, * * * জনৈক ব্রাহ্মণের নিকটে বিক্রয় করেন। তাঁহার বংশীয় একজন এই মহাল ১২৪৮ সালে, ৺মহাদেব মণ্ডলের প্রপৌত্র ৺উৎসবানন্দ মণ্ডল ও কয়েকজন প্রধান মুসলমান প্রজাকে সংবাদ দিয়া, মাত্র ৯০০৲ টাকা পণে তাঁহাদিগকে পত্তনী দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহারাও প্রথম সম্মত হইয়া আসিবার কালে, পথমধ্যে মতদ্বৈধ হওয়ায়, এত সুলভেও মহাল লইতে অসম্মত হইয়া সংবাদ প্রেরণ করেন। তৎকালে জমীজমা বা পত্তনী লইবার অবস্থা সকলের ছিল না। সাড়ে বাইশ শত টাকা আদায়ের মহাল, ৯০০৲ টাকা পণে যাচিয়া দিতে চাহিলেন, তাহাও লওয়া হইল না। শেষে এই তরফের অন্তর্গত মাঝদিয়া গ্রামের হাফেজ উদ্দিন মুন্সী মহাশয় মহাল পত্তনী লয়েন। একাকী মহাল শাসনে অসমর্থ হইবেন আশঙ্কায়, কুড়ূরা গ্রামনিবাসী ধনাঢ্য তিলীজাতীয় ৺তিলকচন্দ্র ও কানাইলাল কুণ্ডুদের ॥৵০ অংশ দিয়া, স্বয়ং ।৵০ অংশে নিজ গ্রামখানিই রাখেন। কুড়ূরা গ্রাম পদ্মাগর্ভে বিলীন হইলে, কুণ্ডু মহাশয়েরা দীঘা গ্রামে আসিয়া বাস করেন। •সারাঘাটের দক্ষিণ ২ ক্রোশ ব্যবধানে এই গ্রাম। কুণ্ডুবাবুদের অবস্থা তৎকালে উত্তমরূপ উন্নত ছিল। ৺তিলকচন্দ্র কুণ্ডুর খ্যাতিও দেশের মধ্যে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, কুড়ূরার কুণ্ডুমহাশয়েরাও মাঝদিয়ার মুন্সী সাহেব, উভয়ে তরফ পাতিলাখালি পত্তনী লয়েন। তদবধি তরফ ॥৵০ ও ।৵০ অংশে বিভক্ত হইয়াছে।

দেবীত্র যোতের আয় দ্বারা পূজা সম্যক্ প্রকারে নির্ব্বাহ হয় না বলিয়া, পূর্ব্বেই একটা মালেকান বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। তরফ পত্তনি লইবার পরে ।৵০র মুসলমান পক্ষও নিজাংশ মত বৃত্তি দিতেন। কয়েক বৎসর হইল, ।৵০ জমীদার বংশেরা হিন্দুর দেবতার উদ্দেশ্যে বৃত্তি দিলে গোহনা

(পাপ) হয় বলিয়া বৃত্তি বন্ধ করিয়াছেন। তাঁহাদের জমীদারীর ক্রমশঃ বিভাগানুভাগ হইয়া, এখন কেহ ৴১০ কেহ ৷৷ এইরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহম্মদীয় আইনের ইহাই পরিণাম। স্বর্গীয় মহাদেব দাসের পরম শিষ্ট প্র-প্রপৌত্র স্বর্গীয় রামলাল রায় মহাশয় তরফ পাতিলাখালির নায়েবি কার্য্যে নিযুক্ত হন। তখন স্বর্গীয় তিলকচন্দ্র ও কানাইলাল কুণ্ডুর পুত্রদ্বয় ৺রামজীবন ও ৺বিশ্বম্ভর কুণ্ডুদের আমল। ৺রামলাল রায়ের মৃত্যুর পর তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় পিতৃপদে নিযুক্ত হন। তখন ৺রামজীবন ও ৺বিশ্বম্ভর কুণ্ডুর পুত্রগণ শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত, জ্ঞানেন্দ্রনাথ, যোগেন্দ্রনাথ বাবুরা নিতান্ত বালক। জমীদারেরাও নাবালক, নূতন নায়েবও অত্যল্প বয়স্ক। শ্রীযুক্ত দ্বারকা নাথ রায় সর্ব্বতোমুখী প্রতিভাবলে, অতি যশোগৌরবের সহিত অনেক দিন এই কর্ম্ম করেন। পরে, তাঁহার জনৈক ভাগিনেয় পিতৃহীন হইলে, তাঁহার সম্পত্তি-রক্ষার্থে একৃজিকিউটর হইয়া তথায় যান। তৎকালে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে তরফ পাতিলাখালির কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া যান। তাঁহার ভ্রাতাও কয়েক বৎসর যশের সহিত কর্ম্ম করিয়া, শেষে কর্ম্মচ্যুত হন। গত ১৩১৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহার নাম ছিল ৺জগন্নাথ রায়। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় বহুগুণ-সম্পন্ন, স্বনামধন্য শ্রীমান্ পুরুষ। স্বদেশে ও বিদেশে তাঁহার বহু খ্যাতি বিদ্যমান। তিনি আরও কয়েক স্থানে কর্ম্ম করিয়াছিলেন; এবং অনেক জমীদারের বিদ্রোহী মহাল, স্বীয় বুদ্ধি কৌশলবলে বশতাপন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। স্বর্গীয় মহাদেব দাসের ঊর্দ্ধতন তৃতীয় পুরুষ স্বর্গীয় আদিত্য নারায়ণ দাস, মহারাষ্ট্রীয় অত্যাচারের সময়ে (বর্গীর হাঙ্গামাকালে) আপনার স্ত্রীপুত্র ও ভৃত্য তথা আশ্রিত সপরিবার জনৈক সূত জাতি সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দেশ হইতে এই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন এই স্থান নিবিড় অরণ্যময় ছিল। তিনিই বন কাটাইয়া এই গ্রামের পত্তন পূর্ব্বক আশ্রিত, ভৃত্য, ও পরিবার বর্গের সহিত বসতি করেন। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণাদি বহু জাতির বসতিবিস্তার হইয়া গ্রামের অত্যন্ত উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বর্ত্তমানে মাহিষ্য, মালাকার, বৈরাগী, নমঃশূদ্র, ও মুসলমান ব্যতীত অন্য জাতি নাই কিন্তু লাহিড়ীর ভিটে, গোয়ালার ভিটে, বাগছির যোত, ইত্যাদি বিশেষণ যুক্ত জমীও ভিটের ডাকে ঐ সকল জাতির বসতির সাক্ষ্য দিতেছে। স্বর্গীয় মহাদেব দাসের চেষ্টায় এই গ্রামে মহামায়ার পূজা স্থাপিত হয়। তদ্বংশ্য শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় মহাশয় দেবীর বর্ত্তমান

নিযুক্ত করেন। উদারমতি চক্রবর্ত্তী মহাশয় এখনও সর্ব্বজন সমক্ষে মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করিয়া থাকেন যে,—"এখানকার মহামায়ার পূজাপ্রণালী সম্বন্ধে আমার শিক্ষাদাতা **দ্বারিদাদা**। মধুসূদন চক্রবর্ত্তী যখন অন্ধ হইয়া গেলেন, তখন এখানকার পূজা করিতে কেহ স্বীকার করেন না। **দ্বারিদাদা** আমার পিতৃদেবের নিকটে যাইয়া যখন আমাকে এখানে পূজা করিবার জন্য প্রার্থনা করেন তখন আমার পিতামাতা পাতিলাখালি মায়ের নামে আশঙ্কা বোধ করিয়া সহসা সম্মত হন নাই। পরে দ্বারিদাদার বহু প্রবোধবাক্যে স্বীকৃত হয়েন। আমার পিতাঠাকুর দ্বারি দাদাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। দ্বারিদাদার হাতে আমাকে সমর্পণ করিয়া নিঃশঙ্ক হইতে পারিলেন। আমাকে আনিয়া দ্বারি দাদা হাতে-খড়ি দিয়া শিক্ষা দিবার ন্যায় পাতিলাখালির মহামায়ার তাবৎ পূজা পদ্ধতি শিক্ষা দিয়াছিলেন। পাতিলাখালির মায়ের পূজা প্রণালী শিক্ষা সম্বন্ধে দ্বারিদাদা আমার একরূপ শিক্ষক।"

দেবীর মণ্ডপ তরফ পাতিলাখালির কাছারীতে বিদ্যমান। খড়ের ছাউনি বৃহৎ পাঁচ চালা ঘর ছিল। কয়েক বৎসর হইতে করগেট টিনের ঘর হইয়াছে। সারাঘাট সাহেব বাজারের জনৈক আগরালা কাঁইয়া, দেবীর নিকটে মানসা (মানত) করিয়া, মোকর্দ্দমা জয়লাভ হওয়ায়, এই করগেট টিনের ঘর প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। দেবীর পূজা ভোগাদির সঙ্কল্প মূল ভূম্যধিকারী বংশীয় ব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত কেনারাম বন্দোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত নন্দনলাল মুখোপাধ্যায়দের নামেই হয়। তাঁহারা এক্ষণে কলিকাতায় বাস করেন। কিছুদিন পূর্ব্বে অর্থাৎ স্বর্গীয় জগন্নাথ রায়ের সময়েও পূর্ব্ব প্রথামত প্রসাদী চিনি, সন্দেশ ও নির্ম্মাল্য হাঁড়িতে পুরিয়া, বিজয়ার পর পাবনার নিকট পহিলানপুর সদর কাছারীতে প্রেরণ করা হইত। এখন আর প্রেরিত হইতেছে না।

এই পাতিলাখালি গ্রামের স্রষ্টা স্বর্গীয় আদিত্যনারায়ণ দাস; গ্রামের অধিষ্ঠাত্রী মহামায়ার সংস্থাপক তদ্বংশীয় মহাত্মা মহাদেব দাস; বর্ত্তমানের পূজক-ব্রাহ্মণ-নিযুক্তকারী ও পূজাপদ্ধতি-শিক্ষাদাতা তদীয় বংশের বিজ্ঞ-প্রবর শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায়। ইনি এখনও বর্ত্তমান আছেন। ইনি বৃদ্ধাবস্থ; ত্রিসন্ধ্যায় অপতিত স্নান, ত্রিসন্ধ্যায় ভগবদুপাসনা, নিরামিষ্য আতপান্ন ভোজন, ইত্যাদি নিষ্ঠাবান্ হিন্দুর কর্ত্তব্যকর্ম্মে ইঁহার বর্ত্তমান জীবন সংরত। এই অযোগ্য লেখক শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায় মহাশয়েরই জ্যেষ্ঠাত্মজ। এই মহেশ্বরীর মণ্ডপাঙ্গনে অদ্যাপি নানা স্থানের নানা জাতি আসিয়া ধুলি-

ধূসরিত কলেবর হইয়া কৃতকৃতার্থ হইতেছেন এবং অভীপ্সিত বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়া, চিনি, দুগ্ধ, অলঙ্কার প্রভৃতি বিবিধ বলি ও উপহার লইয়া আসিয়া জগজ্জননীর শ্রীপাদপদ্মে সমর্পণ করিতেছেন, ইহা দেখিয়া বা শুনিয়া আনন্দোৎফুল্ল না হইবেন—স্বজাতি প্রতিষ্ঠিত মহতী কীর্ত্তি স্মরণ করিয়া গৌরবানুভব না করিবেন—এমন কে আছেন ?

শ্রীদুর্গানাথ দেও রায়।

পাতিলাখালি গ্রামে মহামায়া সংস্থাপনকারীর অধোর্দ্ধ্ব তন পুরুষগণের নির্ঘণ্ট।

৺ আদিত্যনারায়ণ দাস।

|

৺নরহরি দাস

|

৺বটুরাম দাস।

|

৺ মহাদেব মণ্ডল।

(ইনি পাতিলাখালি গ্রামে মহামায়ার পূজা স্থাপন করেন। তরফের প্রধান পদে নির্ব্বাচিত হওয়ায় মণ্ডল উপাধিতে অভিহিত হন।)

|

৺ নবকড়ি মণ্ডল।

|

৺ যাত্রারাম মণ্ডল।

|

৺ উৎসবানন্দ মণ্ডল।

(ইনি মাদার নিকটবর্ত্তী নাটোরের চৌধুরী ছাহেবদের "সরকতিয়া" মহালের নায়েবি কার্য্য করিতেন। আত্রাই নদীর নিকটবর্ত্তি "হুলিখালি" গ্রামেও নায়েবি কর্ম্ম করিয়াছিলেন।)

|

৺রামলাল রায়।

(ইনি তরফ পাতিলাখালির নায়েবি কার্য্যে জীবন কাটান।)

|

১। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ রায়। ২। ৺জগন্নাথ রায়।

|

(ইনিও তরফ পাতিলাখালির নায়েবি কার্য্য, পরে নাবালক ভাগিনেয়ের ষ্টেটে এক্‌জিকিউটর, পুঠিয়া।০ আনির মহালের নায়েবি, মাধবপুর সেন বাবুরদের মহালের নায়েবী ইত্যাদি কর্ম্ম করেন।

|

১। শ্রীদুর্গানাথ দেও রায় ২।৩।৪ * * *

তত্ত্ববিনোদ ও সিদ্ধান্তচুঞ্চু উপাধিপ্রাপ্ত।

বিবাহে পণ প্রথা।

বর্ত্তমান কালে বরপণ গ্রহণরূপ অত্যাচার যেরূপ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে, তাহাতে মনে হয়, অল্পদিনের মধ্যে সমাজ অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইবে। এই সাংঘাতিক অত্যাচারে নিপীড়িত কত শত ভদ্র সন্তান যে দারিদ্র্যের কবলে পতিত হইয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ ভীষণ দৃশ্য সাধারণের নয়নগোচর হইলেও, দুঃখের বিষয়, ইহার প্রতিবিধান হইতেছে না; কেহ কেহ আবার সমাজ-সংস্কারক সাজিয়া "পণ" নামটী পরিবর্ত্তন করিয়া "যৌতুক" নাম দিয়া কন্যা-কর্ত্তার সর্ব্বস্বান্ত করিতে কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করেন না। আশ্চর্য্যের বিষয়! যাঁহাদের পুত্রকন্যা উভয়ই আছে তাঁহারা কন্যার বিবাহের সময় অর্থসংগ্রহ করিতে নানারূপে লাঞ্ছিত ও ভুক্তভোগী হইলেও তাঁহাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হয় না। পুত্রের বিবাহের সময় সমস্তই বিস্মৃত হইয়া যান, বরং উহার প্রতিশোধ লইবার জন্য কন্যাকর্ত্তার নিকট হইতে দ্বিগুণতর অর্থশোষণ করিবার প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এই অদূরদর্শিতা ও নীচ স্বার্থপরতার ফলে সমাজ-শরীরে ধীরে ধীরে যে সমস্ত কুরীতি ও কুনীতি প্রবেশ করিয়া দিন দিন সমাজের শক্তি যেরূপ ক্ষুণ্ণ ও ক্লিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে, তাহাতে অবিলম্বে ইহার প্রতীকার করা সমাজপতিগণের কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয়। পুত্র-বিক্রয় পণ নিবারণকল্পে বক্তৃতায় সভাস্থল কম্পিত করিলে কিছুই হইবে না, নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করা চাই। সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইলে জানিব তিনি প্রকৃত সংস্কারক। সমাজ যে দিন দিন নিতান্ত নিস্তেজ ও হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে, তাহা দেখিয়াও আমাদের সমাজপতিগণ এতই উদাসীন যে, এই পৈশাচিক অত্যাচার নিবারণ জন্য কেহই যথাসাধ্য যত্নবান হয়েন না, সমাজ-পতিগণ সমাজবিধ্বংসকারী এবম্বিধ কুপ্রথা বিদূরিত করুন, তাহা হইলে সমাজের যথেষ্ট উপকার হইবে সন্দেহ নাই।

পুরাকালে জমিদারে জমিদারে, সমাজ-পতিতে সমাজ-পতিতে, কুলীনে কুলীনে, সাধারণে সাধারণে, গরীবে গরীবে বিবাহ বন্ধনের চেষ্টাই অধিক ছিল। কিন্তু আজকাল উচ্চবংশীয়গণ সসম্ভ্রমে "পণসেলামী" লইয়া কুলশীলে ও মান মর্য্যাদায় জলাঞ্জলি দিয়া সাধারণ গৃহে পুত্রের বিবাহ দিতেছেন। এবং নিম্নবংশীয়গণ কোন উপায়ে দশ টাকা অর্থসঙ্গতি করিলে, তাহার পুত্রকে কন্যাদান করিবার জন্য কত কুলীনবংশধর কত খোসামোদ করিয়া থাকেন,

তাহা বোধ হয়, সকলেই বিলক্ষণরূপে অবগত আছেন। ইহাদ্বারা স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে, বর্ত্তমানকালে অর্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বংশ-পরম্পরাগত উচ্চনীচ, ভেদাভেদ বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; এই বহুদিন-সঞ্চিত ভ্রান্তিপূর্ণ কুসংস্কার যে একবারে ঘুচিবে, এরূপ আশা করা যায় না। এবম্বিধ কুকার্য্যে সংকীর্ণমনা অর্থলোভী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের বংশগত নিষ্কলঙ্ক-কুলে কি মলারোপণ করিতেছেন না?

আবার অনেকে সমানে সমানে বিবাহ না দিয়া ধনাঢ্য ব্যক্তির পুত্রকে "পণসেলামীর" টাকা যোগাইয়া বিবাহ দিতে নিঃসম্বল হইয়া বিধবা পত্নীর ও পুত্রকন্যাগণের গ্রাসাচ্ছাদনের কোন ব্যবস্থাই করিয়া যাইতে পারেন না। আর তাঁহারা বৈবাহিকের সহিত কুটুম্বিতাদি চালাইতে ক্রমশঃ ঋণজালে জড়িত হইয়া দুর্দ্দশাসাগরে পতিত হন এবং তাঁহারা ধনবান ও সম্ভ্রান্ত বৈবাহিকের নিকট কিরূপ সম্মান অর্জ্জন করিয়া থাকেন, তাহা পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

ধনশালী ব্যক্তিগণের মধ্যে যাঁহারা পুত্রের বিবাহে "পণ" লইয়া অর্থ-পিশাচের ন্যায় স্বজাতি অর্থশোষণ করিয়া থাকেন, তাঁহাদের এটা স্বভাবের কার্য্য, কোন অভাবের জন্য নহে। অর্থস্পৃহা তাঁহাদের অদম্য হইয়া উঠিয়াছে। সেই সকল স্বার্থবিজড়িতগণ অর্থলোভে পুত্রের সমবয়স্কা পাত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া অকালে পুত্রের মাথা খাইয়া শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে শেষ জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন। এরূপ ধনলিপ্সু ব্যক্তিগণ স্বীয় বধূর বৈধব্য যন্ত্রণা স্বচক্ষে দেখিয়াও যতদিন আপনার নির্লজ্জ জীবনকে ঘৃণিত মনে না করিবেন, আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি, ততদিন সমাজের উন্নতি অসম্ভব।

আবার ইউনিভারসিটীর উপাধিধারী পাত্রকে কন্যাদান করিতে হইলে বহু টাকা "বরপণ" দিতে হইবে, এই ভয়ে কন্যাকর্ত্তা দুগ্ধপোষ্য বালকে কন্যা সম্প্রদান করিয়া থাকেন। এরূপ কার্য্যকারী ব্যক্তিগণ তাঁহাদের সন্তান সন্ততির অকাল মৃত্যুর পথ-প্রদর্শক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই সমাজ-ধ্বংস-কারী "বরপণ" হইতেও বাল্যবিবাহ প্রসূত হইয়াছে। যে জাতি প্রাচীনকালে শৌর্য্যে বীর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে জগতে অতুল গৌরব বিস্তার করিয়াছিল, সেই জাতি "বাল্যবিবাহের" ফলে যে দিনে দিনে হীনবীর্য্য ও দরিদ্র হইয়া পড়িতেছে, তাহাও সমাজপতিগণের ভাবিবার বিষয়। এই অনিষ্টকারী

("বরপণ" অতি মাত্রায় বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছে। উহা নিবারণের জন্য সকলেরই ঐকান্তিক চেষ্টা করা উচিত। যে হেতু শাস্ত্রে লিখিত আছে, বিবাহ সম্বন্ধে যে সকল বিধি নিষেধ আছে, তন্মধ্যে শুল্ক-গ্রহণই একটী মহাপাপ। পুত্র কি কন্যা কাহারও বিবাহ সময়ে "পণ" গ্রহণ করা অনুচিত। শাস্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে লিখিত আছে :—

"ক্রয়ক্রীতা চ যা কন্যা, পত্নী সা ন বিধিয়তে।
তস্যাং জাতাঃ সুতাস্তেষাং পিতৃ-পিণ্ডং ন বিদ্যতে॥" (অত্রিসংহিতা)

অর্থাৎ খরিদা কন্যা পত্নী পদবাচ্য নহে। এবং এইরূপ ক্রীত স্ত্রীর গর্ভের পুত্র পিতার পিণ্ডদানে অধিকারী নহে। আরও দেখা যায় ;—

"শুল্কেন যে প্রযচ্ছন্তি স্বসুতং লোভমোহিতঃ।
আত্মবিক্রয়িণঃ পাপী মহা কিল্বিষকারিণঃ।
পতন্তি নরকে ঘোরে ঘ্নন্তি চাসপ্তমং কুলম্॥" (উদ্বাহতত্ত্বম্)

"যাহারা লোভবশতঃ পণ লইয়া পুত্র বা কন্যাকে বিবাহ দেয়, সেই আত্ম-বিক্রয়ী পাপাত্মা মহাপাতককারীরা ঘোর নরকে পতিত হয় এবং উর্দ্ধতন সপ্তম পুরুষ পর্য্যন্ত নরকে নিক্ষিপ্ত করে"। মনু যাজ্ঞবল্ক্যাদি প্রাচীন আর্য্যসমাজ-রক্ষকগণও "পণ-প্রথা" বিরুদ্ধে ভূরি ভূরি প্রমাণ দেখাইয়া গিয়াছেন॥

কন্যাপণ গ্রহণ করিলে আত্ম-বিক্রয় বা শুক্র বিক্রয় জন্য যেরূপ পাপাক্রান্ত হইয়া পরকালে অশেষ নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, তদ্রূপ "বরপণ" লইলেও উক্ত প্রকার পাপের জন্য দ্বিগুণতর নরক কষ্টভোগ হইয়া থাকে। প্রথমতঃ শুক্রবিক্রয়ের জন্য পাপভাগী, দ্বিতীয়তঃ পণ-সেলামী গ্রহণ করিলে স্বীয় সন্তানের উপর স্বত্ব ও দাবী, শাস্ত্র এবং আইনানুসারে রহিত হইয়া যায়। তজ্জন্য বিক্রীত পুত্রকে পুনরায় গ্রহণ করায় ততোধিক পাপার্জ্জন করতঃ সুদীর্ঘকাল যমালয়ে বাস করিয়া থাকেন। ধিক! শতধিক!! তাঁহাদের এবম্বিধ অর্থো-পার্জ্জনে ; তবে এ কথা সহস্রবার বলিতে পারি যে, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি তাঁহার সাধ্যমত ও স্বেচ্ছানুসারে আপন কন্যাকে যাহা অর্পণ করিবেন, তাহা দোষজনক বলিয়া মনে করি না। যে হেতু স্ত্রীধনে কাহারও অধিকার নাই॥

(স্বার্থলোভে মানুষ পশু হইতে পারে, কেন না, বংশমর্য্যাদার স্বরূপ পণ লইয়া মাতাপিতা পুত্রকন্যাদিগকে হাটে বাজারের গরু ছাগলের মত বিক্রয় করিয়া কসাইর কার্য্য করিতে কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জা বোধ করে না।

সর্ব্বস্বান্ত করিয়া আপনার কি লাভ হইবে? যাহা হউক, প্রত্যেক সমিতির সম্পাদকগণের নিকট আমার বিনীত প্রার্থনা যে যেন তাঁহারা সভাস্থলে স্ব স্ব সমিতির সভ্যগণের কাছে যথোচিত আন্দোলন বা আলোচনা পূর্ব্বক "পণপ্রথা" সমাজ হইতে অপসারিত করিতে বিশেষ যত্নবান হয়েন॥

যে সকল স্বার্থত্যাগী মহাত্মগণ এরূপ অসৎ "পণসেলামী" তুচ্ছ মনে করিয়া স্ব স্ব পুত্রের বিবাহ দিয়া সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইবেন, যে সকল যুবক অর্থলোভ সংবরণ করতঃ বিনা পণে বিবাহ করিয়া সমাজকে ধন্য করিবেন, এবং যে সকল ধনাঢ্য ব্যক্তি তাঁহাদের অর্থের সদ্ব্যবহার করিয়া সমাজের কল্যাণসাধন করিতেছেন; তাঁহারা সকলেই আমাদের ধন্যবাদার্হ। আমরা মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

ডাক্তার শ্রীবসন্ত কুমার ভৌমিক।

ইক্ষু চাষ।

অর্থ উপার্জ্জনের প্রধান উপায় কৃষি ও বাণিজ্য। এই দুই কার্য্য ব্যতীত পরের দাসত্ব করিয়া কেহ কখন উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হয় না। পল্লীগ্রামে অনেকেরই অল্প বিস্তর ভূসম্পত্তি আছে, ইহার উপর যৎসামান্য পুঁজি লইয়া কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিলে স্বাধীনভাবে বেশ দুপয়সা রোজগার হইতে পারে।

ইক্ষু হইতে গুড় ও চিনি প্রস্তুত হইয়া রসনার তৃপ্তিকর বিবিধ প্রকার সুখাদ্য মিষ্টান্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে, সুতরাং ইহার অধিক পরিচয় অনাবশ্যক। পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ইহার সমাদর আছে, তবে ভারতবর্ষেই কিছু অধিক। সম্প্রতি পাটের দর বৃদ্ধি হওয়ায় ইক্ষুর আবাদ ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে। গত বৎসর ভারতে ইক্ষু গুড় ৫,১২৫,১০০ খর্জ্জুর গুড় ১,৮০৫,১০০ এবং তালগুড় ৪,২০০ সর্ব্ব সমেত ৭০,৭৩,৬০০ হন্দর (১ মণ ১৪ সের এক হন্দর) গুড় উৎপন্ন হইয়াছিল কিন্তু তাহাতেও অভাব দূর না হওয়ায় ৫০,০০ ০০০ পঞ্চাশ লক্ষ টনেরও অধিক বিদেশীয় চিনি আমদানী হইয়াছে। এইরূপ প্রতি বৎসরই বিদেশীয় চিনি আমদানী না হইলে ভারতের অভাব মোচন হয় না। এক্ষণে ইক্ষু চাষে মনোযোগী হইলে ভারতের অভাব মোচন হয় এবং বিশেষ লাভের সম্ভাবনা ও আছে।

জাতি-নির্ণয়।—ইক্ষু অনেক প্রকার; তন্মধ্যে বোম্বাই, কাজুলি,

শামসাড়া এই কয় জাতীয় ইক্ষুই সচরাচর এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমোক্ত দুই প্রকার ইক্ষুতে শর্করার ভাগ কিছু কম এবং প্রায়ই কীটের উপদ্রব হয়, এজন্য শামসাড়ার চাষই অধিক পরিমাণে হইয়া থাকে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে সরু ও ছোট আকারের এক প্রকার ইক্ষু জন্মে, ইহাকে খাগড়ি কহে। এই ইক্ষুতে শর্করার ভাগ কিছু বেশী, কীট কিম্বা অন্য কোন শত্রুতে নষ্ট করিতে পারে না এবং সহজেই জন্মিয়া থাকে। পাঠকগণ কাশীর চিনির গুণ অবশ্যই অবগত আছেন, এই খাগড়ি হইতেই সেই চিনি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ভূমি-নির্ণয়——ঈষদুচ্চ ও সমতল ভূমি ইক্ষু চাষের জন্য নির্দ্দেশ করিবে এবং বৃষ্টির জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত রাখিবে। নদী কিম্বা খালের ধারে রসা ভূমিতে ইক্ষু অতিশয় স্থূল ও দীর্ঘাকার হয়, কিন্তু শর্করার ভাগ তত বেশী থাকে না। দামোদর তীরে আবাদ করিয়া দেখিয়াছি, এক একটী ইক্ষু ১৩।১৪ হাত লম্বা ও তদুপযুক্ত মোটা হইয়াছিল, কিন্তু ইহার রস এত পাতলা যে সেরকরা অর্দ্ধ পোয়ার অধিক গুড় হয় না। নীরস ভূমির ইক্ষু যদিও তত বড় হয় না, কিন্তু সেরকরা একপুয়ারও অধিক গুড় জন্মিয়া থাকে। মোট কথা—ছায়াহীন, নীরস ও দোঁয়াশ ভূমিই ইক্ষু আবাদের বিশেষ উপযোগী।

সময় ও রোপণ-প্রণালী——পৌষ হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যেই ইক্ষু রোপণের প্রশস্ত সময়। এই সময় অধিক বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা থাকে না—অথচ নবরোপিত বীজের উপযুক্ত মৃত্তিকাও বেশ সরস থাকে। কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে জমিতে লাঙ্গল দিয়া ডেলা ভাঙ্গিয়া দিবে, এবং ছাই কিম্বা গবাদির মলমূত্র-জনিত সুলভ সার ছড়াইয়া আরও ২।৪বার লাঙ্গল দিয়া সারগুলি উত্তমরূপে মিশ্রিত করতঃ মই দিয়া ক্ষেত্র সমতল করিবে। বীজ রোপণের পূর্ব্বে দড়ি ফেলিয়া দেড় হস্ত ব্যবধানে অর্দ্ধহস্ত প্রশস্ত এক একটী 'দাঁড়া' বা 'জুলি' খুলিয়া যাইবে এবং ঐ 'জুলির' মধ্যে দেড় হস্ত ব্যবধানে অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত এক একটী গর্ত্ত করিয়া প্রতি গর্ত্তে দুইমুষ্টি আন্দাজ রেড়ির খৈল দিবে। কোদালী দ্বারা খৈলগুলি একবার মিশ্রিত করিয়া একটী বা দুইটী করিয়া ডগা শোয়াইয়া মাটী চাপা দিবে। কোন কোন স্থলে দুই হস্ত অন্তর এক একটী গর্ত্ত করিয়া ৩টী ডগাকে ত্রিকোণাকৃতিতে স্থাপন করতঃ রোপণ করিয়া থাকে। ইহাতে ব্যয় কিছু অধিক পড়ে। আমাদের মতে প্রথমোক্ত রোপণই যুক্তিসঙ্গত। ডগা রোপণ করিবার সময়ে গ্রন্থিস্থিত 'চোক' গুলি পাশ্বের দিকে রাখা আবশ্যক। নিম্নের দিকে থাকিলে অঙ্কুরিত হইতে বিলম্ব হয় এবং বৃষ্টি হইলে পচিয়া যাইবার

সম্ভাবনাও আছে। এই সময় মৃত্তিকা অতিশয় নীরস বোধ হইলে সঙ্গে সঙ্গে অল্প পরিমাণে জল দিয়া যাইবে।

ইক্ষু বীজ—মরিশাস প্রভৃতি স্থানে ইক্ষুর বীজ হইতে চারা উৎপন্ন হইয়া থাকে; কিন্তু এখানে বীজ হয় না এবং বীজ উৎপন্ন করিবার জন্য কেহ চেষ্টাও করে না। প্রবাদ আছে, ইক্ষুর ফুল হইলে একটী ভয়ানক দুর্ঘটনা সঙ্ঘটিত হইয়া থাকে; যদিও কখন ফুল জন্মে বীজের জন্য অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে সমূলে বিনাশ করা হয়। সুতরাং ভারতে আবহমান ইহার ডগাই বীজরূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। সুপক্ক ইক্ষু কর্ত্তন কালে ১ বা ১৷৽ হাত পরিমিত ডগা বীজের জন্য রাখিয়া বাকী অংশ 'মাড়াই' করিবে। উর্দ্ধ ভাগ অপেক্ষা মধ্যের অংশ বীজের জন্য রাখিলে গাছ বেশ সবল ও ফসল ভাল হয়। ডগাগুলিকে ৩টী গ্রন্থি (গাঁট) রাখিয়া টুকরা টুকরা করিয়া কাটিবে। অতিশয় কচি ও কীটদষ্ট ডগা একবারে পরিত্যাগ করিয়া সুপুষ্ট চোকযুক্ত নীরোগ ও সুপক্ক ডগাগুলি বীজের জন্য নির্ব্বাচিত করিয়া রাখিবে। এইরূপ ৪ কাহন ডগা হইলেই এক বিঘা ভূমি আবাদ হইতে পারে। ইক্ষু রোপণ দুই প্রকার 'হুম্‌কো' রোপণ এবং 'হাপর' দিয়া রোপণ। কর্ত্তিত ডগাগুলি একবারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করাকে 'হুম্‌কে' বা 'আঁধা' রোপণ কহে। 'হাপর' দিতে হইলে নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত অন্য একটী ছাওয়াযুক্ত স্থানে গর্ত্ত করিয়া ডগাগুলিতে তরল কাদা মাখাইয়া ঐ গর্ত্তে দিবে। উপরিভাগে কিঞ্চিৎ খড় ও অল্প পরিমাণে মাটী চাপা দিয়া ৮।১০ দিন রাখিবে। গ্রন্থিস্থিত চোকগুলি বেশ মুখরিত হইয়া উঠিলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রোপণ করাকে 'হাপর' দিয়া রোপণ কহে। 'হুম্‌কো' রোপণে চারা ফুটিতে কিছু বিলম্ব হয় এবং চোকগুলি অঙ্কুরিত হইবে কি না ঠিক বুঝা যায় না। আমাদের মতে 'হাপর' দিয়া রোপণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

পরিচর্য্যা—ইক্ষু রোপণ করিবার পর ২।১ মাস বিশেষ কিছু কার্য্য থাকে না। তবে ইতিমধ্যে বৃষ্টি হইয়া যদ্যপি আগাছা জন্মে ও মৃত্তিকা বসিয়া যায় নিড়ানি দ্বারা আগাছা তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে মৃত্তিকা আল্‌গা করিয়া যাইবে। বিশেষ সাবধানে এই কার্য্য করা আবশ্যক নবোদ্গত চারার কোন অনিষ্ট না হয়। চারাগুলি মৃত্তিকা ছাড়াইয়া উঠিলে পার্শ্বস্থিত মৃত্তিকা টানিয়া ক্রমে ক্রমে উহার গোড়ায় আইল বাঁধিয়া দিবে এবং পার্শ্বে জল চলাচলের জন্য পথ পরিষ্কার রাখিবে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ রৌদ্রে সম্যক রস না পাওয়ায় পত্রের অগ্রভাগ শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় মৃত্তিকার

অবস্থা বুঝিয়া ১০।১৫ দিন অন্তর জলসেচন করা আবশ্যক। চারাগুলি ১ হস্ত পরিমিত হইলে নিম্নের পক্ক পত্রগুলি উত্তমরূপে ইক্ষুদণ্ডে জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে। যত বড় হইবে এইরূপে বাঁধিয়া ক্রমে নিকটবর্ত্তী ৩।৪ টী 'মাদা'র ইক্ষু একত্র করিয়া ঝাড় প্রস্তুত করিবে। এইরূপ না করিলে ইক্ষুর সারাংশ কোমল হয় না, শৃগালাদিতে নষ্ট করে ও প্রবল ঝড় বৃষ্টিতে হেলিয়া পড়ে। পতিত ইক্ষু সুপক্ক হয় না, রস পাতলা হয় ও মিষ্ট হয় না। সুতরাং যে কোন প্রকারে হউক ইহাকে দণ্ডায়মান রাখা আবশ্যক।

ইক্ষুর শত্রু ও তাহার প্রতীকার—অবস্থা বিশেষে ইক্ষু ভিন্ন ভিন্ন শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া থাকে, ইহার প্রতীকার না করিলে ফসলে লাভবান হওয়া যায় না। প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ বীজ রোপণ করিবার পর উই লাগিয়া সারাংশ নষ্ট করায় চারা অঙ্কুরিত হয় না, কিম্বা অঙ্কুরিত হইবার পরে উই লাগিলে পত্রগুলি শুখাইয়া চারা মরিয়া যায়। এইরূপ স্থলে ডগার কর্ত্তিত অংশের দুইটী পার্শ্ব কেরাসিন তৈলে ডুবাইয়া রোপণ করিলে আর কোন আশঙ্কা থাকে না। কেহ কেহ বলেন, জল সেচনের সময়ে 'নালার' মুখে একটী পাতলা ন্যাকড়ায় হিং কিম্বা খানিকটা সরিষার খৈল বাঁধিয়া রাখিলে উপকার পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় অর্থাৎ চারাগুলি বেশ নধর হইয়া উঠিলে গরু, ছাগল, শজারু, খরগোস ইত্যাদিতে অনিষ্ট করিয়া থাকে। চারি হস্ত পরিমিত লম্বা বাঁখারি ঘন ঘন পুঁতিয়া বেড়া দিলে ইহাদের উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়া যায়। রাত্রিকালে ক্ষেত্রমধ্যে আলো জ্বালিয়া রাখিলে শজারু ও খরগোস প্রবেশ করিতে পারে না। তৃতীয় অবস্থায় অর্থাৎ ইক্ষুদণ্ডগুলি বেশ বড় হইয়া উঠিলে শৃগাল, বন্য-শূকর প্রভৃতিও ইহার বিশেষ ক্ষতি করিয়া থাকে। উল্লিখিত প্রকারে ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে বেড়া দেওয়া থাকিলে আর বিশেষ প্রতীকারের প্রয়োজন হয় না। যদি বেড়া না থাকে, টং বাঁধিয়া পাহারা দেওয়া আবশ্যক। কোনরূপ শব্দ করিয়া ভয় দেখাইলেও পলায়ন করে। ইহার জন্য (১) একটী কেরোসিন টীনের মধ্যে উহা অপেক্ষা কিছু বড় আকারের একটী লৌহদণ্ড ঝুলাইয়া দিবে এবং ঐ দণ্ডে একখণ্ড পীচবোর্ড কিম্বা ঐরূপ কোন জিনিস বাঁধিয়া ক্ষেত্র মধ্যে একটী বাঁশের উপর টীনটী ঝুলাইয়া রাখিবে। বাতাস লাগিয়া পীচবোর্ড টী দুলিলে লৌহদণ্ডের ঘাত প্রতিঘাতে আওয়াজ হইবে। ক্ষেত্রটী বাসস্থানের সন্নিকটে হইলে লৌহদণ্ডটিতে দড়ি বাঁধিয়া মধ্যে মধ্যে বাড়ী হইতেও আওয়াজ করা যাইতে পারে। (২) ৫।৬ হাত পরিমিত একখানি

বাঁশের এক চতুর্থাংশ নিম্নদিকে রাখিয়া অবশিষ্টাংশ মাত্র চিরিয়া পাশাপাশি দুইখণ্ড করতঃ ক্ষেত্র মধ্যে পুতিয়া দিবে এবং উহার একখণ্ডে দড়ি বাঁধিয়া টানিলে শব্দ হইয়া থাকে। যাহা হউক, এইরূপে ১০।১১ মাস রাখিয়া হরিদ্রা বর্ণ হইলে ইক্ষু সুপক হইয়াছে জানিয়া কর্ত্তন করিবে। অপক্ক বা অতিপক্ক অবস্থায় কর্ত্তন করিলে গুড় ভাল হয় না।

সরকারী রিপোর্ট।—কলিকাতা গেজেটে গত জানুয়ারী মাসে প্রকাশিত বিবরণে দেখা যায়,—বর্দ্ধমান, হুগলি, হাওড়া প্রভৃতি জেলায় অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গে প্রকৃতিগত জল হাওয়া অনুকূল ছিল। কিন্তু রাজসাহী, রঙ্গপুর, বগুড়া, ময়মনসিং, বাকরগঞ্জ জেলায় আগষ্ট ও জুলাই মাসে অতিরিক্ত ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় আংশিক ক্ষতি এবং ঢাকা বরিশাল, চট্টগ্রাম ও নোয়াখালী জেলায় পোকা লাগিয়া কিছু ক্ষতি হইয়াছে। অক্টোবর মাসের টানা ঝড়ে কোন কোন স্থানে সামান্য পরিমাণ ক্ষতি হইয়াছে। সুতরাং বঙ্গে জলহাওয়া অনুকূল ছিল না।

গত বৎসর বাঙ্গালা দেশের ২২৩৩০০ একার ভূমিতে ইক্ষু চাষ হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে ২২১৮০০ একার ভূমিতে চারা পোতা হইয়াছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে, চাষের পরিমাণ কমিতে চলিয়াছে। এক একর ভূমিতে যে আক জন্মে তাহাতে ৩৫॥০ মণ গুড় যদি উৎপন্ন হয়, তবে গত বৎসর বাঙ্গালা দেশে ৫,১২৫,১০০ (cwts) হন্দর গুড় হইয়াছিল কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষে ৫২৬৪,৩০০ (cwts) হন্দর হইতে পারে এইরূপ মনে করা যাইতে পারে। এই দেশের খেজুর হইতে ১,৮০৫,১০০ (cwts) হন্দর এবং তালগাছ হইতে ৪২০০ (cwts) হন্দর গুড় পাওয়া যাইতে পারে। অতএব ৫২৬৪৩০০+১৮০৫১০০+৪২০০ =৭০৭৩৬০০ (cwts) হন্দর গুড় মোটের উপর জান্মতে পারে।

বিহার ও উড়িষ্যা গেজেটে ২২শে জানুয়ারী তারিখে প্রকাশিত বিবরণে দেখা যায়—বিহার-উড়িষ্যা গবর্ণমেন্টের মধ্যে মানভূম, হাজারিবাগ ও সম্বলপুর জেলার ইক্ষুচাষ উল্লেখযোগ্য। আবহাওয়া ভাল ছিল। গয়া ও সম্বলপুর জেলায় জল না হওয়ায় ক্ষতি হইয়াছে। গয়া জেলায় পোকা ধরিয়া ক্ষতি হইয়াছে। মোটের উপর ভাল।

২৬৬২০০ একর এবৎসর, ২৬৩,০০০ একর গত বৎসর চাষ হইয়াছে। ২৬৫,৫০০ একর ভূমি এবৎসর ইক্ষুচাষে আবদ্ধ ছিল। হাজারিবাগ জেলায় গড়ে এবৎসর ভাল উৎপন্ন হইয়াছে।

যদি ২২ হন্দর গুড় এক একার জমির ইক্ষুতে উৎপন্ন হয় তবে ৫৮৫৬৪০০ হন্দর গুড় বর্ত্তমান বৎসর হইতে পারে, কিন্তু ৬০৭৫৩০০ হন্দর গত বৎসর উৎপন্ন হইয়াছিল। বিহার উড়িষ্যা প্রদেশে খেজুর ও তালের গুড় যাহা উৎপন্ন হয় তাহা ধর্ত্তব্য নহে।

বঙ্গীয় কৃষিপরিষদে এইরূপ কৃষি সম্বন্ধে ক্রমে ক্রমে আলোচনা আরম্ভ হইবে। ইক্ষুচাষ হুগলি জেলায় যেভাবে করা হইয়া থাকে এই প্রবন্ধে তাহারই আভাষ পাইবেন। অন্য জেলায় যদি ইহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি থাকে কিম্বা বিভিন্ন প্রণালী থাকে পাঠকগণ তাহা আমাদিগকে অবগত করাইবেন। এক জেলার প্রণালী অন্য জেলায় প্রবর্ত্তিত করিয়া কিরূপ উৎপাদন করান যায় তাহা দেখাও উচিত।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী,
সহাধ্যক্ষ—বেঙ্গল নার্শারি,
১।২৪ মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা।

রয়াল পাবলিক সার্ভিস কমিশন।

(কলিকাতার সাক্ষ্য)

কলিকাতায় ২৩শে জানুয়ারী হইতে ৩১শে জানুয়ারী পর্য্যন্ত উক্ত কমিশনরের সমক্ষে বাঙ্গালাদেশের কতিপয় সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে। বিলাতে ও ভারতে উভয় স্থানে "ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস্" পরীক্ষায় ইংরাজ সাক্ষীদিগের আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে। তাহাতে রাজকার্য্যে অধিক পরিমাণে ভারতবাসীর নিয়োগ হইবে এই আশঙ্কা। ভারতবাসীরা সাতসমুদ্র তের নদী পার হইয়া ইংলণ্ডে গিয়া পাশ করিলে তবে তাহাদের দেশের উচ্চ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে পারিবে। প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিস্বরূপ রাজ-কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে অনেক বাঙ্গালী সাক্ষীই প্রতিকূলমত পোষণ করেন। কেবল বাঙ্গালার মধ্যে মিঃ এস্, পি, সিংহ মহাশয় কতকটা অনুকূল মত দিয়াছেন। তিনি বলেন, যোগ্যতার আদর হওয়া উচিত—তবে বিভিন্ন শ্রেণী ও সম্প্রদায়ের জন্য কতকগুলি 'নমিনেশন' দিলেই চলিবে। বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ফাইন্যান্সিয়াল সেক্রেটারী মিঃ এইচ্, এল, ষ্টিভেন্‌সন্ সাহেবও সংক্ষেপেই

মত দিয়াছেন। কেবলমাত্র সেকেণ্ড গ্রেড ডিষ্ট্রীক্ট সেসন্ জজ মিঃ আর্থার হারবার্ট কিউমিং সাহেব এই বিষয় একটু পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন। পাঠকগণের অবগতির জন্য তাঁহার সাক্ষ্য হইতে কতকাংশ উদ্ধৃত করিতেছি :—

Rules of Recruitment সম্বন্ধে অন্যান্য কথা বলিয়া কিউমিং সাহেব বলিতেছেন—

"I further suggest that a rule shou'd be inserted that in making nomination the Hight Court should bear in mind that due consideration should be paid to the claims of the various sections of the community to be represented.

It is desirable that as far as possible when consistent with efficiency all the different sections of the community should be represented. It is undesirable that the service should become the monopoly of one particular section."

"Are all classes and communities duly represented in your Provincial Civil Service?" এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

"It cannot be said that all castes and creeds are duly represented. Out of a service of 332 there are only nine Mahomedans, although the Mahomedans form more than half the population, Neither the Buddhist nor the Christian Religious have any representative in this service.

"The annexed table will show that the service is practically a monopoly of the three castes : Brahmans, Kayasthas and Vaidyas.

"Whilst it is desirable that all castes and communities should be duly represented, efficiency must be still the chief test in making an appointment.

"The High Court in making its nomination should be asked to bear in mind the claims of various communities.

"At the same time it must be borne in mind that the litigants who pay for having their suits decided have a right to demand that they shall be decided by the best agency available. Other qualifications being equal, preference must be given as far as possible to a member of one of the backward or unrepresented communities."

অর্থাৎ "গবরমেণ্ট সার্ভিস যেন কোন জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের এক-

চেটীয়া সম্পত্তি না হয়—যোগ্যতানুসারে সকল জাতি ও সম্প্রদায়ের লোকে যাহাতে রাজকার্য্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া নিযুক্ত হইতে পারেন তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা উচিত—সেইরূপ নিয়ম প্রণয়ন করা উচিত। হাইকোর্ট "নমিনেশন" দেওয়ার সময়ে যেন এই বিষয়ে লক্ষ্য করেন। প্রভিন্সিয়াল সার্ভিসে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি নাই। মুসলমানের সংখ্যা বঙ্গের সমগ্র জন-সংখ্যর অর্দ্ধেকের উপর হইলেও ৩৩২ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে মাত্র ৯ জন মুসলমান আছেন! বৌদ্ধ ও খৃষ্টান কর্ম্মচারী একেবারে নাই বলিলেই হয়! কিউমিং সাহেব একটী টেবল প্রস্তুত করিয়া দেখাইতেছেন যে,—গবর্ণমেণ্ট সার্ভিস তিনটী জাতিরই—"ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থ জাতিরই—একচেটিয়া হইয়াছে। যোগ্যতা একরূপ হইলেও যে যে সম্প্রদায়ের গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারী কম বা যে যে সম্প্রদায় শিক্ষায় অনুন্নত সেই সেই সম্প্রদায়ভুক্ত আবেদনকারীর প্রার্থনা আগেই মঞ্জুর হওয়া কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে হাইকোর্ট ও গবর্ণমেণ্ট যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখেন।"

বাস্তবিকই গবর্ণমেণ্ট সার্ভিস কোন সম্প্রদায় বিশেষের একচেটিয়া সম্পত্তি না হয়, ইহাতে সদাশয় গবর্ণর বাহাদুরের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।

সমালোচনা।

আচার্য্য-ব্রাহ্মণ। গ্রহবিপ্র বা শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণের উৎপত্তি, ইতিবৃত্ত ও সামাজিক মর্য্যাদা প্রভৃতি এই পুস্তকে অতি পরিপাটীরূপে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সন্নিবেশিত হইয়াছে। কাগজ ও ছাপা মন্দ নহে। মূল্য ১।• মাত্র। আমাদের পরমশ্রদ্ধেয় সাহিত্যতত্ত্ববারিধি প্রণেতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ জানা মহাশয় ইহার প্রণেতা। এই পুস্তকে যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া গ্রহবিপ্র বা আচার্য্যজাতির বিশুদ্ধতা সপ্রমাণ করা হইয়াছে তাহা প্রশংসনীয়। 'জ্যোতিষ-ব্যবসা ব্রাহ্মণের পক্ষে' নিন্দনীয় হইলেও গ্রহবিপ্রগণ নিন্দনীয় নহেন।' সদ্ব্রাহ্মণের পক্ষে যে বৃত্তি নিন্দনীয় তাহা অবলম্বন করিয়া কোন ব্রাহ্মণ কিরূপে সদ্ব্রাহ্মণ রহিবেন? অষ্টাদশ অধ্যায়ের ১১৩ পৃষ্ঠায় শূদ্রগণক ও গ্রহবিপ্রজাতির ধর্ম্মতঃ কর্ম্মতঃ ও জন্মতঃ পার্থক্য প্রদর্শনে ইহাই মনে হয় যে. জ্যোতিষ ব্যবসায়ী শূদ্র পতিত, কিন্তু জ্যোতিষ-ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ পতিত নহেন। জ্যোতিষ

সমান মর্য্যাদা পাইতে পারেন কি না? তাহাই বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়—গ্রহবিপ্র জাতির জ্যোতিষ চর্চ্চা তাঁহাদের পাতিত্যসূচক নহে। সুতরাং তাঁহারা পতিত ব্রাহ্মণ নহেন। গ্রহবিপ্রগণের মধ্যে এই পুস্তকের আদর হইবে। গ্রহবিপ্রগণ সমাজে সদ্‌ব্রাহ্মণের ন্যায় আদরণীয় হইলে আমরা সুখী হইব।

প্রতিবাসী মাসিকপত্র। বরানগর হইতে শ্রীযুক্ত সত্যচরণ মিত্র সম্পাদিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ইহাতে বেশ সাহিত্যের ও সাহিত্যিকগণের জীবনীর আলোচনা চলিতেছে। আমরা এই পত্রিকার বহুল প্রচার কামনা করি। লেখা ভাল—উদ্দেশ্য ভাল; মূল্য সুলভ।

বিবিধ-প্রসঙ্গ।

কমিশনের বিলাত যাত্রা। ভারতের রয়াল পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মেম্বরগণ আগামী ১৯শে এপ্রেল তারিখে বিলাত যাত্রা করিবেন ও আগামী শীত ঋতুতে পুনরায় ভারতে আগমন করিবেন।

গোপাল-বান্ধব। আমাদের শ্রদ্ধেয় কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র সরকার মহাশয় বিভিন্ন সংবাদপত্রে গোজাতি সম্বন্ধীয় যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করিতেছিলেন, এক্ষণে তিনি তৎসমূহের সমবায়ে ও আরও নূতন নূতন তথ্য সম্বলিত "গোপালবান্ধব" নামক একখানি সুন্দর পুস্তক সঙ্কলিত করিয়া মুদ্রিত করিতেছেন। প্রত্যেক হিন্দু গৃহস্থের গৃহে উহা গৃহপঞ্জিকার ন্যায় সুশোভিত হইলে দেশের অনেক উপকার হইবে। গোজাতির সেবা ও রক্ষণকল্পে একখানিও সুন্দর পুস্তক বাঙ্গলা ভাষায় এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। প্রকাশ বাবু সমগ্র বঙ্গবাসীর ধন্যবাদের পাত্র।

কলিকতায় গোরক্ষা।—কলিকাতা মিউনিসিপালিটী উৎপাদিকা-শক্তি-সম্পন্না গাভী ও ৭ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক গোহত্যা বন্ধ করিবার পরামর্শ করিতেছেন। ভারতের অন্যান্য নগরে ও পল্লীতে এইরূপ চেষ্টা কবে হইবে?

মাহিষ্য-সমাজ।

দ্বিতীয় বর্ষ—চৈত্র, ১৩১৯।

সত্যপথ।

মাহিষ্য সমাজ স্মরণাতীত কাল হইতে বৈদিক সংস্কারাদিতে, স্মৃতির অশৌচাদিতে, পৌরাণিক পূজাব্রতাদিতে, বহুশাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িলেও তাহাদের পরস্পরে কথন বিদ্বেষ ভাব ছিল না। স্থানভেদে উপবীতী অনুপবীতি-গণ; দশাহ, দ্বাদশাহ, পঞ্চদশাহ, ত্রিংশাহ অশৌচ ধারীগণ; সামবেদ, যজুর্ব্বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রানুসারে কর্ম্মানুষ্ঠাতৃগণ; চাষী, কৃষিকার, হালিক কৈবর্ত্ত, পরাশর দাস প্রভৃতি নামে পরিচয় প্রদাতৃগণ, পরস্পর জ্ঞাতিত্ব ও বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ ছিল—অদ্যাপিও আছে। তন্মধ্যে মেদিনীপুর জেলা সকল বিষয়ের সংযোগ স্থান। এই স্থানের মধ্যে সকল বিষয়ই চাষী জাতিতে বিদ্যমান ছিল, এখনও আছে। আর পৌরহিত্য সম্বন্ধে শূদ্রযাজী ভিন্নশ্রেণী লইয়া কোন ভেদাভেদ ছিল না—অদ্যাপিও নাই। কালক্রমে একদেশদর্শী অশাব্দিক কবিগণ মুদ্রাযন্ত্রের প্রভাবে লেখনী বিস্তার করায় কৈবর্ত্ত নামের উপর অনার্য্যতার লহরী উত্থিত হওয়ায়, চাষী-কৃষিকারাদি নামাভিধেয়, বিভিন্নাশৌচধারী মাহিষ্যগণ আপন আত্মীয় ও স্বজাতি মধ্যে একনাম ও এক প্রকার অশৌচ প্রচলন করিবার অভিপ্রায়ে আমার উদ্দীপনী সভার উদ্দীপন দ্বারা এবং স্বর্গীয় জমীদার বাবু নরহরি জানার জাতিনির্দ্ধারিণী সভার ব্যবস্থা দ্বারা, অথচ ভারত গবর্ণ-মেণ্টের অনুগ্রহে, বাঙ্গালা দেশবাসী চাষী কৈবর্ত্ত জাতি আত্মপূর্ব্বাখ্যা মাহিষ্যনাম জানিতে পারায়, বৈশ্যাভিমান উদ্দীপিত হইয়াছে। শূদ্র জাতির কপট চাতুর্য্য বুঝিতে পারিয়াছে। তদ্দৃষ্টে শূদ্রান্নপুষ্ট, শূদ্রকল্প, ব্রাহ্মণ বেশধারী, সর্ব্বকর্ম্মোপ-জীবীগণ মেদিনীপুরে প্রতাপ বাড়াইতে না পারিয়া, হাওড়া, হুগলী ২৪ পরগণা লইয়া এক গুপ্তদলের সৃষ্টি করতঃ মধ্যে মধ্যে কাগজে ও সভাসমিতিতে চাষী কৈবর্ত্ত মাহিষ্যজাতি নহে, উহারা নিষাদ আয়োগবীজাত অন্ত্যজশ্রেণীর কৈবর্ত্ত,

ইহাদের পক্ষাশৌচ শাস্ত্র সঙ্গত নহে বলিয়া ব্যবস্থা দিয়া, এবং মধ্যে মধ্যে নাপিত, তেলী, গৌড়, চাষী প্রভৃতি জাতির কর মর্দ্দন করিয়া হিংসার ভাব ও জাতিবিদ্বেষ জন্মাইয়া দিতেছে। আরও বলিতেছে, ইদানীর পঞ্চদশাহাশৌচধারী মাহিষ্যেরা অন্ত্যজ কৈবর্ত্ত ছিল, মাহিষ্য নাম লইল বলিয়া ইহাদের পক্ষাশৌচ ধারণ শাস্ত্র সঙ্গত হইতে পারে না। বলপূর্ব্বক করিলে শৌচই হইবে। এই উক্তি কতদূর সত্য, শিক্ষিত সমাজ চিন্তা করুন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মাহিষ্যদের স্থানভেদে একজাতিমধ্যে ও কুটম্ব মধ্যে চাতুর্ব্বর্ণ্যাশৌচই প্রচলন আছে। তন্মধ্যে দশদিন, বারদিন, ত্রিশদিন অশৌচধারী মাহিষ্য সম্বন্ধে কোন মন্দ উক্তি নাই। মেদিনীপুরে দুই একটি রাঢ়ী ঘর ভিন্ন উৎকল, মধ্যশ্রেণী, বৈদিক, ব্যাসোক্তাদির মধ্যে এমন একটিও ব্রাহ্মণ ঘর দেখা যায় না যে, মাহিষ্যের উক্ত চারিপ্রকার অশৌচ বাড়ীতে পৌরহিত্য, যাজন বা দান গ্রহণ করেন না। মেদিনীপুরের উত্তরাঞ্চল ও হাওড়া হুগলী জেলার জ্ঞাতি কুটুম্বেরা শূদ্রাশৌচ বদলাইয়া স্বজাত্যুক্তাশৌচ করায় সেই সেই ঘর অন্ত্যজ কৈবর্ত্ত ছিল, চাষ করিয়া চাষী হইয়াছে, ইত্যাদি প্রবাদ উঠিতেছে। কেহ বা মাহিষ্য স্বীকার করিয়া ব্রাত্য হইয়াছে বলিতেছে, কেহ বা মাহিষ্য বৈশ্যজাতি নহে ম্লেচ্ছজাতি, ইত্যাদি প্রলাপোক্তির দ্বারা নিজ নিজ বিদ্যাবত্তার পরিচয় প্রকাশ করিতেছে।

একদেশদর্শী পণ্ডিতাভিমানীর হিংসাসূচক ব্যবস্থার মর্ম্ম এই যে, মাহিষ্য-জাতির মধ্যে যাহারা বহুকাল হইতে মাসাশৌচ ধারণ করিয়া আসিতেছে, তাহাদের আর পঞ্চদশাহাশৌচ ধারণ করা যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ তাহারা বহুকাল মাসাশৌচ ব্যবহার দ্বারা শূদ্রবৎ হইয়া গিয়াছে। আর তাহার অশৌচ পরিবর্ত্তন শাস্ত্রবিরুদ্ধ ও পাপজনক। কলিতে অশৌচ সঙ্কোচ একবারে নিষিদ্ধ। তদ্‌বিষয়ে স্মার্ত্ত শ্রীরঘুনন্দনের উদ্ধৃত প্রমাণও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন যে, "বৃত্তস্বাধ্যায় সাপেক্ষ মঘসঙ্কোচনং তথা" অর্থাৎ বৃত্ত স্বাধ্যায়াদি অনুষ্ঠানের দ্বারা অশৌচ কমাইবে না।

আহা! কি সুন্দর মীমাংসা—উধোরপিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে ফেলিয়া মহতের নিন্দা রটাইতেছেন। এই বচনের প্রকৃতার্থ পরে পরিস্ফুট হইলে সকলে বুঝিবেন যে, স্মৃতিকর্ত্তার বিন্দুমাত্র দোষ নাই। আমরা মহাত্মা মনুর মতে বলি যে, জাতির শাস্ত্রবিহিত যতদিন অশৌচ তাহা কখন বাড়াইবে না। "নবর্দ্ধয়ে-দঘাহানি প্রত্যুহেন্নাগ্নিষুক্রিয়া।" অশৌচ দিন বৃদ্ধি করিবেন না, কারণ তদ্দ্বারা

গৃহস্থের জন্য কর্ত্তব্য পঞ্চমহাযজ্ঞের ব্যাঘাত হয়। উক্ত অশৌচ কমাইবে না আর বাড়াইবে না—এই দুইটি কথা দ্বারা সমান রাখিবে প্রমাণ হইতেছে। সমান রাখা কাহাকে বলে? ইহার উত্তর, শাস্ত্রে যে চারিজাতির চারিটি অশৌচ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই ঠিক রাখিবে। এই বিষয় হৃদয়ঙ্গম করাইতে হইলে একটুকু বিশদ ভাবে বলা কর্ত্তব্য।

হিন্দু সমাজে যত প্রকার জাতিভেদ থাকুক না কেন, সকলেই প্রধান চারি শ্রেণীতে বিভক্ত আছে। মনুষ্য সমাজ প্রথমে একমাত্র ব্রহ্মপরায়ণ হেতু ব্রাহ্মণ ছিল, পরে বৃত্তস্বাধ্যায়ানুসারে অনেক ভাগ হইলেও তন্মধ্যে চারিটি প্রধান। ভগবান্ গীতায় বলেন—"চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।" অর্থাৎ আমি গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে চারিটি বর্ণের সৃষ্টি করিয়াছি। মহাভারতে শান্তিপর্ব্বে ১৮৮ অধ্যায় লিখিত আছে,—

'ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মমিদংজগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টংহি কর্ম্মভির্বর্ণতাং গতম্॥'

ইহাতে বর্ণের কোন ইতর বিশেষ নাই। পূর্ব্বে ব্রহ্মাকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া সমস্ত মানবজগত ব্রহ্মময় হেতু ব্রাহ্মণই ছিল। পরে কর্ম্মদ্বারা বর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে। মনু মহাত্মা তৎকালে ব্রাহ্মণের কর্ম্ম এইরূপে নির্ণয় করিয়াছিলেন যে,—"ষট্কর্ম্মশালিত্বং ব্রাহ্মণত্বং।" ষট্কর্ম্মকারীই ব্রাহ্মণ। ষট্কর্ম্ম এই ;

'অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈব ব্রাহ্মণানামকল্পয়ৎ॥'

মনু ব্রাহ্মণের পক্ষে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান, প্রতিগ্রহণ, এই ছয়টি বৃত্ত্যর্থ কল্পনা করিয়াছিলেন। পরে তাহারা কিরূপে বিভিন্ন বর্ণ হইল, তাহার প্রমাণ দর্শাইতেছেন—

'কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনা প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মরক্তাঙ্গাস্তেদ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ।'

যে সকল ব্রাহ্মণ কামভোগপ্রিয়, উগ্রতেজস্বী, ক্রোধী, সাহসপ্রিয়, স্বধর্ম্ম-ত্যাগী, রজোগুণাধিক্য হেতু রক্তবর্ণ, তাহারা ক্ষত্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অত্রিঋষি ৩৬৮ শ্লোকে বলেন,—

'শস্ত্রাহতাশ্চ ধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জিতা যেন সবিপ্রঃ ক্ষত্র উচ্যতে॥'

যে বিপ্র সংগ্রামে সকলের সমক্ষে আরম্ভ সময়েই ধনুর্দ্ধর দিগকে অস্ত্রদ্বারা

আহত ও পরাজিত করেন, তিনি ক্ষত্রিয় বলিয়া কথিত। মনুও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে রজোগুণাত্মক কর্ম্মনির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

'প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়ন মেব চ।
বিষয়েষ্বপ্রশক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ॥'

ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রজারক্ষণ, দান যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, গীতনৃত্যবনিতোপভোগ অপ্রসক্তি সেবন কল্পনা করিয়াছিলেন।

'গোভ্যোবৃত্তিংসমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মান্নানুতিষ্ঠন্তি তেদ্বিজাবৈশ্যতাং গতাঃ॥

যাহারা গবাদি পশুপালন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া কৃষ্যুপজীবী, রজস্তমোগুণপ্রভাবে পীতবর্ণ হইয়া স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিল না, তাহারা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হইল। অত্রি বলেন ;

'কৃষিকর্ম্মরতো যশ্চ গবাঞ্চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্য ব্যবসায়শ্চ সবিপ্রো বৈশ্যউচ্যতে॥'

যিনি কৃষিকর্ম্মরত, গবাদি পশুপালক, বাণিজ্য ব্যবসায়ী, সেই বিপ্র বৈশ্য বলিয়া খ্যাত হইল। মনুও বৈশ্যের ঐরূপ বৃত্তি কল্পনা করিয়াছিলেন।

'পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্‌পথং কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥'

পশু সকলের প্রতিপালন, দান, যজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন, জলপথে স্থলপথে বাণিজ্য বৃদ্ধির জন্য ধন প্রয়োগ অর্থাৎ সুদগ্রহণ ও কৃষিই বৈশ্যের বৃত্তি।

'হিংসানৃতপ্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বকর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তেদ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥'

যে সকল ব্রাহ্মণ হিংসাপরায়ণ, মিথ্যাপ্রিয়, লোভী, সর্ব্বকর্ম্মোপজীবী, তমোগুণপ্রভাবে কৃষ্ণবর্ণ এবং শৌচাচারহীন, তাহারা শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিল। অত্রি এই বলেন,— 'লাক্ষা লবণ সংমিশ্রকুসুম্ভক্ষীর সর্পিষাম্।
বিক্রেতা মধুমাংসানাং সবিপ্রঃ শূদ্রউচ্যতে॥'

যিনি লাক্ষা, লবণমিশ্র দ্রব্য, কুসুমফুল বা ফল বা স্বর্ণ, দুগ্ধ, ঘৃত, মধু, মাংস বিক্রয় করেন, সেই ব্রাহ্মণেরা শূদ্র বলিয়া কথিত।

মনুর নির্দ্দিষ্ট শূদ্রের কর্ম্ম এই :—

'একমেবহি শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্মসমাদিশৎ।
এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥'

প্রভু ব্রহ্মা আনন্দিত চিত্তে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য বর্ণের শুশ্রূষা (সেবা) অর্থাৎ আজ্ঞানুবর্ত্তী থাকিয়া, আদিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করা এই একমাত্র কর্ম্ম শূদ্রের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

এই সকল বচন পর্য্যালোচনা করিয়া জানা যায় যে, জাতি বিভাগের প্রধান কারণ দুইটি—গুণ ও কর্ম্ম। গুণ—সংস্কারাদি; কর্ম্ম—অধ্যয়ন, যুদ্ধ, কৃষি আদি। উক্ত গুণকর্ম্মের তারতম্যে প্রত্যেক জাতি তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া থাকে। সংস্কারযুক্ত ও অধ্যয়নাদি বৈধকর্ম্মোপজীবী সগুণ। সংস্কারহীন স্বকর্ম্মনিরত বা স্বকর্ম্মহীন সংস্কারযুক্ত ব্যক্তি সমগুণ। সংস্কার ও স্বজাত্যুক্ত কর্ম্মহীন ব্যক্তি নির্গুণ বলিয়া কথিত। পূর্ব্বকালে স্মৃতিকর্ত্তৃগণ উক্ত চারি জাতির সগুণ, সমগুণ ও নির্গুণ ভেদে অশৌচের দিনও তিন প্রকারে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। পরাশর সংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ে ৫ম শ্লোকে লিখিত আছে :—

'একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবল বেদস্ত নির্গুণো দশভির্দিনৈঃ॥'

সাগ্নিক ও বেদাধ্যায়ী বিপ্রের একদিনে শুদ্ধি হয়। কেবল বেদাধ্যয়ন-নিরত বিপ্রের তিনদিন অশৌচ হয়। অগ্নি ও বেদাধ্যয়নহীন হইলে দশাহাশৌচ হয়। গৌতমীয় মনুর দশমাধ্যায়ে ২২ শ্লোকে লিখিত আছে :—

'একাহাৎ শুধ্যতে বিপ্রো যদি বেদাগ্নিপারগঃ।
ত্র্যহাৎ কেবল বেদাঙ্গৈঃ নির্গুণোদশভির্দিনৈঃ॥'

যদি ব্রাহ্মণ-বংশজাত ব্যক্তি বেদ এবং অগ্নিপরায়ণ হয়, তাহা হইলে জাতকে মৃতকে একদিনে শুদ্ধি হয়। কেবল বেদাধ্যয়ন-সম্পন্ন ব্যক্তি তিনদিনের পর শুদ্ধ হইবে। নির্গুণ দশদিনের দ্বারা শুদ্ধ হইবে। নির্গুণ ব্রাহ্মণ কাহাকে বলে তদ্‌বিষয়ে বিশেষ স্পষ্ট লক্ষণ এবং তাহার জননমরণে কতদিনে শুদ্ধি হইবে, এই বিষয়ে পরাশর তৃতীয় অধ্যায়ে ৬ষ্ঠ শ্লোকে লিখিয়াছেন :—

'জন্মকর্ম্ম পরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনাবর্জ্জিতঃ।
নামধারক বিপ্রস্তু দশাহং সূতকং ভবেৎ।'

যে বিপ্রসন্তান জাতকর্ম্মাদি সংস্কারহীন এবং সন্ধ্যা উপাসনাদি পরিবর্জ্জিত এইরূপ নামধারী বিপ্রের দশদিন সূতকাশৌচ হয়। অষ্টম অধ্যায়ে ২৩ শ্লোকে লিখিত আছে :—

'যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
ব্রাহ্মণাস্ত্বনধীয়ানাস্ত্রয়স্তে নামধারকাঃ॥'

কাষ্ঠনির্ম্মিত হাতী বা চর্ম্মাচ্ছাদিত মৃগ যেমন প্রকৃত হস্তী বা মৃগ নহে, সেইরূপ নামমাত্র সার অধ্যয়নহীন মূর্খ ব্রাহ্মণও প্রকৃত ব্রাহ্মণ নহে। এই নামমাত্র ব্রাহ্মণেরই দশদিন অশৌচ ব্যবস্থিত হইয়াছে। মাহিষ্যের মধ্যে এরূপ নির্গুণ আছে কেহ স্বপ্নে দেখিয়াছেন কি? নিতান্ত অসমর্থা বৃদ্ধা রমণীও একটি গাভী প্রতিপালন দ্বারা, কয়েকটি লঙ্কা বেগুন শাকশব্জি গাছের আয় দ্বারা ও খড়কুটা বিক্রয় করিয়া জীবন-যাপন করে। স্ত্রীজাতি শূদ্রবৎ হেতু "বিবাহ মাত্রং সংস্কারঃ শূদ্রস্য লভতে সদা" স্মৃতির এই বচন দ্বারা তাহাকে অসংস্কৃতা বলিবার কাহারও সাধ্য নাই। তাহার উপর আবার কৃষ্ণমন্ত্রদীক্ষা, নিত্য তুলসীসেবা, গোগ্রাস দান, অশ্বত্থ-প্রদক্ষিণ, হরিনাম-জপমালা-ধারণ, ইত্যাদি দ্বারা সে কি নামধারী বিপ্র-সন্তান অপেক্ষা সগুণ বা সমগুণ নয়? নির্গুণ মনে করিলেও জাত্যুক্তাশৌচ বাড়িবে কিসে? "নবর্দ্ধয়েদঘাহানি" মনুর পঞ্চম অধ্যায়ের ৮৪ শ্লোক অগ্রে ঘেরিয়াছে। যদি মনু অপেক্ষা কোন তেজস্বী ঋষি নির্গুণের আরও অশৌচ বৃদ্ধির বিধান করেন, তবে অগ্রে ব্রাহ্মণাদি জাতির বৃদ্ধি হইবে।

ক্ষত্রিয়ের সগুণাদি ভেদে বিধান এই :—

'ত্রিদিনাৎ শুধ্যতে ক্ষত্রস্তেজোবীর্য্য সমর্থবান্।
দশাহাত্তু ধনুর্বেদে নির্গুণী দ্বাদশৈর্দিনৈঃ॥' ২৩

তেজোবীর্য্য শক্তিমান্ ক্ষত্রিয় তিনদিনের পর শুদ্ধ হয়, কেবল ধনুর্বেদপারগ দশদিনের পর, এবং নির্গুণ অর্থাৎ জাতিমাত্র ক্ষত্রিয় বারদিনের দ্বারা শুদ্ধ হয়। মহাকবি কালিদাস রঘুবংশে ৮ম সর্গে ৭৩ শ্লোকে ইন্দুমতীর মরণে অজের শ্রাদ্ধকরণ স্থলে লিখিয়াছেন,—

'অথ তেন দশাহতঃ পরে, গুণশেষামুপদিশ্য ভামিনীম্।
বিদুষাবিধয়ো মহর্দ্ধয়ঃ, পুর এবোপবনে সমাপিতা॥'

ইহার পর সেই বিদ্বান্ অজ ইন্দুমতীকে গতপ্রাণ দেখিয়া দশদিনের পর উপবনে মহা সমৃদ্ধিযুক্ত শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। ঐ শ্লোকের টীকায় মল্লিনাথ পরাশরের দায় দিয়া বচন উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন :—

"ক্ষত্রিয়স্তুদশাহেন স্বধর্ম্মনিরতঃ শুচিঃ॥"

স্বধর্ম্ম পরায়ণ ক্ষত্রিয় জনন মরণে দশদিনের দ্বারা শুচি হইবে।

বাল্মিকী রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ড ৭৭ অধ্যায় ১ম শ্লোকে দশরথের মৃত্যুতে ভরতের শ্রাদ্ধকরণ স্থলে লিখিয়াছেন :—

'ততো দশাহেতিগতে কৃতশৌচো নৃপাত্মজঃ।
দ্বাদশেঽহনি সংপ্রাপ্তে শ্রাদ্ধকর্ম্মাণ্যকারয়ৎ॥'

তাহার পর নৃপনন্দন ভরত দশদিন গত হইলে, একাদশ দিনে অঙ্গ-প্রায়শ্চিত্তাদি শুদ্ধি কর্ম্ম করিয়া দ্বাদশ দিন প্রাপ্ত হইলে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছিল।

বৈশ্যের নিয়ম এই ঃ—

'দশাহাচ্ছুধ্যতে বৈশ্যঃ যদি বেদে সুপারগঃ।
ক্রিয়াযুগ্ দ্বাদশাহানি পক্ষে চ নিগুণী শুচিঃ॥' ২৪

যদি বৈশ্য বেদপারগ হয় তবে দশদিনে শুদ্ধ হইবে। ক্রিয়াবান্ বৈশ্য বারদিনে ও নিগুণী একপক্ষে শুচি হইবে।

'বৈশ্যবৎ শুধ্যতে শূদ্রঃ সৎশূদ্রস্যাপি তৎসমঃ।
মধ্যমা একবিংশত্যা অধমাস্ত্রিংশতাদনৈঃ॥' ২৫

শূদ্র ও সৎশূদ্র দাসাদি বৈশ্যের ন্যায় পঞ্চদশদিনে শুদ্ধি হয়। মধ্যম শূদ্রের একুশদিনে, অধম শূদ্রের ত্রিশদিনে শুদ্ধি হয়। মনুও বলিয়াছেন ঃ—

শূদ্রাণাং মাসিকং কার্য্যং বপনং ন্যায়বর্ত্তিনাং।
বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চ দ্বিজোচ্ছিষ্টশ্চ ভোজনং॥'

ন্যায়বর্ত্তী, মাসিক বপনশীল, দ্বিজোচ্ছিষ্টভোজী শূদ্রের বৈশ্যের ন্যায় পঞ্চদশাহাশৌচ কল্পনা করিবে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় শুদ্ধিতত্ত্বে মনুর এই বচন উদ্ধার করিয়া বিচার করিয়াছেন যে—

"মনুবচনান্ন্যায়বর্ত্তিশূদ্রাণাং "বৈশ্যবচ্ছৌচকল্পশ্চেত্যত্র" চকারাদ্ বৈশ্য ধর্ম্মাতিদেশে নোপনয়ন প্রশক্তৌ তৎস্থানে ব্রহ্মপুরাণেন বিবাহো বিধীয়তে যথা বিবাহমাত্রং সংস্কারঃ শূদ্রোঽপি লভতে সদেতি"

মনুর বচনানুসারে ন্যায়বর্ত্তী শূদ্রের বৈশ্য ধর্ম্মাতিদেশে উপনয়ন স্থানে ব্রহ্মপুরাণীয় ব্যবস্থায় বিবাহেই সকল সংস্কার সিদ্ধ হইয়াছে। যথা ঃ— শূদ্র সর্ব্বদা বিবাহমাত্র সংস্কারের দ্বারা সকল সংস্কার লাভ করিবে। অন্য একস্থলে উপবীতের ন্যায় উত্তরীয় ধারণ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন ;—

"স্ত্রীশূদ্রয়োরপি দ্বিজোপবীতধারণবদুত্তরীয় ধারণাচারাৎ।"

স্ত্রী ও শূদ্রজাতির কর্ম্মকাণ্ড স্থলে উত্তরীয় ধারণই দ্বিজের উপবীত ধারণবৎ হইবে। অন্য একস্থলে রঘুনন্দন মহাশয় হারালতা মিতাক্ষরাদির বচন একবাক্য করিয়া শূদ্রের দশাহাশৌচ বিধান নিষেধ করিবার প্রসঙ্গে বলিয়াছেন ঃ—

"শূদ্রস্যাপি ব্রাহ্মণস্য সেবকান্তরাভাবে ব্রাহ্মণসেবার্থমেব দশাহান্তরং

শুদ্ধিঃ। "মাসেনৈব তু শুদ্ধিস্যাৎ সূতকে মৃতকে তথা" ইত্যঙ্গিরোবচনে এবকার শ্রুতেঃ সর্ব্বাশৌচ নিবৃত্তিস্তু মাসেনৈব, তস্মাৎ সগুণানাং তত্তৎ কর্ম্মণ্যেবাশৌচস্য সঙ্কোচঃ। সর্ব্বাশৌচ নিবৃত্তিস্তু দশাহাদূর্দ্ধমিতি হারালতা মিতাক্ষরাদ্যুক্তং সাধীয়ঃ। বস্তুতস্তু হেমাদ্রি পরাশরভাষ্যধৃতাদিত্যপুরাণেন বৃত্তাদি নিমিত্তকাশৌচ সঙ্কোচঃ কলৌ নিরস্তঃ। যথা "কন্যানামসবর্ণানাং বিবাহশ্চ দ্বিজাতিভিঃ। বৃত্তস্বাধ্যায়সাপেক্ষ মঘসংকোচনং তথা ইত্যাদি।"

ব্রাহ্মণের অন্য সেবকের অভাবে ব্রাহ্মণসেবার্থে শূদ্রের দশাহের পর শুদ্ধি হইবে। যদিও হারালতা অঙ্গিরাদি মৃত সূতকে শূদ্র মাসের দ্বারা শুদ্ধি হইবে বলিয়াছেন, তথাপি সগুণ শূদ্রের দ্বিজ সেবার্থে অশৌচ সঙ্কোচ করিয়া দশাহের ঊর্দ্ধ সকল অশৌচ শুদ্ধি হইবে মিতাক্ষরাদি এইরূপ বলিয়াছেন। কিন্তু হেমাদ্রিপরাশর ভাষ্যধৃত আদিত্যপুরাণ দ্বারা বৃত্তাদি নিমিত্ত যে অশৌচ সঙ্কোচ লিখিত হইয়াছে, তাহা কলিযুগে হইবে না। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটি কথা বলিয়াছেন, যথা; দ্বিজাতির অসবর্ণা কন্যাবিবাহ, বৃত্তস্বাধ্যায় জন্য অশৌচ সঙ্কোচ ইত্যাদি।

তজ্জন্য কলিযুগে সকলকে নির্গুণ বিবেচনা করিয়া একটি মাত্র প্রমাণ স্থির করিয়াছেন যে,

"শুধ্যেদ্‌বিপ্রোদশাহেন দ্বাদশাহেন ভূমিপঃ।
বৈশ্যঃ পঞ্চদশাহেন শূদ্রোমাসেন শুধ্যতি।"

"ব্রাহ্মণ জাতি দশ দিনে, ক্ষত্রিয় বার দিনে, বৈশ্য পনর দিনে, শূদ্র এক মাসে শুদ্ধ হয়। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মত পর্য্যালোচনা করিয়া জানা যায় যে, কলিতে সগুণ-সমগুণ-অভাব ও নির্গুণ-বাহুল্য হেতু সকলেই স্ব স্ব জাত্যনুসারে উল্লিখিত চারিটি অশৌচ ধারণ করিবে। গুণাদি বিদ্যমান থাকিলেও অশৌচ সঙ্কোচ করিবে না।"

একথা কেবল বাঙ্গলায় কয়জন ব্রাহ্মণ-বংশজাত ব্যক্তিকেই মানিতে দেখা যায়। পশ্চিম-দক্ষিণ-প্রদেশে ও বাঙ্গালার মধ্যে মেদিনীপুর ও তন্নিকটস্থ কয়েকটি জেলায় সকলের নিকট প্রতিপালিত হয় না। ক্ষত্রিয়বৈশ্য দূরের কথা, শূদ্রের মধ্যে করণ, তেলী, নাপিত, কামার, গৌড় প্রভৃতিকে দশদিনের পর একাদশ দিনে শুদ্ধি হইয়া শ্রাদ্ধ দৈবকর্ম্মাদি করিতে দেখা যায়। তাহাদের ব্রাহ্মণাভাব কখন কর্ণে শুনা যায় নাই। সহবাসী অন্যান্য সজ্জনের ভোজনাদিও বন্ধ নাই। কেবল মাহিষ্যের বেলা "ন বর্দ্ধয়েদঘাহানি" বচনকে পদদলিত

করিয়া মাসাশৌচ করিতে হইবে, ইহা কোন পুস্তকে কবে কে দেখিয়াছেন, না শুনিয়াছেন? শাস্ত্রের উক্তি সমস্তই পূর্ব্বে বর্ণিত হইল। তাহাতে বৈশ্যের পঞ্চদশাহের অতীত নিগুর্ণাশৌচ নাই। শূদ্রেরও মাসাশৌচের অতীত নিগুর্ণাশৌচ নাই। যদি কোন কোন শ্রমজীবীর পৈতা ঝুলান না দেখিয়া কোন কলির কবি অশৌচ দিন সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে চান, তবে তাঁহার স্পষ্ট করিয়া বিধানটি বলা কর্ত্তব্য এবং স্বয়ং অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য। নিগুর্ণতর বৈশ্যের যদি মাসাশৌচ হয়, ঐরূপ শূদ্রের ও ক্ষত্রিয়ের কতদিন অশৌচ হইবে? ভাট, গণক, রামাত, রাজুর বা কতদিন? আর নিগুর্ণতর নিগুর্ণতম ব্রাহ্মণের কত দিন অশৌচ হইবে? বর্ত্তমান সমাজে সকল জাতিই প্রায় বৈশ্যকর্ম্মোপজীবী। বরং নিগুর্ণ, নিগুর্ণতর, নিগুর্ণতম ব্রাহ্মণ-সন্তান দেখা যায়, নিগুর্ণ বৈশ্য কবে কে দেখিয়াছেন? তর তম প্রত্যয়ান্ত অপ্রত্যয়ের কথা। অতএব মাহিষ্য ও সৎশূদ্রগণের প্রতি এই নিবেদন যে, এই প্রবন্ধোদ্ধৃত সার্থ প্রমাণগুলি মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিয়া, আমার শেষের দুইটী প্রশ্নের উত্তর সপ্রমাণ বুঝিয়া লইতে পারিলে, আমি প্রবন্ধ লেখার শ্রম সফল মনে করিব। স্বজাতি-বিদ্বেষও মিটিয়া যাইবে। এবিষয়ে আরও বিশদ করিয়া বুঝাইবার আশা থাকিল। বর্ত্তমানে প্রবন্ধবিস্তার ভয়ে ভাব-গুপ্তির ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। ভাব-গ্রাহীর নিকট ভাব গোপন থাকিবে না।

শ্রীসাগরচন্দ্র কবিরত্ন,

আর্ত্তত্রাণ পাঠশালা, রাজারামপুর, নন্দপুর পোষ্ট, মেদিনীপুর।

বৃদ্ধের পত্র সম্বন্ধে মন্তব্য।

বিগত ২৭শে ফাল্গুন তারিখে লিখিত—"শ্রীবৃদ্ধ (বয়ঃ অশীতিবর্ষ)"—এইরূপ চিহ্নিত নামধামহীন একটী সুদীর্ঘ অভিযোগ পত্র ডাকযোগে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। তাহাতে কতিপয় প্রশ্নের উত্তর প্রার্থনা করা আছে। আমরা এরূপ অজ্ঞাত নামা ব্যক্তির কোনরূপ প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নহি। মাহিষ্য-হিতৈষী বৃদ্ধের এরূপ প্রচ্ছন্ন রহিবার বাসনা কেন? প্রকৃত পরিচয় প্রদান করিলে সাদরে তাঁহার সন্দেহভঞ্জন করতঃ কৌতূহল নিবৃত্তি করা যাইবে। এই সংখ্যায় "সত্যপথ" প্রবন্ধ পাঠে তাঁহার অনেকটা সন্দেহ ঘুচিবে।

—মাহিষ্য-সমাজ-সম্পাদক।

কৃষি-বার্ত্তা।

(লেথক—শ্রীআশুতোষ দেশমুখ)

বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষিবিভাগ হইতে প্রাপ্ত তিলের ফসলের আনুমানিক ফর্দ্দে দেখা গেল, এবার বৃষ্টি ও ঋতুর গতি তিলের পক্ষে মোটের উপর সুবিধাজনক হইলেও স্থানে স্থানে বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। ৬৪৭০০ একর জমিতে তিল চাষ হইয়াছে; গত বৎসর ৭৬৭০০ একর চাষ হইয়াছিল। হিসাবমতে সমগ্র বঙ্গে এ বৎসর ১০৪০০ টন তিল পাওয়া যাইতে পারে, গত বৎসর ১১৮০০ টন পাওয়া গিয়াছিল।

যাহাকে আমরা মধ্যবিত্ত বা গৃহস্থ বলি, সেই ঘরের ছেলেরাই এক্ষণে বিলাস ও দারিদ্র্যের মধ্যস্থলে থাকিয়া উদ্যোগী ও কর্ম্মশীল হইবার সুবিধা পাইয়াছে। বঙ্গের পুরাতন অভিজাত বংশগুলি একেবারে বিলুপ্ত না হইলেও জরাগ্রস্ত বটে; মুসলমানী আমলে ও ইংরাজী আমলের প্রথমভাগে পাটোয়ারী কারকুন আমমোক্তার প্রভৃতি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন করিয়া যে নূতন জমিদারী অভিজাত সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল তাঁহাদেরও অবস্থা তথৈবচ। মধ্যবিত্ত অবস্থার লোকের মধ্যে কেবল কেরাণীকুলই সর্ব্বপ্রথম ইংরাজ ও ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের ঘনিষ্ট সংস্পর্শে আসিতে পারিয়াছিল। সেই সুবিধার ফলে মধ্যবিত্তগণের শোভনীয় ডাক্তারী ওকালতী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি যে সকল ব্যবসা "Profession" (পেশা) আখ্যায় গৌরবান্বিত তাহাতে ইঁহাদেরই বংশধরগণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রাদুর্ভাব। এখন কিন্তু ক্রমাগতই বংশবৃদ্ধি হওয়ায় ইঁহাদের সন্তানসন্ততিরা কি করিয়া খাইবে, এ ভাবনা স্বতঃই চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রকে উদ্বিগ্ন করিতেছে।

চাকুরীর দোষটুকু ইঁহাদের এমনই মজ্জাগত যে, বর্ত্তমান জগতে প্রধান বলিয়া গণ্য এই সকল বৈজ্ঞানিক ব্যবসায়ে প্রথম প্রবেশ লাভ করিয়াও ইঁহারা স্বীয় উদরের পরিধি-বৃদ্ধি ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতিই করিতে পারেন নাই। এখন ইঁহাদের জন্য কৃষি কার্য্যের ব্যবস্থা করিয়া চারিদিকে বক্তৃতা চলিতেছে দেখিতে পাইতেছি। ইহাতে আর কিছু না হউক কৃষির মর্য্যাদা এই সকল লোকের অন্তরে কতকপরিমাণে প্রবেশ

করিলেও ফল মন্দ হইবে না। কিন্তু যেথানে "বাপ বেটায় চাষ চাই। তা অভাবে সোদর ভাই॥"—সেথানে "কাঁধেছাতির" দল কিছু করিতে পারিবে কি? বীরপুরুষের মত লাঠি ধরিবার জন্ত আজকাল অনেক প্রকার "খিচুড়ীর" হাত (হাতের ব্যবহার নিষেধ সুতরাং মুখে মুখেই) নিষ্ পিষ্ করে দেখিতে পাই; কিন্তু হাত দুইটীর স্বাভাবিক সদ্ব্যবহার করিতে ইঁহারা যে একেবারেই নারাজ। "শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং" উপদেশের এককাঠি উপরে উঠিয়া এই "নিরীহ ভদ্রের" দল "পাণিনাং"টাই বাদ দিয়াছেন। তাই ইঁহাদের হাতে ডাক্তারী ইঞ্জিনিয়ারিং প্রভৃতি ব্যবসারও স্ফূর্ত্তি নাই। আগেও যে "ঢেউগণা" ছিল এখনও সেই "ঢেউগণা।" যাহা হউক, ইঁহারা যদি এক্ষণে মুখের "কর্ম্মযোগ" ছাড়িয়া হাতের "কর্ম্মযোগ" অভ্যাস করেন, তাহা হইলে বাঙ্গালার ("brain") মস্তিষ্কের অবস্থার কিছু ইতর-বিশেষ হইবে না,—হইবে নিজেদের চরিত্র ও ভবিষ্যতের পরিবর্ত্তন।

"নিরস্তে পাদপে দেশে এরণ্ডোঽপিদ্রুমায়তে।" এই অবসাদ ও পরিক্ষীণতার যুগে যে সকল বক্তা ও লেখকের দল দেশের প্রকৃত স্বার্থ জাতি সাধারণের সর্ব্বত্র সমান পরিপুষ্টির দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া, কেবল তিনি হিন্দু সমাজের যে দুই এক লক্ষের মাথার মণি, স্থানে অস্থানে তাহারই গৌরব ঘোষণা করা এবং প্রসঙ্গতঃ আর সকলের নিন্দা করাই জীবনের সার বলিয়া মনে করেন; সেই সুযোগ পাইলেই আনন্দে উৎফুল্ল হন; তাঁহাদিগকে আমরা আমাদের জাতীয় রোগের উপসর্গ বলিয়া মনে করি। আশা ত আছে, রোগ প্রশমিত হইলে এই সকল উপসর্গও অদৃশ্য হইবে; জাতীয় স্বাস্থ্য পুনরায় ফিরিয়া আসিবে। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ ও কতকগুলি মুসলমান",—"মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ই দেশের মস্তিষ্ক"—এই সকল আস্ফালনের কোন অর্থই ত আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না। "মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়" যদি "middle class" (মিডল ক্লাস) এই ইংরাজী কথার তর্জ্জমা হয় তাহা হইলে এদেশীয় যে জাতিই হউক না কেন, সমগ্র জাতি "middle class" হয় কিরূপে? "ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থের" সকলেই কি "middle class"? তাঁহাদের মধ্যে অভিজাত ও নিম্নশ্রেণী যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, তাহা সেন্সস রিপোর্ট দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন।

পাশ্চাত্যদেশের 'শ্রেণী' বিভাগ ও আমাদের বর্ত্তমান 'জাতি' বিভাগ একেবারেই অসদৃশ। আমাদের বর্ত্তমান জাতিবিভাগকে বরং কতকাংশে পাশ্চাত্য নেসন্যালিটী nationality (যেমন ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ, জর্ম্মাণ) বিভাগের সহিত তুলনা করা যায়। ইংরাজ, জর্ম্মাণ প্রভৃতি nationalityতে যেরূপ class বা শ্রেণীবিভাগ আছে, ব্রাহ্মণ মাহিষ্য প্রভৃতি সংখ্যাবহুল প্রধান জাতিতে সেইরূপ অবিকল গঠিত হইয়াছে। কেবল আমাদের আভ্যন্তরীণ শ্রেণী বিভাগ হিংসা, দ্বেষ ও সংঘর্ষশূন্য অবস্থায় বর্ত্তমান ; বিভিন্ন শ্রেণীর গঠন ও মিলনের সুবিধা পাশ্চাত্য সমাজের অপেক্ষাও সরল ; সেই জন্য বিভিন্নশ্রেণীর স্বার্থ যেখানে বিভিন্নও দেখা যায় তথায় সামঞ্জস্য করিতে গেলে revolution বা বিপ্লবের প্রয়োজন করে না। কিন্তু দেখিতে পাই, কেহ কেহ—কোন্ অভিসন্ধিতে বলিতে পারি না—আমাদের সামাজিক গঠন সম্পূর্ণ অন্যরূপ বলিয়া প্রচার করিতে বদ্ধপরিকর।

নিজ নিজ জাতীয় কাঠখড়ময় বিগ্রহ সমগ্রদেশের ইষ্টদেবতা করিবার আগ্রহ সময়ে সময়ে বড়ই হাস্যাস্পদ হইয়া উঠে। লোকলোচনান্তরালে প্রস্থিত সর্ব্ব-বঙ্গ-শিক্ষা-সম্মিলনীর একখানি পুস্তিকায় দেখিয়াছিলাম লেখা আছে, এদেশে "ব্রাহ্মণ বৈদ্য কায়স্থই কেবল লেখাপড়া মুড়িমুড়কির মত খাইয়া থাকেন"! তা খাইতে পারেন ; কিন্তু সেন্সাসের হিসাব যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের কেহই অর্দ্ধেক লেখাপড়াও হজম করিতে পারেন নাই। কারণ স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাকুক, শুদ্ধ পুরুষ ধরিলেও তাঁহাদের হাজার করা ৫০০ লোক লেখাপড়া রূপ "মুড়িমুড়কীর" রসাস্বাদনে বঞ্চিত!! এই অজীর্ণ-রোগগ্রস্তের দলই কি দেশের "brain" (মস্তিষ্ক)?

বোম্বাই কৃষিবিভাগের মহারথ জি, এফ কিটিঙ মহোদয়ের সম্প্রতি-প্রকাশিত কৃষিপ্রবন্ধে কৃষিসম্বন্ধীয় অনেক সমস্যারই সুন্দর আলোচনা হইয়াছে। কৃষিতে অনুরক্ত ব্যক্তি মাত্রেই এই প্রবন্ধ হইতে অনেক সাহায্য পাইবেন সন্দেহ নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহার উপদেশের এক অংশ বুঝিতে পারিলাম না। তিনি বলেন, প্রচুর পরিমাণে টাকা না ফেলিলে এ দেশে কৃষির উন্নতি অসম্ভব। কৃষকেরা দুঃস্থ ; বৈজ্ঞানিক

খাল বাঁধ প্রভৃতি নির্ম্মাণে তাহাদের সাধ্যাতীত; একযোগে কর্ম্ম করিবার জ্ঞানও তাহাদের জন্মে নাই। এরূপ অবস্থায় কিটিং সাহেব বলেন তাহাদের হস্তে জমি থাকিলে তাহা নিঃশেষ করিয়া দোহন করা অসম্ভব। এবং তাহা না হইলে কৃষি হইতে দেশের যত আয় হইতে পারিত তাহা হইতেছে না। উপযুক্ত লোকের হাতে থাকিলে তাঁহারা জমিতে যত শস্য জন্মান সম্ভব তাহা জন্মাইতে পারিতেন। এখন এই উপযুক্ত লোক কে? না, capitalist (ক্যাপিটালিষ্ট) দেশী মহাজনের ইংরাজী সংস্করণ। "ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জোতদার কৃষক তাড়াইয়া বড় বড় এষ্টেট প্রস্তুত কর, ও খাল বিল কাটিতে পারে এমন capitalist (ক্যাপিটালিষ্ট) এর হাতে দাও। দেখিবে সোণা ফলিবে। দেশে অজস্র অর্থ আসিবে।" আসিবে সত্য কিন্তু ভোগে আসিবে কার? দরিদ্র কৃষকের দারিদ্র্য ঘটিবে কি? যদি দেশটা শুদ্ধ অর্থোপার্জ্জনেরই কল হইত, তাহা হইলে কল যথাসম্ভব না চালাইলে নির্ব্বুদ্ধিতা প্রকাশ পাইত বটে, কিন্তু দেশের প্রধান লক্ষ্য যে, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, নৈতিক পবিত্রতা ও মনুষ্য নামের উপযুক্ত লোকের সৃষ্টি। কৃষি ব্যতীত অন্য কোন্ ব্যবসায়ে এই সকলগুলির একত্র স্ফূর্ত্তি হয়?

যে কোন্ দেশ সভ্যতার উচ্চশিখরে আরোহণ করিতে পারিয়াছে, তাহারই মূলে সুস্থ ও সবল কৃষীবল বর্ত্তমান। রোম যখন সর্ব্বত্র বিজয়ী তখন কৃষক লাঙ্গল ছাড়িয়া তাহার রাজতক্তে বসিতে পারিত। এখনও সুসভ্য আমেরিকার শীর্ষদেশে অনেক কৃষক-সন্তান স্থান লাভ করিতেছেন। পাশ্চাত্য মনিষী এমর্সণ বলেন:—"কৃষক যুগযুগান্তর হইতে সঞ্চিত স্বাস্থ্যের আধার—স্বাস্থ্য ব্যবসায়ের মূলধন—আর কৃষিক্ষেত্র সঞ্চিত ধনের আগার। গ্রামের ক্ষেত্র হইতেই নগরের উদ্ভব হইয়াছে। নগরের—সভ্যতাদৃপ্ত নগরের—শক্তি বল, স্বাস্থ্য বল, চরিত্র বল, বুদ্ধি বল সমস্তই কৃষক হইতে প্রাপ্ত। কৃষক-পিতৃকুল কত শত বৎসর ধরিয়া শীত উষ্ণ, বাত আতপ, দুঃখ দারিদ্র্য, অভাব অন্ধকারের মধ্য দিয়া—বজ্রের মত কঠিন শরীর পাত করিয়া—নীরবে যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের পৌত্র-প্রপৌত্রগণ সেই শক্তিরই বলে ব্যবসা বাণিজ্য, রাজনীতি সমাজনীতি, শাস্ত্র ও শিল্পের চাকা ঘুরাইয়া নগরকে শক্তিচালনার কেন্দ্র করিয়াছে—জগৎ স্তম্ভিত করিতেছে।"

এই কৃষক যদি মজুর মাত্র হয়, তাহা হইলে মানব জাতির মূলধন স্বাস্থ্য ও নীতির অবস্থা কিরূপ দাঁড়াইবে? কলের মজুরের কিরূপ দুর্দ্দশা জানেন কি? জমিদারী প্রথার নিষ্পেষণ যতই থাকুক না কেন, কৃষককে নিজের বলিবার একটু জমি দিন—কৃষক দুঃখ দারিদ্র্যকে অগ্রাহ্য করিয়া ভবিষ্যতের জাতীয় মূলধন সঞ্চয় করিবে। শুদ্ধ আপাতদৃশ্য অর্থলাভের জন্য এ সকল কি বিসর্জ্জন দেওয়া যায়?

কিটিঙ সাহেব কৃষির যে অল্প উন্নতি দেখিয়া এইরূপ রোগরোগী উচ্ছেদক ব্যবস্থা করিয়াছেন, আমরা তাহা শিক্ষা-বিস্তার হইলেই সম্পূর্ণভাবে পুষ্টিলাভ করিবে বলিয়া মনে করি। উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে—লেখাপড়ার চক্র হাতে দিলে—সাহেব কৃষকের যাহা যাহা অভাব বলিয়াছেন, সে সকল গুলি দূর করা কৃষকের অনায়াসসাধ্য হইতে পারে। কলে রোজ ২০০ মণ ধান ভানা চলে। কিন্তু কৃষককে ঢেঁকি দিয়া সেই ২০০ মণ চাহিলে চলিবে কেন? কৃষকের হাতেও কল দিন; ধান অপর্য্যাপ্ত পাইবেন অধিকন্তু ভবিষ্যতেরও সুবন্দোবস্ত হইবে। লেখাপড়ায় সকল শিক্ষারই গতি সহস্রগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে—আর কৃষি সেই লেখাপড়া হইতেই বঞ্চিত! যে যুগে মানবের বিন্দুপরিমেয় স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া—গুরুর পাদমূলে বৎসরের পর বৎসর একান্তে বসিয়া—ধীরে ধীরে অতি কষ্টে শিক্ষাব্যাপার সমাহিত হইত; আবার নানা কৌশলে সীমাবদ্ধ স্মৃতিশক্তির মধ্যে সেই জ্ঞানটুকু সঞ্চিত করিয়া রাখিতে হইত;—সে যুগে মানবের স্মৃতি কতটুকু বিদ্যার ভার বহন করিতে পারিত? কৃষক—নিয়তির প্ররোচনায় সম্মুখদেশেই দৃষ্টিবদ্ধ মানবসমাজের অরক্ষিত পশ্চাদ্ভাগে পর্ব্বতের ন্যায় দণ্ডায়মান কৃষক—সেই যুগের লোক। লেখাপড়া রূপ কলের সাহায্যে কৃষক অপেক্ষা দুই এক গুণ অধিক কাজ করিতে পার বলিয়া—একটু অধিক বুদ্ধির পরিচয় দিতে পার বলিয়া—বড়াই করিও না। কৃষকের হাতেও কল দাও; দেখিবে, তোমার বিলাসক্লেদখিন্ন হস্ত অপেক্ষা কৃষকের বাহুবল অনেকগুণ অধিক।

নবগঠিত প্রদেশ 'বিহার ও উড়িষ্যার' কৃষিব্যবসায়িগণ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় ও বড়লাটের সভায় কৃষির অধিকার রক্ষা করিবার জন্য অন্ততঃ দুইজন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবার ক্ষমতা চাহিয়াছিলেন। তাঁহারা বলেন, উকীল প্রভৃতির দ্বারা

কৃষকের প্রতিনিধিত্ব সুচারুরূপে চলিতে পারে না। অনেক স্থলে তাঁহাদের ব্যবসায়ের সহিত কৃষকের ব্যবসায়ের সংঘর্ষ হয় এবং কৃষির অভাব অভিযোগ প্রত্যক্ষ জানিবার ও বুঝিবার সুবিধাও তাঁহাদের নাই। গবর্ণমেণ্ট এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করেন বটে, কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁহাদের প্রার্থনা পূরণ করিবার সময় এখনও হয় নাই বলিয়া ইঙ্গিত করিয়াছেন। বিভিন্ন ব্যবসায়ের প্রতিনিধি তত্তৎ ব্যবসায়ীর মধ্য হইতে নির্ব্বাচন করাই নীতিসঙ্গত, এবং পুরাতন ভারতীয় সমাজে ও ইউরোপে সেই প্রথাই চলিয়াছে বলিয়া রাজ্যপরিচালনে বিশৃঙ্খলা ঘটে নাই। নিজ নিজ কর্ত্তব্য সাধ্যমত প্রতিপালন করা যেমন ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ, নিজ নিজ ব্যবসায়ের অধিকার রক্ষা করাও সেইরূপ সামাজিক কর্ত্তব্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম। না করিলে, যদি ব্যবসায়ের অবনতি ঘটে বা অন্য ব্যবসায়ের তজ্জনিত অযথা পুষ্টি হয়, তাহা হইলে সামাজিক সামঞ্জস্য নাশের জন্য উদাসীন ও অকর্ম্মণ্য ব্যবসায়িগণকে তুল্যরূপে দায়ী হইতে হইবে। বঙ্গে কৃষি ব্যবসায়ের সহিত যে দুই তিনটী মৌলিক প্রধান প্রধান জাতির অধিকাংশের ভাগ্য বিজড়িত, অন্ততঃ তাঁহাদের একযোগে কর্ম্ম করিবার বুদ্ধি ও তদনুরূপ জ্ঞান না জন্মিলে, মন্ত্রিসভায় কৃষির অধিকার রক্ষা করিবার চেষ্টা সফল হইবে না। বোধ হয়, বিহার ও উড়িষ্যার অবস্থা তদ্রূপ; সেইজন্য গবর্ণমেণ্ট কৃষি ব্যবসায়িগণের প্রার্থনা পূরণ করিলেন না। যাহা হউক, আর বিহারীগণ অপেক্ষা সকল বিষয়ে অগ্রগামী বলিয়া বাঙ্গালীদের দর্প করা চলিবে না।

আমাদের দেশে বলদের সাহায্য ব্যতিরেকে কৃষিকার্য্য অসম্ভব। অথচ গোজাতির পুষ্টি ও বৃদ্ধি সম্বন্ধে আমরা কোন ধারাবাহিক উৎকৃষ্ট নিয়ম অনুসরণ করি না। এ বিষয়ে ব্যক্তিগত চেষ্টায় বড় অধিক ফল হয় না; প্রায় সকল ব্যাপারের মত ইহাতেও সমবেত চেষ্টা চাই। এই সমবেত চেষ্টা অন্য দেশে জনসাধারণের পক্ষ হইতে হয়, কিন্তু আমাদের দেশে গবর্ণমেণ্ট এই সব কার্য্যে অগ্রণী। বিগত গবাদির সেন্‌সাস্ রিপোর্ট এখনও বাহির হয় নাই; তথাপি বঙ্গীয় কৃষিবিভাগের ঋতু ও শস্য সম্বন্ধীয় রিপোর্ট হইতে সংগৃহীত বলদের সংখ্যা কৃষিতে অনুরক্ত লোকের উপকারে আসিতে পারে, যথা:—রাজসাহী ২৫০০০০, রঙ্গপুর ১৪৭৯০, ফরিদপুর ৩৪৫৬০০, বাখরগঞ্জ ২৬৯৪১৩, চট্টগ্রাম ৫২০০০০, নোয়াখালি ৪২৯৮৬।

সামাজিক গতিবিধি।

১। নদীয়া জেলার আমলাসদরপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ বিশ্বাস মহাশয় লিখিয়াছেন—'আমাদিগের পল্লীসমিতির কার্য্য একরূপ চলিতেছে, ক্রমশঃই সমিতির প্রতি অনেকেরই সহানুভূতি দেখা যাইতেছে। সমিতির নামে কিছু কিছু করিয়া বিবাহ ইত্যাদিতে অর্থ সংগ্রহ হইতেছে, এবং তদ্দ্বারা আবশ্যকীয় পুস্তকাদি খরিদ করা হইবে। ৭।৮ জন মাহিষ্য-ব্যাঙ্কিং-এণ্ড-ট্রেডিং কোম্পানির অংশ গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইয়াছেন; সত্বরেই তাঁহাদের টাকা পাঠাইতেছি। এই সমিতির উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ উন্নতি দেখা যাইতেছে। প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের মহিলাগণই মাহিষ্য-মহিলা পাঠ করিয়া থাকেন। সমিতির অন্যতম সভ্য শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস কৃষির উন্নতির জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।'

২। জেলা ২৪ পরগণা গোবরডাঙ্গা হইতে শ্রীযুক্ত বাবু জগৎপতি সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন—"কলিকাতা হ্যারিসন রোড দিয়া যাতায়াতের সময় মধ্যে মধ্যে মাহিষ্য-ব্যাঙ্কিং-এণ্ড-ট্রেডিং কোম্পানির সাইনবোর্ড খানি দৃষ্টিপথে পতিত হয় বটে, কিন্তু উহার তথ্য জানিবার জন্য তৎকালীন ইচ্ছা মনে উদয় হইলেও বিশেষ ফলবতী হয় নাই। অদ্য মাহিষ্য-সমাজ পত্রিকায় উহার বিজ্ঞাপন দেখিয়া এতদ্বিষয়ে কৌতূহলী হইয়াছি। কোম্পানির জন্য পরিশ্রম করিতে ইচ্ছা জন্মিয়াছে"—আমরা জগৎপতি বাবুর এই সাধুসঙ্কল্পের জন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আশা করি, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে পল্লীসমিতি স্থাপন করিবেন এবং যাহাতে সেই সেই স্থানে বঙ্গীয় মাহিষ্য সমিতির উদ্দেশ্যগুলি বিশেষ রূপে প্রচারিত হয় তজ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

৩। জেলা দিনাজপুরের অন্তর্গত হরিপুর হইতে শ্রীযুক্ত বাবু নবকিশোর দাস মহাশয় লিখিয়াছেন—"এখানকার মাহিষ্য সমাজপতিগণের চেষ্টায় ও উদ্যোগে স্থানে স্থানে পল্লীসমিতি স্থাপিত হইতেছে। সমিতির সভ্য সংখ্যা বৃদ্ধি করণ মাহিষ্য ব্যাংকের শেয়ার গ্রহণ করণ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় গুলির প্রতি সকলেরই সহানুভূতি আকৃষ্ট হইতেছে।"

৪। মধ্য প্রদেশের পেঞ্চ নামক স্থান হইতে শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রনাথ

অতি দূরদেশে থাকিয়াও জাতীয় প্রেমে অনুপ্রাণিত হইয়া সমাজের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করিতেছেন। আমরা সমাজহিতৈষী এই বন্ধুদ্বয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

৫। উকিলের সহানুভূতি।—হাইকোর্টের উকীল মাননীয় শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন শিকদার বি-এল মহোদয় মাহিষ্য-সমাজের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার যত্নে ও উদ্যোগে গত মাঘ মাস মধ্যে প্রায় ১৫ জন মাহিষ্য ভ্রাতা মাহিষ্য-সমাজ পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হইয়াছেন। প্যারী বাবুর এই স্বজাতিপ্রেমের জন্য সমগ্র মাহিষ্যসমাজ তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে। আমরা আশা করি, প্রত্যেক শিক্ষিত মাহিষ্য ভ্রাতাই সমাজের উন্নতির জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিয়া আমাদিগের কার্য্যে যোগদান করিবেন।

মাহিষ্য ব্যাঙ্কিং এণ্ড ট্রেডিং কোম্পানীর অংশীদার।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর)

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ মাইতি সাং গোপেন্দ্র-নিকেতন
পোষ্ট পটাশপুর, মেদিনীপুর ... ... ১০৲
" " ফকিরদাস মাইতি সাং ঘোড়াদহ ... ... ১০৲
" " ডাক্তার জ্ঞানেন্দ্রনাথ প্রধান পোষ্ট পেঙ্ক সিঃ পিঃ ... ১০৲
" " নারায়ণচন্দ্র কোলে ওভারসিয়ার " " ... ১০৲

☞ আর আর যাঁহারা এই কোম্পানীর অংশ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের নামধাম মাহিষ্য-সমাজ পত্রিকায় ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

গ্রাহকগণের নিকট নিবেদন।—১৩১৯ বঙ্গাব্দ শেষ হইল, এখনও অনেক গ্রাহকের নিকট তাঁহাদের দেয় মূল্য বাকী রহিয়াছে; দয়া করিয়া মণিঅর্ডার যোগে পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন। ১৩২০ সালের মাহিষ্য-সমাজ গ্রহণ করিবেন কি না, তাহা যেন আমরা ১০ই বৈশাখের পূর্ব্বে অবগত হই। যাঁহাদের নিকট হইতে নিষেধসূচক কোন পত্র না পাইব তাঁহাদের অভিমত আছে জানিব। অনেক মহাত্মা বৈশাখ হইতে তিন চারি মাস পর্য্যন্ত কাগজ গ্রহণ করেন, পরে মূল্য বাবদ ভিঃ পিঃ করিলে লইতে অস্বীকার করেন। ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয়। মাহিষ্য-সমাজ বঙ্গদেশীয় মাহিষ্য-জাতির মুখপত্র—ইহা সকলের সমান আদরের জিনিস। প্রত্যেক গ্রাহক যদি অন্ততঃ একটী করিয়া নূতন গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দেন, তাহা হইলে অনায়াসে গ্রাহক সংখ্যা দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে। এ বিষয়ে দয়া করিয়া সকলে লক্ষ্য করিবেন—ইহাই আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ।

সামতা ব্রাহ্মণসভা ও মাহিষ্য-সমাজ।

বিগত ১লা চৈত্রের হিতবাদীতে জেলা হাওড়া, পাণিত্রাস নিবাসী পূজনীয় শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয় আমাদের বিরুদ্ধে যে গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা বিশেষ দুঃখিত।

মাহিষ্য-সমাজ ক্ষুদ্র পুস্তকের আকার বাহির হইলেও ইহা একখানি মাসিক সংবাদ পত্র। সংবাদ পত্রের সম্পাদক বা কর্ম্মচারিগণ কখনও মফস্বলের সকলের স্থানেই স্বয়ং গতায়াত করিয়া সংবাদ সংগ্রহ করেন না, বা তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। স্থানীয় সংবাদদাতাদিগের প্রেরিত বিবরণের উপর নির্ভর করিতে হয়। আমরাও এইভাবে কার্য্য করিয়া থাকি। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইয়াছে। বিগত ২১শে মাঘ তারিখে হাওড়া কুলিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গৌরহরি চৌধুরী মহাশয় একখানি সুদীর্ঘ পত্রে সভার বিবরণ প্রেরণ করিয়াছিলেন। স্থানাভাব বশতঃ তাঁহার পত্রটী সমস্তই ছাপিতে পারি নাই; তাহা হইতে সার সঙ্কলনপূর্ব্বক একটু সংক্ষিপ্ত বিবরণ মাত্র আমরা পত্রস্থ করিয়াছিলাম, মূল পত্রখানি নিম্নে প্রকাশিত হইল।

আমাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিয়া সাধারণ সংবাদপত্রে ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে পূজনীয় কাব্যতীর্থ মহাশয় আমাদের নিকট যদি পত্র লিখিয়া ভ্রম সংশোধনের জন্য আদেশ করিতেন, তাহা হইলে আমরা সবিশেষ তদন্ত করিয়া পরবর্ত্তী সংখ্যায় ভ্রম স্বীকার করিতাম। অথবা তিনি যদি প্রতিবাদ পত্রখানি আমাদের নিকট প্রেরণ করিতেন, আমরা নিশ্চয়ই উহা মাহিষ্য-সমাজে প্রকাশ করিতাম। বাদপ্রতিবাদ মুদ্রিত করিতে অস্বীকার করিলে, তবে না কি অন্য সংবাদ পত্রে তাহা প্রকাশ করা বিধিসঙ্গত। কাব্যতীর্থ মহাশয় এই দুইটী পন্থার কোনটীরও অনুসরণ না করিয়া যে কোন্ যুগের ভদ্রতা রক্ষা করিয়াছেন তাহা আমাদের বুদ্ধির অগোচর। তজ্জন্য আমরা বিশেষ ক্ষুব্ধ।

সামতা গ্রামে যে ব্রাহ্মণ সভার অধিবেশন হইয়াছিল তাহা সত্য, তবে তাহার আলোচ্য বিষয়গুলির মধ্যে মাহিষ্য জাতি সম্বন্ধে প্রস্তাব লইয়াই কাব্যতীর্থ মহাশয় আমাদের উপর এই গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। আমরা সানুনয়ে প্রার্থনা করিতেছি যে, উক্ত সভার সভাপতি মহাশয় সত্য ঘটনা প্রকাশ করিবেন। তাহাতে আমাদের ভ্রম বুঝিতে পারিলে আমরা উক্ত সভার সকল ব্রাহ্মণের নিকটই ক্ষমাপ্রার্থী হইতে বাধ্য থাকিব।

গৌরহরি বাবুর পত্র :—

(প্রাপ্ত)

কুলিয়া, হাওড়া।

মহাশয়, ২১শে মাঘ, রবিবার।

পাণিত্রাস হাইস্কুলের হেড্‌পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ মহাশয়ের চেষ্টায় বিগত ৬ই মাঘ রবিবার উলুবেড়িয়া সবডিভিসনের অন্তর্গত ব্রাহ্মণ প্রধান মেল্লক গ্রামের পার্শ্ববর্ত্তী সানতা গ্রামে একটী মহতী ব্রাহ্মণসভার অধিবেশন হইয়াছিল। মেল্লক নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু দক্ষিণাপদ রায় চৌধুরী মহাশয় সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। সংবাদ পত্রে উচ্চপ্রশংসিত বহুনাট্যপ্রণেতা কল্যাণপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় সহকারী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। কল্যাণপুর নিবাসী প্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত বাবু হারাধন রায়, গোবিন্দপুর নিবাসী হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি স্থানীয় প্রধান প্রধান বহু সংখ্যক ব্রাহ্মণ উক্ত সভায় যোগদান করেন। এতদ্ব্যতীত পার্শ্ববর্ত্তী ৬।৭টী গ্রামের গণ্যমান্য ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় উক্ত সাধারণ ব্রাহ্মণ সভায় আহূত হইয়াছিলেন। আধুনিক ব্রাহ্মণদিগের সামাজিক ও নৈতিক উন্নতি অবনতির বিষয় সম্যক্ পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক যুক্তি তর্ক ও মীমাংসা দ্বারা সমাজ-সংস্কারকল্পে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করাই উক্ত সভার প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। কাব্যতীর্থ মহাশয় কর্ত্তৃক সভার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করা হইলে হরিবাবু স্বভাব-সিদ্ধ সুন্দর সুললিত ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করতঃ ব্রাহ্মণগণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া সমবেত ব্রাহ্মণমণ্ডলীর প্রশংসাভাজন হন। হরি বাবুর বক্তৃতা শুনিয়া সভাস্থ সকলেই বলিলেন, 'আজ হইতে আমরা ব্রাহ্মণেতর কোন জাতির প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করিব না,—আমরা ব্রাহ্মণ, তাহারা আমাদের পুত্র ; পুত্র যতই কু হউক না, তবু আমাদের পুত্র পরিত্যাজ্য নয়।' এই কথা শুনিয়া হরিবাবু অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে কাব্যতীর্থ মহাশয় ব্রাহ্মণ-সভার অন্যতম উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন—"পক্ষাশৌচধারী মাহিষ্যগণকে নাপিত দেওয়া হইবে কিনা—ইহাই সভার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, যে আজ প্রায় দেড় বৎসর কাল স্থানীয় ব্রাহ্মণগণের সহিত পক্ষাশৌচাবলম্বী মাহিষ্যগণের তুমুল বিবাদ চলিয়া আসিতেছিল, ফলে কয়েকটী ফৌজদারী মোকদ্দমারও সৃষ্টি হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ প্রমুখ ব্রাহ্মণগণ পাণিত্রাস গ্রামে একটী সভা

করিয়া মাহিষ্য সম্প্রদায়ের সহিত সর্ব্বপ্রকার সামাজিক সম্বন্ধ ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। এমন কি মাহিষ্যগণের নাপিত বন্ধ করিবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। মাহিষ্যগণকে একজন ভিন্ন ক্ষৌরকার নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। মাহিষ্যগণকে নাপিত প্রদান করা হইবে কিনা—এই প্রশ্ন উঠিলে পর হরিবাবু বলেন—"মাহিষ্যগণ কি এতই হীন যে নাপিতের জন্ম আমাদের অনুগ্রহপ্রার্থী? আর যে নাপিত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রাদি ছত্রিশ জাতির—এতদ্ব্যতীত ইংরেজ মুসলমান খ্রীষ্টান প্রভৃতি যে সকল জাতির—সকল অবস্থায় প্রতিদিন ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন করে—সেই নাপিত মাহিষ্যদিগকে প্রদান করা হইবে কি না মীমাংসা করিবার জন্ম ব্রাহ্মণ-সভা আহ্বান করা হইয়াছে? এবং ইহাই কিনা এই ব্রাহ্মণ সভার প্রধান উদ্দেশ্য!"

ন্যায়তীর্থ মহাশয় হরিবাবুর কথার অনেক প্রতিবাদ করেন। ক্রমে উভয়ের মধ্যে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা আরম্ভ হইল। কিন্তু ন্যায়তীর্থ মহাশয়ের অমূলক প্রতিবাদ যতই তীব্র হউক না কেন, হরিবাবুর ওজস্বিনী ও চিত্ত-চমৎকারিণী বক্তৃতার নিকট খরস্রোতমুখে তৃণের ন্যায় কোথায় চলিয়া গেল। অবশেষে স্থির হইল, ব্রাহ্মণ-সভা হইতে মাহিষ্যগণকে নাপিত প্রদান করা হইবে। নচেৎ মাহিষ্যগণে জব্দ করাই অনেকের উদ্দেশ্য ছিল,—কিন্তু ভগবান যাহার সহায় মানবে কি তাহাকে সমাজচ্যুত করিতে পারে? বলাবাহুল্য যে, হরিবাবু কর্ত্তৃক কৃষিবৈবর্ত্ত বা মাহিষ্যগণের পক্ষাশৌচ যে শাস্ত্রানুমোদিত তাহাও প্রতিপন্ন হইয়াছিল; নতুবা ব্রাহ্মণগণ প্রতিবাদে ক্ষান্ত হইতেন না, ইহাই আমাদের ধারণা। হরিবাবু এই সভায় কেবলমাত্র স্বভাব-সুলভ বাক্‌পটুতার পরিচয় দেন নাই—পরন্তু যথেষ্ট ব্রাহ্মণোচিত শাস্ত্রানুশীলনেরও পরিচয় দিয়াছিলেন।

হাওড়া জেলার অন্তর্গত সেনক, সামতা, পাণিত্রাস্ ও পার্শ্ববর্ত্তী আরও কয়েকটী গ্রাম লইয়া যে ব্রাহ্মণসমাজ গঠিত আছে, তাহাই ঐ জেলার আধুনিক অন্যান্য ব্রাহ্মণ সমাজের আদর্শ বলিয়া পরিগণিত, কারণ একস্থানে এত অধিক সংখ্যা ব্রাহ্মণের বাস হাওড়া জেলার অন্য কোনও স্থলে দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই আদর্শ ব্রাহ্মণ সমাজের ব্রাহ্মণগণের সহিত স্থানীয় মাহিষ্য সম্প্রদায়ের বর্ষাধিকব্যাপী সমাজ-সংঘর্ষণ যেমন অশান্তিময় তেমনই লজ্জাবাঞ্জক। সেই অশান্তিময় তুমুল সমাজ সংঘর্ষণের বিদ্বেষ-বহ্নি যে এত অল্পদিনে—এত অল্পায়াসে—নির্ব্বাপিত হইবে—তাহা আমাদের ধারণাতীত ছিল। এইজন্য

আমরা আজ সেই সমাজের নিয়ন্তা—দেশের হিতকারী—শান্তির প্রতিষ্ঠাতা—স্বধর্ম্মনিষ্ঠ উদারচেতা সুব্রাহ্মণ শ্রীযুক্ত হরিপদ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চরণযুগলে কৃতজ্ঞতা সহকারে ভক্তিকুসুমাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। শুধু হরিবাবু কেন, পণ্ডিতপ্রবর কাব্যতীর্থ মহাশয়কেও যথোচিত কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রদর্শন না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না। দেখিতে গেলে, কাব্যতীর্থ মহাশয়ের উদ্যমে আজ এই ব্রাহ্মণসভা সংস্থাপনরূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইল,—সাম্প্রদায়িক মনোমালিন্যের প্রধূমিত অন্তর্দাবানল নির্ব্বাপিত হইল। আশা করি যেন এই ব্রাহ্মণসভা উত্তরোত্তর উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণপূর্ব্বক সমাজের শিরোমণি রূপে বিরাজ করে এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়রূপ বিভিন্ন কুসুমদল একই সমাজসূত্রে সন্নিবেশিত করিয়া হিন্দুসমাজরূপ মনোরম মাল্য রচনা করিতে সমর্থ হয়। ভারতের গ্রামে গ্রামে এইরূপ এক একটী ব্রাহ্মণ সভা প্রতিষ্ঠিত হইলে যে অধঃপতিত ভারতভূমির লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া আসিবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

উপসংহারে মাসাশৌচাবলম্বী ও পক্ষাশৌচাবলম্বী দ্বিধা বিভক্ত পরস্পর বিবদমান মাহিষ্যগণের নিকট আমার নিবেদন যে, তাঁহারা যেন শাস্ত্রানুমোদিত পণ্ডিতজনসম্মত পন্থা অবলম্বনপূর্ব্বক আত্মবলক্ষয়মূলক কলহে নিরস্ত থাকিয়া মনুষ্যত্ব লাভ করেন ও মাহিষ্য জাতির লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হন। ইহাও মনে থাকা উচিত যে, আগে শাস্ত্র, পরে দেশাচার বা লোকাচার।

(স্বাক্ষর) শ্রীগৌরহরি চৌধুরী।

উদ্বোধন

(বঙ্গীয় মাহিষ্য-সমিতির ১৩১৯ বার্ষিক অধিবেশনে গীত)

ভো ভো সভাজন! পরম ভাজন, প্রীতি-নিরাজন আজি আয়োজন।
যথা সুবিহিত, বিধানবোধিত, সমাহিত-চিত করুন গ্রহণ॥
শুভ স্বস্তি ঋদ্ধি পুণ্যাহ বাচনে, জাতিরূপা জগজ্জননী অর্চ্চনে,
প্রেমানুরাগের সলিল সেচনে, পূত পুলকিত হ'ক জনে জন॥
শুভক্ষণে আজি শুভসম্মিলনে, শুভ আগমনে শুভ আন্দোলনে,
সমাজের শুভ শুদ্ধি সঙ্কল্পনে, হ'ক শুভ রীতি নীতির চলন॥
আজি এ পবিত্র মিলন মন্দিরে, মিলি এস ভাই অন্তরে বাহিরে,
একতার ফলে আশীর্ব্বাদ শিরে, অচিরে মোদের হইবে বর্ষণ।
লেখক, পাঠক, গ্রাহক, পোষক, গায়ক, গাথক কিম্বা সম্পাদক,
বক্তা, শ্রোতা আদি সমাজ সেবক, হউক সকলে সফল যতন।
গৌড়াদ্য বৈদিক ব্রাহ্মণ-সমাজ, জয়যুক্ত হউক মাহিষ্য-সমাজ,
শ্রীপঞ্চম জর্জ্জ রাজ-অধিরাজ, জয়যুক্ত হউক যাচে নারায়ণ।